দা ডিভাইন রিয়ালিটি

আল্লাহ, ইসলাম; এবং নাস্তিকতাবাদের মরীচিকা

হামজা জর্জিস

sean
PUBLICATION

দা ডিভাইন রিয়ালিটি

আল্লাহ, ইসলাম এবং নাস্তিকতাবাদের মরীচিকা

হামজা আন্দ্রেস জর্জিস

অনুবাদ

মাসুদ শরীফ

সম্পাদনা

আরিফ আজাদ

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

দ্য ডিভাইন রিয়ালিটি

হামজা আন্দ্রেস জর্জিস

প্রথম বাংলা-সংস্করণ
রজব ১৪৪১ হিজরি। মার্চ ২০২০
ISBN : 978-984-8046-00-5
www.seanpublication.com
+88 01781 183 501

হার্ডকাভার MRP: ৫৫০ টাকা।
পেপারব্যাক MRP: ৪৭৫ টাকা।

'The Divine Reality : Sroshta Islam and The Mirage of Atheism', by Hamza Andreas Tzortzis, translated by Masud Shorif, Edited by Arif Azad, published by Sean Publication Limited of Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
দোকান নং ৩, দ্বিতীয় তলা
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+88 01753 344 811

সূচি

অধ্যায় ৭

অধ্যায় ৮

অধ্যায় ৯

সম্পাদকের কথা

যদ্দুর মনে পড়ে, বাংলা অন্তর্জালে নাস্তিকতার সাথে আমার পরিচয় ঘটে ২০১৩ সালের দিকে। বাংলা ব্লগ দুনিয়ায় নাস্তিকদের তখন পোয়াবারো অবস্থা। তারা দিনরাত ইসলাম, মুসলিম, আল্লাহ, মুহাম্মাদ ﷺ, উম্মুল-মুমিনীন, কুরআনসহ ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান নিয়ে খিস্তি-খেউড় করত। তাদের সেই খিস্তি-খেউড়ের বিপরীতে মুসলিমদের অবস্থান বলতে একমাত্র সদালাপ ব্লগ ছাড়া বাংলা অন্তর্জালে আর কিছু চোখে পড়েনি তখন। এর কারণ হতে পারে বাঙালি মুসলমানেরা প্রযুক্তির সান্নিধ্যে তখনও ওভাবে আসেননি। ব্লগ দুনিয়ায় মুসলিমদের অনুপস্থিতিতে বাঙাল নাস্তিকেরা তাদের অন্তরের সমস্ত ক্লেদ, সমস্ত ঘৃণা, জিঘাংসা এবং বিদ্বেষকে রংচং এবং বিজ্ঞানের মোড়কে উপস্থাপন করে বেড়াত। ফলে নতুন নতুন যেসব মুসলিম তরুণেরা ইন্টারনেট দুনিয়ায় পা রাখত, শুরুতেই তাদের সাথে পরিচয় ঘটত নাস্তিকদের এই অন্ধকার দুনিয়ার। দুনিয়াটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকলেও বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে দুনিয়ার সমস্ত আলো বুঝি তারাই ধারণ করে বসে আছে। বাকি সবখানে কেবল বিশ্বাসের অন্ধকার। মানুষ যেভাবে আলেয়াকে আলো ভেবে ভুল করে, ঠিক মুসলিম তরুণদের একটি বিশাল অংশ তখন নাস্তিকদের সেই আলেয়াকে আলো ভেবে তার দিকে পা বাড়াচ্ছিল। ধর্মপ্রাণ পরিবার থেকে উঠে আসা তরুণেরা রাতারাতি পরিণত হচ্ছিল ধর্মদ্রোহীতে। যে-পিতা সন্তানের মননে খুব সযত্নে বুনে রেখেছিল বিশ্বাসের বীজ, নাস্তিকদের ছত্রছায়ায় এসে সেই মননে মহীরুহ হয়ে উঠছিল খোদাদ্রোহীতার চারা। এমনই একটি বিষাক্ত, দুর্গম, দুঃসহ সময়ের মধ্য দিয়ে কাটছিল তখনকার দিনগুলি।

এমন নয় যে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে মুসলিমরা কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেয়নি। নাস্তিকদের সকল প্রশ্নের জবাব যুগে যুগে মুসলিমরা দিয়ে এসেছে এবং এখনও দিচ্ছে। আমাদের ইমাম আবু হানিফা থেকে ইমাম গাযালি—মহান এই মানুষগুলোর জীবনের দিকে তাকালেই আমরা এর সত্যতা দেখতে পাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের মানসিকতায়। আমাদের তরুণেরা শিক্ষাবিমুখ। তারা নাস্তিকদের প্রশ্নগুলোকে যুক্তির বিচারে অব্যর্থ ভাবতে রাজি; কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোর বিপরীতে কোনো জবাব আছে কিনা আদৌ, এতটুকু পরিশ্রম তারা করতে রাজি নয়। ফলে, নাস্তিকদের প্রশ্নের বিপরীতে মুসলিম স্কলারদের ভুরি ভুরি কাজের যে-ভান্ডার, সেই ভান্ডার অবধি যাওয়ার ফুসরত আর হয়ে ওঠে না আমাদের প্রজন্মের। তারা ডুব দেয় একটি অন্ধকার গলির মাঝে। নাস্তিকতার রঙিন ফাঁদে তারা খুইয়ে বসে ঈমান।

আমি যে-সময়টায় নাস্তিকতার সাথে পরিচিত হয়েছি, সেই অবস্থা থেকে আমরা এখন অনেকখানি উত্তরণ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আরবি, উর্দু, ফার্সি এবং

ইংরেজিতে নাস্তিকতার বিপরীতে মুসলিমদের কাজ তো ছিলই, বাংলা ভাষাতেও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে, তাদের প্রশ্ন, যুক্তি, অপবাদের বিরুদ্ধে বেশ ভালো রকমের গোছানো কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। বাংলা ভাষায় নাস্তিকতার বিরুদ্ধে যে-কয়েকটা গোছানো কাজ হয়েছে, তাতে নতুন করে সংযোজন হতে যাচ্ছে উসতাদ হামজা আন্দ্রেস জর্জিসের *'দা ডিভাইন রিয়ালিটি'* বইটি।

ব্যক্তিগতভাবে বেশকিছু বছর আগ থেকে উসতাদ হামজাকে ফলো করি আমি। বেশ ভালো মানের আর্গুমেন্ট দাঁড় করানোর তার যে-সহজাত গুণ, সেই গুণ আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে। যখন তার *'দা ডিভাইন রিয়ালিটি'* পড়ার সৌভাগ্য হয়, তখন বেশ আপ্লুত হয়েছিলাম আমি। নাস্তিকতা নিয়ে ইংরেজি ভাষায় বিষয় ধরে ধরে জবাবমূলক একমাত্র বই সম্ভবত উসতাদ হামজার বইটি।

নাস্তিকদের প্রধান অস্ত্র হলো বিজ্ঞান এবং দর্শন। এ দুটো বিষয়ের মারপ্যাঁচে তারা এমন একটা ভাব দাঁড় করাতে চায় যেন দুনিয়ার তাবত বিজ্ঞান আর দর্শনের মূলমন্ত্র হলো একটাই—ধর্ম হটাও। আসলেই কি তা-ই? বিজ্ঞান কি সত্যিই খেদিয়ে বিদেয় করে দেয় ধর্মকে? দর্শন কি আসলেই অবান্তর বলে মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা এবং উত্তর দেওয়া সহজ না। এই সুযোগটাই লুফে নিয়েছে নাস্তিক-মহল। তারা সাধারণ মানুষের সামনে এমন একটা দৃশ্যপট তৈরি করেছে যেন বিজ্ঞান আর দর্শনে প্রবেশের প্রধানতম শর্তই হলো ধর্মকে জাদুঘরে রেখে আসা।

নাস্তিকদের এই কৌশল এখন বিশ্বব্যাপী প্রশ্নের সম্মুখীন। সারা পৃথিবীতে এখন ধর্মবাদীরা বিপুলভাবে এ-সকল তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করছে। বিজ্ঞান এবং দর্শন যে নাস্তিকদের একচেটিয়া কোনো সম্পত্তি নয়, এবং ধর্মের সাথে যে বিজ্ঞান-দর্শনের কোনো বিরোধ নেই, তা এখন বহুল আলোচ্য বিষয়গুলোর একটি। ঠিক এই বিষয়টিকেই প্রাধান্য করে তার বইটি সাজিয়েছেন উসতাদ হামজা। বিজ্ঞানের যে-ব্যাপারগুলোকে রংচং মাখিয়ে, দর্শনের যে-বিষয়গুলোকে ধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিকেরা দাঁড় করাত, ঠিক সেই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে একে একে সেগুলোর অপনোদন তিনি করেছেন তার *'দা ডিভাইন রিয়ালিটি'* বইতে। বইটিতে তিনি যেমন নাস্তিকতার অপনোদন করেছেন, ঠিক একইভাবে তিনি সত্য ধর্ম, সত্য উপাস্যের দিকেও মানুষকে আহ্বান করেছেন। বইটি যেমন নাস্তিকতার বিরুদ্ধে একটি শক্ত অবস্থান সমেত আমাদের সামনে আছে, একইভাবে দাওয়ার জন্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিশেবেও *'দা ডিভাইন রিয়ালিটি'* আমরা পাঠ করতে পারি।

অতীব প্রয়োজনীয় এই বইটিকে প্রচুর খাটা-খাটুনি করে অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই মাসুদ শরীফ। আমরা যারা এই বই থেকে উপকৃত হয়েছি এবং হব ইন শা আল্লাহ, তারা উসতাদ হামজার মতন মাসুদ শরীফ ভাইকেও দু'আতে রাখতে ভুলব না। বইটা সম্পাদনার গুরুভার আমার ওপর অর্পণ করেছিলেন উসতাদ-তুল্য রফিক ভাই। যদিও আমি এত উঁচু মানের বইটা সম্পাদনার যোগ্য ছিলাম না, তারপরও ভাইয়ের বদান্যতায় ধন্য হয়েছি। আল্লাহ যেন ভাইকেও উত্তম বদলা দান করেন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই বইটাতে কাজ করতে গিয়ে আমার জানার পরিধিও নতুন করে সমৃদ্ধ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সিয়ান পরিবারকেও অসংখ্য ধন্যবাদ মহামূল্যবান এই বইটিকে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করায়। সর্বোপরি এই বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রাণ খোলা দু'আ। আল্লাহ যেন এই বইটিকে তাঁর দীনের জন্য, বিভ্রান্ত মুসলিমদের হিদায়াতের উসিলা হিশেবে কবুল করেন। আমীন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লাবিল্লাহ।

আরিফ আজাদ

arifazad.bd@outlook.com

ফেব্রুয়ারি ২, ২০২০

অধ্যায় ১

নাস্তিকতাবাদ

শুরুতেই নাস্তিকতা বলতে আসলে কি বোঝায়, সে ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করা যাক। আক্ষরিক অর্থে Atheism মানে 'নাস্তিকতা'। আর এই Atheism-এ যারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে বলা হয় নাস্তিক। অর্থাৎ, নাস্তিক হলো এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ বা কোনো ধরনের ঈশ্বর, দেবদেবীতে বিশ্বাস করে না। শব্দটির মূল ধাতু হলো theos, যার অর্থ, 'কোনো ঈশ্বর বা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস'। দুটো শব্দই গ্রিক শব্দ থেকে আগত। তবে বর্তমানে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা বুঝতে হলে আভিধানিক অর্থের বাইরে আমাদের চোখ ফেরাতে হবে।

সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাস করার মানে আসলে কী? এর মানে কি নিজেকে যিনি নাস্তিক দাবি করেন, তার কাছে তার দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ আছে? নাকি স্রষ্টা বা ঈশ্বর সম্পর্কে আস্তিকরা যে ধরনের যুক্তিতর্কের অবতারণা করে থাকে, তাতে তিনি আস্থা রাখতে পারেন না? নাকি স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো ধারণাতেই তিনি বিশ্বাসী নন?

আদতে নাস্তিকতাবাদের সংজ্ঞা নিয়ে বিশেষজ্ঞরাও নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। সে যাহোক, দার্শনিক আলাপ-আলোচনা নিয়ে আমার আসলে কোনো আগ্রহ নেই। আমার আলোচনা নাস্তিকতার বাস্তব ও ব্যবহারিক বিষয়াদি নিয়ে।[১]

ওপরে বর্ণিত প্রথম প্রশ্নটিকে সামনে রেখে আগানো যাক।

যিনি নিজেকে একজন 'নাস্তিক' দাবি করে থাকেন, তার কাছে কি তার দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান আছে?

কেননা, জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে নিজেকে যিনি নাস্তিক দাবি করেন, তার কাছে এ-সম্বন্ধে প্রমাণ থাকা জরুরি। তিনি যদি দাবি করতে চান যে স্রষ্টা বলতে আদতে কেউ নেই, তা হলে তার দাবির পক্ষে তাকে অবশ্যই প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, তারা কি আস্তিকদের উপস্থাপিত কোনো যুক্তিতর্কের ব্যাপারে আশ্বস্ত নন?

ঘটনা যদি এটাই হয় তা হলে তো ব্যাপারটাকে মোটাদাগে আর নাস্তিকতাবাদের মাঝে ফেলা যায় না। ব্যাপারটা তখন চলে যায় সংশয়বাদের মধ্যে। সংশয়বাদী মানে হলো—যে ব্যক্তি স্রষ্টায় বিশ্বাসও করতে পারে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারে না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের একটা দোলাচলে তার অবস্থান। কেউ যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ের মধ্যে থাকে, তা হলে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি তাকে সঠিক যুক্তিপ্রমাণ দেওয়া যায়, তার তো অকপটে সেটা মেনে নেওয়ার কথা

শেষ প্রশ্নটি ছিল- 'নাকি তারা স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো ধারণাতেই বিশ্বাসী নন?'

কোনো ধরনের যৌক্তিক কারণ ছাড়া কেবল নিজের ইচ্ছে বা খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কেউ যদি স্রষ্টাতে অবিশ্বাস করে, তা হলে সেটা কাল্পনিক রূপকথা বা রাশিফলে বিশ্বাস করার মতোই একটা ব্যাপার।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাস্তিকদের সাথে বেশ কিছু আলোচনা-বিতর্কে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমি। আমার লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, নাস্তিকদের সাথে যদি এই প্রশ্ন রেখে আলোচনা শুরু করা যায় যে, 'কোনো ধরনের স্রষ্টায় আপনি বিশ্বাস করেন না কেন?', তা হলে এটা তাদের সাথে আলোচনার জন্য একটা চমৎকার সূচনা হতে পারে (দেখুন অধ্যায় ৪)।

এই প্রশ্ন দিয় আলোচনা শুরু করার ফলে তাদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের যে জবাব আসবে তা থেকে আপনি সহজেই তাদের সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌঁছাতে পারবেন। আপনি বুঝতে পারবেন তিনি আসলে কোন শ্রেণির লোক। তিনি কি সংশয়বাদী, নাকি যুক্তি-প্রমাণহীন নাস্তিক, নাকি স্রষ্টার অস্তিত্ব-বিরোধী কোনো প্রমাণ তার কাছে আছে।

সংশয়বাদীদের বেলায় স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করাই যথেষ্ট। তারা যদি আন্তরিক হন, আপনার উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণ যদি অকাট্য হয়, তা হলে তারা আপনার দাবি মেনে নিতে বাধ্য।

তারা যদি কোনো যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া এমনিতেই নাস্তিক হবার দাবি করে, আমি তখন তাদের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করি। জানতে চাই, স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পক্ষে কী প্রমাণ আছে তাদের কাছে? বিনা যুক্তিতে স্রেফ নিজের পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে কিছু বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার নেতিবাচক পরিণতি তুলে ধরি তাদের সামনে। তারা যদি দাবি করেন তাদের কাছে তাদের মতের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে, আমি তখন সেটা ভালোভাবে শুনতে ও বুঝতে চাই। একজন মুসলিম হিসেবে তখন আমার প্রথম কাজ হলো, তাদের উপস্থাপিত প্রমাণগুলোর যৌক্তিক ও নির্মোহ বিশ্লেষণ করা। এবং এর মাধ্যমে সেগুলোর মধ্যে তাদের বুঝের বাইরে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে সেগুলো একে একে অপনোদন করা। এরপর স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে ধরা।

তো, মোটা দাগে নাস্তিক হওয়া মানে:

- আল্লাহ বা কোনো স্রষ্টার ধারণায় অবিশ্বাস।
- আল্লাহর অস্তিত্বের স্বপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণের প্রতি অনাস্থা (সংশয়ী)।
- স্রষ্টা বলে কিছু নেই এমন একরোখা ধারণা।

নাস্তিকতা বিষয়ক অনেক চুলচেরা জটিল-কঠিন বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে, বেশির ভাগ নাস্তিকেরা আসলে স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণে আশ্বস্ত নন। তার মানে এরা ঠিক নাস্তিক নন; সংশয়বাদী। আল্লাহর অস্তিত্বের স্বপক্ষে তাদের উপযুক্ত যুক্তিপ্রমাণ দেওয়া গেলে তাদের বিশ্বাসী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল।

ওপরে নাস্তিকতার বাস্তব যে-সংজ্ঞা দিলাম, তার মানে কিন্তু এই নয় যে এর বাইরে অন্য কোনো ধরনের নাস্তিকের একেবারেই অস্তিত্ব নেই। কারও কারও মাঝে একাধিক নাস্তিকীয় ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

মানুষ তো আসলে কোনো বুদ্ধিমান যন্ত্র নয় শুধু। তার মন-মানসিকতা, চিন্তাধারা গড়ে ওঠার নেপথ্যে বিচিত্র কারণ থাকে। আবেগ-অনুভূতি, সামাজিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে ভূমিকা রাখে। এর সবগুলো উদ্‌ঘাটন তো চাট্টিখানি কথা নয়। তবে নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, নাস্তিকতাবাদ কেবলই যুক্তি আর বিজ্ঞানের ওপর ভর করে গড়ে ওঠা কোনো সিদ্ধান্ত নয়। বরং এর সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে বহুমাত্রিক মনস্তাত্ত্বিক নানা বিষয়। (তবে হ্যাঁ, সব নাস্তিকের বেলায় এটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে)।

স্রষ্টাবিদ্বেষ (Misotheism)

এটাকে ঠিক নাস্তিকতাবাদ বলা যায় না। তবে এটা যে স্রষ্টাকে অস্বীকার করার একটা ধরন তাতে সন্দেহ নেই। এই মতবাদ পোষণকারীরা সরাসরি স্রষ্টাকে 'অস্বীকার' করেন না; বরং তাঁকে তীব্র ঘৃণা করেন। তারা আফসোস করেন, যদি স্রষ্টা না থাকত তা হলে কতোই-না ভালো হতো!

স্রষ্টাবিদ্বেষের বিষয়টি এতদিন বেশ অন্ধকারেই ছিল। তবে এখন এটা নিয়ে কিছু বলা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ ধারণা করেন, কোনো কোনো নাস্তিকতাবাদের আসল মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিই হলো স্রষ্টাবিদ্বেষ। বার্নার্ড শোয়াইজার নামক এক সহযোগী অধ্যাপক একটি বই লিখেছেন এ বিষয়ে। কাজটি করতে গিয়ে বহু প্রসিদ্ধ চিন্তক আর লেখকদের বইপত্র ঘেঁটেছেন তিনি। এদের মধ্যে আছেন, অ্যালজার্নন

চার্লস সোয়াইনবার্ন, জোরা নিল হার্সটন, রেবেকা ওয়েস্ট, এলি উইসেল, পিট্‌র শাফার এবং ফিলিপ পুলম্যান।

বইটিতে তিনি এই মর্মে উপসংহারে এসেছেন যে, পৃথিবীতে এত অন্যায়-অবিচার, দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণা দেখে স্রষ্টাবিদ্বেষীরা একজন মহানুভব, মমতাময় স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা ঠিক মেনে নিতে পারেন না। তিনি দেখিয়েছেন, তাদের মাঝে যে "ইতিবাচক মানবিক হৃদয়াবেগ" আছে, সাধারণত ওটাই ইন্ধন জোগায় স্রষ্টাকে ঘৃণা করতে।[২]

শোয়াইজার আরও বলেছেন, স্রষ্টাবিদ্বেষীরা আবেগ-অনুভূতি এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অস্থির। তিনি বলেছেন,

> "যারা মানসিক, আবেগিক এবং শারীরিকভাবে জর্জরিত, স্রষ্টা থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি[৩]... স্রষ্টাবিদ্বেষীতার আগুন নেভাতে বা নাস্তিকতার পথ বন্ধ করতে তাদের সহযোগিতা করলেই যে তা কাজে আসবে—তা হলফ করে বলা যায় না।"[৪]

এধরনের মানুষগুলোর মধ্যে একেকজনের স্রষ্টাবিদ্বেষের ধরন একেক রকম। তবে মানুষের যন্ত্রণাভোগে স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে তাদের ধারণা মোটের ওপর এক। তারা মনে করেন:

> "একজন মহানুভব স্রষ্টার ভাবমূর্তির সঙ্গে দুনিয়াব্যাপী এত অন্যায়-অবিচার, দুঃখ-দুর্দশা কিছুতেই মানায় না। এটা তার কাছে স্রেফ কোনো ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণের বিষয় নয়। স্রষ্টাবিদ্বেষীরা সত্যিকার অর্থেই স্রষ্টাকে এসবের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন। দৈবাৎ যেকোনো অন্যায় বা অন্যায্য দুঃখভোগের জন্য তাঁকে দায়ী করেন তারা। মানুষের দুঃখভোগে স্রষ্টার ভূমিকাটাকে নাস্তিক ও স্রষ্টাবিদ্বেষীরা দেখে একদম উলটো দিক থেকে। এই স্রষ্টায় বিশ্বাসীরা বলবে, স্রষ্টাবিদ্বেষীদের কাল্পনিক এসব দাবি একেবারেই অযৌক্তিক। কিন্তু স্রষ্টাবিদ্বেষীদের মতে এখানে ঘটনাক্রমে স্রষ্টার ওপর দোষারোপ করা হয়নি, বরং তিনিই সব অন্যায়ের মূল উৎস, সব অন্যায়ের আসল কারণ।"[৫]

শোয়াইজার খুব গভীরভাবে চিন্তা করেছেন বিষয়টি নিয়ে। স্রষ্টাবিদ্বেষীতাকে তিনি তিন শ্রেণিতে শ্রেণিতে ভাগ করেছেন:

- সংশয়ী স্রষ্টাবিদ্বেষী
- সত্যিকার স্রষ্টাবিদ্বেষী, এবং
- রাজনৈতিক স্রষ্টাবিদ্বেষী।

তার মূল বক্তব্যটির সারাংশ করলে স্রষ্টাবিদ্বেষীদের প্রশ্নটিকে এক কথায় দাঁড় করানো যায় এভাবে:

> "মানুষ কী এমন অন্যায় করেছে যে, স্রষ্টা তাদের ওপর এত দুর্ভোগ চাপিয়ে দিচ্ছেন?"

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, নাস্তিক দাবিদারদের একটা বড় অংশ একইসাথে স্রষ্টাবিদ্বেষী।

তাদেরকে যদি বলা হয়, আচ্ছা 'যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তা হলে কি তাঁর আনুগত্য মেনে নেবেন আপনি?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই থলের বেড়ালটা বেরিয়ে আসবে। (দেখুন অধ্যায় ১৫)। আমার সাথে আলাপ হওয়া বেশির ভাগ নাস্তিক আমাকে এর উত্তরে 'না' বলেছেন।

পৃথিবীব্যাপী অকারণ অন্যায় ও দুঃখভোগের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে থাকেন স্রষ্টাবিদ্বেষীরা। মানুষের ওপর ঘটে চলা নির্মম সব অত্যাচার দেখে তাদের উদ্বেগ আর যন্ত্রণার প্রতি আমিও সহমর্মী। কিন্তু নাস্তিক আর স্রষ্টাবিদ্বেষীদের সমস্যা হলো—তাদের সমবেদনার সাথে এক ধরনের চাপা আত্ম-অহংকারও রয়েছে তাদের মধ্যে। নিজের চোখ ছাড়া অন্য চোখে তারা কখনও দুনিয়াকে দেখতে চান না কোনোভাবেই। আবেগী এক মিথ্যাযুক্তির কাছে নিজেদের তারা সোপর্দ করেন। স্রষ্টার ওপর মানবীয় গুণ আরোপ করে তাঁকে চিন্তা করেন অবতার হিসেবে। তারা মনে করেন, আমরা যেভাবে ভাবী, স্রষ্টাকেও সেভাবেই ভাবতে হবে। তাঁকে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে সবধরনের অন্যায় থামাতে হবে। এসব অন্যায় চলতে দিলে তাঁকে অবশ্যই আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে; কিংবা তাকে অস্তিত্বহীন ঘোষণা করতে হবে।

স্রষ্টার প্রকৃতিকে মানুষের মতো ভেবে নিয়ে তাকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করার কারণে সামগ্রিক বিষয়টিতে তাদের একধরনের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। এমনকি তারা এটা ভেবে উচ্ছ্বসিত হন যে, স্রষ্টার চেয়ে মানুষের মহানুভবতা বেশি। কিন্তু সত্যি হলো, তাদের এই বিশ্লেষণ, এই মূল্যায়ন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতাই স্পষ্ট করে দেয়। স্রষ্টার কর্মকাণ্ড ও ইচ্ছের প্রকৃতির মাঝে থাকা ঐশ্বরিক গতি-প্রকৃতি তারা ধরতে পারেন না।

বাস্তবতা হলো, দুনিয়াজুড়ে ঘটে চলা অন্যায়, নিপীড়ন তো আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এটাও ভাবার অবকাশ নেই যে, এইসব অন্যায় নিপীড়ন দেখে তিনি আনন্দ পান, আর এজন্য তিনি এসব থামাচ্ছেন না।

বাস্তবতা হলো, তিনি এমন পূর্ণ ও সামগ্রিক দৃশ্যপটটি একই সাথে দেখতে পান, যা আমরা দেখি না; আমরা দেখি সেই পূর্ণছবির ক্ষুদ্র একটি অংশ। এটা বুঝতে পারলে মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক এক প্রশান্তি অনুভব হয় মনে। এটা অনুধাবনের কারণে

বিশ্বাসীরা বোঝে, পৃথিবীতে ঘটা প্রতিটি ঘটনার সুতো বাঁধা আছে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার সাথে। এর মাঝেই আছে কল্যাণ। কিন্তু স্রষ্টাবিদ্বেষীরা তা মানতে নারাজ। তারা কোনো যুক্তিও শুনতে আগ্রহী নন। নিজেদের উদ্ধত স্বভাব আর অহংএর মাঝে পড়ে থাকেন তারা। একসময় তারা হতাশ হয়ে পড়েন। ব্যর্থ হন তাঁর পরীক্ষায়। স্রষ্টাকে ঘৃণা করতে করতে একসময়ে তারা স্রষ্টাকে ভুলেই যান একেবারে। ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা, মমতা আর কল্যাণকেই তখন বাতিল করে দেন তারা (দেখুন অধ্যায় ১১)।

নাস্তিকতাবাদ এবং দার্শনিক প্রকৃতিবাদ

নাস্তিকতাবাদ ইস্যুতে ইসলাম কী বলে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। তবে তার আগে দার্শনিক প্রকৃতিবাদ নিয়ে দুটো কথা বলতে চাই। কারণ, বইয়ের বেশ কিছু অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গটি আসবে।

নাস্তিকতাবাদের মতো দার্শনিক প্রকৃতিবাদও[৬] ঐশ্বরিক সত্তা এবং অতিপ্রাকৃত যেকোনো কিছুকে অস্বীকার করে। এজন্য দেখা যায়, বেশির ভাগ নাস্তিক আসলে দার্শনিক প্রকৃতিবাদী ধারণা পোষণ করেন। দার্শনিক প্রকৃতিবাদ মানে, জগতে ঘটা প্রতিটি ঘটনাকে ভৌতিক প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করা। মতবাদটি বলে, প্রাকৃতিক এসব প্রক্রিয়ার পেছনে বিশেষ কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য নেই।

দার্শনিক প্রকৃতিবাদীরা সবধরনের অতিপ্রাকৃত দাবিকে অস্বীকার করেন। কেউ কেউ বলেন, দৃশ্যমান জগতের বাইরে যদি কিছু থেকেও থাকে, এর সঙ্গে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সের মতে, সব নাস্তিকই মূলত দার্শনিক প্রকৃতিবাদী। তিনি বলেন, একজন নাস্তিক "বিশ্বাস করে, এই প্রাকৃতিক ও জড়জগতের বাইরে কিছু নেই"।[৭]

তবে যারা একটু চিন্তাশীল নাস্তিক তারা অবশ্য প্রকৃতিবাদী নন। তারা স্রষ্টার অস্তিত্বে অস্বীকার করলেও অতিপ্রাকৃতিক অনেক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও স্বীকার করেন। তাই আস্তিকদের পক্ষে এদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করা তুলনামূলক সহজ। কারণ, তারা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের সম্ভাবনা স্বীকার করেন বলে আস্তিকদের কিছু ধ্যানধারণার সাথে তাদের চিন্তার মিল পাওয়া যায়।

স্রষ্টার অস্তিত্বের বিপক্ষে অবস্থানকারী বেশির ভাগ নাস্তিকেরা আসলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দার্শনিক প্রকৃতিবাদই গ্রহণ করেন। সে যাহোক, কেউ দার্শনিক প্রকৃতিবাদী হন কি না হন, এই বইয়ে উপস্থাপিত বেশির ভাগ যুক্তিপ্রমাণগুলো উভয় ধরনের নাস্তিকদের সাথেই ব্যবহার করা যাবে।

নাস্তিকতার ইসলামি সংজ্ঞা

নাস্তিকতাবাদকে ইসলামে বলা হয় 'ইলহাদ'। এর আক্ষরিক অর্থ 'বিচ্যুতি'। শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ 'লাহাদ' থেকে। এর মানে পাশে অন্য আরেকটি গর্তওয়ালা কবর। অর্থাৎ মূল গর্ত থেকে বিচ্যুত আরেকটি গর্ত। ভাষাতাত্ত্বিকভাবে 'ইলহাদ' মানে প্রাকৃতিক ও যৌক্তিক কিছু থেকে বিচ্যুতি। নবি মুহাম্মাদ ﷺ জানিয়েছেন, প্রতিটি মানুষ সহজাতভাবেই মহান আল্লাহকে উপলব্ধি করার প্রকৃতি বা স্বভাব নিয়ে জন্ম নেয়। তাঁর আনুগত্যের প্রতি এক তীব্র অনুরাগ থাকে মানুষের প্রকৃতির মাঝে (দেখুন অধ্যায় ৪)।[৮] নাস্তিকতা যে মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি এবং স্বাভাবিক চিন্তার বিরোধী তার পরিষ্কার প্রমাণ নিহিত আছে এই হাদীসে।

ইসলামি ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে আছে স্রষ্টা (আল-খালিক), ভরণ-পোষণদানকারী (আল-মুকীত), মহাউদ্ভাবক (আল-মুবদি)।

নাস্তিকেরা যেহেতু জগতের কোনো স্রষ্টা আছে বলে বিশ্বাস করেন না, তাই তারা এই নামগুলোকে অস্বীকার করেন। স্রষ্টার একত্ব বা তাওহীদে বিশ্বাস অনুযায়ী, মহান আল্লাহর যেকোনো নাম ও গুণাবলিকে অস্বীকার করা একধরনের শির্ক বা পৌত্তলিকতা (দেখুন অধ্যায় ১৫)। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এজন্য নাস্তিকদেরকে পৌত্তলিক হিসেবেও ধরা হয়।

স্রষ্টাতে অস্বীকারকারীদের সম্বন্ধে কুরআন বলে, তারা "দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে"।[৯] স্রষ্টার একত্বে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলে, "বোধ-বিবেচনাহীন"।[১০] এ থেকে বোঝা যায়, পৌত্তলিকরা, এবং আরেকটু বিস্তৃত পরিসরে, নাস্তিক্যবাদীরা অযৌক্তিক, অপরিণামদর্শী এবং অবিবেচক। এককথায় ইসলামের চোখে নাস্তিকতাবাদ হচ্ছে, অনিশ্চয়তা ও অযৌক্তিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ এক দৃষ্টিভঙ্গি।

নাস্তিকতাবাদ নিয়ে ইসলামের সংজ্ঞাটি সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়। কারণ, ইসলাম নাস্তিকতা ও আস্তিকতার মধ্যবর্তী কোনো বিশ্বাস নয়; বরং ইসলাম মহান স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বে নিশ্চিত বিশ্বাসভিত্তিক একটি জীবনব্যবস্থা। নাস্তিকতাবাদকে মানুষের মৌলিক অবস্থান বিবেচনা করে না কুরআন। এজন্য নাস্তিকতা নিয়ে কুরআন তেমন আলোচনারও অবতারণা করেনি; গোটা কুরআনের মধ্যে বড়জোর দুটো আয়াত সরাসরি নাস্তিকতাবাদ নিয়ে কথা বলেছে, (দেখুন অধ্যায় ৫)।

জীবন ও জগতের সৃষ্টি-রহস্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কুরআনের অনেক আয়াত বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরে। পাশাপাশি নির্দেশ করে, এই মহাজগৎ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে মহান স্রষ্টার সুগভীর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা; এবং এসব সৃষ্টির পেছনে তাঁর সুনির্দিষ্ট

উদ্দেশ্যও রয়েছে। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে কেবল আল্লাহই যে আমাদের উপাসনা পাওয়ার একমাত্র হকদার, আয়াতের ভাবভঙ্গিগুলো সেদিকে সুস্পষ্ট প্রণোদনা দেয়, (দেখুন অধ্যায় ১৫)। নাস্তিকতাবাদকে নাকচ কিংবা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবেই বিবেচনা করে না কুরআন। কেননা, তার দৃষ্টিতে এটা প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতাকে অস্বীকারকারী এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অবস্থান (দেখুন অধ্যায় ৪)।

নাস্তিকতাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইসলামের ইতিহাসে

৮ম শতকে 'যাহরিয়া' মতবাদীদের আবির্ভাবের আগে ইসলামের বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনো সামাজিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক হুমকি হয়ে ওঠেনি নাস্তিকতাবাদ। যাহরিয়াগণ ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী। তাদের মতে, জ্ঞান কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতির মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব। তারা মনে করতেন, এই মহাবিশ্ব চিরন্তন, অর্থাৎ, মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে অস্তিত্বে আছে এবং তা অসীম সময় ধরে অস্তিত্বশীল থাকবে। তাদের ধারণা মতে, এই মহাবিশ্ব চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং বাদ-বাকি সবকিছুর অস্তিত্বের পেছনে এই বৈশিষ্ট্যগুলোই দায়ী। তাদের বিবেচনায়, সবকিছু সব সময়ই অস্তিত্বশীল ছিল। কোনো কিছু অস্তিত্বে আসার জন্য কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন নেই।[১১]

বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও হানাফি মাযহাবের প্রাণপুরুষ ইমাম আবু হানিফার সাথে এক যাহরিয়া মতবাদীর বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন ফারাজ ইস্পাহানি তার কিতাবুল-আগানি নামক গ্রন্থে। উন্মুক্ত বিতর্কগুলোতে যাহরিয়াদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নাকাল করে ছাড়তেন ইমাম আবু হানিফা (দেখুন অধ্যায় ৮)।

যাহরিয়া মতবাদীদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করেছেন ইমাম গাযালি, ইবনুল-জাওযি, জাহিয, মুহাম্মাদ বিন শাবিব, ইবনু কুতাইবা, আবু 'ঈসা আল ওয়ার্‌রাক-সহ বহু ইসলামি বিদগ্ধ ব্যক্তিরা।[১২] 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' বইতে যাহরিয়াদের খণ্ডিতবাদী বলেছেন ইমাম গাযালি। তিনি দেখিয়েছেন, মহাজগৎ এবং এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সামগ্রিক কোনো বুঝ নেই তাদের। তিনি বলেছেন, এরা কাগজের ওপর ঘুরে বেড়ানো পিঁপড়ের মতো। কলমের নড়চড় আর কালির বাইরে দৃষ্টি মেলতে পারে না তারা। ফলে দেখতে পায় না মূল লেখককে।[১৩]

তবে নাস্তিকতাবাদের এই ইসলামি ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সে সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা বা বিতর্কের জন্য একটি চমৎকার পরিবেশ ছিল। আর এটা কেবল সেই সমাজেই সম্ভব, যেখানে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ ও সহনশীলতা বজায় থাকে। এর কারণ হলো, কুরআন এটা একেবারেই স্পষ্ট করে

দিয়েছে যে, মানুষের মধ্যে নানারকম বিশ্বাস থাকা মহান আল্লাহর ইচ্ছেরই একটি অংশ। এবং বিশ্বাসের ব্যাপারে কারও ওপর জবরদস্তি করা যাবে না। বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহনশীল মনোভাব থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলছে:

> "তোমার প্রভু চাইলে, পৃথিবীর বুকে সবাই বিশ্বাসী হতো—একজনও বাকি থাকত না। তারপরও কি মানুষদের বিশ্বাসী বানানোর জন্য জোরাজুরি করবে?[১৪]"

> "দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।"[১৫]

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়টি সম্বন্ধে খুব সুন্দর এক মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট ইসলাম-বিশারদ ড. জাফার ইদ্রিস:

> "অনৈসলামি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়টি ইসলামের একটি অপরিহার্য মূলনীতি। কুরআনের বহু আয়াতে স্পষ্ট করে বলা আছে এটা। মুসলিমেরা তার চর্চাও করে গেছেন ইতিহাস-জুড়ে। বাইরে থেকে নিজেদের ধর্মে এটা আমদানি করেননি তারা। আবার এমনও না যে, পরিস্থিতির কারণে এধরনের কিছুর আশ্রয় নিতে হয়েছে। এটা ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃতিগত দাবি।"[১৬]

বর্তমান সময়ে ইসলামের যুক্তিভিত্তিক বুনিয়াদগুলোকে যেসব বিতর্কের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সেগুলোর মোকাবিলা করার ব্যাপারে মুসলিমদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী থাকা উচিত। কারণ, ইসলামের কালজয়ী সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যেই নাস্তিক-সেক্যুলারদের কথিত এসব 'নতুন' আপত্তির জবাব দেওয়া আছে। সত্যি বলতে কী, মুসলিম জাতির মধ্যে এত বড় উঁচু স্তরের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, যাদের কাছে এসব কথিত আপত্তির জবাব প্রদান কোনো ব্যাপারই নয়। এখন প্রয়োজন শুধু জ্ঞানের এই বিশাল ভান্ডার থেকে তথ্য জোগাড় করে বর্তমান সময়ের উপযোগী করে উপস্থাপন করা।

পশ্চিমাবিশ্বে নাস্তিকতাবাদ

মাত্র হাজার বছর আগেও পশ্চিমা সমাজে নাস্তিকতা কোনো জনপ্রিয় বিষয় ছিল না। এমন ধ্যানধারণার অনুসারী-সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। ইতিহাসবিদদের মতে, এসময়ে কিছু কিছু ব্যক্তি "[নিজেদের] অবিশ্বাস উচ্চারণের স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন কোনো কোনো দুঃসাহসী দার্শনিক। তবে এসব তত্ত্ব তারা বাস্তবে কোনো প্রয়োগ করতে পারেননি। কিংবা ধর্মীয় আচারপ্রথাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেননি।"[১৭]

নাস্তিকতাবাদ শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় প্লুটার্কের 'অন সুপারস্টিশান' বইয়ের অনুবাদে গ্রিক পণ্ডিত স্যার জন চেকের লেখায়। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে নাস্তিকতাবাদের কারণে বিতর্কিত লেখালেখি জন্ম নেয় ফ্রান্সে।[১৮] সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে বিষয়টিকে হুমকি মনে করা হতো। খ্যাতিমান ব্রিটিশ নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক জোসেফ অ্যাডিসনের একটি বই আছে 'দ্যা এভিডেন্স অফ দ্যা ক্রিস্টিয়ান রিলিজিয়ন' নামে। সেখানে নাস্তিকতাবাদের বিরুদ্ধে লেখা একটি অধ্যায়ে বিষয়টিকে তিনি দেখিয়েছেন এভাবে:

> "এসব অতি উৎসাহীদের মাঝে হাস্যকর আর বিকৃত চিন্তার কিছু বিষয় আছে। ঠিকঠাকভাবে তা তুলে ধরা মুশকিল। এরা আসলে এক ধরনের অস্থির জুয়াড়ি। অথচ সত্যি বলতে কিছু নিয়েই তারা বাজি ধরেননি। তারা মানুষকে অবিরতভাবে একটা বিষয়ের দিকে ডেকে যাচ্ছেন। অথচ এ থেকে না তারা নিজেরা কিছু পাবেন, আর না যাদের ডাকছেন তারা কিছু পাবেন। মোদ্দাকথা, নাস্তিকতাবাদ বিষয়টার চেয়ে ওটা ছড়ানোয় তাদের যে-বেদম উৎসাহ সেটাই বেশি অযৌক্তিক। নানা ধরনের পরস্পরবিরোধী আর অলীক মতামতের সাথে ঘোঁট তাদের। অথচ ধর্মের মাঝে সামান্য জটিলতা পেলেই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। খ্যাতনামা নাস্তিকদের মতানুসারে জগতের কার্যকারণীয় বা চিরন্তন গঠন, চিন্তাশীল সত্তা ও আত্মার নশ্বরতা, মানবদেহের দৈবাৎ গঠন, বস্তুর গতিশীল অবস্থা, মহাকর্ষ বলের মতো বেশ কিছু বিষয় আছে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তুর তালিকায়। যে-ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাদের এত তীব্র বিরোধিতা, তার চেয়ে এসব ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতে কি বেশি মাত্রার নিশ্চয়তার প্রয়োজন হয় না? এ প্রজন্মের কলহবাজদের তাই উপদেশ দিতে চাই, নিজেদের এবং জনগণের কল্যাণের স্বার্থে তারা যেন অন্তত নিজেদের ব্যাপারে স্থির থাকে। ধর্ম নিয়ে বিরোধিতার কারণে অতি উৎসাহের দহনে যেন আর না জ্বলে। নির্বুদ্ধিতার কারণে যেন ধর্মান্ধতায় না পোড়ে।"[১৯]

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্ম নিয়ে কীরকম আবেগময় ও প্রচণ্ড ধরনের কথাবার্তা হতো তার একটা আভাস মেলে এখানে। নাস্তিকতাবাদ তখন ব্রিটেনে মোটেই কোনো জনপ্রিয় আন্দোলন ছিল না। তবে ততদিনে অবিশ্বাসের একটা বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে মাটি ফুঁড়ে বের হতে শুরু করেছিল তার ফল।

নাস্তিকতাবাদ নিয়ে তখনকার সময়ে চলমান আলোচনায় এডিসনের মন্তব্যটি পক্ষপাতদুষ্ট অবশ্যই। তবে বিষয়টি নিয়ে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ ভালো রকমের কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি হয়েছিল ইউরোপে। একারণে কেতাবি ধরনের

সংশয়বাদ এবং যুক্তিনির্ভর নাস্তিকতাবাদের পথ সুগম হয়েছিল তখন। অনেক দার্শনিক আর চিন্তাবিদদেরও ভূমিকা ছিল এসবের পেছনে।

১৬৮৯ সালে 'ডি নন এক্সিসটেনশিয়াল ডাই' গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসলেন পোলিশ চিন্তাবিদ কাজমির লুইশনিস্কি (Kazimierz Lyszczynski)। তার মতে ঈশ্বর জিনিসটা মানুষের কল্পনায় বানানো। অন্যের ওপর জোর খাটাতে তাঁর একটা ধারণা তৈরি করেছে মানুষ। জার্মান সমালোচক ম্যাথিয়াস নুজেন (Matthias Knutzen) বেশ ভালো-সংখ্যক সমর্থন পেয়েছিলেন নাস্তিকতাবাদী লেখালেখি করে। ১৬৭৪ সালের দিকে এসব নিয়ে কলম চালান তিনি। ১৭০০ শতাব্দীর দিকে ডেভিড হিউম ও ভলতেয়ারের প্রচার করা কিছু যুক্তিতর্ক আর ধ্যানধারণা পরবর্তী সময়ে নাস্তিকতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ইন্ধন হিসেবে কাজ করে। যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে নিজের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক যুক্তি দেখিয়ে ভলতেয়ার বলেছিলেন, একজন ঈশ্বর আছেন; তবে মানুষের যাপিত জীবনে তাঁর আদেশ-নিষেধ সম্বলিত ওয়াহি আর ধর্মীয় জ্ঞানের কর্তৃত্বকে নাকচ করে দেন তিনি।

অন্যদিকে, ঈশ্বর ও ধর্ম নিয়ে বেশ কিছু সংকলন বের করেন ডেভিড হিউম। তিনি বলে বসেন, ঈশ্বরের ধারণাটাই অবোধগম্য। ঈশ্বরকে যে থাকতেই হবে এই ধারণার বিরোধিতা করেন তিনি। চেষ্টা করেন পরিকল্পনা যুক্তির (argument from design) দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা উন্মোচন করতে (দেখুন অধ্যায় ৮)। তার মতে, পৃথিবীতে অন্যায় এবং যন্ত্রণাভোগের ব্যাখ্যা কী হতে পারে সে-বিষয়টা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চ্যালেঞ্জিং। প্রাচীন দার্শনিকদের যুক্তির অনুরণনে ঈশ্বরকে তিনি অস্বীকার করেননি বটে; তবে অন্যায়ের মাত্রা এবং মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর ন্যায্যতা প্রতিপাদনে আমাদের অক্ষমতার দিকে আঙুল তুলেছেন (অধ্যায় ১১)। তার সমালোচনাগুলোর ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় ধর্মীয় অলৌকিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে। তিনি মনে করতেন, কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে যদি প্রত্যক্ষদর্শীদের ভুল করার সম্ভাবনা কম হয়, কেবল তখনই এসবে বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

১৯ শতাব্দীতে নাস্তিকতাবাদের ঝান্ডা উড়িয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নেন তৎকালীন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য চার্লস ব্র্যাডলাফ। সমাজের চোখে নাস্তিকতাবাদকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। জীবদ্দশায় তিনি লক্ষ্যটা অর্জন করে যেতে না পারলেও, পরবর্তীদের জন্য সহজ করে গিয়েছিলেন কাজটা।[২০] 'অবিশ্বাস থেকে মানবতার প্রাপ্তি', 'নাস্তিকতাবাদের কৈফিয়ত', 'সংলাপে সংশয়[২১]' নামে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। লেখনীর মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করেছেন "নাস্তিকীয় মতবাদ লালনকারী, এবং অন্যায়ভাবে যাদের নাস্তিক্যবাদী বলে সন্দেহ করা হয়, তাদের ব্যাপারে কিছু প্রচলিত পূর্বধারণা"[২২] দূর করতে। নাস্তিকতাবাদ

গ্রহণে ব্রিটিশ সমাজকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, এটা যে উলটো মানুষকে সুখী করে, সমাজে কল্যাণ বাড়ায়—এসব প্রচারেও ছিলেন সরব। 'অবিশ্বাস থেকে মানবতার প্রাপ্তি' প্রবন্ধে ব্র্যাডলাফ লিখেছেন, "সংশয়বাদিতা থেকে মানবসমাজের প্রাপ্তি সবচে বেশি। খ্রিষ্টধর্ম এবং এর পূর্বেকার ধর্মবিশ্বাসগুলো থেকে ধীরে ধীরে সরে আসাটা মানুষের সুখ ও কল্যাণ বাড়িয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়ে যাবে।"[২৩]

১৯২০-এর দশকে আবির্ভাব ঘটে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের। বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রায় অনুপ্রাণিত সংস্কারপন্থি দার্শনিকদের এই আন্দোলনের মূল কথা হলো: কোনো বক্তব্য যদি অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা যায়, কেবল তখনই তা অর্থবহ। কারও কথা যদি ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব না হয়, তাদের মতে, সেটা অর্থহীন। তাদের বিবেচনায় বস্তুজগতের বাইরে কিছু নেই। কোনো বক্তব্য হয় সরাসরি বোঝা যায়, নয় পর্যবেক্ষণ করে। যেমন, 'বলটি লাল'—একথাটি সত্য, কারণ দেখাই যাচ্ছে বলটি লাল। আবার, 'বলটি বাউন্স খাচ্ছে'—একথাটি আমরা বলটির দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। কোনো কিছুর অর্থ নির্ণয়ে অভিজ্ঞতাবলে অর্জিত জ্ঞানকে নিক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন এরা। তাদের মানদণ্ড অনুযায়ী, কোনো কিছুকে সত্য হতে হলে তাকে অবশ্যই বস্তুগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করে দেখতে হবে। তাদের কাছে এজন্য স্রষ্টা, অধিবিদ্যা, নৈতিকতা আর ইতিহাস-সংক্রান্ত বিষয়ের অনেক কিছুই অর্থহীন। স্রষ্টাকে যেহেতু বস্তুগত দিয়ে যাচাইয়ের সুযোগ নেই, নাস্তিকতাবাদ তাই তাদের প্রাথমিক অবস্থান।

৬০-এর দশকেই যবনিকা পতন হয় এই মতবাদের। এর অন্যতম কারণ, তাদের মতবাদটা ছিল আত্মঘাতী। তাদের কাছে অর্থবহতার মানদণ্ড ছিল যেকোনো বিষয়কে জাগতিক অভিজ্ঞতায় যাচাই করা। কিন্তু এই মানদণ্ডটাই তো জাগতিক অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা সম্ভব নয়! তার মানে তাদের ঠিক করা মানদণ্ডটাই অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে।

এদের অবসানের পর বিদ্যোৎসাহী মহলে নতুন করে জেগে ওঠে আস্তিকতাবাদ। বুদ্ধিবৃত্তিক এ নবজাগরণ নিয়ে টাইম ম্যাগাজিন বলেছিল, "মাত্র দু-দশক আগেও কেউ চিন্তা করতে পারেননি। কিন্তু চিন্তা ও যুক্তির জগতে ঘটে চলছে এক নীরব বিপ্লব: ঈশ্বর ফিরে আসছেন। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, কথাগুলো ধর্মবেত্তা বা সাধারণ বিশ্বাসীদের মধ্যে হচ্ছে না; হচ্ছে কেতাবি দার্শনিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে। অথচ একসময় ওখানে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বশক্তিমানকে নিয়ে আলোচনা ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন সেখানেই নতুন করে হাওয়া লেগেছে এ আলোচনার পালে।"[২৪]

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বেশ কৌতূহল-জাগানিয়া কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কারণে নতুন করে প্রাণ পায় বুদ্ধিজাত আস্তিকতা। আগে মনে করা হতো, এই মহাজগৎ বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিরন্তন কাল থেকে; কোনো স্রষ্টা নেই এর।

কিন্তু 'বিগ ব্যাং' বলল মহাজগতের শুরু আছে (দেখুন অধ্যায় ৫)। ৭০-এর দশকে জ্যোতির্বিদগণ মহাজগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিষয়ে খেয়াল করলেন; করলেন চুলচেরা সূক্ষ্ম পরিমাপ ও বিশ্লেষণ। তারা বুঝলেন, মানুষের মতো জটিল চেতন প্রাণের জীবনধারণের জন্য জগতের সব নিয়ম ও বিন্যাস আসলে পরিকল্পিত, সুসংগতিপূর্ণ (দেখুন অধ্যায় ৮)।

গত শতকের শুরুর দিকে জীববিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ছিল অপর্যাপ্ত। আমরা ভাবতাম প্রাণীদেহের ক্ষুদ্রতম উপাদান কোষ বুঝি শুধু প্রোটপ্ল্যাজম-জাতীয় এক তরল উপাদান। কিন্তু ১৯৫৩ সালে জেইমস ওয়াটসন এবং ফ্র্যান্সিস ক্রিক ডিএনএ'র সর্পিলাকার কুণ্ডলী আবিষ্কার করলেন। এরপর তো রীতিমতো বিপ্লব ঘটে গেল অণুজীববিদ্যায়। আণুবীক্ষণিক পর্যায়ে একে একে বের হতে লাগল চমৎকার এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানা বিষয়। জিন-সংকেতের সার্বজনীনতার বিষয়টি ক্রিককে (যিনি নিজেই একজন নাস্তিক) এত অভিভূত করে যে, এগুলো দৈবাৎ হওয়ার মত থেকে ফিরে এসে তিনি বলতে বাধ্য হন— এখানে নিশ্চিত সৃষ্টিজগতের বাইরের কারও হস্তক্ষেপ আছে।[২৫] এসব আবিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি—সেই সাথে এগুলোর দার্শনিক সম্ভাবনা—ধীরে ধীরে আস্তিকতা পুনরায় ফিরে আসে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং কেতাবি আলোচনার টেবিলে। আজ আস্তিকতা সর্বাধিক সম্মানজনক বুদ্ধিবৃত্তিক মত।

বর্তমানে স্রষ্টা-বিষয়ক ধাঁধা দূর করতে অনেক প্রকাশনী বই ছাপাচ্ছে। জনপ্রিয়ও হচ্ছে বইগুলো। সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমগুলোতেও এ-সংক্রান্ত অনেক পোস্ট চোখে পড়ছে অধুনা।

নাস্তিকতাবাদের বিকাশ

তবে, এরপরও নাস্তিকতাবাদ আজ দ্রুত-বর্ধমান একটি সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। নিজেদের নাস্তিক বা নিধার্মিক দাবি করা লোকদের সংখ্যা গত ২০ বছরে বেড়েছে অনেক। নব্য নাস্তিকতাবাদ নামে পরিচিত এই আন্দোলনটি নাস্তিকতাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের (এটাকে নাস্তিকতাবাদের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়) পক্ষে তাদের যুক্তি তুলে ধরছে। রিচার্ড ডকিন্স, স্যাম হ্যারিস, ক্রিস্টোফার হিচেন্স এবং ড্যান ডেনারের মতো আধুনিক নাস্তিক্যবাদী লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ব্যাপকভাবে এর প্রচার করছেন। তাদের বইগুলোও পেয়েছে পাঠকপ্রিয়তা এবং বহুল বিক্রীত হবার মর্যাদা। হাজার হাজার লোক তাদের বক্তৃতা শুনছেন, দেখছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন, তাদের যুক্তির ভাষা আপত্তিজনক, ভ্রান্ত এবং স্থূল।

ক্রিস্টোফার হিচেনস বলেছেন, "ধর্ম সবকিছুকে বিষাক্ত করে তোলে",[২৬] স্যাম হ্যারিস বলেছেন, "আমাদের ধর্মীয় পরিচয়ের দিন তবে শেষ হলো"।[২৭] রিচার্ড ডকিন্স

স্রষ্টাকে "মোহ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৮] আদর্শগত দিক থেকে তাদের মাঝে মৌলিক কিছু মিল থাকলেও, মতগত পার্থক্যও কম নয়। কোনো কোনো পণ্ডিত নাস্তিক তো নব্য নাস্তিকদের এসব কথার সঙ্গে দ্বিমতও করেন। দার্শনিক টিম ক্রেইন যেমন লিখেছেন:

> "আমার কাছে মনে হয়, নব্য নাস্তিকদের অনেক দাবিই সত্য নয়। পৃথিবীতে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক দিক থেকেই ভুল। পৃথিবীর সমস্যা মোকাবিলায় ধর্ম সম্পর্কে এভাবে আগানোটা সুস্থ বোধবিবেচনা-সম্পন্ন কর্মপন্থা হতে পারে না। মানুষের বিশ্বাস বদলানো—বিস্ময়করভাবে কঠিন। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট এখানে—আর যা-ই হোক, তাদের [অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসীদের] গর্দভ, যুক্তিহীন বা অকর্মণ্য অজমূর্খ বলাটা সঠিক কর্মপন্থা নয়।"[২৯]

বিখ্যাত নাস্তিক দার্শনিক মাইকেল রুস বলেছেন, "দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সব বিষয়েই ডকিন্সকে অজ্ঞ বলে মনে হয়। অনেক কিছুতে তার প্রমাণও দেখা যাচ্ছে।" মহাজগৎ সৃষ্টিতে স্রষ্টার নিপুণ নকশা[৩০] এবং খ্রিষ্টবাদ সম্পর্কে নব্য নাস্তিকদের কৌশলের সমালোচনায় তিনি বলেছেন,

> "নিপুণ নকশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চরম বিপর্যয়—আমরা এই লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছি... অন্ধ নাস্তিকতাবাদের প্রয়োজন নেই আমাদের; আমাদের চাই বিষয়গুলোর সঠিক উপলব্ধি। আপনাদের কেউ খ্রিষ্টবাদ নিয়ে সত্যিকার অর্থে পড়াশোনা, বা এর বিশ্বাসগুলোর মোকাবিলায় আগ্রহী নন। খ্রিষ্টবাদকে শয়তানের শক্তি বলে রিচার্ডের দাবিটা একেবারেই অর্থহীন। উদ্ভটভাবে অনৈতিক। তারচে বড় কথা, আমরা একটি লড়াইয়ে আছি। এই লড়াইয়ে আমাদের সহযোগী বানানো দরকার; শুভবুদ্ধির কাউকে বিরোধী বানানো নয়।"[৩১]

নিজেদের মধ্যে 'কোন্দল' থাকার পরও নব্য নাস্তিকতাবাদ তার ধ্যানধারণা প্রচারে বেশ সফল। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ২৫.১% লোক দাবি করেন তারা কোনো ধর্মের অনুসারী নন। যুক্তরাজ্যের ক্যাম্পাসগুলোতে এর হার নিয়মিত বাড়ছে।[৩২] ইউরোপে ৪৬% মানুষ ঈশ্বরের চিরাচরিত ধারণায় বিশ্বাসী নন। সেখানকার ২০% মানুষ কোনো ধরনের আত্মা, ঈশ্বর বা প্রাণশক্তিতে বিশ্বাসী নন।[৩৩] চীনের অর্ধেক মানুষ নিজেদের নাস্তিক দাবি করেন।[৩৪] সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফিল জাকারম্যানের বিবেচনায় অনেক সমাজেই নাস্তিকতার ব্যাপক প্রসার ঘটছে।[৩৫] তিনি বলেছেন, বিশ্বের প্রধান প্রধান বিশ্বাসগুলোর মাঝে নাস্তিকতাবাদের স্থান এখন চতুর্থ: "...প্রচলিত ধর্মমতগুলোর

মধ্যে খ্রিষ্টানধর্ম (২০০ কোটি), ইসলাম (১২০ কোটি) এবং হিন্দুত্ববাদের (৯০ কোটি) পর, অবশেষে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীরা এখন চতুর্থ।”[৬৬]

মুসলিম জগতেও আছড়ে পড়েছে নাস্তিকতাবাদের এই ঢেউ। উইন-গ্যালাপ ইন্টারন্যাশনালের মতে ৫% সাউদি নিজেদের নাস্তিক দাবি করেন। ১৯% সাউদি জনগণ নিজেদের দাবি করেন নিধার্মিক।[৬৭] আরবি ভাষায় নাস্তিকতা-সম্পর্কিত বইপুস্তক অনূদিত হয়ে প্রকাশের কারণে আরব-বিশ্বেও বাড়ছে এর প্রাদুর্ভাব।

পশ্চিমের মুসলিমরাও অনুরূপ সমস্যায় জর্জরিত। এখানেও ধর্মত্যাগীদের সংখ্যা বাড়ছে দিনদিন। নিজেদের তারা দাবি করছেন নাস্তিক। মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তরে দিনদিন প্রকট হচ্ছে সমস্যাটা। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই ঝড়ের গতি বাড়ছে হু হু করে। নাস্তিকমনা প্রকাশনী ও প্রচারমাধ্যমগুলোর আগ্রাসী প্রচারণা একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে মুসলিমদের সামনে। আশপাশের নষ্ট পরিবেশের চাপে সংশয়ের গোলক ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে অনেক সরলমতি ছেলেমেয়েরা। এগুলোর মোকাবিলায় যথেষ্ট আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মতাত্ত্বিক হাতিয়ার যদি না থাকে, তা হলে ভুল পথে চলে গিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করতে শুরু করবে তারা।

ইসলাম যে সংগতিপূর্ণ, সত্য, আর নাস্তিকতাবাদ যে একটা বুদ্ধিবৃত্তিক মরীচিকা—তা প্রমাণ করার হাতিয়ার মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়াটাই এ বই রচনার পেছনে আমার অন্যতম উদ্দেশ্য।

অধ্যায় ২

নাস্তিকতাবাদের প্রভাব

এ আলোচনার শুরুতেই বলে নেওয়া প্রয়োজন, নাস্তিকতাবাদ কেবল কোনো বায়বীয় বিষয় নয়; মানুষ যদি এটা গ্রহণ করে নেয় তা হলে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রভাব আছে। নাস্তিকতাবাদের দাবিগুলো সত্য বলে মেনে নেওয়া হলে জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমন কিছু 'যুক্তিবাদী' সিদ্ধান্ত-গ্রহণ আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে উঠবে, যা বাস্তবে খুবই অন্তঃসারশূন্য। কারণ, নাস্তিকতাবাদের চোখে মানুষের জীবন অতি তুচ্ছ।

প্রথম অধ্যায়ে বলেছি, বেশির ভাগ নাস্তিক আসলে প্রকৃতিবাদী দার্শনিক বিশ্বাস লালন করেন। তাদের মতে অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বলে কিছু নেই; জগতের সবকিছুকে বস্তুগত ভৌত-প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাদের এ ধরনের বিশ্বাস পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের জন্য যে কত বড় হুমকি তা গভীর ভাবনা-চিন্তা ছাড়া বোঝা যায় না।

নাস্তিকতাবাদ বলতে চায় স্রষ্টা বলতে আদতে কেউ নেই। এই বিশ্বাসের ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো: কারও কৃতকর্মের জন্য কাউকে কোথাও কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না। এ-মতাদর্শ অনুযায়ী জীবনের কোনো পরম উদ্দেশ্য নেই, আশা নেই; মূল্যবোধও নেই। অর্থবহ সুখও নেই।[৩৮] কথাগুলো শুনতে হয়তো গৎবাঁধা ধর্মীয় কথার মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু নাস্তিকতাবাদী বিশ্বাসের গভীরে গেলে, তাদের আদর্শ-বিশ্বাসগুলোকে যৌক্তিক ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে একথাগুলোই স্পষ্ট হয়ে উঠবে সবার কাছে।

আশাহীন জীবন

আশা মানে কোনো কিছু হওয়ার বা প্রাপ্তির কামনা। আমরা সবাই সুন্দর জীবন, সুস্বাস্থ্য, ভালো উপার্জনের আশা করি। আমরা চাই সুখী অমর জীবন। আমাদের জীবন এত সুন্দর—কেউ চাই না টুপ করে এর আলোটা একদিন নিভে যাক। মানুষ আশা করে জগতের সব অন্যায়ের সুবিচার হতে হবে একদিন। বিচার হবে দোষীদের। জীবনে কষ্ট

পেলে, যন্ত্রণা ভোগ করলে, এর বিনিময়ে একসময় শান্তি-সুখের আশা করি আমরা। মানুষের মনটাই এমন। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আমরা সব সময়ই প্রত্যাশা করি আলোকচ্ছটা। একবার আনন্দ আর প্রশান্তি খুঁজে পেলে, ধরে রাখতে চাই আজীবন।

নাস্তিকতাবাদ যেহেতু কোনো ধরনের স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, সেহেতু তাদের কাছে পরকালীন জীবন একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব বিষয়। তাদের এ বিশ্বাসের ফলাফল হলো: এক দুর্দশাভরা জীবনের পর আর কোনো সুখের আশা নেই। মৃত্যুর পর সুবিচারের আশা করার কোনো সুযোগ এখানে নেই। নাস্তিকতাবাদ বলে—জীবনের শেষ প্রান্তে আলোর যে রেখার কল্পনা তুমি করছ, সেটা ভুলে যাও।

মনে করুন, আপনার জন্ম হয়েছে সুবিধাবঞ্চিত তৃতীয় বিশ্বের গরিব কোনো দেশে। আপনার জীবনটাই পার হয়েছে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে। নাস্তিকতাবাদ বলবে—এতদ্‌সত্ত্বেও আপনার সামনে অপেক্ষা করছে কেবল একটাই পরিণতি- মৃত্যু! এই মৃত্যুই শেষ। এর পরে আর কিচ্ছু নেই। কোনো আলো নেই। কোনো আশা-ভরসা নেই। মৃত্যুর মাধ্যমেই আপনি একটি জৈবিক জীবনের পরিসমাপ্তি টেনে দেন। এই জৈবিক জীবনই কেবল পরম সত্য। এর বাইরে আর কোনো সত্য নেই।

কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে কী বলে জানেন?

ইসলাম বলে—আমাদের জীবনে ঘটা প্রতিটি যন্ত্রণার পেছনে আছে মহৎ কোনো কল্যাণ। তার মানে ব্যাপক অর্থে আমাদের কোনো কষ্ট-যন্ত্রণাই অর্থহীন নয়। আল্লাহ আমাদের সব দুঃখ-কষ্টের খবর জানেন। আমরা তাঁর প্রতি অনুগত থাকলে তিনি আমাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেবেনই (দেখুন অধ্যায় ১১)।

কিন্তু নাস্তিকতাবাদ বলবে, আমাদের যন্ত্রণাগুলো আমাদের সুখের মতোই অনর্থক। পুণ্যবানদের স্বেচ্ছা আত্মত্যাগ আর ভুক্তভোগীর হতাশা তাদের কাছে একই পাল্লার এপাশ-ওপাশ। এগুলোর পেছনে কোনো বৃহৎ কল্যাণ বা কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। কোনো পরজীবন বা অনন্ত সুখের আশা নেই।

কোনো না কোনো সময়ে খুব বিলাসী বা সুখময় জীবনেও মানুষের সাথে খারাপ কিছু ঘটে থাকে। কিংবা অঢেল সুখের মধ্যে বাস করেও কেউ হয়তো কামনা করেন আরও বেশি বেশি সুখ, আরো বেশি স্বচ্ছন্দ। ওঁত পেতে থাকা এই হতাশাকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন হতাশাবাদী দার্শনিক আর্থার সোফেনহার:

> “আমরা যেন মাঠে চড়ে বেড়ানো ভেড়া; সাক্ষাৎ কসাইয়ের সামনে আনন্দ-বিনোদনে মশগুল। একটার পর একটা ভেড়া জবাই করছে সে। সুখের দিনগুলোতে আমরা অচেতন থাকি ওঁত পেতে থাকা রোগব্যাধি, দারিদ্র্য, অঙ্গহানি, অন্ধত্ব বা বুদ্ধিলোপের মতো দুর্ভাগ্যগুলোর ব্যাপারে... সময়

ক্রমাগত চেপে আসছে আমাদের ওপর। দম নিতে দিচ্ছে না, ধাওয়া করছে আমাদের পিছু পিছু, লাঠি হাতে কড়া হেডমাস্টারের মতো। কখনো যদি সময় তার হাত গুটিয়ে নেয়, আমরা তখন বিরক্তির সাগরে হাবুডুবু খাই... জগৎ ও মানবজাতি থাকার চেয়ে বরং না থাকলেই ভালো হতো—এ বিশ্বাসই আমাদেরকে এক প্রকারের বিলাসিতায় ডুবিয়ে রাখে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে স্যার বা সাহেব না বলে বলা উচিত ভুক্তভোগী, দুর্ভাগা।"[৩৯]

কুরআন এই হতাশার কথা উল্লেখ করেছে পরোক্ষভাবে। একজন বিশ্বাসী কখনো হতাশ হতে পারে না। অবস্থা যত সঙিনই হোক, সবকিছুর পরও আশা আছে। সুমহান আল্লাহ তাঁর অসীম মমতা দিয়ে অনুক্ষণ জড়িয়ে রেখেছেন আমাদের। তাঁর এই মমতা এখানে যেমন আছে, থাকবে পরজীবনেও: "অবিশ্বাসীরা বাদে কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।"[৪০]

নাস্তিকতাবাদী দুনিয়ায় চূড়ান্ত সুবিচার বলে কিছু নেই। জীবনের মরুভূমিতে তা শুধুই মরীচিকা। তাদের মতে যেহেতু পরকাল বলে কিছু নেই, তাই মানুষের জবাবদিহিরও কোনো দরকার নেই। ১৯৪০ সালে নাৎসি গণহত্যার কথাই চিন্তা করুন। নিরপরাধ এক ইহুদি নারী চোখের সামনে দেখছেন তার স্বামী আর সন্তানকে হত্যা করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তাকেও ঢোকানো হবে গ্যাস চেম্বারে। তার চোখের সামনে শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার। নাস্তিকতাবাদী দর্শন কী সুবিচার দেবে তাকে? নাৎসিদের পরাজয় হয়েছিল যদিও; কিন্তু সেটা তার মৃত্যুর পর—নাস্তিকতাবাদের চোখে যখন তিনি সময়ের জঠরে লীন। স্রেফ কিছু পদার্থের পুনর্বিন্যাস মাত্র। প্রাণহীন কাউকে সে কী করে নিষ্কৃতি দেবে? অন্যদিকে ইসলাম সবাইকে দেয় চূড়ান্ত সুবিচারের নিশ্চয়তা। কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সবাইকেই- এটাই মানবজাতিকে দেওয়া ইসলামের চূড়ান্ত আশ্বাস।

> "সেদিন লোকজন বিভিন্ন দলে দলে আসবে। তাদের কর্মলিপি দেখানো হবে। কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে যেমন দেখতে পাবে, অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলেও দেখতে পাবে।"[৪১]

> "সবাইকে তাদের কর্মফল অনুযায়ী পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই মহাকাশমালা আর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। কারও প্রতি কিয়ৎ পরিমাণও অবিচার করা হবে না।"[৪২]

ধরুন, এক মা আদর করে তার সন্তানের হাতে একটা খেলনা তুলে দিলেন। কিন্তু একটু পরেই বিনা কারণে সেটা তিনি কেড়ে নিয়ে নিলেন। দার্শনিক প্রকৃতিবাদ বলবে আপনার জীবন ঠিক এমনই। আমাদের জীবন এক অসাধারণ উপহার বটে; কিন্তু সব আনন্দ-সুখ-ভালোবাসা লোপাট হয়ে যাবে একসময়, হারিয়ে যাবে চিরদিনের জন্য।

নাস্তিকতাবাদ বলবে এই হলো আপনার জীবন। কিন্তু ইসলাম আপনাকে শোনাবে পরকালীন জীবনের অনন্ত আনন্দের কথা:

> "তাদের মন যা চাইবে সবই থাকবে সেখানে। তারচেয়েও আরও অনেক বেশি কিছু থাকবে তাদের জন্য আমার কাছে।"[৪৩]

> "ধার্মিক জীবনযাপনকারীদের জন্য থাকবে ভালো ভালো পুরস্কার; এবং এরচেয়েও আরও বেশি কিছু...।"[৪৪]

> "সেদিন জান্নাতবাসীরা মশগুল থাকবে আনন্দ-আড্ডায়... (তাদের বলা হবে), সালাম (শান্তি তোমাদের ওপর), এই সম্ভাষণ পরম প্রভু, মমতবানের তরফ থেকে।"[৪৫]

নগণ্য মানুষ

একজন মানুষ আর একটা চকলেটের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রশ্নটাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না। নাস্তিকদের মনস্তত্ত্ব ধরতে এর উত্তরটা বেশ কাজে দেবে।

প্রকৃতিবাদী মতবাদ পোষণকারী নাস্তিকেরা বলবেন, অস্তিত্ববান সবকিছুই আসলে পদার্থের পুনর্বিন্যাসের ফসল। কিংবা উদ্দেশ্যহীন অচেতন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও কারণের ফল। তাই যদি হয়, তা হলে কার কী দাম আছে?

একটা হাতুড়ি দিয়ে চকলেট গুড়ো গুড়ো করা, আর নিজের মাথায় বাড়ি মেরে ফাটিয়ে ফেলা একই কথা প্রকৃতিবাদীদের কাছে। কারণ, তারা বলবেন, চকলেটের টুকরা আর আমার হাড়গোড় কেবলই নির্জীব পদার্থের পুনর্বিন্যাস।

এধরনের কথাবার্তার জবাবে সাধারণত বলা হয়: "আমাদের অনুভূতি আছে", "আমরা জীবন্ত", "আমাদের ব্যথা লাগে", "আমাদের আত্মপরিচয় আছে", "আমরা মানুষ!" প্রকৃতিবাদীরা বলবেন, এগুলোও পদার্থের পুনর্বিন্যাসের কাতারেই পড়ে। কিংবা—আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে—কারও মস্তিষ্কে ঘটা অনুভব-অনুভূতিগুলো কিছু স্নায়বিক-রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, বাস্তবে আমাদের অনুভূতিবোধ, কথা বা কাজকে পদার্থের মৌলিক উপাদানে নিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথবা কোনো এক ধরনের ভৌত প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব। নাস্তিকদের কাছে তাই মানুষের আবেগ-অনুভূতি একেবারেই মূল্যহীন। এগুলো সবই স্রেফ কিছু বস্তুগত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

প্রশ্নে ফিরে যাই: একজন মানুষ আর একটা চকলেটের মধ্যে পার্থক্য কী?

নাস্তিকেরা জবাবে বলবেন, কোনো পার্থক্য নেই। যা কিছু পার্থক্য চোখে দেখা যায়, তা কেবল মায়া। সত্যিকার অর্থে এগুলোর মূল্য একই। সবই যদি নিছক পদার্থ এবং কেবল প্রাকৃতিক কারণ ও প্রক্রিয়ার ফসল হবে, তা হলে সত্যিই সবকিছু মূল্যহীন।

আচ্ছা, তা হলে পদার্থের এক বিন্যাসের চেয়ে অন্য বিন্যাসের ফারাক মূল্যায়ন হবে কীসের নিক্তিতে? বিন্যাসের জটিলতা বেশি হওয়ার কারণেও তো কোনোটাকে অধিক মূল্যবান বলা যাবে না! কারণ, নাস্তিকতাবাদ তো বলে কোনো কিছুই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি হয়নি। সবই উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো, জড় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও কারণের ফল।

মজার ব্যাপার কী, নাস্তিকতাবাদের অনিবার্য এ-পরিণাম খোদ নাস্তিকেরাই অনুসরণ করেন না। কারণ, তখন যে তাদের নিজেদের জীবনই বিলীন হতো হতাশায়। তারা কিন্তু ঠিকই পরম এক উদ্দেশ্য জুড়ে দেন আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে। কারণ, স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা আর আমাদের অস্তিত্বের পেছনে নিহিত সত্যটাকে চেনার জন্মগত প্রকৃতি যে খোদ স্রষ্টাই পুরে রেখেছেন তাদের মাঝে (দেখুন অধ্যায় ৪)। ইসলামি পরিভাষায় এর নাম 'ফিতরা' বা স্বভাবধর্ম। এক নিগূঢ় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের সৃষ্টি করেছেন সুমহান আল্লাহ। বাকি সব সৃষ্টি থেকে তিনি মানুষকে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা। আমাদের এ-জীবন অর্থহীন নয়। কারণ, এর স্রষ্টাই অর্থবহতা দিয়েছেন একে:

> "আদাম-সন্তানদের আমি অবশ্যই সম্মানিত করেছি... আমার অনেক সৃষ্টির ওপর তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছি।"[৪৬]

> "প্রভু মোদের, আপনি যে আমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেননি।"[৪৭]

ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের মূল্য দেয়। আল্লাহকে যারা মানেন, আর মানেন না, তাদের মাঝে পার্থক্য করে ইসলাম বলে: "বিশ্বাসীরা কি অবিশ্বাসীদের মতো? তারা কক্ষনো এক না।"[৪৮]

প্রকৃতিবাদ তথা বস্তুবাদ পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করে। ঐশী সুবিচারের কোনো জায়গা এখানে নেই। একজন মানুষ জঘন্য অপরাধী হোক বা শান্তিকামী হোক তাতে কিছুই আসে যায় না; মৃত্যুই তার জীবনের শেষ পরিণতি। একজন হিটলার বা একজন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের জীবনের দাম তার কাছে সমান। সবার মৃত্যুই যদি শেষ গন্তব্য হবে, নাস্তিকতাবাদ তা হলে কী দিচ্ছে আমাদের? কিছুই না।

পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। ইসলাম বলে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করেন, যিনি দয়াশীল, সৎ, ন্যায়পরায়ণ, সদয় এবং ক্ষমাশীল—তার সাথে খারাপ লোকের কোনো তুলনা হয় না। সৎকর্মশীলদের স্থান হবে অনন্ত সুখের রাজ্য জান্নাতে। অন্যদিকে, খারাপ লোকদের ছুড়ে ফেলা হবে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে। যারা আল্লাহর দয়া ও বিধানকে অমান্য করবে, তাদের পরিণাম হবে এরকম। ইসলাম আমাদের সামনে জীবনের এক পরম মূল্য তুলে ধরে। কিন্তু নাস্তিকতাবাদের কাছে সেই মূল্যের যৌক্তিক কোনো ন্যায্যতা নেই। তার চোখে এটা আমাদের মতিভ্রম।

কোনো কোনো নাস্তিক আপত্তি তোলেন, আল্লাহ কেন আমাদের জীবনের পরম মূল্য দেবেন?

উত্তরটা কিন্তু খুবই সরল।

সুমহান আল্লাহ এই মহাজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি বস্তুজগতের উর্ধ্বে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অসীম। তাঁর অন্যতম দুটো নাম সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান। যা কিছুকে তিনি গুরুত্ব দেন, তা সর্বজনীন এবং বস্তুনিরপেক্ষ (objective)[৪৯]।

বিষয়টি আরেকটা দিক থেকেও ভাবা যায়।

আল্লাহ হলেন সর্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ নিখুঁত সত্তা। কণা-পরিমাণ ভুল বা বিভ্রান্তি থেকেও তিনি মুক্ত। সুতরাং, তিনি যা কিছুকে গুরুত্ব দেবেন, তা অবশ্যই বস্তুনিরপেক্ষ হবে। কারণ, এটা তাঁর পূর্ণাঙ্গতার প্রতীক।

কেউ কেউ বলবেন, আল্লাহ যে আমাদের জীবনকে একটা মূল্য দিয়েছেন, এটা যদি মেনে নিইও, তবুও তো বিষয়টা ব্যক্তিনিরপেক্ষ (subjective)[৫০]। কারণ, এই মূল্য দেওয়াটা তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে।

আসলে 'ব্যক্তিনিরপেক্ষতা' সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এমন কথা বলেন তারা। ব্যক্তিনিরপেক্ষতা মানে বিষয়টি কোনো একজন ব্যক্তির সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গির উৎস অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। তিনি সব জানেন; আমরা না। প্রখ্যাত তাফসিরকারক ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই। কেবল সেই জ্ঞানের কিছু অপূর্ণ ও খণ্ডিত কিছু অংশ রয়েছে আমাদের কাছে। তার সামনে রয়েছে একটা গোটা দৃশ্যপট। সেই দৃশ্যপটের কেবল একটা ছোট্ট অংশই আমরা দেখতে পাই।

মানুষের মূল্য তথা মর্যাদার বিষয়টি অল্প কথায় খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সাইয়্যিদ হোসেইন নাস্‌র। তিনি বলেছেন-

> "মানুষের দায়িত্ব বা অধিকার বিষয়ে কথা বলার আগে ধর্মীয় ও দার্শনিক একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি: 'মানুষ হওয়ার মানে কী?' আজকাল অনেকেই মানবাধিকার, মানব-জীবনের পবিত্রতা নিয়ে কথা বলেন। অনেক সেক্যুলার তো দাবি করেন, ধর্মানুসারীরা নয়; শুধু তারাই মানবাধিকারের সত্যিকারের সমর্থক। আশ্চর্যের ব্যাপার কী, এই এরাই আবার বেশির ভাগ সময়ে বিশ্বাস করেন মানুষ হলো বিবর্তিত বানর-জাতীয় প্রাণী। বানর-জাতীয় প্রাণীটি এসেছিল আরও নিম্নজাতের প্রাণী থেকে। তাদের উদ্ভব হয়েছিল

নানারকম আণবিক পদার্থ থেকে। অণুগুলোর আদি মহাজাগতিক কুয়াশার ওপর কাজ করা কোনো 'উদ্দেশ্যহীন শক্তি'র পরিণাম যদি হয় মানুষ, তা হলে মানবজীবনের পবিত্রতার বুলিটি কি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিরর্থক নয়? শুধুই ফাঁপা আবেগী কথন নয়? মানবতার মর্যাদার বিষয়টি কি বাস্তবতা-বর্জিত মতলবি অভিমত নয়? আমরা যদি কেবলই অতি উচ্চমানের সুবিন্যস্ত কিছু নির্জীব কণার সমাহার-ই হবো, তা হলে 'মানবাধিকার' দাবিটির আর ভিত্তি রইল কোথায়? এসব প্রশ্নের কোনো ভৌগোলিক সীমা নেই। পৃথিবীর সব জায়গায় চিন্তাশীল মানুষ এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবেন।"[৫১]

আমাদের না-হয় মূল্য আছে, কিন্তু এই দুনিয়ার কী দাম?

ধরুন, আপনাকে একটা ঘরে রাখলাম। আপনার পছন্দের সব গেইম, গ্যাজেট, প্রিয় মানুষজন আর খাবার-দাবার সবই দিলাম। তবে একটা চিরকুটে আপনাকে জানিয়ে দিলাম আর মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে এই দুনিয়া আর এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বলুন তো আপনার সাথে থাকা এসবের কী মূল্য আছে এখন আপনার কাছে?

৫ মিনিট হোক আর ৭৫ বছর—সবই তো আসলে সময়ের হিসাব। ৭৫ বছর পরও যদি সব ধ্বংস হয়ে যায়—একই তো কথা। নাস্তিকীয় দৃষ্টিতে একবার ধ্বংস মানেই সব শেষ। কেউ আর এগুলোর খবর রাখবে না। ইসলামও বলে সবকিছু একদিন বিলীন হবে। তো, পরম অর্থে দুনিয়ার আসলে সত্যিকার দাম নেই কোনো। মাত্র কয়েক দিনের কারবার এখানে। তবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এর একটা আপেক্ষিক মূল্য আছে। দুনিয়া হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের ক্ষেত্র। ভালো কাজ আর মহান স্রষ্টার উপাসনার মঞ্চ। এগুলোই তো মানুষের নিবাস গড়ে দেয় জান্নাতে। কাজেই এখানেই সব শেষ নয়। কোনো ফুটো জাহাজের আরোহীদের মতো নই আমরা, যে কেবল ডুবে যাওয়ার অপেক্ষাই আমাদের কাজ। বরং দুনিয়ার জীবনে ঠিক কাজটা করে গেলে আমরা পাব আল্লাহর ক্ষমা আর কৃপা।

> "পরজীবনে যেমন ভয়ংকর শাস্তি আছে, তেমনি আল্লাহর ক্ষমা আর কৃপাও আছে। সুতরাং, আল্লাহর ক্ষমা লাভের প্রতিযোগিতা করো..."[৫২]

উদ্দেশ্যহীন জীবন

"আমরা এখানে কেন এসেছি তা জানি না। তবে, স্রেফ মজা করতে যে আসিনি —তা নিশ্চিত।"[৫৩] দার্শনিক লুডউইগ উইটগেন্সেন এভাবেই বলেছিলেন কথাটা। জীবনের উদ্দেশ্যটা যে কী—সে প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না তার কাছে। তবে এটা যে শুধু মৌজমাস্তির ক্ষেত্র নয়, সেটা তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তবে অনেকের কাছে এই ধরনের প্রশ্নই আজগুবি। তাদের মতে- জীবন নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই। আমরা এখানে কেন এসেছি তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে মাথার কাঁচা চুল সাদা করে ফেলার কোনো প্রয়োজন নেই। তারচে বরং নির্ভাবনার নাটাই হাতে কাটিয়ে দেব একজীবন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অ্যালবার্ট ক্যামাস বলেছিলেন, "জীবনের মানে খুঁজতে গেলে জীবনে আর বাঁচতে পারবেন না আপনি।"[৫৪] তিনি আসলে বলতে চাচ্ছেন, আমাদের অস্তিত্বের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকুক কি না থাকুক, নিজের ভালো লাগে—এমন একটা জীবন পার করাই মূল কথা।

তো, দেখা যাচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। আচ্ছা, মূল যে-প্রশ্নটা—অর্থাৎ জীবনের যে একটা উদ্দেশ্য আছে, এটা বিশ্বাস করা কি যৌক্তিক?

আপনি হয়তো চেয়ারে বসে বইটি পড়ছেন। সভ্য সমাজের বাসিন্দা বলে আপনার গায়ে হয়তো পোশাকও জড়িয়েছেন। আচ্ছা, আমাকে বলুন তো এগুলোর পেছনে কী উদ্দেশ্য আছে? পোশাক কেন পরেছেন? চেয়ারের কাজ কী?

উত্তরগুলো খুবই সহজ অবশ্যই। চেয়ারে আমরা বসতে পারছি। পোশাক আমাদের শরীরকে উষ্ণ রাখছে। নগ্নতা ঢাকছে। তা ছাড়া সৌন্দর্যের বিষয়ও আছে। চেয়ার বা পোশাক সবই তো জড়বস্তু। এগুলোর কোনো অনুভূতি নেই। মানসিক সামর্থ্য নেই। কিন্তু আমরা ওগুলোর সাথে কিছু উদ্দেশ্য জুড়ে দিয়েছি। যেমন, চেয়ারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ তাতে বসবে। পোশাকের উদ্দেশ্য হলো সে মানুষের শরীর আবৃত করবে। আর সেখানে মানুষের মতো সচেতন বোধসম্পন্ন এক সত্তার কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না—এরচে বড় অযৌক্তিক কথা আর কী হতে পারে! জীবনের যদি কোনো উদ্দেশ্যই না থাকে আমাদের অস্তিত্বটাই তো তবে অর্থহীন।

প্রকৃতিবাদীরা এমনই এক উদ্দেশ্যহীন জীবনের প্রবক্তা। এই মতবাদ বলে, আমরা নাকি সুদূর অতীতে ঘটা কিছু দৈব অযৌক্তিক প্রাকৃতিক কার্যকলাপের ফল। এক ডুবন্ত জাহাজে ভেসে ভেসে দিন গুনছি। রূপক জাহাজটি হলো আমাদের মহাজগৎ। বিজ্ঞানীদের মতে এক অনিবার্য ধ্বংসের পথে ছুটে চলছে এটা। একসময় 'তপ্ত মৃত্যু' হবে এর অনিবার্য পরিণতি। সূর্য গ্রাস করে ফেলবে পৃথিবীকে। তার আগেই অবশ্য প্রচণ্ড দাবদাহে মারা যাবে পৃথিবীর সব প্রাণ।[৫৫] জাহাজটি যদি ডুবেই যাবে, বলুন তো, চেয়ারগুলো এক জায়গা থেকে নিয়ে আরেক জায়গায় সাজিয়ে কী লাভ? কী দরকার ভুখা এক বৃদ্ধ নারীর হাতে এক গ্লাস দুধ তুলে দেওয়ার? কিন্তু কুরআন এমন বোহেমিয়ান অস্তিত্বের কথা বলে না। সে তুলে ধরে মানুষের সহজাত অবস্থান: "প্রভু আমাদের, আপনি এগুলো কোনোকিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি!"[৫৬]

উদ্দেশ্য থাকা না থাকা নিয়ে আরও বহু বিতর্ক জন্ম নেয়।

কোনো কোনো নাস্তিক বলতে পারেন, উদ্দেশ্য নেই বলে আমরা নিজেরাই নিজেদের উদ্দেশ্য সৃষ্টি করার স্বাধীনতা পেয়ে থাকি। কেউ কেউ বলেছেন, 'জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই বলে আমরা সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত তৈরি করতে পারি'। তাদের মতে সৃষ্টির সবকিছুই যেহেতু অনর্থক, তাই পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আমরা নিজেরাই একটা অর্থ দাঁড় করিয়ে নিতে পারি বৈকি।

তো, তাদের এই সমস্ত আলাপ থেকে আমরা কোন সারমর্মে এসে পৌঁছাতে পারি? তারা একবার বলছে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই; আবার একটু পরে নিজেরাই একটা স্বরচিত উদ্দেশ্য দাঁড় করাচ্ছে। বাচ্চারা যখন খেলাধূলা করে তখন খেয়াল করলে দেখবেন- খেলতে গিয়ে তারা একবার ডাক্তার সাজে, পরক্ষণেই নার্স সাজে; একটু পর আবার অফিসার সাজে, এরপর মুহূর্তে আবার বাবা-মা সাজে। বাচ্চাদের এ ধরনের খেলার সাথে নাস্তিকদের কথাবার্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু জীবন-মঞ্চে এমন শিশুসুলভ মনোভাবের কোনো সুযোগ আসলে নেই। আমাদের পরিপক্ক হতে হবে। এ-জীবন যে নিছক কোনো বৈকালিক খেলাধুলার আসর নয়, মুখোমুখি হতে হবে সেই অমোঘ সত্যের।

জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আরেকটি বিতর্কের সূচনা করেন ডারউইনীয়ান বিবর্তনবাদীরা। তাদের দাবি হলো: এ জীবনের উদ্দেশ্য শুধু ডিএনএ[৫৭] সঞ্চার। বিখ্যাত নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স 'দ্যা সেলফিশ জিন' বইতে বলেছেন, আমাদের শরীর শুধু এ উদ্দেশ্যেই বিকশিত হয়েছে।[৫৮] এই মতবাদের সমস্যা হচ্ছে, এই প্রক্রিয়া আমাদের অস্তিত্বকে নামিয়ে আনে দীর্ঘ এক জৈবিক প্রণালি অনুসরণে ঘটা দৈবাৎ এক দুর্ঘটনার স্তরে। মানুষ যেন বিভিন্ন কণার দৈবাৎ সংঘর্ষ আর পুনর্বিন্যাসের ফলে আবির্ভূত কোনো কাকতালীয় সত্তা।

কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইসলাম মানবীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কথা বলে না। এর দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে যেমন সহজাত, অন্যদিকে বলিষ্ঠ। কিছু পদার্থ আর সময়ের উৎপাদিত পণ্য থেকে ইসলাম আমাদের তুলে আনে সচেতন সত্তার স্তরে। আমাদেরকে দেয় মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক গড়ার এক মহৎ সুযোগ (দেখুন অধ্যায় ১৫)।

কপট সুখ

"তাঁর ব্যাপারে যারা সচেতন তাদের জন্যই আছে সুখে ভরা ভবিষ্যৎ।"[৫৯]

সুখ মানব-প্রকৃতির এক অনিবার্য চাওয়া। সুখের সত্যিকার মানে বুঝি কি না-বুঝি—সবাই আমরা সুখী হতে চাই। সাধারণ কোনো মানুষের কাছে যদি জানতে চান, কেন তারা ভালো চাকরি খোঁজেন, বলবে, "ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য।" যদি আরেকটু বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন তারা ভালোভাবে বাঁচতে চান, বলবে, "সুখী

হওয়ার জন্য।" এরপর যদি জিজ্ঞেস করেন, "কেন আপনি সুখী হতে চান?" এবার কিন্তু তারা আর কোনো জবাব দিতে পারবে না, কারণ, সুখী হওয়াটাই শেষ ঠিকানা। এরপর আর কোনো পথ নেই।

সুখের সংজ্ঞা একেকজনের কাছে একেক রকম। কেউ বছরের পর বছর নিজের নামের পাশে নানা ভারি ভারি ডিগ্রি জুড়াতে ব্যস্ত। কেউ সুখের আশায় ক্যারিয়ার দক্ষতা বাড়ায়। কেউ নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমে সুঠাম দেহ গঠনকেই মনে করে সুখী হওয়ার উপায়। কেউ-বা পরিবারের ভালোবাসা পেতে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার মাঝেই খুঁজে পান সুখ। কেউ কেউ প্রতিদিনের কাজের চক্র ভাঙতে সপ্তাহান্তে ঘুরে বেড়ান বন্ধু-বান্ধবদের সাথে। একটু সুখের পরশ পেতে মানুষ কত কসরতই না করে বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃত সুখ আসলে কীসে?

মনে করুন, এই বইটি পড়তে পড়তে আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ আপনাকে নিথর করে ঘুম পাড়িয়ে দিল। ঘুম থেকে জেগে দেখলেন, হাই ক্লাস একটি বিমানের প্রথম শ্রেণির আসনে আপনি বসে আছেন। আপনার চারপাশে খাবার-দাবারের বিশাল আয়োজন। আপনি যেখানটায় বসে আছেন, সেটা যেন মখমলের বিছানার মতোই নরম আর তুলতুলে। বড়ই আরামাদায়ক। বিমানের ভিতরে বিনোদনের যাবতীয় সুব্যবস্থা করা আছে। চমৎকার এক পরিবেশ। সব সুবিধা একেবারে হাতের নাগালে। বলুন তো, আপনি কি এই মুহূর্তে সুখী?

কে আপনাকে নিথর করল? কীভাবে এই বিমানে এলেন? এই সফরের উদ্দেশ্য কী? কোথায় যাচ্ছেন আপনি? হাতের কাছের এত সব ভোগের বস্তু থাকার পরও কি এসব প্রশ্ন মনে খচখচ করবে না? ফেনিল বেলজিয়ান চকলেট কেইক হাতে থাকলেই কি উবে যাবে প্রশ্নগুলো? এই যে সুখ, এ তো এক মায়া। ক্ষণস্থায়ী মিথ্যে সুখ। ওপরের প্রশ্নগুলো মাথা থেকে জোর করে সরিয়ে না রাখলে সে-সুখ ভোগের উপায় নেই।

আচ্ছা, এবার বলুন তো, দুনিয়াতে সত্যিই কি আপনি সুখী? এখানে আপনার অস্তিত্ব কি হঠাৎ নিথর হয়ে গিয়ে জেগে উঠে নিজেকে বিমানে আবিষ্কারের মতো না? কবে জন্মাব, কোথায় জন্মাব, কে আমার বাবা-মা হবেন—এসবের কিছুই তো আমরা নিজেরা বেছে নিইনি। অথচ তারপরও দেখুন, আসল সুখ পেতে যেসব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি, সেগুলোর ব্যাপারে মড়ার মতো দিব্যি নির্বিকার আমরা।

সত্যিকার সুখ কোথায় তা হলে?

সত্যিকার সুখ আমরা কেবল তখনই পাব যখন আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুনিয়াদি প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাব। কোত্থেকে এসেছি আমরা? কে পাঠিয়েছেন? এ জীবনের উদ্দেশ্য কী? মৃত্যুর পর কোথায় যাব আমরা? এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব পেলেই

খুঁজে পাব সত্যিকার সুখের ঠিকানা। তা না-হলে আমাদের সুখ হবে মাতালের সুখের মতো। মদের ঘোরে পাগলের মতো সবকিছুতেই হাসে বলে বাইরে থেকে দেখে যাকে সুখী মনে হয়।

জন্তু-জানোয়ারের মতো কেবল স্বেচ্ছাচারী জিন্দেগি কাটালে টিকে থাকা যাবে না। বিভিন্ন হরমোনের গোলাম বনে গিয়ে, বা কেবল শারীরিক চাহিদা মেটানোর ধান্ধায় থাকলে এসব প্রশ্নের উত্তর আর খুঁজে পাওয়া হবে না।

মনে করুন, ছোট্ট এক ঘরে আপনি-সহ ৫০ জন লোক বন্দি। বের হওয়ার কোনো পথ নেই। ঘরের ভেতর শুধু ১০ টুকরো রুটি। এগুলো খেয়েই নাকি চালাতে হবে সামনের একশ দিন। কী করবেন এখন? যদি মনের পশুবৃত্তিকে উসকে দেন, তা হলে রক্তারক্তি হবে। কিন্তু যদি সবাই মিলে বাঁচার চিন্তা করেন, তা হলে অন্তত বেঁচেবর্তে থাকার একটা সম্ভাবনা জাগবে। তখন শুধু আজকের দিনের জন্য নয়, চিন্তা থাকবে সামনের দিনগুলোতেও বেঁচে থাকার।

ওপরের উদাহরণটি এবার নিজের জীবনে প্রয়োগ করে দেখুন। এ জীবনে কত অনুঘটক। সেগুলোর কারণে জীবনের গতিও হয় অনেক রকম। অথচ তারপরও কিনা আমরা ব্যস্ত শুধু নিজেদের ভোগবাসনা মেটাতে। ভালো একটা চাকরির জন্য পিএইচডি ডিগ্রি কিংবা অন্য কোনো দক্ষতার প্রয়োজন হতে পারে। একটা জীবন আমরা স্রেফ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আনন্দ-আড্ডাতেই কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এগুলো তো আসলে পৃথিবীতে আরও কটা দিন টিকে থাকা আর বংশবিস্তারের জন্য। আমি কে—এই প্রশ্নের জবাব যদি না পাই, জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি না খুঁজে ফিরি, সত্যিকার অর্থবহ সুখের পাখি তা হলে কি ধরা দেবে কখনো?

প্রকৃতিবাদ বা বস্তুবাদ এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারে না। চূড়ান্ত অর্থে সুখের কোনো হদিস দিতে পারে না আমাদের। তাকে জিজ্ঞেস করুন, কেন আমরা এখানে? সে বলবে কোনো কারণ নেই। তার কাছে জানতে চান, কোথায় যাচ্ছি আমরা? সে বলবে কোথাও না; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি।

অন্যদিকে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইসলামের জবাবটি বেশ সরল: আমরা এখানে এসেছি আল্লাহর উপাসনা করতে (দেখুন অধ্যায় ১৫)।

উপাসনা বললেই আমাদের মনে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কিছু গৎবাঁধা চিন্তা মাথায় আসে। কিন্তু ইসলাম শব্দটাকে স্রেফ কিছু রীতিপ্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয় না। আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজই হতে পারে আল্লাহর উপাসনার নিমিত্ত। আমাদের ছোটবড় সব কথা, অন্যের সাথে সদয় আচরণ—সবই হতে পারে আমাদের উপাসনা। আল্লাহর সন্তুষ্টি আদায়ে যেকোনো কাজই গণ্য হতে পারে উপাসনা হিসেবে। শুধু

নামাজ-রোজাতেই বৃত্তবন্দি নয় ইসলামি উপাসনা। আল্লাহকে জানা, তাঁকে সবচে বেশি ভালোবাসা, তাঁকে মানাও ইবাদাত। এটাই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। এটা আমাদের সমাজ ও মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে। কুরআনে এ-নিয়ে খুব চমৎকার এক উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ:

> "আল্লাহ তোমাদের একটা উপমা দিচ্ছেন: পারস্পরিক বিবাদে জড়ানো বহু শরিকেরা যার মনিব, আর যে কিনা শুধু তার একমাত্র মালিকের প্রতি নিবেদিত—এ দুজন কি সমান? সব তারিফ আল্লাহর। তাদের বেশির ভাগই একথা জানে না অবশ্য।"[৬০]

আল্লাহর উপাসনা ছেড়ে দিলে নানা মিথ্যা উপাস্যের পাপেট হয়ে পড়ি আমরা। আমাদের জীবনসঙ্গী, আমাদের বস, শিক্ষক, বাবা-মা, যে-সমাজে আমরা বাস করি, এমনকি আমাদের কামনা-বাসনাগুলো—কোনো না কোনোভাবে এগুলো নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় আমাদের। সামাজিক মানদণ্ডের কথাই ধরুন। সমাজ যেটাকে সুন্দর বলে, আমাদের অনেকের কাছে তা-ই সুন্দর। অনেক কিছুই আমাদের পছন্দ, আবার অনেক কিছুই আমাদের অপছন্দ—কিন্তু সবই অন্যের ইচ্ছাতেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়।

যে-ধরনের শার্ট বা কামিজ আপনি পরছেন, কেন পরছেন? যদি বলেন, আপনার পছন্দ তাই—উত্তরটা আসলে কোনো কিছু না ভেবেই বলছেন আপনি। কেন ঠিক এই নির্দিষ্ট ধরনটাই পছন্দ আপনার? এভাবে প্রশ্নটার গভীর থেকে গভীরে যেতে থাকলে বেরিয়ে আসবে আসল সত্য: "অন্যেরা এতে আমাকে ভালো বলে তাই"। চটকদার বিজ্ঞাপন আর আশপাশের মানুষের চাপে এভাবেই জর্জরিত হতে থাকি আমরা নিরন্তর।

আমাদের 'মনিব'-এর যেন শেষ নেই। আমাদের ওপর এদের অনেক দাবি। আবার এসব মনিবরাও 'লড়ছে একে অন্যের সাথে'। সেই লড়াইয়ের বলি হয়ে ঘোল-খাওয়া অতৃপ্ত জীবনযাপন করছি আমরা। অথচ আমাদের নাড়িনক্ষত্র সবকিছুর খবর সবচে ভালো জানেন আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ। নিজের মায়ের চেয়েও অনেক অনেক বেশি ভালোবাসেন তিনি আমাদের। সেই তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, কে আমাদের আসল মালিক। কার দাসত্বে ভেঙে যেতে পারে হাজারো মিথ্যে দাসত্বের নিগড়।

'রিক্লেম ইয়োর হার্ট' বইতে ইয়াসমিন মোগাহেদ লিখেছেন, আল্লাহ বাদে বাকি সবকিছু দুর্বল, নড়বড়ে। তাঁর উপাসনাতেই আমাদের মুক্তি:

> "দুর্বল আর নগণ্যের পিছে ছুটে আপনি নিজেও হয়ে পড়েন মূল্যহীন। ওটা যদি কখনো ছুঁতেও পান, তা-ও কখনো প্রয়োজন ফুরোবে না। কদিন বাদেই নতুন এক পিপাসা জাগবে। সত্যিকারের তৃপ্তি আর সুখ কখনো পাবেন না। যে-পৃথিবীতে আমাদের আবাস, ফিরে ফিরেই নতুন জিনিসের দরকার পড়ে

সেখানে। অদল-বদল করতে হয়। পুরোনো ফোন ফেলে আমরা নতুন ফোন নিই। পুরোনো গাড়ি বা কম্পিউটার বদলে নিই নতুন গাড়ি নতুন ল্যাপটপ। এমনকি কখনো বদলে ফেলি নিজের সঙ্গীকেও।

"তবে এ গোলামি থেকে মুক্তি আছে। যাঁর ওপর আপনার সব ভার অর্পণ করবেন, তিনি যদি অভঙ্গুর হন, চিরস্থায়ী হন, সবচে শক্তিশালী হন, তা হলে আপনার টলে পড়া অসম্ভব। ভেঙে যাওয়া কল্পনাতীত।"[৬১]

মহান আল্লাহর দয়ার আবেশে নিজেদের জড়িয়ে নেওয়া কিংবা তা থেকে দূরে সরে আসার পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে। তাঁর কথা মানলে, তাঁর উপাসনা করলে, তাঁকে ভালোবাসলে সুগম হবে আমাদের জান্নাত-যাত্রা। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে ঠাঁই হবে নরককুণ্ডে। পছন্দ এখন আমাদের।

তো মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রামাণ্য কোনো জবাব নাস্তিকতাবাদের কাছে নেই। কাজেই এর পাবন্দি করে সত্যিকার সুখের সুলুক মিলবে না। কোনো নাস্তিক যদি নিজেকে সুখী দাবি করেন, আমি বলব, সে সুখ মাদকাসক্তের সুখ। নিজের অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে যারা ভাবেন, তারাই জাগ্রত। তারাই খুঁজে পান সুখের চাবি। অন্যদিকে জানার ভাণ করে না-জেনেই ঢেকুর তোলেন যারা, সঠিক উত্তর জেনেও দোনোমনা অবস্থায় থাকেন, সুখপাখির নাগাল পাওয়া কখনো সম্ভব না তাদের পক্ষে। যিনি কারণটা জানেন, আর যিনি জানেন না তারা কখনো কি এক?

আল্লাহকে অস্বীকার করলে এর যৌক্তিক পরিণাম যে কী হতে পারে, সেটা বেশ পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে এ অধ্যায়ে। নাস্তিকদের জীবনের চূড়ান্ত মূল্য, তাদের আশা আর সুখের বিষয়টার আবেগীয় ন্যায্যতা থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। খোদ রিচার্ড ডকিন্সই স্বীকার করেছেন এটা। তিনি বলেছেন, প্রকৃতিবাদের কাছে সবই অর্থহীন:

"অন্যদিকে, এই মহাজগৎ যদি হয় স্রেফ কিছু ইলেকট্রন আর স্বার্থপর জিনের কারবার, তা হলে বাস দুর্ঘটনার মতো নিরর্থক বিষাদ যেমন প্রত্যাশিত; নিরর্থক সৌভাগ্যও। এধরনের জগৎ উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে খারাপও না, ভালোও না। এখানে কোনো ধরনের কোনো উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ নেই। উদ্দেশ্যহীন প্রাকৃতিক শক্তি আর জিনগত প্রতিলিপির জগতে কিছু লোক মার খাবে, কিছু লোক ভাগ্যবান হবে। এর মাঝে আপনি কোনো মিল বা কারণ খুঁজে পাবেন না। এখানে কোনো সুবিচার নেই। এ-জগতের যদি কোনো পরিকল্পনা, কোনো ভালো-খারাপ উদ্দেশ্য না-ই থাকল, এটা তা হলে যা হওয়ার তা-ই: উদ্দেশ্যহীন নির্মম উদাসীন।"[৬২]

একটা যুক্তিহীন, উদ্দেশ্যহীন জড় জগৎ আমাদের আবেগ-অনুভূতির কদর করতে পারে না। একজন সচেতন পরাজাগতিক সত্তার পক্ষেই শুধু সম্ভব আমাদের এসব মানবিকতা-বোধের বুদ্ধিবৃত্তিক ন্যায্যতা দেওয়া।

অধ্যায় ৩

নাস্তিকতাবাদ কেন অযৌক্তিক

আমরা একটি ছোট্ট ঘটনা নেব। আমাদের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মনে করুন, আপনি একজন উবার-চালক। একদিন রেল স্টেশন থেকে যাত্রী নেওয়ার ডাক পেলেন। আপনি খুব কাছেই ছিলেন; দ্রুত পৌঁছে গেলেন স্টেশনে। দুজন যাত্রী উঠলেন গাড়িতে। সালাম বিনিময় করলেন। অ্যাপে ট্রিপ চালু করে আপনি দেখে নিলেন তারা কোথায় যেতে চাচ্ছেন। জায়গাটা রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরে। শহরের গাড়ির ভিড়বাট্টা ঠেলে বেশ কিছুক্ষণ পরে আপনি পৌঁছালেন গন্তব্যে।

আচ্ছা, এবার ঘটনাটিকে আমরা একটু পেছন ফিরে দেখি। ধরুন, গাড়িতে যাত্রীরা ওঠার পর যদি নিজের চোখে পট্টি বেঁধে নিলেন। তখন কী হতো বলুন তো! আপনি কি তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারতেন? নিজেই তো চোখে দেখছেন না, আরেকজনকে কীভাবে গন্তব্যে পৌঁছাবেন! যাত্রীদেরকে যদি বলেন আপনি চোখ বেঁধেই ড্রাইভ করতে পারবেন, তা হলে তারা পাগল ছাড়া আর কী বলবে আপনাকে?

রূপক অর্থে এখানে খোলা চোখের চক্ষুষ্মান উবারচালক হলেন ইসলামের প্রতিনিধি। আর চোখে পট্টি বাঁধা লোকটা নাস্তিকতাবাদের মুতসুদ্দি।

যুক্তিপ্রমাণটি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা

মুসলিম-নাস্তিক নির্বিশেষে সবাই মনে করেন, তারা যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তার মানে তাদের সবারই মানসিক ও যৌক্তিক বিচারশক্তি আছে। মনের চোখ দিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথটি পরখ করতে পারেন। মন আমাদের যুক্তিতর্কটিকে 'চালিয়ে' নিয়ে পৌঁছে দেয় মানসিক গন্তব্যে। বা অন্যভাবে বললে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে। এটি হলো বোধবিবেচনা-সম্পন্ন প্রতিটি মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নাস্তিক লোকটাকে তা হলে চোখে-পট্টি-বাঁধা উবার-চালকের সঙ্গে তুলনা করলাম কেন?

আগের অধ্যায়ে বলেছি, বেশির ভাগ নাস্তিকতাবাদী দর্শনের মাঝে লুকিয়ে থাকে প্রকৃতিবাদী দার্শনিক মতবাদ। তার দাবি, সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে হবে উদ্দেশ্যহীন,

অযৌক্তিক পদ্ধতি দিয়ে। চোখে পট্টি বেঁধে যেমন যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়, তেমনি উদ্দেশ্যহীন বস্তুবাদী পদ্ধতি ব্যবহার করে যুক্তিতর্ককেও গন্তব্যের দিকে 'চালিয়ে' নেওয়া সম্ভব নয়। নাস্তিকতাবাদ তাই যুক্তিহীনতার প্রতিশব্দ। নিজের দাবিকৃত স্বতঃসিদ্ধ অনুমানকে সে নিজেই বাতিল করে দেয়। মানুষের যে যুক্তি-ক্ষমতা আছে, প্রকৃতিবাদী দর্শনের সঙ্গে সেটা একেবারেই বেমানান। উদ্দেশ্যহীন আর অযৌক্তিক প্রক্রিয়া থেকে যুক্তির আবির্ভাব হতে পারে কীভাবে? তারপরও যদি কেউ গো ধরেন, তাদের বলি, জাদুকরের কারসাজি দেখেছেন নিশ্চয়। চোখে ভেলকি লাগিয়ে কবুতর, ফুল, খরগোশ কত কী সে পলকের মাঝে হাজির করে। এই তো মাত্রই দেখালেন তার জাদুর বাক্স খালি। মুহূর্তেই সেখানে থেকে জলজ্যান্ত কবুতর বের হয়ে উড়ে বসল শামিয়ানার খুঁটিতে। কী তাজ্জব কারবার! আসলে ওটা তো আগে থেকেই জাদুকরের কাছে ছিল। কৌশলে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছিলেন। সবাই জানে বিষয়টা। কিন্তু আপনি বলছেন, না। জাদুকর ওটা সত্যি সত্যিই হাওয়া থেকে নিয়ে এসেছেন। আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনার কথাটা কত বড় অযৌক্তিক? নাস্তিকতাবাদ ঠিক এমনই যুক্তিহীন। আল্লাহর অস্তিত্বহীনতা প্রমাণে নাস্তিকতাবাদ যুক্তি ব্যবহারের বড়াই করে। অথচ সত্যি বলতে খোদ যুক্তিকেই বুড়ো আঙুল দেখায় এই মতবাদ।

ইসলামি বিশ্বাস কেন চক্ষুষ্মান উবার-চালকের মতো?

কারণ, মানুষের মানসিক বিচারশক্তির বিষয়টা ইসলামি বিশ্বাসের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায়। যার নিজের মধ্যে যে-সামর্থ্যের অভাব, সে অন্যের মাঝে সেই সামর্থ্য সঞ্চার করবে কীভাবে? আমাদের মানসিক বিচারশক্তির সামর্থ্য কেবল এমন একজনের কাছ থেকেই আসা সম্ভব, যিনি মহান বিচারক, মহাজ্ঞানী; যিনি নিজে সব দেখেন, জানেন, সর্বজ্ঞানী। অন্যভাবে বললে, যৌক্তিক কোনো সত্তা থেকেই যৌক্তিকতা আসতে পারে। সুতরাং আমাদের মানসিক জ্ঞানের মধ্যে বিচারশক্তির সামর্থ্য মহাজ্ঞানী আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে।

আস্তিক-নাস্তিক দুজনেই যুক্তি-ক্ষমতার জের টানেন। কিন্তু সে যুক্তি বাস্তবে প্রয়োগ করলে দেখা যায় তা কেবল ইসলামের সঙ্গেই খাপ খায়; নাস্তিকতাবাদের সঙ্গে একেবারেই যায় না। এ-অধ্যায়ে এগুলোই সবিস্তারে বলব। তার আগে চলুন একটা কাল্পনিক কথোপকথন দেখে নিই:

নাস্তিক: 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। ঈশ্বরে বিশ্বাস অযৌক্তিক।'

মুসলিম: 'চমৎকার বলেছেন তো! কিন্তু আপনি কী মনে করেন, আপনি এই যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করেই এসেছেন?'

'বুঝিনি। ভেঙে বলুন।'

'জগতের সবকিছু কি জড়পদার্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? আপনি কি মনে করেন, অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই?'

'আলবৎ।'

'কিন্তু জড় বস্তুগুলো তো উদ্দেশ্যহীন, বিচারবুদ্ধিহীন। এরকম বিচারশক্তিহীন জড়পদার্থ থেকে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনে সামর্থ্য সৃষ্টি (আপনার মতো মানুষ) কীভাবে আসতে পারে? যে-জিনিসের মধ্যে যে-সামর্থ্য নেই, যেটা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সেটা সে কীভাবে অন্যদের দিতে পারে? উদ্দেশ্যহীন স্থূল বস্তু থেকে কীভাবে আমরা যুক্তি-প্রয়োগের সামর্থ্য পেলাম? এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কীভাবে আপনার যুক্তিসামর্থ্যকে ব্যাখ্যা করবেন?'

'খুব সহজ। আমাদের মস্তিষ্কের বিবর্তন হয়েছে।'

'ঠিক আছে। নাস্তিকতাবাদ অনুযায়ী এই বিবর্তিত মস্তিষ্কও তো জড় উপাদান থেকে এসেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক বিবর্তিত হয়ে যুক্তিক্ষমতা লাভ করেছে। কারণ, জগৎ সম্বন্ধে যত বেশি আপনি জানবেন, তত বেশি আপনার টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়বে।'

'না। কথাটা ঠিক না। জগৎ সম্বন্ধে অযৌক্তিক বিশ্বাস নিয়েও টিকে থাকা যায়।'

'সে যাহোক, কথা হচ্ছে আমরা দুজনেই যুক্তিকে সত্য বলে মানি। এটা কোনো সমস্যা না।'

'হ্যাঁ, আমার জন্য কোনো সমস্যা না। সমস্যাটা নাস্তিকতাবাদের জন্য। তাদের কাছে মানুষের যুক্তিক্ষমতা অনর্থক। কারণ, স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারে নাস্তিকতাবাদ যে অনুমানকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে তার আশ্রয় নিয়েছে, সেটাকে তো সে নিজেই বাতিল করে দিচ্ছে। কাজেই নাস্তিক হওয়া অযৌক্তিক। খোদ যুক্তিকেই তো বাতিল করে দিচ্ছে এটা।'

'আচ্ছা, যাহোক, আপনাকে আগে আমার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে।'

'মূল জায়গাটা এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন আপনি। যে-'প্রমাণ' শব্দটি ব্যবহার করছেন, তাতে বোঝা যায় আপনার অস্তিত্বের মধ্যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের সামর্থ্য আছে। কিন্তু আপনি যদি কেবল স্থূল জড়পদার্থের সংমিশ্রণ হন তা হলে আপনার মধ্যেই তো কোনো যুক্তি উপস্থাপনের সামর্থ্য থাকার কথা না। আপনার মুখে এ-ধরনের দাবি মানায় না। কারণ, নাস্তিকতাবাদে তো অযৌক্তিকতার কোনো জায়গা নেই, তাই না? অযৌক্তিকতা থেকে তো যুক্তি আসতে পারে না, তাই না? আপনি নিজের অস্তিত্বকে

কেবল বস্তুর সংমিশ্রণ দাবি করে আবার নিজেই যুক্তি উপস্থাপন করছেন, সেহেতু এর দ্বারা খোদ নাস্তিকতাবাদ ধারণাটাই অযৌক্তিক সাব্যস্ত হয়। যুক্তি আসতে পারে কেবল যুক্তিধারা মেনে। আমাদের যুক্তি-সামর্থ্য থাকার বিষয়টি সবচে ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে ইসলামি বিশ্বাস। কারণ, ইসলাম বলে মহান আল্লাহ হলেন সর্বদ্রষ্টা, সর্বজান্তা, সর্বজ্ঞানী; তাই আমাদের মধ্যে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য একমাত্র তাঁর কাছ থেকে আসাটাই স্বাভাবিক।'

যুক্তি কী?

এ-অধ্যায়ের প্রস্তাবিত যুক্তিপ্রমাণ প্রসঙ্গে আগেই বলে নেওয়া ভালো: এখানে যুক্তি মানে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণের সামর্থ্য। আমরা প্রচেষ্টার মাধ্যমে সত্যজ্ঞান অর্জন করতে পারি। আমাদের মাঝে আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা আছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, জানা তথ্যের ভিত্তিতে উপসংহার টানতে পারি, যুক্তির সাহায্যে বিচার করতে পারি। যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারার এই সক্ষমতা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের সবচে চমৎকার দিক। এ-সময় আমাদের সিদ্ধান্তগুলো গড়ে ওঠে মনের মাঝে ঘটে চলা যুক্তি-সমর্থিত বিচারশক্তির ওপর। মনের চোখে আমরা দেখতে পাই উপসংহারটি। বইয়ের ভাষায় বললে, একটা যুক্তিপ্রমাণের পেছেন যেসব কারণ থাকে, সেগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধের অনুসরণে গড়ে ওঠে আমাদের সিদ্ধান্ত। এভাবে যে-সিদ্ধান্তে আমরা আসি তা যেন আমরা মনের চোখে দেখতে পাই দিব্যি। কিন্তু এই 'দেখা'র বিষয়টা কোনো জড় বস্তু দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। সিদ্ধান্তটির সাথে কারণগুলো কেন বা কীভাবে সম্বন্ধ জুড়েছে—জড় জগতের কোনো কিছু তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। মোটকথা, সিদ্ধান্তটা যুক্তির যে ধারা অনুসরণে আসছে, সেগুলো প্রয়োগের সময় তার একটা মনোছবি তৈরি হয় আমাদের চিন্তাজগতে।

কোনো কোনো যুক্তিপ্রমাণ আমরা দাঁড় করাই বিভিন্ন কারণের ওপর ভিত্তি করে। একে আমরা বলতে পারি কারণভিত্তিক যুক্তিপ্রমাণ (Deductive Argument)। এটা ব্যবহার করে আমাদের যৌক্তিক বিচারশক্তির বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে পারব।

কারণভিত্তিক যুক্তিপ্রমাণের সিদ্ধান্তটি যদি অনিবার্যভাবে এর কারণগুলোর অনুসরণে আসে, তা হলে এই যুক্তিপ্রমাণ বৈধ। এর সাথে কারণগুলোও যদি সঠিক হয়, যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, তা হলে তা নিরেট।

একটা উদাহরণ দিয়ে সহজে বুঝুন বিষয়টা। প্রথমে ৩টি হেতুবাক্য দেখুন:

❧ সব ব্যাচেলরই অবিবাহিত পুরুষ।

- রঞ্জু ব্যাচেলর।
- তার মানে, রঞ্জু অবশ্যই অবিবাহিত পুরুষ।

আমাদের বিচারশক্তি-বলে জানি, (১) ও (২) থেকে অনিবার্যভাবে (৩)-ই আসে। (৩)-এর সাথে আগের দুটো হেতুবাক্যের সম্বন্ধ কী করে হলো, বা যৌক্তিকভাবে কেন এটাই আসে, তা কোনো জড় প্রক্রিয়া দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। কারণ, অনিবার্য সিদ্ধান্তটা তো শুধু হেতুবাক্যগুলোয় থাকা শব্দের অর্থের ভিত্তিতে আসেনি;[৬৩] এসেছে হেতুবাক্যগুলোর মধ্যকার সম্বন্ধের কারণেও।[৬৪] হেতুবাক্যগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধের সাথে অনিবার্য সিদ্ধান্তটার এই যে সম্পর্ক, তা কোনো জড় পদ্ধতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ থেকে বোঝা যায়, যুক্তি জিনিসটাই বস্তুজগতের উর্ধ্বে এক অতিপ্রাকৃতিক বিষয়।

বিষয়টি আরও সহজে বোঝার জন্য নিচের কারণভিত্তিক যুক্তিপ্রমাণটি খেয়াল করুন:

- সাকিব ৫টি বলচ দেখেছে।
- সাকিবের দেখা ৫টি বলচের রং হলুদ।
- তার মানে কিছু কিছু বলচ অবশ্যই হলুদ।

এই সিদ্ধান্তটিও সঠিক। কারণ, হেতুবাক্যগুলো থেকে এই সিদ্ধান্তই আসে। সাকিব যেহেতু ৫টি হলুদ বলচ দেখেছে, তার মানে কিছু বলচ অবশ্যই হলুদ হবে। ১ ও ২ নং বাক্য থেকে ৩ নং বাক্যের অবধারিত সিদ্ধান্তটিই আসে।

কিন্তু কেন? বলচ কী তা কিন্তু জানি না আমরা (ভালো কথা, শব্দটা আমার বানানো); কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তটি যে যৌক্তিক, তা নিয়ে দ্বিমত নেই কোনো। এর কারণ, হেতুবাক্যগুলোর অর্থ যেটাই হোক—আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে নিজস্ব যে-অনুমানই করি না কেন—যুক্তিপ্রমাণগুলোর যৌক্তিক ধারাটি ঘটে আমাদের চিন্তাজগতে।

একদিকে আমাদের চিন্তাজগৎ কোনো বাহ্যিক প্রমাণ ছাড়াই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে; অন্যদিকে হেতুবাক্যগুলোর মধ্যে সম্বন্ধ জুড়েছে। কোনো প্রাকৃতিক বা পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রমাণ দিয়ে এই সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা যায় না। ১ ও ২ নং বাক্য থেকে যে ৩নং বাক্যই আসবে—আমাদের চিন্তাজগৎ সেদিকেই নিয়ে গেছে আমাদের বিচারশক্তিকে। অন্যভাবে বললে, আমাদের চিন্তাজগৎ ১ ও ২ নং বাক্যকে হেতুবাক্য হিসেবে নিয়ে, আমাদের বিচারশক্তিকে পৌঁছে দিয়েছে ৩নং বাক্যে। আমাদের মানসিক এই গন্তব্য বিষয়টি কোনো জড়ো প্রক্রিয়া নয়। কারণ, জড় প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যহীন,

এলোমেলো; তাদের নিজস্ব কোনো সচেতন চালিকাশক্তি নেই। তার মানে, আমাদের সিদ্ধান্ত বোঝার সামর্থ্য বর্ণনায় কোনো জড় প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যায় না।

যুক্তি: বিজ্ঞানের অনুমান

মানুষের চিন্তাজগতের এক অনন্য গুণ আছে। আমরা ঠিক-বেঠিক, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দরের মাঝে পার্থক্য করতে পারি। জন্তু-জানোয়ার আর মানুষের মাঝে সবচে বড় পার্থক্য এটা। মানুষের দিগ্‌বিজয়ী অগ্রযাত্রার মূলে আছে তার মানসিক চিন্তা-সামর্থ্য। সত্যি বলতে কী, বিজ্ঞান চর্চা শুরুর আগেই আমাদের আস্থা রাখতে হয় এই চিন্তাশক্তির গুণে। বিজ্ঞানের একটি মৌলিক বিশ্বাস হলো—আমরা যুক্তি খাটাতে পারি। এই বিশ্বাস না থাকলে আমরা প্রমাণ বা সত্যের মতো শব্দগুলো কখনো ব্যবহারই করতে পারব না।

আমাদের যুক্তিপ্রয়োগের সামর্থ্যকে ঘিরেই গড়ে ওঠে বিজ্ঞান-চর্চা। অথচ কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই সামর্থ্যটির স্বরূপ পুরোপুরি বর্ণনা করতে পারে না। যেকোনো গবেষণার ফল আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারব—এই বিশ্বাস রেখেই কিন্তু বিজ্ঞানীরা কোনো রূপতত্ত্ব বা প্রশ্নের সমাধান খোঁজেন। যেকোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার যুক্তিসিদ্ধ বৈধতা যাচাইয়ের সামর্থ্যও তাদের আছে বলে মেনে নেন তারা। তার মানে কী দাঁড়াল? একজন বিজ্ঞানী কোনো গবেষণা চালানোর আগেই অনুমান করে নিচ্ছেন তার যুক্তিপ্রয়োগের সামর্থ্য আছে।

বিজ্ঞান যে আমাদের যুক্তিসামর্থ্যকে একেবারেই ব্যাখ্যা করতে পারে না, বিষয়টা একেবারে এমনও নয়। কিন্তু বুনিয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান যুক্তির ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে না। যুক্তির উদ্ভবকে কেবল কিছু বস্তুগত প্রণালি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে এর অতীন্দ্রীয় বিষয়টি কিন্তু অনালোকিতই থেকে যায়। এজন্য যুক্তির ন্যায্যতা প্রমাণে শুধু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করলে চলছে না এক্ষেত্রে। আমাদের চিন্তাজগতে যুক্তির ধারা অনুসরণে যে-সিদ্ধান্তটি আমরা মনের চোখে দেখি, তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না বিজ্ঞান। কারণ, কথিত এই বিজ্ঞানের মূল কথা হলো সবই বস্তু, বস্তুর বাইরে কিছু নেই; তাই বস্তুগতভাবে যা পর্যবেক্ষণ করা যায় না, তার কোনো অস্তিত্বও নেই; কিংবা বলা যায় বিজ্ঞানের গণ্ডি কেবল বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ যুক্তিপ্রমাণের সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যগুলোর যে-সম্বন্ধের ভিত্তিতে অনিবার্যভাবে এসেছে তা কোনো জড় প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণের উপায় নেই। আর পর্যবেক্ষণ ছাড়া বিজ্ঞান কোনো কিছুকে সমর্থন কিংবা বাতিল করতে পারে না। খোদ যুক্তিকে ব্যাখ্যার জন্যই বিজ্ঞানের যুক্তি প্রয়োজন। কাজেই কেউ যদি তর্ক করেন, বিজ্ঞান আমাদের যুক্তিক্ষমতাকে ন্যায্যতা দিতে পারে—এ যেন প্রমাণ করার আগেই কোনো কিছুকে 'প্রমাণিত' বলার শামিল। জগৎকে বোঝার জন্য বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে এক কার্যকরী হাতিয়ার, তবে এর সীমাবদ্ধতাও কম নয় (দেখুন অধ্যায় ১২)।

কেউ কেউ বলতে পারেন, অনুমানগুলোকে ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না। এ ধরনের কোনো কোনো অনুমান (বা প্রথম মূলনীতি)-কে প্রমাণ ছাড়াই সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয়। আমি একমত তাদের সাথে। কিন্তু অনুমানের মধ্যেও তো পার্থক্য আছে; সব অনুমান যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি সব সত্যও নয়। কোনো অনুমানকে সঠিক হতে হলে, এটা যে-জ্ঞান, ধারণা বা তত্ত্বকে সমর্থন করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অর্থবহ হতে হবে। যে অনুমান যে-দর্শনকে সমর্থন করতে চায়, সেটা যদি সেই দর্শনের সঙ্গেই খাপ না খায়, তা হলে সেই অনুমান সঠিক হতে পারে না। যেমন ধরুন, "যেসব প্রাকৃতিক আইন বিশ্বজগৎকে পরিচালনা করছে, সেগুলোর মাঝে একটা সুসংগতি আছে"—এই ধারণাটির ওপর টিকে আছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা যদি এখন বলেন যে, না সুসংগতি নেই, তা হলে আগের ধারণাকে হয় বাতিল করতে হবে, নয় বদলাতে হবে।[৬৫]

দার্শনিক বস্তুবাদ মনে করে উদ্দেশ্যহীন, যুক্তিহীন জড় প্রক্রিয়া দিয়ে যুক্তিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথচ এটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একেবারেই বেখাপ্পা। এমন একটা অনুমানকে একজন নাস্তিক—তা-ও আবার প্রকৃতিবাদী নাস্তিক—কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? সত্যি বলতে বস্তুবাদে যুক্তির কোনো জায়গা নেই। জড় বস্তুর প্রাকৃতিক পদ্ধতি থেকে যুক্তির উদয় অসম্ভব। উদ্দেশ্যহীন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া থেকে কোনোভাবেই মানুষের বিচারসামর্থ্যের জাগরণ ঘটতে পারে না। নাস্তিকদের হয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে, নয়তো বলতে হবে আমরা বুদ্ধিমান প্রাণী নই।

নাস্তিকতাবাদ দিয়ে মানুষের বোধবুদ্ধির ন্যায্যতা দেওয়া যায় না

বেশির ভাগ নাস্তিকেরা যে আসলে দার্শনিক প্রকৃতিবাদী তা তো আগেই বলেছি। প্রকৃতিবাদ মানে হলো বস্তুবাদ, আর বস্তুবাদ দাবি করে অতীন্দ্রীয় বা অতি প্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। জগতের সবকিছুকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দিয়ে তথা বস্তুগত ভৌতিক সূত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে দাবি করে সে। তার মতে সবকিছুই উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো বস্তুগত জড় প্রক্রিয়ার ফসল। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারমাণবিক কণা, পরমাণু আর অণু শাই শাই করে ছুটে চলছে কোনো ধরনের তত্ত্বাবধান বা দিক-নির্দেশনা ছাড়া। কেউ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালন করছে না এগুলোকে।

ঘটনা যদি এই-ই হয়, মানুষ তবে কীভাবে তার বিচারশক্তি আছে বলে দাবি করতে পারে? কীভাবে বলে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য আছে?

যুক্তি প্রয়োগ করার প্রাথমিক শর্ত হলো যৌক্তিক বিচারশক্তি থাকা। হেতুবাক্যগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ থেকে যুক্তির ধারা অনুসরণে অবধারিতভাবে যে-সিদ্ধান্তটি আসে- তা চর্মচক্ষু দিয়ে নয় বরং মনের চোখে দেখার সামর্থ্য লাগে। কিন্তু

প্রকৃতিবাদ, বস্তুবাদ এখানেই তালগোল পাকিয়ে বসে। সে বলতে চায় সবকিছু টিকে আছে উদ্দেশ্যহীন জড় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ওপর। এমন কথা বললে হেতুবাক্যগুলো থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্যের বিষয়টিই বাতিল হয়ে যায়।

কোনো বস্তুর মধ্যে যে-সামর্থ্য বা যে-জিনিসটা নেই, সেটা সে কক্ষনোই অন্যের মধ্যে সঞ্চার করতে পারবে না। আমার কাছে লাখ টাকা না থাকলে আপনাকে কোত্থেকে আমি হাজার পঞ্চাশেক টাকা দেব? আমার নিজের যদি আয়রোজগারের ব্যবস্থা না থাকে, আমি যদি নিজেই ঋণে জর্জরিত থাকি, তা হলে সঞ্চয় বাড়বে কীভাবে? একটা জড় প্রক্রিয়া যদি যুক্তিহীন হয়, তা হলে কীভাবে সেটা যুক্তির বিকাশ ঘটাবে? জড় প্রক্রিয়াগুলোর প্রকৃতি এমন যে, এদের নিজস্ব কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই, বিচারশক্তি নেই। যুক্তির গতিধারা বোঝার ক্ষমতা নেই তাদের। নিজ থেকে কোনো উদ্দেশ্যই তারা সাধন করতে পারেনা। জড় প্রক্রিয়া থেকে যুক্তির উৎসারণ, আর হাওয়া থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া একই মাপের ফাঁপা বুলি।

প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নাস্তিকতাবাদকে কেবল যুক্তিহীনই করে না, একে বরং দাঁড় করায় যুক্তির দুশমন হিসেবে। স্রষ্টাকে তারা যুক্তি দিয়ে বাতিল করতে চায়। অথচ খোদ যুক্তিশক্তিই তাদের দর্শনের সঙ্গে বেমানান। জড়পদার্থ থেকে বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে পারে না। তাই প্রকৃতিবাদ কোনোভাবেই আমাদের যুক্তি-সামর্থ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

আমাদের এই যুক্তিপ্রমাণটির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কিছু পাল্টা-যুক্তি আছে। এ অধ্যায়ের শেষে তা নিয়ে কথা হবে। তবে এই পরিসরে সংক্ষেপে সেটা নিয়ে দুটো কথা বলি।

এই যুক্তিপ্রমাণের অন্যতম পাল্টা-যুক্তি হচ্ছে, কম্পিউটার প্রোগ্রাম কারণভিত্তিক যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে। কম্পিউটার প্রোগ্রাম জড় বস্তু হয়েও যেহেতু এটা করতে সক্ষম, সেহেতু জড় প্রক্রিয়া দিয়ে যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা করা যায়।

অধ্যায়ের শেষ অংশে এ নিয়ে বিশদ কথা বলব। এখানে শুধু এটুকু বলে রাখি, কম্পিউটার প্রোগ্রামের নিজস্ব কোনো 'বিচারশক্তি' নেই; আরও নির্দিষ্ট করে বললে 'অর্থবহ বিচারশক্তি' তো থাকার প্রশ্নই ওঠে না। মানবীয় যুক্তিবোধ অর্থবহ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। যেকোনো সিদ্ধান্ত, এর প্রয়োগ নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি (এমনকি যদি তার অর্থ না-ও বুঝি, যেমন ওপরে বলচের উদাহরণে দেখেছি)। এর মানে মানবীয় যুক্তিবোধের মাঝে অর্থবহ বিচারশক্তির গুণ আছে। কিন্তু কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাঝে এটি নেই। কম্পিউটার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সম্বন্ধজনিত নিয়মের (syntactical rules) ওপর; অর্থসংক্রান্ত নিয়মের (symantics) ওপর নয়। পরে এ ব্যাপারে আরও সবিস্তারে বলা হবে।

ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ কি যুক্তিক্ষমতাকে ন্যায্যতা দিতে পারে?

খালি চোখে মনে হয় ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ বুঝি-বা আমাদের যুক্তিসামর্থ্যের একটা ব্যাখ্যা দিতে পারে। প্রকৃতিবাদের ঘাটতিটা হয়তো সে পুষিয়ে নেবে।

ডারউইনীয় মতবাদ বলে, আমাদের চিন্তাজগৎ বিবর্তিত হতে হতে যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করেছে। আশেপাশের পরিবেশের হালহাকিকত বোঝাটা আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহায্য করেছে টিকে থাকতে। এজন্য তাদের সত্য-মিথ্যার ফারাক বোঝাটাও জরুরি ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বুঝি পাওয়া গেল। কিন্তু আতসি কাঁচের নিচে রাখলে এখানেও বহু সমস্যা নজরে পড়ে। খোদ চার্লস ডারউইনেরও খটকা ছিল ব্যাপারটা নিয়ে। কেবল যদি কোনো নিম্নতর প্রাণ থেকে বিবর্তিত হয়ে আমাদের চিন্তাজগতের বিকাশ ঘটে সত্য অনুধাবনের এ সামর্থ্য অর্জিত হয়, তা হলে এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। ১৮৮১ সালে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন,

> "কিন্তু এরপর আমার মনে সব সময় একটা ভয়ংকর খটকা জাগে। নিম্নতর প্রাণের চিন্তাজগৎ থেকে বিকশিত হওয়া মানবমনের চিন্তাজগতের কি কোনো মূল্য আছে? বা আদৌ কি তা নির্ভরযোগ্য? বানরের চিন্তাজগতের নিশ্চিত কোনো বিশ্বাসের ওপরও কি আস্থা রাখবেন কেউ?—আদৌ যদি ওরকম কোনো প্রাণীর চিন্তাজগতে কোনো নিশ্চিত বিশ্বাস থেকে থাকে আর কি।"[৬৬]

চলুন দেখি মানবীয় যুক্তিবোধকে বাঁচাতে প্রকৃতিবাদী বিবর্তন কোনো রক্ষাকবচ হতে পারে কি না। প্রকৃতিবাদী বিবর্তন বলতে বোঝাচ্ছি, ঐশী হস্তক্ষেপমুক্ত বিবর্তন প্রক্রিয়া। এই মত অনুসারে, আমাদের টিকে থাকার জন্যই যুক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য এবং সঠিক বিশ্বাস অর্জন একটি অনিবার্য বিষয়। এজন্য আমাদের চিন্তাজগৎ বিবর্তিত হয়ে যুক্তিসামর্থ্য অর্জন করেছে।

এই দাবিটির সমস্যা একাধিক।

প্রথমত, টিকে থাকার জন্য সত্য-মিথ্যা ফারাক করতে পারাটা জরুরি নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মানসিক বিচারশক্তি অর্জনও কোনো শর্ত নয়। বিবর্তনবাদের মূল কথা 'টিকে থাকার' সামর্থ্য অর্জন; যৌক্তিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নয়। মানুষের যুক্তিবাদী মনের অন্যতম গুণ আবিষ্কার-অন্বেষা। কিন্তু এটা অনেক সময় আমাদের জন্য প্রাণঘাতী।

আমাদের চিন্তাশক্তির অন্যতম গুণ হলো সত্য-মিথ্যার মাঝে ফারাক করতে পারা। আমাদের আছে মানসিক বিচারশক্তি। কারণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

আমরা যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি, তখন এগুলোকেই কাজে লাগাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: প্রকৃতিবাদী বিবর্তন কি এই সামর্থ্যগুলোর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে?

এক কথায় উত্তর: না, পারে না।

মিথ্যা বিশ্বাস নিয়েও যে জগতে দিব্যি টিকে থাকা যায়, সেটা দেখাতে পারলেই বোঝা যাবে বিবর্তন প্রক্রিয়াতে যুক্তিসামর্থ্যের বিকাশ ঘটার প্রয়োজন নেই।

ভুলভাল বিশ্বাস রেখেও টিকে থাকা যায়। এবং খুব ভালোভাবেই যায়।

ধরুন, কেউ বিশ্বাস করেন, যেসব পোকার গায়ে লাল গুটি আছে, সব বিষাক্ত। তিনি ওগুলো থেকে শত হাত দূরে থাকেন। এতে কি তার টিকে থাকতে সমস্যা হবে কোনো? একটুও না। অথচ তার ধারণাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। অনেক পোকার গায়েই তো লাল গুটি থাকে; সবগুলোই তো আর ক্ষতিকর না। ছোট্ট লেডিবার্ড পোকাটাকে অনেকেই চেনেন হয়তো।

অনেকে ছত্রাক-জাতীয় সবকিছুকে বিষাক্ত মনে করেন। কিন্তু আমরা জানি মাশরুমের মতো কিছু কিছু ছত্রাক-জাতীয় খাবার বেশ স্বাস্থ্যকর। দর্শনের অধ্যাপক অ্যান্থনি ও'হিয়ার দেখিয়েছেন, বিবর্তনবাদ মানুষের মাঝে মিথ্যা বিশ্বাসও জন্ম দিতে পারে। আর তা নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায় একজীবন:

> "কোনো কোনো পাখি নির্দিষ্ট রঙের শুঁয়োপোকা এড়িয়ে চলতে পারে সেগুলো বিষাক্ত হওয়ার কারণে। কিন্তু এ কারণে সে কিন্তু সেই রঙের অন্যান্য বিষহীন শুঁয়োপোকাও এড়িয়ে যাবে। বিষহীন পোকার বিষ থাকা নিয়ে ভুল ধারণা লালন করছে পাখিটি। তবে হ্যাঁ, সাধারণভাবে বিষাক্ত-অবিষাক্ত উভয় ধরনের শুঁয়োপোকা এড়ানোয় তার টিকে থাকার সম্ভাবনা বেড়েছে। বিষাক্ত পোকাগুলোর কিছু প্রজাতি বিবর্তিত হয়ে বিষহীন হয়েছে যদিও—তবে এখানে আমরা মিথ্যার বিষয়ে বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা পাচ্ছি। বিবর্তনমূলক কার্যপ্রণালি থেকে সব সময় যে সত্য পাওয়া যায় না সরাসরি- সেই বিষয়টিই এখানে প্রতীয়মান হচ্ছে।"[৬৭]

মিথ্যা বিশ্বাস নিয়েও টিকে থাকার বিষয়টি প্রকৃতিবাদের সামনে আরেকটি জটিল প্রশ্ন দাঁড় করাচ্ছে: কেন আমরা আমাদের চিন্তাশক্তিতে নিশ্চিত আস্থা রাখব? টিকে থাকার সাথে যেহেতু সত্যের কোনো অনিবার্য সম্বন্ধ নেই, মিথ্যা বিশ্বাস নিয়েও যেহেতু দিব্যি টিকে থাকা যাচ্ছে, তা হলে সেই মিথ্যা বিশ্বাস চালিত বিবর্তন প্রক্রিয়ার ওপর গড়ে ওঠা যুক্তিক্ষমতায় কীভাবে আস্থা রাখব?

আমাদের মাঝে থাকা আবিষ্কারের নেশাও বিবর্তনবাদের জন্য মহা সমস্যা। পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র বোঝা, বা গণিত কষার মতো সামর্থ্য দেওয়ার কী প্রয়োজন

বিবর্তন প্রক্রিয়ার? একটা সময়ে গিয়ে জীবন ও জগৎকে বোঝার জন্য আমাদের চিন্তাশক্তি পরিণত হবে—টিকে থাকার জন্য এমন কথার অবতারণা করার কোনো মানে হয় না। কারণ, তেলাপোকা আর বিটল পোকাদের মতো প্রাণীরা বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে কোটি কোটি বছর ধরে। অথচ তাদেরকে আমরা এক দিনের জন্যও দেখিনি টেবিলে বসে চায়ে চুমুক দিয়ে নাস্তিকতাবাদের (বা অন্যকিছুর) উপস্থিতি এবং যৌক্তিক পরিণাম নিয়ে ঝড় তুলছে।

একটু ভাবুন তো: একটা রকেটে ৫ লাখ কেজি জ্বালানি আছে। ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৫০০ মাইল বেগে এটিকে মহাশূন্যে ছোড়া হবে। রকেটের নভোচারী জানেন না কখনো তিনি ফিরে আসতে পারবেন কি না। কিংবা আদৌ পৌঁছাতে পারবেন কি না মহাশূন্যে। তারপরও কীসে তাকে উদ্বুদ্ধ করল এই নভোযানে চড়তে? এই আবিষ্কারের নেশা কি তার টিকে থাকার জন্য সহায়ক? মেরুদণ্ডের কশেরুকায় কাঁপন তোলা ঠান্ডা আর চরম বৈরী পরিস্থিতি মাড়িয়েও কেন হিমালয় জয় করার স্বপ্ন দেখে মানুষ? যাওয়ার আগে তো এটা ভাবা উচিত যে- বাঁচব না মরব। কেন একজন সন্ন্যাসী নির্জনবাসে চিরকুমার থেকে অন্তর শুদ্ধির উপায় খোঁজেন? এটা কি মানব-প্রজন্মের-ধারা-বজায়-রাখা-বিরোধী নয়? মানুষের মাঝে আবিষ্কারের নেশা অতি তীব্র। কখনো কখনো তা টিকে থাকার চিন্তাকেও ছাড়িয়ে যায়। বেঁচে থাকার সহায়ক জিনিসটি থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কত মানুষ আলিঙ্গন করছেন স্বর্গীয় সুখ।

তো যেসব কর্মকাণ্ড আমাদের টিকে থাকাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, সেরকম অনেক কিছুতেই আমাদের প্রবল আগ্রহ। এ-বিষয়টাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব আমরা? প্রকৃতিবাদী বিবর্তনবাদের কাছে এই আবিষ্কার-বাসনা অনর্থক। শিল্পকলা, আধ্যাত্মবাদ, দর্শন কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার মতো বিষয়গুলো আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য নয় মোটেও। কিন্তু আমাদের উচ্চতর যুক্তিবোধ আর জ্ঞানের পিপাসা বেশির ভাগ সময় এসব বিষয়েই আকৃষ্ট করে আমাদের। যেহেতু এ ধরনের আচরণগুলোর কোনো অভিযোজিত কল্যাণ নেই, তাই এগুলোকে বাতিল করে দেওয়ার কথা ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের। ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ আসলে শুধু "টিকে থাকা আর প্রজনন"-কে ব্যাখ্যা করে, এটা আমাদের যুক্তিক্ষমতা কিংবা আবিষ্কার-বাসনার সদুত্তর দিতে পারে না।

ওপরের দুটো সমস্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সত্যের সাথে নয়; বরং টিকে থাকার সাথে খাপ খায় ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব। আর তাই আমাদের যুক্তিক্ষমতা এবং

আবিষ্কার-বাসনার ব্যাখ্যায় এটা অযোগ্য। বিশেষজ্ঞরা এ সমস্যাগুলো ঠিকই উপলব্ধি করেছেন। চমৎকার কিছু মন্তব্য করেছেন এগুলো নিয়ে। জীববিজ্ঞানী জন গ্রে লিখেছেন,

> "টিকে থাকার তাড়না থেকেই যদি মানুষের চিন্তাশক্তির বিবর্তন হয়, তা হলে এটা যে বাস্তবতার জ্ঞান অর্জন করতে পারে—এধরনের চিন্তার কী কারণ আছে? যে-জ্ঞান আমাদের আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃতিবাদী দর্শন তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না।"[৬৮]

ডিএনএ আবিষ্কারক ফ্যান্সিস ক্রিক বলেছেন, "আমাদের উঁচুমাত্রার বিকশিত মস্তিষ্কও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের তাড়নায় বিবর্তিত হয়নি; শুধু টিকে থাকা আর বংশধারা বজায় রাখার জন্যই বিবর্তিত হয়েছে।"[৬৯]

মনন-বিজ্ঞানী স্টিভেন পিঙ্কার লিখেছেন, "আমাদের মস্তিষ্কের বিন্যাস হয়েছে সবলতার জন্য; সত্যের জন্য নয়। সত্য কখনো উপযোগী, কখনো নয়।"[৭০]

স্পষ্টভাষী নাস্তিক এবং স্নায়ুবিজ্ঞানী স্যাম হ্যারিস মনে করেন বিজ্ঞান একসময় ঠিকই আমাদেরকে উত্তর জানাবে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, "...সত্যের নাগাল পেতে প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের যৌক্তিক, গাণিতিক এবং তাৎক্ষণিক উপলব্ধির পরিকল্পনা করেনি।"[৭১]

মোট কথা, আল্লাহর অস্তিত্ব নাকচ করতে নাস্তিকেরা দাবি করেন যে তারা যুক্তি ব্যবহার করেন। কিন্তু তাদের এ ধরনের দাবি আসলে একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভণ্ডামি। কারণ, নিজেদের যুক্তিক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে গেলে হয় তাদের নাস্তিকতাবাদকে অস্বীকার করতে হবে; নয়তো খোদ যুক্তিকেই। পরিহাসের বিষয় হলো, তাদের যুক্তিক্ষমতার সেরা ব্যাখ্যা দিতে পারে আল্লাহর অস্তিত্ব।

ইসলামি ধর্মতত্ত্ব: সেরা ব্যাখ্যা

আমার নিজের কাছে এক টুকরো রুটি যদি না থাকে, আপনাকে কীভাবে দেব বলুন তো? নিজের কাছে না থাকলে অন্যের কাছ থেকে কিনে বা বানিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সেই সামর্থ্যও যদি না থাকে, তা হলে তো তাও পারছি না। এ-বিষয়ক মূলনীতিটি আবার স্মরণ করিয়ে দিই: যার মাঝে যে-সামর্থ্যের অভাব, বা যে-সামর্থ্য বিকাশের অভাব, সে সেটা অন্যদের মাঝে সঞ্চার করে দিতে পারে না।

একটা জড়শক্তি কোনোভাবেই বিচারবুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে পারে না। কারণ, এর মাঝে সেই গুণটা নেই। বস্তুর মাঝে প্রাকৃতিক সব প্রক্রিয়া বোধ-বিবেচনাহীন। একটা গাছ কারও ওপর ভেঙে পড়ার সময় বাছবিচার করে না যে সে কি মুক্তমনা না ধর্মপ্রাণ। এদের কোনো বিচারশক্তি নেই।

হেতুবাক্যগুলোর সম্বন্ধ অনুসরণে অনিবার্যভাবে যে-সিদ্ধান্তটি চলে আসে, সেটা তারা 'দেখতে' পায় না। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব খুব সরলভাবে আমাদের এই যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাশক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারে। কারণ, একজন সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী স্রষ্টাই কেবল হতে পারেন এমন চিন্তাশক্তির উৎস হতে। সৃষ্টিজগতের শুরুতে যদি থাকে কেবল জড়বস্তুর উদ্দেশ্যহীন প্রক্রিয়ার ছুটোছুটি, তবে এরা যদি শত কোটিবারও পুনর্বিন্যস্ত হয়, কখনোই চিন্তাশক্তির জন্ম দিতে পারবে না। কিন্তু আদিতে যদি একজন সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী মহাপ্রজ্ঞাবান স্রষ্টা থাকেন, তা হলেই কেবল যুক্তিক্ষমতাবান সচেতন জীবের আবির্ভাব সম্ভব। নিজের যুক্তিক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাখ্যায় তাই খোদ নাস্তিকদেরই প্রয়োজন পড়ছে আল্লাহর। নইলে এর পেছনে তারা কোনো যুৎসই ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারবে না।

এ অধ্যায়ের শুরুতে তোলা প্রশ্নগুলোর খুব সহজ-সুন্দর উত্তর দেয় ইসলাম। আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের মাঝে দিয়েছেন যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাশক্তি। আমাদের মাঝে আছে আবিষ্কার-আকাঙ্ক্ষা। এসবই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পুরো করার জন্য। মহান আল্লাহর সৃষ্টি-নিদর্শন খেয়াল করে আমরা পুরো করি সেই উদ্দেশ্য। আমরা তাঁর সৃষ্টি-নিদর্শন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে তাঁর শক্তি আর সৃজনক্ষমতার পরিচয় পাই। আমরা স্বেচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হই তাঁর উপাসনায় (দেখুন অধ্যায় ১৫)।

আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা আর ইচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন এই মহাবিশ্ব, আমাদের চিন্তাশক্তি। মহাজগতের পরস্পর-সংযুক্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম এবং আমাদের যুক্তিক্ষমতার চমৎকার ব্যাখ্যা দিচ্ছে এটা। কুরআনের খুব সুন্দর একটি আয়াত মনে পড়ছে: আল্লাহ্ বলেছেন,

> "আমি দিগ্‌দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মাঝেই তাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনমালা, যেন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি সত্য। সবকিছুর ব্যাপারে তিনি যে সাক্ষী, তোমাদের প্রভুর ব্যাপারে এটাই কী যথেষ্ট নয়?"[৭২]

আল্লাহ্ বারবার আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ভাবনাচিন্তা করতে, আমাদের চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করতে:

> "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা মারা?"[৭৩]

> "তোমরা কি ভাবনাচিন্তা করবে না?"[৭৪]

আয়াতগুলো বলছে, আমাদের আছে সত্য বোঝার যুক্তিক্ষমতা, জীবন ও জগৎকে সঠিকভাবে দেখার চোখ আর উপলব্ধির অন্তর। কুরআনে আল্লাহ্ অন্য এক জায়গায় বলেছেন, "মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাবদলে অবশ্যই সমঝদার মানুষদের জন্য নিদর্শন আছে।"[৭৫]

আয়াতগুলো থেকে আমরা একটি পূর্ণ ছবি পাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন যুক্তিসিদ্ধ মন, আবিষ্কার-আকাঙ্ক্ষা। এগুলোর সদ্ব্যবহার করে আমরা বুঝতে পারি জগতের রূপনির্যাস। আর তখন অবধারিতভাবে নত হই স্রষ্টার উপাসনায়। বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সব শাখায় বিচরণে যাবতীয় মেধা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু পরিহাসের বিষয়, কেউ কেউ আল্লাহ-প্রদত্ত এই উপহার পেয়ে খোদ আল্লাহর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেন (দেখুন অধ্যায় ১২)।

এতক্ষণ যে-আলোচনা করলাম তার বিপরীতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি আছে। নিচে এগুলো নিয়ে কথা বলছি।

জ্ঞানের ঘাটতির কারণে ঈশ্বর

কেউ কেউ "গড অফ দ্যা গ্যাপস" যুক্তি দিয়ে আপত্তি তোলেন। যুক্তিটার মূল কথা হচ্ছে: কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণেই অদৃশ্য ইশ্বরের দিকে ধাবিত হয় মানুষ। কিন্তু কেবল একটা শূন্যতা পূরণের প্রয়োজনে ঈশ্বরে বিশ্বাসের জন্ম দিতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞান একসময় এত এগিয়ে যাবে যে, তখন এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে, আর তখন ইশ্বরের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে।

তবে "জ্ঞানের ঘাটতি"র এই যুক্তি খাটে না। কারণ, আমাদের যুক্তিটি বৈজ্ঞানের জ্ঞানের ঘাটতি নিয়ে নয়; বরং বিজ্ঞানের ভিত্তি নিয়ে। কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার আগে চাই যুক্তিক্ষমতা। বিজ্ঞান একসময় এর নিজের অনুমানকে ব্যাখ্যা করবে, এ যেন দুষ্টচক্রে তর্ক করার শামিল। আমাদের আলোচনাটি বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। কারণ, আমরা এখানে কথা বলেছি খোদ বিজ্ঞানেরই বুনিয়াদি অনুমান নিয়ে। আর তাই "জ্ঞানের ঘাটতির কারণে ঈশ্বর"-তর্ক বেমানান এখানে।

বিচারহীন যুক্তি

বিচারহীন যুক্তিবাদ দাবি করে, খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া যুক্তিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। এই বক্তব্য অনুসারে, কোনো কিছু যদি ব্যাখ্যাতীত হয়, আপনি সেখানে তা হলে যুক্তি ব্যবহার করতে পারেন না। তবে নাস্তিকেরা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে এই যুক্তি বরং খ্রিষ্টানদের দিকেই তাক করেন। নাস্তিক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করতে পারেন, খ্রিষ্টান ব্যক্তিটি কেন মনে করেন, তিনি তার যুক্তিক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। জবাবে খ্রিষ্টান ব্যক্তিটি বলতে পারেন, খ্রিষ্টবাদ তার যুক্তিক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করে বলে। নাস্তিক ব্যক্তি তখন জানতে চাইতেই পারেন, তা কীভাবে। আর এভাবেই দেখা যাবে চক্রাকারে তর্কটি চলতে থাকবে।

এ-অধ্যায়ের যুক্তিপ্রমাণটি বিচারহীন যুক্তি নয়। আমাদের যুক্তিক্ষমতাকে স্বীকার করে এটি। যুক্তি খাটানোর আগে এটা আমাদের যুক্তিক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে বলে না। কোন মতটি আমাদের যুক্তিক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে পারে, আমাদের যুক্তিপ্রমাণ বরং সেটা তুলে ধরে। আল্লাহর অস্তিত্ব দিয়ে আমাদের যুক্তিক্ষমতাকে সবচে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রকৃতিবাদ—এবং এর বর্ধিত রূপ বস্তুবাদ ও নাস্তিকতাবাদ—আমাদের যুক্তিক্ষমতাকেই নাকচ করে দেয়। কাজেই এই মতবাদের বাতিল হওয়া ছাড়া গতি নেই।

দুরূহ জিনিস থেকেও বিচারবুদ্ধির আবির্ভাব হতে পারে

বস্তুর প্রকৃতির প্রদত্ত অনেকগুলো জটিল প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে একটা প্রণালি গড়ে ওঠে। অনেক জটিল-কঠিন কার্যক্রম চলে তাতে। উদীয়মান বস্তুবাদীরা দাবি করেন, কোনো প্রণালি যেসব উপাদানে গঠিত, তার মাঝে নির্দিষ্ট কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য না থাকলেও সেখান থেকে সেটার উদয় সম্ভব। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা বলেন, একসময় যা 'রহস্যজনক' বলে মনে হতো, তার জটিল প্রক্রিয়া বুঝতে পারার পর সব রহস্য হারিয়ে গেছে। তারা বলেন, আমাদের যুক্তিক্ষমতা—বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিচারশক্তি অর্জন—মস্তিষ্কের জটিল প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়াগুলো যখন আমরা বুঝতে পারব, তখন আমাদের যুক্তিক্ষমতাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব।

হামেশা তারা এক্ষেত্রে পানির অণুর (H_2O) উদাহরণ টেনে আনেন। আমরা জানি, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দুটো গ্যাসীয় পদার্থ। অথচ রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়া করে এদুটো থেকেই তৈরি হয় তরল পানি। হাইড্রোজন আর অক্সিজেনের মাঝে কিন্তু পানির গুণাবলি নেই। এধরনের উদাহরণ ব্যবহার করে উদীয়মান বস্তুবাদীরা বলতে চান, জটিল কোনো প্রণালির উপাদানগুলোর মাঝে কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ গুণ না থাকলেও সেখান থেকে নতুন গুণের জন্ম হতে পারে।

কিন্তু এই উদাহরণটিও বেখাপ্পা। কারণ, এই অধ্যায়ে আমরা যে-যুক্তিপ্রমাণের কথা বলেছি সেখানে জড় বস্তু থেকে জড় বস্তুর উদ্ভবের কথা বলা হয়নি (যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পানির ভৌত গুণাবলির উদ্ভব ঘটাচ্ছে); বরং জড় বস্তু থেকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সজীব গুণাবলি উদ্ভবের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মস্তিষ্কের সব ক্রিয়াকর্মও যদি কখনো বোঝা যায়, এবং তাদের মধ্যকার কারণঘটিত পারস্পরিক ক্রিয়াগুলোও যদি বের করা যায়, তারপরও তা কীভাবে আমাদের যুক্তিক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করবে? উদ্দেশ্যহীন, দৈব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে যে-বিচারশক্তি গড়ে উঠেছে বলে দাবি করা হয়, সেটা ব্যবহার করে কীভাবে সত্যের হদিস পাওয়া সম্ভব—এ প্রশ্নের সদুত্তর সে তখনও দিতে পারবে না।

জটিলতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেই কি সবকিছুর ব্যাখ্যা হয়ে যায়? এ তো যেন অনেকটা "হয়ে যায় আর কী"—এরকম বলার মতো। আমার মতে, প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে-ফাঁপা জায়গা তৈরি করেছে, তা পূরণে নব-বিকশিত বস্তুবাদের ভূমিকা খুবই নড়বড়ে (নব-বিকশিত বস্তুবাদ যে ব্যক্তিগত সচেতন অনুভূতিবোধকে ব্যাখ্যা করতে পারে না তা অধ্যায় ৭-এ আলোচনা করা হয়েছে)।

মানুষের যৌক্তিক বিচারশক্তি আর জড় প্রক্রিয়া এক নয়। এটা H_2O উদাহরণের আরেকটি সমস্যা। বিচারশক্তি প্রয়োগের সময় কাজ করে নানা স্নায়বিক কর্মকাণ্ড। H_2O-এর উদাহরণ যারা দেন, তারা বিচারশক্তি আর জড় প্রক্রিয়াকে একই কাতারে রেখে বিচার করেন। অধ্যাপক র‍্যামন্ড ট্যালিস বলেছেন, "হয় পানি হিসেবে, নয় H_2O অণু হিসেবে—যেকোনো একভাবে প্রকাশ করতে হবে। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দুই ধরনের পর্যবেক্ষণের উপযোগী... পানির এই দুটো দিক দুই ধরনের চেহারা, দুই ধরনের পর্যবেক্ষণ। স্নায়বিক কর্মকাণ্ডকে তড়িৎ-রাসায়নিক ক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতা হিসেবে পর্যবেক্ষণের মতো এক নয়।"[৭৬]

নব-বিকশিত বস্তুবাদ গ্রহণের পরিণামে আমরা এমন সব তত্ত্বকে মেনে নিতে শুরু করব যেগুলো কিনা কোনো প্রণালির বস্তুগত প্রক্রিয়াগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। জটিলতাকেই যদি কেউ নতুন বৈশিষ্ট্য বর্ণনার কৈফিয়ত হিসেবে দাঁড় করাতে চান—তা কীভাবে এল তার কোনোরূপ ব্যাখ্যা না দিয়ে—তা হলে একটা তত্ত্বকে কেন যেকোনো কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারবে বলে মেনে নেব আমরা? অনেকগুলো ইট থাকলেই বাড়ি বানানো সম্ভব—এ যেন কোনো নবিশ রাজমিস্ত্রীকে এমন কথা বলার শামিল। অথচ বাড়ি বানাতে সিমেন্ট, নকশা, বালু, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রীসহ আরও অনেক কিছু দরকার। মোট কথা, নব-বিকশিত বস্তুবাদ কোনো সুসংগত তত্ত্ব নয়। প্রকৃতিবাদের ফাঁক ভরাটের জন্য এটা এক অসংগতিপূর্ণ চেষ্টা।

জড় প্রক্রিয়া বিচারবুদ্ধিকে ব্যাখ্যা করতে পারে?

জড় প্রক্রিয়া থেকে যে বিচারবুদ্ধির জন্ম হতে পারে না, এর বিপরীতে আরেকটি তর্ক দেখা যায় সচরাচর। তর্কটি বলে, কম্পিউটার প্রোগ্রামও তো কারণভিত্তিক যুক্তি খাটিয়ে কাজ করতে পারে। যেকোনো বৈধ কারণভিত্তিক যুক্তিতে সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবেই আসে। যৌক্তিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এটি। কম্পিউটার প্রোগ্রাম যেহেতু জড় প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, এবং এটা যৌক্তিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তার মানে জড় প্রক্রিয়া আমাদের যুক্তিক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

কিন্তু এটিও একটি বেখাপ্পা যুক্তি। বলছি কেন।

আমরা এ অধ্যায়ে দেখেছি, হেতুবাক্যগুলোর মধ্যকার যৌক্তিক সম্বন্ধের ওপর ভিত্তি করে যে-মানসিক বিচারশক্তি গড়ে ওঠে তার ওপরই গড়ে উঠেছে মানুষের যুক্তিবোধ। কম্পিউটার প্রোগ্রাম কিছু "দেখতে" পায় না। মানুষের শুধু যে বিচারশক্তি আছে, তাই নয়; এ বিচারশক্তি একইসাথে অর্থবহ। আমরা যে-সিদ্ধান্তে আসি, সেটিকে বোঝা এবং প্রশ্ন করার সামর্থ্যও আছে আমাদের। কম্পিউটার প্রোগ্রামের এরকম অর্থবহ কোনো বিচারশক্তি নেই। কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলো তৈরি হয় সম্বন্ধজনিত নিয়মের ওপর ভিত্তি করে, শব্দার্থতত্ত্বের ওপর নয়।

এদুটোর মাঝে পার্থক্য বোঝার জন্য নিচের বাক্য তিনটি দেখুন:

I love my family.

αγαπώ την οικογένειά μου.

আমি আমার পরিবারকে ভালোবাসি।

তিনটি বাক্য একই অর্থ দিচ্ছে। এটা শব্দার্থতত্ত্বের অংশ। বাক্যের অর্থ নিয়ে কথা হচ্ছে এখানে। কিন্তু বাক্যগুলোর মধ্যকার অক্ষর, শব্দের বিন্যাসের বিষয়টি কিন্তু আলাদা। প্রথম বাক্যে আছে ইংরেজি 'প্রতীক', দ্বিতীয় বাক্যে গ্রিক, এবং শেষেরটায় বাংলা। এ থেকে আমরা নিচের হেতুবাক্যগুলো দাঁড় করাতে পারি:

- কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলো সম্বন্ধজনিত (প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে)।
- চিন্তাশক্তির অর্থবহতা আছে।
- অর্থের জন্য প্রতীক নিজে একে তো যথেষ্ট নয়; অত্যাবশ্যকও নয়।
- কাজেই, কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে থেকে চিন্তাশক্তিক্ষম নয়।[৭৭]

ধরুন, বরফ-ধসের ফলে দৈবক্রমে পাহাড়ের পাথরগুলো একের পর এক বসে 'আমি আমার পরিবারকে ভালোবাসি' বাক্যটি তৈরি করল। তার মানে কি পাহাড় জানে পাথর-বিন্যাসের ফলে তৈরি হওয়া বাক্যের অর্থ? না। শুধু প্রতীকের পুনর্বিন্যাস কোনো অর্থ দেয় না।[৭৮]

কম্পিউটার প্রোগ্রাম অর্থের ওপর নয়; গড়ে ওঠে প্রতীকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে। কিছু গ্রিক অক্ষর মনমতো সাজালেই অর্থবহ বাক্য তৈরি হবে না। শব্দের অর্থ বোঝার জন্য সঠিক বিন্যাসের বাইরেও প্রয়োজন আরও কিছু বিষয়। কম্পিউটার প্রোগ্রাম কাজ করে প্রতীকের নিয়ন্ত্রিত বিন্যাসের ওপর; অর্থের ওপর নয়। কোনো কিছুরই কোনো অর্থ জানে না এটা।

কেবল প্রতীকের ওলটপালটে যে সেগুলোর অর্থ বোঝা যায় না, তার একটি চমৎকার পরীক্ষা করেছেন অধ্যাপক জন সার্ল। তার পরীক্ষাটির নাম চীনা ঘর চিন্তাধারা-পরীক্ষা।

> "মনে করুন, আপনি একটি তালাবদ্ধ ঘরে আছেন। ঘরটিতে বেশকিছু ঝুড়িতে আছে চীনা প্রতীক। মনে করুন, (আমার মতো) আপনি একটি চীনা শব্দও বোঝেন না। তবে চীনা প্রতীকগুলোকে বিন্যস্ত করার জন্য আপনাকে বাংলায় একটি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। অর্থের ভিত্তিতে নয়, সম্বন্ধের ভিত্তিতে কীভাবে নিখুঁতভাবে নিয়মানুগভাবে সাজাবেন, নির্দেশিকা বইটিতে আছে তার নিয়মকানুন। তো ধরুন নির্দেশিকা বইটি বলছে: 'এক নং বাস্কেট থেকে একটি প্যাঁচানো অক্ষর নিয়ে দুই নং বাস্কেটের একটি প্যাঁচানো অক্ষরের পাশে রাখুন।' এখন মনে করুন, ঘরে আপনাকে আরও কিছু চীনা প্রতীক দেওয়া হলো। সেগুলো কীভাবে আবার ফেরত পাঠাবেন তার জন্য আরও কিছু নিয়ম দেওয়া হলো আপনাকে। মনে করুন, ঘরে আপনাকে অজানা যে-প্রতীকগুলো পাঠানো হয়েছে ঘরের বাইরের লোকেরা সেগুলোকে বলেন 'প্রশ্ন'। আর ঘর থেকে আপনি যেগুলো ফেরত পাঠালেন তারা সেগুলোকে বলেন, 'উত্তর'। আরও মনে করুন, প্রোগ্রামটি নকশায় প্রোগ্রামকারীরা এত সুদক্ষ, আর আপনিও প্রতীকগুলো বিন্যাসে এত দক্ষ যে, আপনার উত্তরগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন স্থানীয় কোনো চীনাভাষীরই দেওয়া উত্তর ওটা। মোট কথা, তালাবদ্ধ ঘরে চীনা প্রতীকগুলোকে ওলটপালট করে আগত চীনা প্রতীকগুলোর প্রত্যুত্তর হিসেবে আপনিও চীনা প্রতীক ফেরত পাঠাচ্ছেন... এখন এই কাহিনির মূলকথা হচ্ছে: একজন বহিঃস্থ পর্যবেক্ষণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি আসলে একটি আদর্শ কম্পিউটার প্রোগ্রামের গুণে এমনভাবে কাজ করলেন, যেন আপনি চীনা ভাষা বোঝেন; অথচ সত্যি কথা বলতে, আপনি তো আসলে একটাও চীনা শব্দ বোঝেন না।"[৭৯]

চীনা ঘর চিন্তাধারা-পরীক্ষায় ঘরের ভেতরের লোকটি একটি কম্পিউটারের ভান করছেন। আরেকজন লোক প্রতীকগুলোকে এমনভাবে সামলাচ্ছেন, যে মনে হচ্ছে ভেতরের লোকটি চীনাভাষা বোঝেন। কিন্তু আসলে তো তিনি বোঝেন না। তারা কেবল নির্দেশিকা অনুকরণ করছেন। অধ্যাপক সার্ল সিদ্ধান্তে এলেন: "শুধু প্রতীকগুলো নিয়মানুগ হলেই অর্থবোধকের জন্য যথেষ্ট নয়। শুধু প্রতীকগুলো ওলটপালট করলেই তাদের অর্থের নিশ্চয়তা দেয় না।"[৮০]

আপত্তিকারী বলতে পারেন, কম্পিউটার প্রোগ্রাম অর্থ না জানলেও গোটা প্রক্রিয়া তা জানে। অধ্যাপক সার্ল এই আপত্তিকে বলেছেন, "পদ্ধতির উত্তর"।[৮১] চীনা ঘর

চিন্তাধারা-পরীক্ষার একটি বর্ধিত সংস্করণে শার্ল দেখিয়েছেন, গোটা কম্পিউটার ব্যবস্থাও অর্থ বোঝে না: "মনে করুন, ঝুড়ির সবকিছু এবং নির্দেশিকা পুস্তিকা আমি মুখস্থ করেছি। আমার মাথা দিয়েই আমি সব হিসেবনিকেশ করছি। আপনি চাইলে মনে করতে পারেন আমি খোলা জায়গায় কাজ করছি। 'কম্পিউটার ব্যবস্থা'টিতে যা যা আছে, আমার মাঝেও তা-ই তা-ই আছে। আমি যেহেতু চীনাভাষা বুঝি না, কম্পিউটার ব্যবস্থাও না।"[৮২]

কম্পিউটার কোনো স্বাধীন ব্যবস্থা নয়। এর নিজের কোনো সামর্থ্য নেই কারণভিত্তিক যুক্তি প্রয়োগের। সচেতন এবং বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষই এদের নকশা করেছে, উন্নত করেছে, তৈরি করেছে। তাই কম্পিউটার আসলে আমার যৌক্তিক বিচার-সামর্থ্যেরই প্রসারিত রূপ। উইলিয়াম হ্যাস্কার ব্যাখ্যা করেছেন,

> "কম্পিউটারকে যৌক্তিক বিচারশক্তি খাটিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে বলেই এটা এসব কাজ করতে পারে। অন্যভাবে বললে, কম্পিউটার আসলে এর নকশাকারী এবং ব্যবহারকারীর বিচারবুদ্ধির বর্ধিত রূপ। খবর কিংবা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য টেলিভিশন যেমন কোনো স্বাধীন উৎস নয়, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের জন্য কম্পিউটারও তেমন স্বাধীন কোনো উৎস নয়।"[৮৩]

যুক্তির ব্যাপারে নাস্তিকতাবাদের কোনো একচেটিয়া অধিকার নেই—থাকতে পারে না। নাস্তিকেরা যুক্তিপ্রবণ এবং নাস্তিকতাবাদ যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে—এই যে এমন একটি মনোভাব বেড়ে উঠছে তা ভীষণ লজ্জার। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। উদ্দেশ্যহীন বস্তুগত দৈবপ্রক্রিয়া আমাদের যুক্তিক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। আল্লাহর অস্তিত্ব বাতিলে নাস্তিকতাবাদ যে-গুণটি ব্যবহার করে বলে দাবি করে, তা বরং সেই গুণটিকেই বাতিল করে দেয়। অন্যদিকে ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী আমরা বাস করি সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ স্রষ্টার সৃজন করা মহাবিশ্বে। তিনিই আমাদের দিয়েছেন যুক্তিক্ষমতা। আমাদের যুক্তিক্ষমতাকে ইসলামি বিশ্বাস সংগতিপূর্ণভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে; অন্য আর কিছু নয় (অন্য আর কিছু আসলে পারবেও না)। উদ্দেশ্যহীন দৈবপ্রক্রিয়া আমাদের উপলব্ধি-ক্ষমতা, আমাদের চিন্তাশক্তি আর শেখার ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে—এমন ধারণা অযৌক্তিক। যারা এর ওপর জেদ করে লেগে থাকবেন তারা আসলে যুক্তির দুশমন। চোখে-পট্টি-বাঁধা যে-উবার চালক গোঁয়ারের মতো বলেন, তিনি যাত্রীদেরকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারবেন, তার সাথে এদের কোনো ফারাক নেই।

অধ্যায় ৪

নাস্তিকতাবাদ কেন অস্বাভাবিক

মনে করুন, এক বিকেলে আপনার পুরোনো স্কুল বন্ধু শাহরিয়ার আপনাকে ফোন দিল। নবম-দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান ক্লাসে আপনি আর ও পাশাপাশি বসতেন। বহুদিন হয় ওর সাথে আপনার কথা হয়নি। কিন্তু এখনো মনে আছে, মাঝে মাঝে ও আপনাকে উদ্ভট উদ্ভট সব প্রশ্ন করে ভড়কে দিত। ওর কথাগুলো শুনতে আপনার ভালো লাগত বটে, কিন্তু আপনি ওর ধ্যানধারণাগুলোকে ঠিক মেনে নিতে পারতেন না। যাহোক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর ফোনটি ধরলেন আপনি। কুশল বিনিময়ের পর সে আপনাকে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। আপনি রাজি হলেন। তো রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, "একটা কথা বলব?" আপনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। আগে কখনো শোনেননি, এমন একটি বিষয় সে আপনাকে বলতে শুরু করল: "এই যে আমাদের অতীত—যেমন ধরো, গতকাল তুমি কী করেছ, গত বছর কী করেছ, এবং তোমার জন্ম পর্যন্ত—এসব আসলে বাস্তবে ঘটেনি। এগুলো সবই কল্পনা, তোমার মস্তিষ্কের বিভ্রম।"

নাতিদীর্ঘ এই ভূমিকা উপস্থাপনের পর সে আপনাকে প্রশ্ন করল: "তুমি কি বিশ্বাস কর অতীতের অস্তিত্ব আছে?"

যুক্তিপ্রবণ মানুষ হিসেবে আপনি তার দাবির সাথে একমত না হয়ে আপনি তাকে পালটা প্রশ্ন ছুড়লেন, "অতীতের অস্তিত্ব যে নেই, তার পক্ষে তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে?"

কোন দৃশ্যটি আপনি পছন্দ করবেন?

তার অতীতকে অস্তিত্বহীন প্রমাণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা, না আপনার অতীতকে বাস্তব প্রমাণের চেষ্টা করার দৃশ্য?

অবশ্যই প্রথমটি। কারণ, বাকি সব বোধসম্পন্ন মানুষের মতো অতীতের অস্তিত্বকে আপনি বিবেচনা করেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে। যেকোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্যের সত্যতা নিয়ে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে, তা প্রমাণের দায় বর্তায় চ্যালেঞ্জকারীর ওপর।

এবারে আসুন দৃশ্যটি আস্তিক-নাস্তিক সংলাপে কল্পনা করি।

এক আস্তিক তার এক নাস্তিক বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাল রাতের খাবারে। খাবারদাবারের এক পর্যায়ে নাস্তিক বন্ধুটি বলল, "বুঝলে, আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই। তার অস্তিত্বের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।"

আস্তিক লোকটি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে একের পর এক বিভিন্ন যুক্তিতর্ক দিয়ে গেল। কৌশলটা কি ঠিক? আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের দায় তো পরে। আগে তো ভেবে দেখা উচিত, কেন আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করাটাকেই প্রাথমিক প্রশ্ন হিসেবে মেনে নিচ্ছি? আল্লাহ আছেন কি না—এর বদলে প্রশ্ন হওয়া উচিত: তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকারে আপনার কাছে কী কারণ আছে?

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের পক্ষে অনেক ভালো ভালো যুক্তিপ্রমাণ আছে আমি জানি। তার কিছু কিছু এ বইতে উল্লেখও করেছি। কিন্তু এখানে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, আল্লাহর অস্তিত্বহীনতার বিপরীতে কোনো যুক্তি না থাকলে, তাঁকে বিশ্বাস করাটাই তো যৌক্তিকভাবে প্রাথমিক অবস্থান। না হলে এটা তো উপযুক্ত কোনো কারণ ছাড়া অতীতের বাস্তবতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলার মতো। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকেই নাস্তিকতাবাদ অস্বাভাবিক।

স্বতঃসিদ্ধ সত্য

অনেক বিশ্বাসকেই আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে বিবেচনা করি—মানে এগুলো অনিবার্যভাবেই স্বাভাবিক। এই যেমন:

- প্রকৃতির অভিন্নতা
- কার্যকারণ সম্বন্ধ
- অতীতের বাস্তব অস্তিত্ব
- আমাদের যুক্তির বৈধতা
- আমাদের চিন্তাজগতের অস্তিত্ব
- বহির্জগতের অস্তিত্ব ইত্যাদি

কেউ যখন এসব স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে, আমরা তখন অন্ধের মতো তার কথা মেনে নিই না। তাকে বরং জিজ্ঞেস করি, "এগুলো অস্বীকার করার মতো কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে?"

এধরনের সত্যগুলো স্বতঃসিদ্ধ কারণ:

সর্বজনীন: এর মানে এগুলো কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সম্পদ না; বহু সংস্কৃতি জুড়ে একই। তার মানে যে সবাই এই সত্যে বিশ্বাস করে, বা এগুলোর ব্যাপারে সবাই একমত তা না। আসল কথা হচ্ছে, স্বতঃসিদ্ধ সত্য কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি থেকে জন্মায় না।

জন্মগত: বিষয়টা বাইরে থেকে অন্য কেউ শিখিয়ে দেয়নি। এটা অর্জিত কোনো জ্ঞান নয়। হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত চিন্তাভাবনা এবং বোধবিবেচনা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুঝে নেওয়া। এককথায় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শেখা নয় এটা।

স্বাভাবিক: মানবমনের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের কারণে তৈরি।

সহজাত: জগৎ সম্বন্ধে সবচে সহজ ও সর্বব্যাপী ব্যাখ্যা।

"অতীত"-এর মতো স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে চলুন খাটিয়ে দেখি এই বৈশিষ্ট্যগুলো।

অতীতের বাস্তবতা স্বতসিদ্ধ। কারণ এটি সর্বজনীন, শেখানো হয়নি, স্বাভাবিক এবং সহজাত। বর্তমানই একসময় অতীত হয়। প্রতিটি সংস্কৃতি এই অতীতে বিশ্বাস করে। সেদিক থেকে এটি সর্বজনীন সত্য। এটা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির ফল নয়। এটা কাউকে শেখাতে হয় না। কারণ, অতীতের বাস্তবতা কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। অতীত যে বাস্তব এটা বাবা-মার কাছ থেকে শুনে শুনে কেউ বড় হয় না। মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতাতেই বোঝে এটা। এর বাস্তবতা খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। যেকোনো সুস্থজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করবেন, অতীত মানে যা ঘটে গেছে। মানুষের অভিজ্ঞতার সবচে সরল ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হলো অতীত—যা গত হয়েছে। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সহজাত বুঝের ওপর এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছে আমাদের মাঝে। অতীতকে 'বিভ্রম' দাবি করলে তা বরং সমস্যা সমাধানের চেয়ে আরও বেশি চাগিয়ে দেয়। এধরনের দাবি আমাদের জাগতিক মৃত্যু, স্মৃতি কিংবা লিখিত ইতিহাসের কোনো সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

ঈশ্বর: স্বতঃসিদ্ধ সত্য

একসময় যা বর্তমান ছিল তাই যে অতীত, এটা যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তেমনি ঈশ্বরকে বিশ্বাসও একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এ অধ্যায়ে 'ঈশ্বর' বলতে আমরা একজন স্রষ্টার একেবারে মৌলিক ধারণাকে বোঝাচ্ছি, মানবীয় দুর্বলতাহীন প্রাথমিক এক কারণ বা পরিকল্পনাকারী। ঈশ্বর বলতে এখানে আমি কোনো বিশেষ ধর্মের দেবতা বা ঈশ্বরকে বোঝাচ্ছি না। ঈশ্বরের মৌলিক ধারণায় বিশ্বাস কেন সর্বজনীন, জন্মগত, স্বাভাবিক

এবং সহজাত তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে নিচের আলোচনায়। খেয়াল রাখবেন, এই অধ্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে না। বরং নাস্তিকীয় অবস্থানের চেয়ে একজন স্রষ্টা বা প্রথম কারণে বিশ্বাসের প্রাথমিক অবস্থান যে অনেক বেশি সংগতিপূর্ণ সেটাই বলা হবে এখানে।

সর্বজনীন

জগতের স্রষ্টা বা অতিপ্রাকৃত কারণ সম্বন্ধিত মৌলিক ধারণাটি কোনো একক সংস্কৃতির লালিত বিশ্বাস নয়। পৃথিবীর ইতিহাসজুড়ে বহুসংস্কৃতির অংশ এটি। কার্যকারণ এবং অন্যের চিন্তাজগতের অস্তিত্বের মতো সর্বজনীন বিশ্বাস এটা। অন্য একজন মানুষের মাঝেও যে চিন্তাশক্তি আছে, প্রতিটি সংস্কৃতির বেশির ভাগ বুদ্ধিমান মানুষ তা বিশ্বাস করে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অতিপ্রাকৃত কারণের বিষয়টিও এমন। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ঈশ্বরের ধারণা বিভিন্ন রকম। তাই বলে এটি একজন স্রষ্টা বা মনুষ্য গুণাবলিহীন সত্তার মৌলিক ধারণাকে নাকচ করে না।

পৃথিবীতে নাস্তিকদের সংখ্যা যতই হোক না কেন, ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিষয়টি সর্বজনীন। তাই বলে সবাই এতে বিশ্বাসী হবে তা না। এই বিশ্বাসটি যে বহুসংস্কৃতির অংশ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের সর্বজনীন বিশ্বাসের সমর্থনে তাই যথেষ্ট। কোনো একদুটি বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির কারণে কিছু মানুষের মধ্যে এমন বিশ্বাস তৈরি হয়নি। আর এমনিতেও দুনিয়াতে নাস্তিকদের চেয়ে আস্তিকের সংখ্যা বেশি। পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসের শুরু থেকেই এই সংখ্যাধিক্য।

জন্মগত

স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলোকে শেখাতে হয় না বা শিখতে হয় না। স্পাগেত্তি কী এটা জানতে হলে আমাকে পশ্চিমা খাবারদাবার আর ইতালীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানা লাগবে। শব্দটি নিয়ে কেবল ভাবনাচিন্তা করলেই আমি এ সম্বন্ধে জেনে যাব না। কিন্তু যেকোনো জিনিসের যে একজন প্রস্তুতকারী থাকে, এটা জানার জন্য আপনাকে আলাদা করে শিখতে হয় না। হয়তো এজন্যই সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, যদি নাস্তিকদের শিশু সন্তানদের কোনো মরুদ্বীপে ফেলে রাখা হয়, তাদের মনে একসময় এই বিশ্বাস জাগবেই জাগবে: কেউ না কেউ এই দ্বীপ তৈরি করেছে।[৮৪] ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের একেকজনের ভাবনা একেকরকম হতে পারে; কিন্তু একজন স্রষ্টা বা আদি-কারণ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসটি তৈরি হয় একান্ত নিজস্ব ভাবনাচিন্তা থেকেই।

কোনো কোনো নাস্তিক চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলেন, "পাস্তাদানব আর ঈশ্বরে বিশ্বাস একই কথা।" এই আপত্তিটা নিঃসন্দেহে ভুল। স্বতঃসিদ্ধ সত্যের জন্য বাইরে থেকে কোনো তথ্যের প্রয়োজন পড়ে না। দানব যে আছে, কিংবা পাস্তা বলে

যে একটা খাবার আছে, এজন্য তো আগে এসম্পর্কিত তথ্য লাগবে আপনার। কেউ জন্মগতভাবে বা নিজে ভেবে ভেবে এগুলো সম্বন্ধে জানতে পারে না। পাস্তাদানব তাই কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। আর এজন্য এর সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্বের তুলনা চলে না। আর তা ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে অনেক ভালো ভালো প্রমাণ আছে। বিপরীতে পাস্তাদানবের অস্তিত্বের পক্ষে কোনো প্রমাণই নেই।

স্বাভাবিক

মানবমন তার স্বভাবগত কারণেই একজন অতিপ্রাকৃত পরিকল্পক বা প্রথম কারণে বিশ্বাস করে। চিত্রকর ছাড়াই কোনো চিত্রকর্ম তৈরি হয়ে গেছে, বা একটা ভবন রাজমিস্ত্রী ছাড়া আপনাআপনি দাঁড়িয়ে গেছে—এমন চিন্তাকে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আজগুবি মনে করে। মহাজগতের বিষয়টাও এমন। আল্লাহর স্বতঃসিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে প্রাচীন সময় থেকেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার বিষয়। কিংবদন্তি 'আলিম ইবনু তাইমিয়্যা ব্যাখ্যা করেছেন, "একজন সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি সব মানুষের অন্তরে গাঁথা আছে... এটা তাদের সৃষ্টির আবশ্যিক শর্ত থেকে...।"[৮৫] দ্বাদশ শতকের 'আলিম রাগিব ইসফাহানিও বলেছেন, "আল্লাহর জ্ঞান অন্তরে খোদাই করা।"[৮৬] ইসলামি এসব অবস্থানের বাইরেও জ্ঞানের বহু শাখায় এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে এই জগৎকে সৃষ্ট এবং পরিকল্পিত হিসেবে দেখে, সেসব কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় এসব গবেষণায়।

মনস্তাত্ত্বিক প্রমাণ

গাছ-গাছালি, লতা-পাতা এবং প্রাণীদের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের উৎস নিয়ে গবেষণা করেছেন বিদ্যানুরাগী অলিভেরা পেত্রোভিচ। তিনি দেখেছেন, স্কুলগামী যতজন ছেলেমেয়ে বিশ্বাস করে এগুলো মানুষের সৃষ্টি, তার চেয়ে সাতগুণ বেশি স্কুলগামী ছেলেমেয়েরা বিশ্বাস করে এগুলো ঈশ্বরের সৃষ্টি।[৮৭] বহু সাক্ষাৎকার, এবং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপেও তিনি বলেছেন, অতিপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঈশ্বরে বিশ্বাসটিই স্বাভাবিক। অন্যদিকে নাস্তিকতায় বিশ্বাস অর্জিত মননগত অবস্থান।[৮৮] তার রচিত 'ন্যাচারাল-থিয়োলজিকাল আন্ডার্স্ট্যান্ডিং ফ্রম চাইল্ডহুড টু অ্যাডাল্টহুড' বইতে এ সম্বন্ধে আরও সবিস্তারে জানা যাবে।

মনোবিদ পল ব্লুম প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, মননগত মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় পাওয়া গেছে, একজন মহান পরিকল্পককে বিশ্বাস এবং দেহমনের দ্বৈতবাদে বিশ্বাস—ধর্মীয় বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ এই দিক দুটো কিশোরদের কাছে স্বাভাবিক।[৮৯] *"শিশুরা কি সহজাতভাবে আস্তিক?"*—শিরোনামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন

অধ্যাপক ডেবোরাহ কেলেমেন। বিভিন্ন গবেষণা থেকে তিনি সেই নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, শিশুরা প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যের চোখে দেখে।

বিষয়টি অবশ্যই আরও গবেষণার দাবি রাখে। তবে আপাতত এটা 'জন্মগত আস্তিকতা'র সমর্থনে ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমরা যেদিকটি আলোচনা করছি, কেলেমেনের সারাংশ সেকথাই বলছে:

> "সাম্প্রতিক মননগত গবেষণায় দেখা যায়, ৫ বছরের দিকে শিশুরা বুঝতে শুরু করে, প্রাকৃতিক বস্তুগুলো মানবসৃষ্ট নয়। তারা মানুষের তৈরি বস্তুগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কেও ধারণা রাখে। একটা বস্তুর নকশা-কারুকাজগত সূক্ষ্মতা উপলব্ধিরও একটা সামর্থ্যও তৈরি হয় তাদের মধ্যে। প্রমাণ থেকে দেখা যায়, ৬-১০ বছর বয়সী শিশুরা প্রকৃতির মাঝে একটা মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পায়; আর এর সাথে প্রাকৃতিক সৃষ্টিগুলোকে যে তারা মানুষের সৃষ্টি মনে না করার একটা সম্বন্ধ আছে। এসব গবেষণা থেকে শিশুদের ব্যাখ্যামূলক মনোভাবকে সহজাত আস্তিক্যবাদ হিসেবে বলা যেতে পারে।"[১০]

এলিসা জার্নেফেল্ট, কেটলিন এফ. ক্যানফিল্ড এবং ডেবোরাহ কেলেমেন একটি গবেষণা করেছেন সাম্প্রতিক। তাদের গবেষণার শিরোনাম: *"অবিশ্বাসীদের বিভক্ত চিন্তাধারা: বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিধার্মিক প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে প্রকৃতির উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টির ব্যাপারে সহজাত বিশ্বাস"*। এ গবেষণা থেকে বলা হয়েছে, প্রকৃতিকে পরিকল্পিত হিসেবেই দেখার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে মানুষের।[১১]

তিনটি সমীক্ষার ভিত্তিতে এই মত দেওয়া হয়েছে।

প্রথম সমীক্ষাটি করা হয় ৩৫২ জন প্রাপ্তবয়স্ক উত্তর-অ্যামেরিকানদের ওপর। তাদের মাঝে ধার্মিক, নিধার্মিক দু-ধরনের লোকই ছিলেন। কম্পিউটারে তাদের ১২০টি ছবি দেখানো হয়। তাদের কাজ ছিল "ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে তা কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করেছে কি না" সেটা বিচার করা। কিবোর্ডে নির্দিষ্ট বোতাম চেপে 'হ্যাঁ বা না' রায় দিতে হতো তাদের। কাউকে কাউকে কাজটা করতে হতো ঝটপট। কাউকে আবার কিছুক্ষণ ভাবার সময় দেওয়া হতো।[১২]

১৪৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক উত্তর-অ্যামেরিকানের ওপর করা হয় দ্বিতীয় সমীক্ষা। "নাস্তিকদের ইমেল তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশ্য নিধার্মিক সংঘ ও সংস্থার মাধ্যমে এরা নিযুক্ত হন।"[১৩] প্রথম সমীক্ষার লোকদেরকে যে-কাজ করতে হয়েছিল, তাদেরও সেই একই কাজ করতে দেওয়া হয়।

তৃতীয় সমীক্ষা করা হয় ১৫১ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাস্তিক ফিনিশদের নিয়ে। "সারা ফিনল্যান্ডের ছাত্রসংঘ এবং সংস্থার ইমেল-তালিকার মাধ্যমে তারা নিযুক্ত হন।"[১৪] তাদেরকেও একই কাজ করতে দেওয়া হয়।

প্রত্যেকটি সমীক্ষা থেকেই পাওয়া যায় তাক লাগানো ফলাফল। বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ তাদের আলোচনা শেষে দেখলেন, নাস্তিকেরাও জিনিসগুলোর সৃষ্টির মধ্যে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছে:

> "উত্তর ইউরোপের ফিনল্যান্ডে ধর্মহীনতা একটি সাধারণ সামাজিক বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতো তেমন আস্তিক্যমূলক আলোচনাও হয় না এখানে। কিন্তু মজার বিষয়, প্রথম ও দ্বিতীয় সমীক্ষার সাথে সংগতি রেখে তৃতীয় সমীক্ষাতেও অভিন্ন ফল পাওয়া গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে বলতে গেলে, জীবিত ও জড় প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুগুলোকে মানুষের বাইরে অন্য কোনো স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবেই দেখেন ফিনল্যান্ডের নিধার্মিকেরা; এবং এ সৃষ্টির যে কোনো উদ্দেশ্য আছে তাও তারা স্বীকার করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওখানে কিন্তু আস্তিক্যমূলক আলোচনা প্রসিদ্ধ না। তারপরও তিনটি সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী নিধার্মিকদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্মগুলোকে উদ্দেশ্যপূর্ণ সাব্যস্ত করায় উত্তর-অ্যামেরিকান নাস্তিকদের চেয়ে ফিনল্যান্ডের নাস্তিকেরা বেশি সরব। এ থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতির উদ্দেশ্যপূর্ণ সৃষ্টি হওয়াকে সমর্থন করার প্রতি মানুষের ঝোঁক কেবল পারিপার্শ্বিক আস্তিক্যমূলক সাংস্কৃতিক আলোচনার ওপর নির্ভর করে না।"[১৫]

> "সম্পূর্ণ সচেতনভাবে ধর্মহীন হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। বিষয়টা মননগতভাবে কঠিন চেষ্টার অর্জিত ফল, সেই প্রস্তাবের পক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক সমর্থন"[১৬] দিচ্ছে গবেষণাটির ফলাফল। আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হয় এখান থেকে: "প্রকৃতিকে পরিকল্পিত হিসেবে দেখার গভীর স্বাভাবিক প্রবণতা আছে"[১৭] মানুষের মাঝে। অন্যভাবে বললে, অবিশ্বাসী হতে হলে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম ঝরিয়ে শিখতে হবে বিষয়টা। অন্যদিকে জন্মগতভাবেই আমরা জগৎকে দেখি পরিকল্পিত হিসেবে। সাধারণভাবে গবেষণাটি আস্তিকতাকে তুলে ধরছে সহজাত হিসেবে। তবে "সবকিছুকে পরিকল্পতি হিসেবে দেখার এই যে জন্মগত বোধ, সেগুলো নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর অজানা এখনও।"[১৮]

মননগত এবং ক্রমবিকশিত মনোবিজ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই আরও অনেক গবেষণা প্রয়োজন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে। তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস যে স্বাভাবিক, উপরোক্ত গবেষণাগুলো তারই সমর্থন দিচ্ছে।

কিছু কিছু গবেষণা বলে, ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুরা বাস্তবতা আর অলীক কল্পনার মাঝে ফারাক করতে পারে না সহজে। কেউ কেউ এসব গবেষণাকে তুলে ধরতে পারেন ওপরের যুক্তিপ্রমাণটির বিরোধিতা করতে। কিন্তু এই গবেষণাগুলো উপরোক্ত গবেষণার ফলাফলকে দুর্বল করতে পারে না। কারণ, এসব গবেষণার মূল নজর ছিল ধর্মীয় প্রতিবেশ; একজন পরিকল্পক বা স্রষ্টার প্রয়োজন আছে কি না—সে ধারণা নিয়ে নয়।[১১] আর তারচেও বড় কথা কী, ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুদের বাস্তবতা আর উদ্ভট কল্পনার মাঝে ফারাক করতে না পারার বিষয়টা কিন্তু অধিবিদ্যাগতভাবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ। কারণ, যদি বলা হয় এটা আস্তিকতাবাদের চেয়ে নাস্তিকতাবাদকে সমর্থন করে, তার মানে আগে থেকেই ধরে নেওয়া হচ্ছে নাস্তিকতাবাদ সত্য আর আস্তিক্যবাদ মিথ্যা। এ ধরনের গবেষণা তাই উপরোক্ত গবেষণার ফলাফলকে বাতিল করবে না। আর তা ছাড়া আমি যেসব গবেষণার কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলোর আছে বহুসংস্কৃতি-ব্যাপী সংশ্লিষ্টতা। তার মানে অংশগ্রহণকারীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আস্তিক বা নাস্তিক যা-ই হোক, সবার মাঝেই আছে আস্তিক্য-প্রবণ প্রবৃত্তি।

উপরোক্ত গবেষণার ফলাফলের ব্যাপারে আরেকটি বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু গবেষণায় নাস্তিক্যবাদকে বলা হয়েছে মননগতভাবে কঠিন চেষ্টার ফল। তার মানে অবিশ্বাস করার জন্য বেশি চিন্তার প্রয়োজন হচ্ছে। এ থেকে অনেকে মনে করেন, এই অবস্থানই তো তা হলে বেশি যৌক্তিক। কিন্তু আসলে তাদের এই আপত্তিটা ভুল সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে টানা। মূলত এই প্রমাণটা বলে যে, নাস্তিকতাবাদের জন্য জড় জগৎ সম্বন্ধে অস্বাভাবিক অনুমান গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে (দেখুন অধ্যায় ১২)। আর সেজন্যই মানসিকভাবে এটা বেশি কষ্টসাধ্য।

সবগুলো প্রাসঙ্গিক গবেষণার কথা আমি এখানে উল্লেখ করিনি। আলোচনাটি তাতে অনেক জটিল হয়ে যেতে পারে। আর তা ছাড়া আপাত-বিরোধী সমীক্ষা থাকলেও, আমার মতে সেগুলো চূড়ান্ত নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস সহজাত হওয়া সম্বন্ধে গবেষণার হার যে এখন বাড়ছে সেটা দেখানোই ছিল আমার এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

সমাজবিদ্যাগত এবং নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ

"*বোর্ন বিলিভার্স: দ্যা সায়েন্স অফ চিল্ড্রেন'স রিলিজিয়াস বিলিফ*" বইতে অধ্যাপক জাস্টিন ব্যারেটের গবেষণা চষে দেখেছে শিশুদের আচার-আচরণ এবং দাবিদাওয়া। তিনি সিদ্ধান্ত টেনেছেন শিশুরা "প্রাকৃতিক ধর্ম"-তে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে,

গোটা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন কেবল একজন। সেই সত্তাকে তারা মানবীয় গুণসম্পন্ন মনে করে না। তাঁকে তারা বিবেচনা করে অতিপ্রাকৃত ঐশী সত্তা হিসেবে:

> "শিশু-মন এবং অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের ওপর করা গবেষণায় দেখা যায়, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে সহজে বিশ্বাস করার মতো স্বাভাবিক এবং দ্রুত চিন্তাশক্তি প্রয়োগের গুণ অর্জন করে তারা। নির্দিষ্ট করে বললে, জন্মের এক বছরের মধ্যে শিশুরা শক্তি আর অ-শক্তির মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তারা বুঝতে শেখে শক্তিগুলো লক্ষ্য পূরণে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদের অবস্থান বদলাতে পারে। তাদের আশেপাশে যথেষ্ট নজির না থাকলেও তারা আগ্রহভরে এ ধরনের ক্রিয়াকর্ম খোঁজে। প্রথম জন্মদিনের অল্প কিছুদিনের মাথাতেই তারা বুঝতে পারে, শক্তিগুলো বিশৃঙ্খলতা থেকে শৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে; কোনো প্রাকৃতিক শক্তি বা সাধারণ কোনো বস্তু নিজে থেকে তা পারে না... এই যে প্রকৃতির মাঝে ক্রিয়াকর্ম আর উদ্দেশ্য খোঁজার প্রবণতা, সাথে মননশীল সত্তা থেকে উদ্দেশ্য আর শৃঙ্খলা আসা সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি থেকে বলা যায়, তারা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে উদ্দেশ্যপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবেই দেখে। স্রষ্টা তা হলে কে? শিশুরা জানে কোনো মানুষ স্রষ্টা হওয়ার যোগ্য নয়। তা নিশ্চয় অমানবীয় কেউ—ঈশ্বর... শিশুরা জন্মগতভাবে এমন এক সত্তায় বিশ্বাসী। আমি তাই এটাকে বলি প্রাকৃতিক ধর্ম...।"[১০০]

সহজাত

একজনমাত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব জগতের সবচে সহজাত ব্যাখ্যা। কোনো বাহ্যিক নির্দেশনা ছাড়া সহজেই বোঝা যায় এটা।

যেকোনো জিনিসের প্রতি কারণ আরোপ করার একটা তীব্র অনুরাগ আছে মানুষের। জগতের ব্যাপারেও মানুষের ধারণা তা-ই (দেখুন অধ্যায় ৫ ও ৬)। মানুষের সব অন্তর্জ্ঞান সঠিক নয় অবশ্য, তবে যেকোনো জিনিসের ব্যাপারে আমাদের যে একটা প্রাথমিক অন্তর্জ্ঞান থাকে, তা থেকে যদি সরে আসতে হয়, তা হলে প্রমাণ থাকা জরুরি। যেমন ধরুন, মহাবিশ্বের সুপরিকল্পনা ও নকশা দেখে স্বাভাবিকভাবে মানুষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে এর একজন পরিকল্পক আছে অবশ্যই (দেখুন অধ্যায় ৮)। তাকে যদি এখন এই মত থেকে সরতে হয়, তা হলে এই সহজাতজ্ঞানের বিপরীত মত সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ লাগবে।

একজন ঈশ্বর, স্রষ্টা, পরিকল্পক বা অতিপ্রাকৃত প্রথম কারণে বিশ্বাসের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এটি সর্বজনীন, জন্মগত, স্বাভাবিক এবং সহজাত। তার মানে 'ঈশ্বর একজন আছেন কি না' এটা কোনো উচিত প্রশ্ন নয়; উচিত প্রশ্ন হলো: 'আপনি কেন

ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন?' এভাবে ন্যায়সংগতভাবেই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবেন আপনি।

নাস্তিকতাবাদ অস্বাভাবিক। স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে যিনি চ্যালেঞ্জ করেন, প্রমাণের দায় তারই। যিনি দাবি করেন অতীত এক বিভ্রম কিংবা অন্য মানুষদের চিন্তাজগৎ নেই, তখন এটা প্রমাণের দায়ও তার। নাস্তিকেরাও এর থেকে আলাদা নয়। তারা যে জগতের প্রথম কারণ বা স্রষ্টাকে অস্বীকার করেন, তাই এটা তাদেরকেই যুক্তিসংগতভাবে প্রমাণ করতে হবে।

"নাস্তিকতাবাদ স্বতঃসিদ্ধ সত্য"

কোনো কোনো নাস্তিক যুক্তি দেখান, প্রাথমিকভাবে নাস্তিকতাবাদই সত্য। কিন্তু আসলে বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। নাস্তিকতাবাদ এখন একটি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান হতে পারে (হয়তো-বা লিখিত ইতিহাসের শুরু থেকেই); কিন্তু এটি জন্মগত নয়; সহজাতজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীলও নয়। সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে অস্বীকার করতে, কোনো জিনিসের পেছনের কারণকে অস্বীকার করতে মানুষকে বাইরে থেকে ধারণা নিতে হয়। এজন্য মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে অস্বীকার করার বিষয়টি মোটেও সবচে সরল ও সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা নয়। এটা সমস্যা সমাধানের চেয়ে বরং আরও বেশি সমস্যা পাকায়।

যেমন ধরুন: শূন্য থেকে মহাজগতের অস্তিত্বে আসার পেছনে ব্যাখ্যা কী (দেখুন অধ্যায় ৫)? পরনির্ভরশীল এই মহাজগতের অস্তিত্বের পেছেন কোনো ব্যাখ্যা থাকবে না কেন (দেখুন অধ্যায় ৬)? এসব প্রশ্নের সদুত্তর কোথায়?

নাস্তিকেরা বলতে পারেন, মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি নিয়ে বিকল্প ব্যাখ্যা আছে। তা আছে বটে, কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলো স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। এগুলো প্রাথমিক অবস্থান নয়; অর্জিত অবস্থান। স্বতঃসিদ্ধ কিছুকে অস্বীকার করতে গেলে যে প্রমাণ দিতে হবে সেকথা একটু আগেই বলেছি। জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিকল্প ব্যাখ্যা যে নেই, আমি তা বলছি না। আমি শুধু প্রাথমিক অবস্থানটা দেখিয়ে দিতে চাচ্ছি। প্রাথমিকভাবে যেহেতু একজন ঈশ্বরের মৌলিক ধারণার বিষয়টি সত্য, কাজেই প্রথম যে-প্রশ্নটি আমাদের করা উচিত তা হচ্ছে: ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারে কী প্রমাণ আছে তাদের কাছে?

জন্মগত স্বভাব: ফিতরা

আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য, ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় সে বিষয়টার নাম *ফিতরা*। আরবি তিন অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দমূল *ফা-তা-রা* থেকে এসেছে

শব্দটি। এর সঙ্গে সম্বন্ধিত অন্যান্য শব্দের মাঝে আছে *ফাতরুন* এবং *ফাতারাহ*। এর অর্থ সৃষ্ট বা তৈরি জিনিস। আভিধানিকভাবে এর অর্থ এমন কিছু, যেটা আল্লাহ আমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ধর্মতাত্ত্বিকভাবে, *ফিতরা* হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা বা জন্মগত অবস্থান। আল্লাহর প্রতি সহজাত জ্ঞান এবং তাঁর উপাসনার প্রতি তীব্র অনুরাগ দিয়ে তিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন।[১০১] নবি মুহাম্মাদ ﷺ থেকে নির্ভরযোগ্য একটি বক্তব্য আছে এ ব্যাপারে। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক শিশু *ফিতরাতের* ওপর জন্মায়। কিন্তু পরে তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা আগুন-পূজারি বানায়...।"[১০২]

নবিজির বক্তব্য থেকে দেখছি, প্রত্যেক মানুষের মাঝেই থাকে এই জন্মগত অবস্থান। কিন্তু বাবা-মায়ের লালন-পালন এবং সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষ এ থেকে সরে যায়।

ফিতরা সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। একাদশ শতাব্দীর বিদগ্ধ ধর্মতাত্ত্বিক গাযালি বলেছেন, আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতা এবং উপাসনা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর একচ্ছত্র অধিকারের বিষয়টি মানুষ এই *ফিতরার* মাধ্যমেই বুঝতে পারে। তিনি বলেছেন, আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞানের বিষয়টি এমন যে, এটা "থাকে প্রত্যেক মানুষের চেতনার গভীরে।"[১০৩] চতুর্দশ শতকের মনীষী ইবনু তাইমিয়্যা *ফিতরাকে* বলেছেন এমন কিছু, যার মাঝে খোদাই হয়ে থাকে আল্লাহর জ্ঞান: "...*ফিতরা* থেকেই একজন নিপুণ স্রষ্টার অস্তিত্ব জানা যায়। এই জ্ঞান অমোচনীয়, অনিবার্য এবং সুস্পষ্ট।"[১০৪]

মানুষের এই অবস্থানটি স্বভাবগত হলেও এর ওপর *পর্দা* পড়ে যেতে পারে। পারিপার্শিক কোনো প্রভাবে হতে পারে বিনষ্ট। নবিজির বক্তব্য অনুযায়ী সে প্রভাব পড়তে পারে বাবা-মায়ের লালন-পালন, সমাজ কিংবা সঙ্গদোষ থেকে। এসব আছর মানুষের *ফিতরাকে* ঢেকে দিতে পারে কালো মেঘে। সত্য স্বীকার করা থেকে পারে বাধা দিতে। ইবনু তাইমিয়্যা বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থান যখন অন্য কিছুর আছরে ঢেকে যায়, তখন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে তার জন্য অন্যান্য প্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে:

> "যার *ফিতরা* অক্ষুণ্ণ, তার কাছে স্রষ্টা এবং তাঁর পূর্ণতার স্বীকৃতি সহজাত এবং অনিবার্য। অবশ্য এর স্বপক্ষে এর বাইরেও অন্যান্য প্রমাণ আছে। কারও *ফিতরায়* যখন ঘুণ ধরে... অনেক লোকেরই তখন সেসব প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে।"[১০৫]

যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণগুলো এই অন্যান্য প্রমাণের মাঝে পড়বে। প্রাথমিকভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ দেওয়ার পক্ষপাতী নন ইবনু তাইমিয়্যা। তিনি মনে করতেন, তাঁকে বোঝার জন্য *ফিতরাই* প্রধান উপায়। তবে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে

বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণের বিরোধিতা তিনি করেননি।[১০৬] তবে এসব প্রমাণাদি দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে এগুলো যেন ইসলামি ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে মানানসই হয়। এর বিরোধী কোনো হেতুবাক্য (বা ধারণা) নেওয়া যাবে না।

ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে একটা বিষয় খেয়াল রাখা খুব জরুরি। শুধু কোনো ধরনের কার্যভিত্তিক যুক্তি, কারণভিত্তিক যুক্তি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা হয় না এখানে। এগুলোর কাজ আসলে *ফিতরা*কে জাগিয়ে তোলা। যে-মেঘ ওটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে সরিয়ে ফেলা। যে-সত্য পুরে দেওয়া আছে আমাদের অন্তরের ভেতর, তা পুনরায় 'স্মরণ' করিয়ে দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণের কাজ।

মনে করুন, আমি চিলেকোঠা সাফ করছি। পুরোনো মালপত্র সরাতে গিয়ে আমার ছোটবেলার খুব প্রিয় একটা খেলনা পেয়ে গেলাম: "আরে, এই তো আমার সেই প্রিয় খেলনাটা। কত খেলতাম এটা নিয়ে ছোটবেলায়।" বিজ্ঞান ও যুক্তির ভূমিকাও অনেকটা তেমন। আমাদের *ফিতরার* মাঝে যে-জ্ঞান পুরে দেওয়া আছে, সেটাকে আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জাগিয়ে তোলাই এসব যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণের কাজ।

ফিতরার ওপর থেকে ঘনমেঘ সরানোর অন্যান্য উপায়ের মাঝে আছে আত্ম-জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, ভাবনাচিন্তা। কুরআন তো রীতিমতো উৎসাহ করে প্রশ্ন করতে, ভাবনাচিন্তায় মগ্ন হতে:

> "ভাবনাচিন্তাকারীদের জন্য আমি এভাবেই নিদর্শনমালাকে সবিস্তারে খুলে বলি।"[১০৭]
>
> "ভাবনাচিন্তাকারী মানুষদের জন্য এতে অবশ্যই এক নিদর্শন আছে।"[১০৮]
>
> "তারা শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারা [নিজেরাই] নিজেদের স্রষ্টা? নাকি তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে এই মহাকাশমালা আর পৃথিবী? আসলে তারা নিজেরাই নিশ্চিত না।"[১০৯]

যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণকে ইসলামি জ্ঞানতত্ত্ব দেখে পথ হিসেবে; গন্তব্য হিসেবে নয়। এদের কাজ *ফিতরা*কে জাগানো। দিক-নির্দেশ যে কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আসে, এটা বোঝা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। তিনি যদি দিশা না দেন, তা হলে হিমালয় পরিমাণ যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ দিয়েও কাউকে ইসলামের সত্যতা বোঝানো যাবে না। খুব স্পষ্ট করে এই নীতি বলে দিয়েছেন মহান আল্লাহ:

> "তুমি তোমার পছন্দমতো কাউকে দিশা দিতে পারো না। বরং আল্লাহ যাকে খুশি পথ দেখান। দিশাপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনিই সবচে ভালো জানেন।"[১১০]

হিদায়াত বা পথনির্দেশ পাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আল্লাহর দয়া, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করে এটা। আল্লাহ যদি চান কেউ যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণে আশ্বস্ত হয়ে ইসলামের সত্যতা মেনে নেবে, তবে কেউ সেই মানুষকে আটকাতে পারবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ, তাঁর শাশ্বত প্রজ্ঞায় যদি সিদ্ধান্ত নেন কোনো লোক হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য নয়, তা হলে তাকে যত অকাট্য প্রমাণই দেওয়া হোক, কক্ষনো সে সত্য কবুল করবে না।

মোদ্দা কথা, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস একটি স্বতঃসিদ্ধ ও প্রকৃতিগত সত্য। আর স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে কেউ অস্বীকার করলে এর বিপরীত প্রমাণ দেওয়ার দায় অস্বীকারকারীর। ঐশী সত্তার অনস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া গেলেই শুধু সেটা আল্লাহকে বিশ্বাসের বিষয়টিকে দুর্বল করতে পারে। সে যাই হোক, এই বইতে আমরা দেখব, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নাস্তিকদের যেকখানা যুক্তি আছে তা কীভাবে দুর্বল এবং দার্শনিকভাবে জোলো (দেখুন অধ্যায় ১১, ১২)। আল্লাহর অস্তিত্ব যে আমাদের সহজাত জ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তা খুব সংক্ষেপে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিদগ্ধ ব্যক্তি উইসাম শারকাওয়ী:

> "কেউ যদি নিজেকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে, তার আশপাশের জগৎ নিয়ে ভাবে, তা হলে তার মনের গহনে প্রথমেই জাগবে এক উচ্চতর শক্তির ভাবনা। গোটা জগতের ওপর তাঁর রাজত্ব। জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংস, গতি-জড়তা, জগতে ঘটে চলা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি পরিবর্তনের ওপর একক নির্বাহী তিনি। মানুষ তার এই ভাবনাটির পক্ষে প্রমাণ দিতে পারুক কি না-পারুক, এই বাস্তবতা যে সে বোঝে, এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক অবস্থান। নির্ভুল ও যথাযথ প্রমাণ অবশ্যই... আমরা তো আমাদের মাঝেও অনুভব করি মমতা, ভালোবাসা, ঘৃণা, সাহস আর অপছন্দের অনুভূতি। আমাদের মাঝেই তো এগুলোর বিচরণ, কিন্তু কোথায় এগুলোর অস্তিত্বের প্রমাণ? নিজের অনুভূতি আর বোধশক্তির বাইরে আর কি কোনো প্রমাণ কেউ নিয়ে আসতে পারে? তবুও তো এগুলো সন্দেহাতীতভাবে সত্য। মানুষ তীব্র উত্তেজনা আর ব্যথা অনুভব করে। অথচ এই অনুভূতিকে ব্যক্ত করার বাইরে আর কোনো প্রমাণ সে হাজির করতে পারে না। মানুষ যে এই ফিতরা, এই সহজাত অবস্থান দিয়ে সৃষ্টি, এবং এই গভীর অনুভূতিগুলো যে আমাদের মাঝে খোদাই করা, তা নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। বিনা কারণে বা অযথাই আমাদের মাঝে এগুলোর বিচরণ নয়। বরং জগতের সঙ্গে মানানসই স্বাভাবিক এক সত্য এটা।"[১১১]

অধ্যায় ৫

শূন্য থেকে মহাজগৎ?

মনে করুন, আপনি একটা ঘরের কোণে বসে আছেন। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে দরজাটা সিলগালা করে আটকে দেওয়া হয়েছে। এখন, না এই ঘরের ভেতরে আর কিছু ঢুকতে পারবে, আর না যেতে পারবে বাইরে। ঘরের মেঝে, দেয়াল, ছাদ সবখানেই পাথরের ঢালাই। শূন্য এই ঘরে নিকশ অন্ধকারে আপনি বসে আছেন একাকী। চরম বিরক্তিতে হাঁপিয়ে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুচোখ বুজে এল আপনার। কয়েক ঘণ্টা পর ঘুম ভেঙে উঠলেন আপনি। কিন্তু চোখ খুলতেই আপনার চোয়াল খুলে যাবার জোগাড় হলো বিস্ময়ে! ঘরের মাঝখানে কোথা থেকে যেন একটা টেবিল চলে এসেছে। শুধু টেবিলই না, তার ওপর একটা ল্যাপটপ। কাছে যেতেই দেখলেন পর্দায় লেখা: এই টেবিল আর কম্পিউটার এসেছে শূন্য থেকে।

পর্দার লেখাটা কি বিশ্বাস করেন আপনি? অবশ্যই না। আপনার সহজাত জ্ঞান বলছে, কোনো কারণ ছাড়া বেমক্কা একটা টেবিল আর ল্যাপটপ এভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে না। কিন্তু তারপরও কীভাবে যে এল আপনি কোনো কুলকিনারা করতে পারছেন না। কিছুক্ষণ ভাবনাচিন্তা করে বেশ কিছু যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন মনে মনে। এক হতে পারে কোনো কারণ বা পূর্বক্রিয়া ছাড়াই চলে আসতে পারে এগুলো—অন্য কথায় শূন্য থেকে। আরেক হতে পারে, এরা নিজেরাই নিজেদের তৈরি করেছে আপনাআপনি। আর নাহলে কোনো পূর্বক্রিয়া এদেরকে সৃষ্টি করেছে, বা এখানে এনে রেখেছে। আপনার বোধ-বিবেচনা যদি ঠিক থাকে, আপনার কাছে তিন নম্বর ব্যাখ্যাটাই সবচে যৌক্তিক মনে হওয়াটা স্বাভাবিক।

কারণ, এই ধরনের যুক্তি সর্বজনীন। তবে এই যুক্তির আরও বলিষ্ঠ সংস্করণটি কুরআনে চমৎকার ভাষায় পাওয়া যায়। যুক্তিটি বলে, কোনো সসীম সত্তা হয় শূন্য থেকে আসতে পারে, বা নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করতে পারে, অথবা অন্য কোনো সৃষ্টি তাকে সৃষ্টি করতে পারে, কিংবা অন্য কোনো চিরন্তন সত্তা সৃষ্টি করতে পারে। যুক্তিটিকে আরও ভেঙে বলার আগে একটা জিনিস পাঠকের নজরে আনতে চাই। কুরআন কিন্তু প্রায়ই যুক্তিসিদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক তুলে ধরে। পাঠককে ধরে রাখার জন্য কুরআনের

ভাষা যেমন আশ্বস্তকারী, তেমনি জোরালো। ভাবনার দেয়ালে আলোড়ন তোলা প্রশ্ন আর জোরালো সব যুক্তি দিয়ে কুরআন ইতিবাচকভাবে ছাপ ফেলে আমাদের মন ও মননে। কুরআনের এই দিকটি সম্বন্ধে সহযোগী অধ্যাপক রোজালিন্ড ওয়ার্ড গোয়নে বলেছেন, "কুরআনের অনেক অংশেই যে যুক্তিতর্কের উপস্থিতি, তা থেকে বোঝা যায় প্রতিদিনের কাজকর্মের জন্য যুক্তির কত প্রয়োজন মানুষের...।"[১১২] ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রেও এর অনেক প্রভাব আছে বলে মনে করেন গোয়নে: "কুরআনের বিষয়বস্তুর মাঝে যুক্তিতর্ক এত প্রবল, এর গঠনে এত অবিচ্ছেদ্য যে, এটা কুরআনীয় মনীষীদের চিন্তাধারার রূপরেখা গড়ে দিয়েছে বহুভাবে।"[১১৩]

যুক্তি আর আকাশবাণীর মাঝে যে সম্বন্ধ আছে, তা ইসলামের প্রাথমিক সময়ের 'আলিমেরাও জানতেন। তারা বুঝেছিলেন, ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি প্রমাণের অন্যতম উপায় যৌক্তিক চিন্তাভাবনা। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রাজ্ঞ মনীষী ইবনু তাইমিয়্যা লিখেছেন, প্রথম যুগের 'আলিমেরা "জানতেন, আকাশবাণী এবং যৌক্তিক প্রমাণ দুটোই সত্য। একটি আরেকটির জন্য অপরিহার্য। যৌক্তিক প্রমাণকে যে-ই যথাযথভাবে বিচারবিশ্লেষণ করেছে, সে জানে, নবি-রাসূলদের কথাবার্তার সঙ্গে এটা সংগতিপূর্ণ। তাদের বার্তায় বিশ্বাসের অনিবার্যতাও প্রমাণ করেছে এগুলো।"[১১৪]

কুরআনের যুক্তি

আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে কুরআনে তিনি খুব জোরালো যুক্তি তুলে বলেছেন, "তারা কি তা হলে কোনো কারণ (স্রষ্টা) ছাড়া সৃষ্ট? নাকি তারা নিজেরাই [নিজেদের] স্রষ্টা? আর নাকি তারাই সৃষ্টি করেছে মহাকাশ আর এই পৃথিবী? আসলে তারা নিজেরাই তো নিশ্চিত না।"[১১৫]

কুরআনের এই যুক্তিটি প্রাথমিকভাবে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা। তবে মানুষ ছাড়া অন্য যেকোনো সৃষ্ট বস্তুর বেলাতেও এটা খাটবে। আয়াতটিতে ব্যবহৃত খুলিকু শব্দের অর্থ সৃষ্ট, তৈরিকৃত, আবির্ভূত।[১১৬]

আমরা এবারে যুক্তিটিকে ভেঙে ভেঙে দেখব।

কোনো কিছু কীভাবে সৃষ্ট হতে পারে বা অস্তিত্বশীল হতে পারে সে-সম্বন্ধে কুরআন শুধু তর্কের খাতিরে হলেও চারটি সম্ভাবনার কথা বলেছে:

- এমনি এমনি সৃষ্ট: "তারা কি তা হলে কোনো কারণ ছাড়া সৃষ্ট?"
- নিজেরা নিজেদের স্রষ্টা: "নাকি তারা নিজেরাই [নিজেদের] স্রষ্টা?"

- অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্ট: “নাকি তারাই সৃষ্টি করেছে মহাকাশমালা আর এই পৃথিবী?”, এর মানে কোনো সৃষ্ট বস্তু একেবারে শুরুতে অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্ট।
- চিরন্তন সত্তা থেকে সৃষ্ট: “আসলে তারা নিজেরাই অনিশ্চিত”, এর মানে আল্লাহকে অস্বীকার করার কোনো ভিত্তি নেই। অর্থাৎ একজন চিরন্তন স্রষ্টা আছেন।”[১১৭]

ওপরের যুক্তিটিকে আমরা একটি সর্বজনীন সূত্রে ফেলতে পারি:

- মহাজগৎ সসীম।
- সসীম বস্তু শূন্য থেকে আসতে পারে, নিজে থেকেই আবির্ভূত হতে পারে, অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তু একে সৃষ্টি করতে পারে, অথবা কোনো অসৃষ্ট বস্তু একে সৃষ্টি করতে পারে।
- সসীম বস্তু শূন্য থেকে আসতে পারে না, নিজে থেকেও আবির্ভূত হতে পারে না। এবং কোনো সৃষ্ট বস্তু একেবারে শুরুতে একে সৃষ্টি করতে পারে না।

তার অনিবার্য মানে হলো, কোনো চিরন্তন সত্তা একে সৃষ্টি করেছেন।

সসীম মহাজগৎ

এই মহাজগৎ যে-সসীম সে-সম্বন্ধে অনেক দার্শনিক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে সবচে জোরালো ও সরল প্রমাণে দেখা যায়, জড় কোনো আদর্শ অসীমের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এখানে আমি আদর্শ অসীম বলতে বোঝাচ্ছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে ভাগ করা যায় এমন অসীম। একাধিক পৃথক পৃথক অংশ দিয়ে এগুলো গঠিত। যেমন ধরুন, কোনো শরীরী বা জড় বস্তু। হতে পারে তা কোনো পরমাণু, কোয়ার্ক, বাস, জিরাফ বা কোয়ান্টাম ক্ষেত্র।

যে-অসীমকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে ভাগ করা যায় না, সেটা একাধিক পৃথক পৃথক অংশ দিয়ে গঠিত না। এ-ধরনের অসীম সুসংগতিপূর্ণ এবং এর অস্তিত্ব থাকতে পারে। আল্লাহর অসীমতা এ-ধরনের অবিচ্ছিন্ন অসীম। তিনি কোনো পৃথক পৃথক জড় অংশ দিয়ে তৈরি নন। ইসলামি ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী তিনি স্বতন্ত্র পরাজাগতিক এক সত্তা।

অস্তিত্বশীল কোনো বস্তুর পক্ষে যে অসীমত্ব ধারণ করা সম্ভব না, তার সবচে আশ্বস্তমূলক এবং সহজাত প্রমাণ পাওয়া যায় ভাবনা-পরীক্ষায় (Thought Experiment)। এই অসীম অবশ্য গাণিতিকভাবে অসীম ধরে নেওয়া থেকে আলাদা। যৌক্তিকভাবে অসংগতিপূর্ণ হলেও, এটা গাণিতিক বলয়ে অস্তিত্বশীল। এই বলয় নানা

স্বতসিদ্ধ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। তবে আমরা এখানে দেখব বস্তুগত দুনিয়ায় অসীম কিছুকে উপলব্ধি করা সম্ভব কি না। নিচের উদাহরণ দুটো খেয়াল করুন:

থলে ভরতি বল

মনে করুন, আপনার কাছে একটা ব্যাগে অসীম সংখ্যক বল আছে। সেখান থেকে দুটো বল নিয়ে গেলে আর কয়টি থাকবে? গাণিতিকভাবে এখনো অসীম সংখ্যক বল থাকবে আপনার কাছে। কিন্তু বাস্তবে থাকবে থলেতে যে-পরিমাণ বল আগে ছিল, তারচে দুটো কম। দুটো বল থলে থেকে বাইরে না ফেলে যদি আরও দুটো ভরেন, তা হলে কতগুলো বল হবে? আগে যা ছিল, তার থেকে দুটো বেশি, তাই তো? থলের ভেতর মোট কতগুলো বল আছে তা আপনার গুনতে পারা উচিত; কিন্তু আপনি পারবেন না। কারণ, অসীমের বিষয়টা কেবলই একটা ধারণা। বস্তুগত দুনিয়ায় এর অস্তিত্ব নেই। এ থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, পৃথক পৃথক ভৌত অংশের সমন্বয়ে বাস্তবে কোনো অসীম কিছু গড়ে উঠতে পারে না। বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট এ প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, "বস্তুগত জগতে কোথাও অসীমকে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃতিতে যেমন এর অস্তিত্ব নেই, তেমনি যুক্তিসিদ্ধ ভাবনাচিন্তার জন্য এটা কোনো বৈধ ভিত্তি নয়; অসীম কেবলই একটি ধারণা।"[১১৮]

বিভিন্ন আকারের ঘনকের স্তূপ

মনে করুন, আপনার কাছে অনেকগুলো ঘনবস্তুর স্তূপ আছে। প্রতিটা ঘনকের গায়ে নম্বর দেওয়া। প্রথম ঘনকের ঘনত্ব ১০ সেন্টিমিটার কিউব। পরের ঘনকের ঘনত্ব ৫ সেন্টিমিটার কিউব। এরপরেরটার ঘনত্ব আগেরটার অর্ধেক। পরবর্তীগুলোর ঘনত্ব এভাবেই অনাদি পরম্পরায় কমে চলছে। আপনি এখন ঘনকগুলোর স্তূপের একেবারে চূড়ায় উঠে প্রথমটি সরিয়ে নিন তো দেখি। পারবেন না। কোনো ঘনক নেই। কেন? যদি চূড়োয় কোনো ঘনক পাওয়া যায়, তার মানে এটা অসীম অবধি পৌঁছায়নি। তবে যেহেতু চূড়োয় কোনো ঘনক নেই, এ থেকে বোঝা যায়, গাণিতিকভাবে ধারণা হিসেবে অসীমের অস্তিত্ব থাকলেও, বাস্তব জগতে একে ঠাহর করার উপায় নেই। ঘনকের স্তূপের চূড়োর যেহেতু সীমা-পরিসীমা নেই, তার মানে পৃথক পৃথক ভৌত পদার্থে তৈরি কোনো অসীম বস্তুকে বাস্তবে উপলব্ধি করা সম্ভব না।

ধারণাগতভাবে, এই মহাজগৎও সেই থলে ভরতি বল, কিংবা ঘনকের স্তূপের মতো। এই মহাজগৎ বাস্তব। পৃথক পৃথক ভৌত পদার্থের সমন্বয়ে এর গঠন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় এমন অসীমের অস্তিত্ব যেহেতু বাস্তব দুনিয়ায় নেই, তার মানে এই মহাজগৎ অসীম হতে পারে না। এটা সসীম। আর যেহেতু এটি সসীম, তার মানে এর একটা শুরু আছেই, থাকতেই হবে।

মহাজগতের শুরু সম্বন্ধে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে, সেগুলো এখানে আলোচনা করলাম না। কারণ, এগুলো এখনো অমীমাংসিত। এর মানে এমন এক "প্রস্তাব যা বলে, বিজ্ঞানভিত্তিক যেকোনো তত্ত্বের বিপরীতে প্রমাণভিত্তিক অন্তত একটি তত্ত্ব থাকবে...।"[১১১] মহাজাগতিক প্রমাণ সম্বন্ধে প্রায় ১৭টি প্রতিযোগী মডেল আছে। এগুলোর কোনো কোনোটা বলে, মহাজগৎ সসীম। এর শুরু আছে। আবার কোনো কোনোটা বলে, মহাজগৎ কালাতীত। তো কোনো প্রমাণই চূড়ান্ত নয়। নতুন প্রমাণ পর্যবেক্ষণের পর কিংবা নতুন কোনো রূপের বিকাশ ঘটলে এসব সিদ্ধান্ত বদলে যেতে পারে (দেখুন অধ্যায় ১২)।

যাহোক, মহাজগতের শুরু সম্বন্ধে আমরা এখন সেই চারটি যৌক্তিক সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলব।

শূন্য থেকে সৃষ্টি?

এই সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলার আগে 'শূন্য' দিয়ে কী বোঝাচ্ছি তা বলে নিতে চাই। শূন্য মানে যাবতীয় সবকিছুর অনুপস্থিতি। ধরুন, যদি সবকিছু, সব পদার্থ, শক্তি, সম্ভাব্য সব বিষয় বিলীন হয়ে যায়, সেই অবস্থাকে বলা হয় শূন্য। কোয়ান্টাম শূন্যতা বা ক্ষেত্রের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলবেন না। এ বিষয়টা আমি পরে বলব। শূন্য মানে কোনো কারণজনিত পরিবেশের অনুপস্থিতিকেও বোঝায়। কারণজনিত পরিবেশ মানে ফল নিয়ে আসে এমন যেকোনো ধরনের কারণ। সেই কারণ হতে পারে বস্তুগত বা অবস্তুগত।

শূন্য থেকে কিছু আসতে পারে বলে দাবি করার মানে কোনো কিছু যেন ভেলকিবাজির মতো আপনাআপনি অস্তিত্বে চলে আসতে পারে। এমন দাবি আমাদের সহজাত জ্ঞান ও যুক্তিকে অপমান করার শামিল।

মহাজগৎ কি শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসতে পারে? অবশ্যই না। শূন্য থেকে কিছুই আসে না। শূন্যতা কোনো কিছুরই জন্ম দিতে পারে না। কোনো কারণ না থাকলে কিছু ঘটে না। সহজ একটা অঙ্ক কষে এটা বলতে পারি আমরা। ০+০+০=০-ই হবে; ৩ না।

এ-বিষয়টি যেহেতু যুক্তিসিদ্ধ (বা অস্তিত্ব, সৃষ্টি ও জ্ঞানসংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্রের) মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তাই এটা খুবই সহজাত একটি বিষয়। অস্তিত্বহীন কিছু থেকে কোনো কিছু অস্তিত্বশীল হতে পারে না। এই সহজাত জ্ঞানের বিপরীত কিছু যদি কেউ দাবি করে, আমি তা হলে বলব সেটা মনন-নির্ভর অনুসন্ধান ও বিচারের পরিপন্থি দাবি। তা না-হলে তো যেকেউই যেকোনো কিছু দাবি করতে পারে। কেউ যদি দাবি করেন, এই মহাজগৎ শূন্য থেকে আসতে পারে, তা হলে এর পরিণাম হবে

উদ্ভট। তারা তা হলে বলে বসবেন, কোনো ধরনের কারণজনিত পরিবেশ ছাড়াই যেকোনো কিছু ঘটতে পারে।

যারা বলেন, শূন্য থেকে কোনো কিছুর উদ্ভব সম্ভব, তাদের তো তা হলে এটাও বলা উচিত, কোনো কারণঘটিত অবস্থা ছাড়া যেকোনো কিছু উধাও-ও হয়ে যেতে পারে। সে হিসেবে, কোনো ভবন যদি পুরোপুরি হাওয়া হয়ে যায়, তা হলে তার চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ, কোনো কিছু যদি এমনি এমনি উদ্ভব হতে পারে, তা হলে কোনো জিনিস এমনি এমনি হাওয়াও হয়ে যেতে পারে। তবে এ ধরনের কোনো কিছু বলা অবশ্যই যৌক্তিকভাবে উদ্ভট।

কোয়ান্টাম শূন্যতায় কোনো কণিকা ফট করে অস্তিত্বশীল হতে পারে—এমন একটা যুক্তি দেখিয়ে শূন্য থেকে মহাজগতের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় প্রায়ই। এই যুক্তি দেওয়ার বেলায় কোয়ান্টাম শূন্যতাকে মনে করা হয় শূন্য। কিন্তু তা ঠিক না। এই কোয়ান্টাম শূন্যতাও কিছু একটা। এটি পুরোপুরি খালি কোনো জায়গা নয়। এবং এখানে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম চলে। কোয়ান্টাম শূন্যতা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী শক্তির একটি অবস্থা। এটা শূন্য নয়, ভৌত।[১২০]

অধ্যাপক লরেন্স ক্রসের 'শূন্য'

জার্মান দার্শনিক, গণিতবিদ গটফ্রেড উইলহেম লেবনিজের একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন: "কিছু না থাকার বদলে কেন কিছু আছে?"[১২১] অধ্যাপক লরেন্স ক্রস তার 'আ ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং' নামে বইটিতে এই প্রশ্নটিকে আরও চড়িয়ে দিয়েছেন। করেছেন জনপ্রিয়। বইটিতে ক্রস বলতে চেয়েছেন, এই মহাজগতের 'শূন্য' থেকে আবির্ভাব হওয়াটা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব। তার কথাটি যত উদ্ভটই শোনাক, তার সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গটি ধরার জন্য কিছু পূর্বানুমান ও ব্যাখ্যা নিয়ে কথা বলা দরকার।

ক্রসের 'শূন্য' আসলে কিছু একটা। বইটিতে তিনি শূন্যকে বলেছেন 'অস্থিতিশীল'।[১২২] আবার অন্য জায়গায় শূন্যকে বলেছেন ভৌত কিছু। একে বলেছেন, "খালি, তবে পূর্ব থেকে বিদ্যমান ফাঁকা জায়গা।"[১২৩] খুব মজার এক অর্থবিভ্রাটের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। ইংরেজি ভাষায় 'নাথিং' বা শূন্য মানে সার্বিক অস্বীকৃতি। কিন্তু ক্রসের 'শূন্য'-কে মনে হচ্ছে অন্য কিছু একটার পরিচিতি। তাঁর গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, 'শূন্য' মানে সময়, ফাঁকা জায়গা এবং কণার অনুপস্থিতি। এসব কথা বলে তিনি অনভিজ্ঞ পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন। ওখানে যে কিছু পরিমাণ ভৌত পদার্থের উপস্থিতি আছে, সেটা তিনি প্রকাশ করেননি। ক্রসের দাবি মতো যদি কোনো পদার্থের উপস্থিতি না-ও থাকে, ভৌত ক্ষেত্র ছিল অবশ্যই। কারণ, অভিকর্ষজ বলকে আটকে রাখা যায় না বলে ভৌত ক্ষেত্রবিহীন কোনো জায়গা থাকা অসম্ভব। কোয়ান্টাম তত্ত্বে,

বাস্তবতার এই পর্যায়ে অভিকর্ষের জন্য ভরযুক্ত বস্তুর প্রয়োজন না হলেও, ভৌত ক্ষেত্র লাগবে অবশ্যই। আর তাই, ক্রসের 'শূন্য' আসলে কিছু একটা। তিনি তাঁর বইয়ের অন্য জায়গায় লিখেছেন, কোয়ান্টাম দোলন থেকে সবকিছু অস্তিত্বশীল হয়েছে। 'শূন্য' থেকে সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টা এটা ব্যাখ্যা করে বটে, কিন্তু এর মানে কিন্তু আবার এটাও যে এর জন্য আগে থেকেই বিদ্যমান কোয়ান্টাম অবস্থা থাকা লাগবে।[১২৪]

'কোয়ান্টাম মেকানিকস অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স' বইয়ের লেখক অধ্যাপক ডেভিড অ্যালবার্ট ক্রসের বইটির রিভিউতে লিখেছেন:

> "কিন্তু এটা ঠিক না। জিরাফ, রেফ্রিজারেটার কিংবা সৌরজগতের মতো আপেক্ষিকতা-সম্বন্ধীয় কোয়ান্টাম-ক্ষেত্রীয় তাত্ত্বিক শূন্য অবস্থাও (Relativistic-quantum-field-theoritical vaccum state) সরল কিছু ভৌত কণার সুনির্দিষ্ট বিন্যাস। কোনো জায়গায় একেবারেই কোনো ভৌত কণা নেই—এরকম সত্যিকার আপেক্ষিকতা-সম্বন্ধীয় কোয়ান্টাম-ক্ষেত্রীয় তাত্ত্বিক অবস্থার মানে ক্ষেত্রগুলোর কোনো নির্দিষ্ট বিন্যাস নয়; বরং ক্ষেত্রগুলোর অনুপস্থিতি! এই যে কোনো কোনো ক্ষেত্রের বিন্যাস কখনো কখনো উপাদানগুলোর অস্তিত্বের সঙ্গে মেলে, আবার কখনো মেলে না—এটা কোনো তাজ্জব বিষয় না। আমার আঙুলগুলোর কিছু কিছু বিন্যাস যে মুঠির সঙ্গে মেলে, এ বিষয়টা তেমনই। যদি ঠিকঠাকমতো দেখেন, তা হলে বুঝবেন, এগুলোর কোনোটিই দূরতমভাবেও শূন্য থেকে সৃষ্ট কিছু না।"[১২৫]

দার্শনিক স্বাতন্ত্র্য

লেবনিজের বর্ষপ্রাচীন প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে অধ্যাপক ক্রস 'শূন্যতা'র সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন। তার সংজ্ঞা শূন্যতার প্রচলিত দার্শনিক স্বাতন্ত্র্যকে ঘোলাটে করে ফেলায় পুরো আলোচনাটি হয়েছে আরও জটিল। পরিভাষা হিসেবে 'শূন্যতা' মানে সত্তাহীন কিছু, বা কোনো কিছুর অনুপস্থিতি।[১২৬] তার মানে ক্রসের 'শূন্যতা'র অর্থ অনুযায়ী কেউ যদি বলে বসেন:

- "গতকাল রাতে কী মজার খাবার যে খেলাম। ওটা ছিল কিছুই না।"
- "হলে কারও সাথে আমার দেখা হয়নি। তারা আমাকে এই ঘরের পথ দেখিয়েছেন।"
- "লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে কিছুই সুস্বাদু হয় না।"[১২৭]

তা হলে তার কথাও যুক্তিসংগত হবে!

অথচ এই কথাগুলো পুরোপুরি অযৌক্তিক। ওপরের কথাগুলোতে 'শূন্যতা'র সংজ্ঞা যদি কেউ না বদলান তা হলে এগুলো স্রেফ নিরর্থক বিচারবাক্য। অধ্যাপক ক্রস

অবশ্য শূন্যতা বলতে কোনো অস্তিত্বহীন কিছুকে বোঝাননি। তিনি লিখেছেন, "একটা জিনিস অবশ্য নিশ্চিত। 'কিছু না থেকে যে কিছুই আসে না'—সৃষ্টিতত্ত্বের এ বিষয়টি নিয়ে আমি যাদের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাদের কাছে অধিবিদ্যার এই 'নিয়মটি'র কোনো ভিত্তি নেই বিজ্ঞানে।"[১২৮]

এর মানে ক্রস পরিষ্কারভাবেই শূন্যতার অর্থকে কিছু একটা দিয়ে বদলে দিয়েছেন। কারণ, পদ্ধতি হিসেবে বিজ্ঞানের বিচরণ ভৌত জগতে। কেবল বস্তুর ঘটনা বা প্রক্রিয়ার ভাষাতেই উত্তর দিতে পারে বিজ্ঞান। এ জীবনের মানে কী? আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না?—এ ধরনের প্রশ্ন যখন জিজ্ঞেস করি আমরা, তখন অধিবিদ্যাগত জবাবই প্রত্যাশা করি। আর তাই এটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বাইরের জিনিস (দেখুন অধ্যায় ১২)।

শূন্যতা বা অস্তিত্বহীনতার ধারণাগুলো বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে। কারণ, যেসব সমস্যা বস্তুগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাধা করা যায় বিজ্ঞান শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান দার্শনিক এলিয়ট সোবার এই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছেন। এমপিরিসিজম নামে এক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন: "যেসব সমস্যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাধা করা যায়, বিজ্ঞান কেবল তার মাঝেই নিজেকে আটকে রাখতে বাধ্য।"[১২৯]

'শূন্যতা'র সমস্যাটা বিজ্ঞান সমাধা করতে পারে না বলে, অধ্যাপক ক্রস এর অর্থ বদলে দিয়েছেন। এ যেন এক অদৃশ্য পরাজয়। একে তো জবাব দেওয়া সম্ভব না, তার ওপর পরাজয় স্বীকার না করে, অন্য কারও কাছে প্রশ্নটি না তুলে, প্রশ্নটির উত্তরই বদলে ফেলার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

শূন্যতার ধারণাটি অধিবিদ্যাগত ধারণা, আর বিজ্ঞানের কাজকারবার কেবল পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়ে—একথা স্বীকার করে নিলেই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সততার পরিচয় দেওয়া হতো।

অসম্পূর্ণ গবেষণা, ভাষাচাতুরি

অধ্যাপক ক্রস অবশ্য মেনে নিয়েছেন, তার 'শূন্যতা' গবেষণা অস্পষ্ট, চূড়ান্ত প্রমাণের অভাব আছে। তিনি লিখেছেন, "আমি এখানে 'হতে পারে' শব্দটার ওপর জোর দিচ্ছি। কারণ, পরিষ্কারভাবে এই প্রশ্ন সমাধানে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য কখনো আমরা না-ও পেতে পারি।"[১৩০] বইটির অন্য জায়গায় তিনি তার যুক্তির অপূর্ণতাও স্বীকার করেছেন, "বিস্তারিত বের করতে যে-পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক জটিলতা আছে, সেকারণে আমার মনে হয় এই বিষয়ে, আপাত বিশ্বাসযোগ্যতার চেয়ে বেশি কিছু আমরা অর্জন করতে পারব না।"[১৩১]

শূন্যতা শব্দটির ওপর নতুন অর্থ না চাপিয়ে অধ্যাপক ক্রস আসলে বললেই পারতেন যে বস্তুশূন্য অবস্থার মতো কোনো একটা ভৌত অবস্থা থেকে মহাজগতের

উৎপত্তি। কিন্তু ক্রসের বইটি পড়ে মনে হয় তিনি বরং তার ভাষাচাতুরি ধরে রাখতেই নাছোড়বান্দা। ইসলাম নাকি নাস্তিকতা: কোনটা বেশি অর্থবহ?—এই প্রসঙ্গে তার সাথে আমার বিতর্কে তার বইয়ের প্রসঙ্গটা আমি তুলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, তার ব্যাখ্যা করা শূন্যতা আসলে কিছু একটা। অনেকটা কোয়ান্টাম কুয়াশার মতো। কিন্তু তিনি পাল্টা-প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, "কোনো স্থান না, কোনো সময় না, কোনো নিয়ম না... কোনো মহাজগৎ না, কিচ্ছু না, একেবারে শূন্য।"[১০২]

খুব গুরুত্বপূর্ণ এক গোপন হেতুবাক্য তিনি ইচ্ছেকৃতভাবে বাদ দিয়েছেন বলে মনে হয়। সেটি হচ্ছে: শূন্যতার মাঝেও কিছু ভৌত উপাদান আছে। অন্য একটি উন্মুক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন কিছু একটা আর শূন্যতা, দুটোই "...ভৌত উপাদান।"[১০৩]

মোট কথা, অধ্যাপক ক্রসের শূন্যতা আসলে শূন্য নয়। কোনো এক ভৌত অবস্থা থেকেই এসেছে এই মহাজগৎ। ক্রসের ভাষায় সেটাই "শূন্যতা"। কিছু না থাকার বদলে কেন কিছু আছে?—এই লেবনিজীয় প্রশ্নটির উত্তর তাই আর পাওয়া যায়নি। বাস্তবে আসলে ক্রস যে-প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন সেটা হলো: কিছু একটা থেকে কীভাবে কিছু একটা এল? বিজ্ঞান এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। এজন্য ভাষাচাতুরির আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

শূন্যতার ব্যাপারে ক্রসের চাতুরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আল্লাহর অস্তিত্ব হারিয়ে যায় না। এই মহাজগৎ (সময় ও স্থান) যে আসলে কিছু একটা থেকেই এসেছে, তিনি বরং সেটাই তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। আর তাই এই মহাজগতের অস্তিত্বের পক্ষে উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন এখনও।

"কার্যকারণ কেবল এই মহাজগতের ভেতর অর্থবহ; তার মানে শূন্য থেকে এই মহাজগৎ অস্তিত্বেও আসতে পারে"

কার্যকারণ-সম্বন্ধ নিয়ে ইতিহাস জুড়ে বেশ কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। ডেভিড হিউম বলেছিলেন, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে কার্যকারণের ধারণাটি নেওয়া হয়েছে। হিউমের কথা সত্য হলে আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে কার্যকারণের অস্তিত্ব নেই। আমাদের এ-অধ্যায়ের আলোচনা মহাজগতের আবির্ভাব নিয়ে। আর এটি যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের বাইরে, তার মানে মহাজগৎ আবির্ভাবের ব্যাখ্যায় আমরা একে ব্যবহার করতে পারব না। অন্যভাবে বললে, যেহেতু কার্যকারণ-সম্বন্ধের বিষয়টি কেবল এই মহাজগতের ভেতরেই অর্থবহ, সেহেতু এর বাইরে একে প্রয়োগ করা যাবে না। মহাজগতের শুরু সম্বন্ধে আমাদের যদি নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতা না-ই থাকে, বা এর অস্তিত্বের আগে কী ঘটেছিল সে-সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা না থাকে, তা হলে এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই শোভনীয় আমাদের জন্য।

কার্যকারণের বিষয়টি আমাদের অভিজ্ঞতাজাত—এই আপত্তিটি ভুল। কার্যকারণ-সম্বন্ধ আসলে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান। এটি অধিবিদ্যাগত বিষয়। অভিজ্ঞতা ব্যাপারটি বোঝার জন্যই তো বরং ওটা প্রয়োজন আমাদের। অভিজ্ঞতাকে বুঝতে আমরা একে কাজে লাগাই; উল্টোটা নয়। চোখে হলুদ চশমা পরলে সবই হলুদ দেখাবে; বাইরের সবকিছু হলুদ বলে না। কার্যকারণ-সম্বন্ধ না থাকলে এই জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোনো অর্থবহ উপলব্ধি গড়ে উঠত না।

নিচের উদাহরণটি খেয়াল করুন। মনে করুন, আপনি ঢাকার সংসদ ভবনের ভেতর ঢুকেছেন। আপনি এর প্রবেশ-পথ দেখছেন, গোল বৃত্তের রেখায় সারি সারি আসন দেখছেন, খুঁটিহীন বিশাল ভবনের ঠিক মাঝখানে আলো ঢোকার অভিনব ছাদ দেখছেন। এরপর চোখ নামিয়ে দেখলেন মাননীয় স্পিকারের বসার জায়গাটি। আপনি চাইলে এই দেখার ধারাটা উল্টো করেও দেখতে পারতেন। প্রথমে স্পিকারের বসার জায়গা, এরপর আলো ঢোকার ছাদ, তারপর সারি সারি আসন, শেষে প্রবেশ পথ।

এবারে আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা ভাবুন। মনে করুন, আপনি একটি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে এক সাম্পান নৌকা আসছে। শুরুতে আপনি শুধু নৌকাটির সামনের বাঁকানো অংশটি দেখতে পেলেন। চাইলেও কিন্তু আপনি আগে নৌকাটির পেছনের অংশ দেখতে পারবেন না। সংসদ ভবন দেখার বেলায় আপনি ইচ্ছেমতো যেকোনো একটি অংশ আগে-পরে দেখতে পেতেন। কিন্তু নদীতীরে ভেসে আসা নৌকার বেলায় তা কিন্তু সম্ভব না। এই যে দেখার ক্রম, এটা কীভাবে নির্ধারিত হলো? কীভাবে আপনি জানলেন কখনো আপনি আগে-পরে ইচ্ছেমতো দেখতে পারবেন, কখনো পারবেন না? এটিই হচ্ছে কার্যকারণ-সম্বন্ধের ধারণা। সংসদ ভবন এবং নৌকা দেখার বেলায় আপনার মনের ভেতর যৌক্তিক কার্যকারণ-সম্বন্ধ ঘটে চলে।

তো, যেকথাটি বলতে চাচ্ছি, আপনার মাঝে আগে থেকেই কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিষয়টির বোধ না থাকলে ওপরের দুটো পর্যবেক্ষণের মাঝে আলাদা করতে পারতেন না। এটা না থাকলে আমাদের পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা হতো একেবারে অন্যরকম। শুধু একটাই উপায় হতো তখন: সবকিছুর বেলাতেই নির্দিষ্ট ক্রমধারা। কার্যকারণ-সম্বন্ধ আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল নয়। কারণ, ওটা না থাকলে আমরা বরং কিছুর অভিজ্ঞতাই লাভ করতে পারতাম না। কাজেই যুক্তিসিদ্ধভাবেই এটা বলা যায়, এই মহাজগৎ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার আগেই কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিদ্যমান।

শূন্য থেকে যদি কিছু না-ই হয়, তা হলে আল্লাহ কীভাবে শূন্য থেকে সৃষ্টি করলেন?

এই যুক্তিটি ভুল। কারণ, এখানে মনে করা হয় যে আল্লাহও কিছু না: শূন্য।

আল্লাহ একেবারেই স্বতন্ত্র ও অস্তিত্বশীল এক সত্তা। তাঁর ইচ্ছে ও ক্ষমতাবলে তিনি শূন্য থেকে যেকোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। কোনো কিছুকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দিতে পারেন। এখানে তাই শূন্য থেকে কিছু আসছে না। এই মহাজগতের অস্তিত্বে আসার পেছনে কাজ করছে সুমহান আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছা ও সার্বভৌম ক্ষমতা।

শূন্যতা থেকে কিছু আসা অসম্ভব। শূন্যতা মানেই অস্তিত্বহীনতা, সম্ভাবনাহীনতা। সেখানে কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই। কোনো ধরনের সম্ভাবনা বা প্রাথমিক কারণ ছাড়া একেবারে শূন্য থেকে কিছুর আবির্ভাব হয়েছে দাবি করাটা অযৌক্তিক। মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছে ও ক্ষমতার মাধ্যমে সেই প্রাথমিক কারণটি ঘটান। ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারায় অবশ্য বলা হয় মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন শূন্য থেকে। তবে এখানে শূন্য দিয়ে আসলে বোঝানো হয় কোনো ধরনের বস্তুগত উপাদানের অনুপস্থিতি। নেপথ্যে কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ বা সম্ভাবনা ছিল না, তা বোঝানো হয় না।[১০৪] এই মহাজগৎকে অস্তিত্বে আনতে আল্লাহর ইচ্ছে ও ক্ষমতা কাজ করে কার্যকারণ হিসেবে।

আপনা থেকে সৃষ্ট?

এই মহাজগৎ কি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে? সৃষ্টি মানে আবির্ভূত হওয়া; একসময় যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্ট হওয়া মানেই সসীম। সৃষ্টির এই বিষয়টি বুঝতে পারলে আমরা বুঝব, আপনা থেকে সৃজন হওয়ার বিষয়টি যৌক্তিক এবং বাস্তবিকভাবে অসম্ভব। কারণ, এর মানে একটা বস্তু একই সময়ে অস্তিত্বশীল আবার অনস্তিত্বশীল। এটা অসম্ভব। কোনো কিছু আবির্ভূত হওয়ার মানে একসময় এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কোনো কিছু 'আপনাআপনি' সৃষ্ট হয়েছে, একথা বলার মানে, অস্তিত্বশীল হওয়ার আগে যেন সেটা অস্তিত্বশীল ছিল!

নিচের প্রশ্নটার কথাই ধরুন: আপনার মা কি নিজেকেই নিজে জন্ম দিতে পারেন? এমন কথা বলার মানে, আপনার মা নিজে জন্ম হওয়ার আগেই আবার নিজেকে জন্ম দেবেন! কোনো কিছু সৃষ্ট হওয়ার মানে একসময় এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং এর কোনো কিছুর করার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনা থেকেই সৃষ্ট হওয়া তাই অসম্ভব। সব সৃষ্ট বস্তুর বেলায় এটা সত্য—এমনকি এই মহাজগতের বেলাতেও। প্রাজ্ঞ ইসলামি ব্যক্তি খাত্তাবি খুব সুন্দরভাবে এধরনের যুক্তির ভুল তুলে ধরে বলেছেন,

> "এই যুক্তিটি আরও বেশি ভুল। কোনো কিছুর যদি অস্তিত্ব না-ই থাকে, তা হলে কীভাবে ধারণা করা হয় যে এর কোনো ক্ষমতা আছে? আর কীভাবেই-বা এটি কিছু সৃষ্টি করতে পারে? কিছু করতেই-বা পারবে কীভাবে? এই দুটো যুক্তি যদি খণ্ডিত হয়, তা হলে প্রমাণ হয় যে তাদের একজন স্রষ্টা আছেন। সুতরাং তারা তাঁকে বিশ্বাস করুক।"[১০৫]

ব্রিটিশ মানবাধিকার সংঘের বর্তমান প্রধান অ্যান্ড্রিউ কপসনের সঙ্গে এ নিয়ে একবার এক বিতর্ক হয়েছিল আমার সাথে বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটিতে। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কুরআনের যুক্তি তুলে ধরেছিলাম তার কাছে। আপনা থেকে সৃষ্ট হওয়া যে অসম্ভব, আমার এই কথার বিপরীতে তিনি বলেছিলেন, এককোষী প্রাণীর মধ্যে তো এটা পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় এর নাম অযৌন প্রজনন।

বেশ কিছু দিক থেকে তার আপত্তিটি টেকে না। এককোষী প্রাণীর যে-উদাহরণ তিনি দিয়েছেন, তা আসলে আপনা থেকে সৃষ্ট কিছু না। বরং এটা প্রজননের এক ভিন্ন ধারা। একটিমাত্র কোষ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের আবির্ভাব হয়। আর এর মাঝে শুধু সেই জনক কোষেরই জিনগত বৈশিষ্ট্য থাকে।

তার উদাহরণটি যদি আমরা মহাজগতের সৃষ্টির ব্যাপারে খাটাই, তা হলে ধরে নেওয়া হবে, এ মহাজগতের অস্তিত্ব ছিল সব সময়ই। কারণ, অযৌন প্রজননের বেলায় দেখেছি, পরবর্তী প্রজন্মের আবির্ভাবের জন্য জনক কোষের উপস্থিতি থাকা লাগে। তার আপত্তিটা আসলে আমার কথাকেই প্রমাণ করছে: এই মহাজগতের অস্তিত্ব ছিল না একসময়। সুতরাং এটা নিজেই নিজের অস্তিত্ব দিতে পারে না।

এতক্ষণ আমার কথা শুনে আপনার মনে হতে পারে, তার মানে এই যুক্তি তো নিতান্তই বাচ্চাসুলভ। এটা নিয়ে আলোচনার কী প্রয়োজন ছিল। আমি একমত আপনার সাথে। তবে কোনো কোনো নাস্তিকের পাল্টা-যুক্তি যে কী পরিমাণ অযৌক্তিক হতে পারে, সেটা দেখানোর জন্যই বললাম এ নিয়ে।

অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে সৃষ্ট?

আলোচনার খাতিরে ধরে নিই যে, "হ্যাঁ, এই মহাজগৎ অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তার সৃষ্টি।" আপনার কি মনে হয় এই জবাবে প্রশ্নকারী সন্তুষ্ট হবেন? অবশ্যই না। তর্কবাদী লোক আবার জিজ্ঞেস করে বসবে, "তা হলে সেই সৃষ্ট সত্তাকে কে সৃষ্টি করল?" যদি বলি অন্য এক সৃষ্ট সত্তা, তার পরের প্রশ্ন কী হবে তা হলে? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন: "তা হলে সেই সৃষ্ট সত্তাকে কে সৃষ্টি করল?" হাস্যকর এই কথাবার্তা যদি আজীবন চলতে থাকে, তা হলে একটা জিনিসই প্রমাণ হবে: একজন অনাদী স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা।

কেন?

মহাজগতের মতো সৃষ্ট কোনো জিনিস অন্য এক সৃষ্ট সত্তা থেকে সৃষ্টি— অনিশেষভাবে যুক্তির এই ধারা চলতে পারে না। একে বলা হয় কার্যকারণ-সম্বন্ধের অন্তহীন পশ্চাদযাত্রা; তাকে কে? তাকে কে? তাকে কে? এভাবে পেছনে চলতে থাকা কোনোভাবেই অর্থবহ নয়। নিচের উদাহরণ দুটো দেখুন:

মনে করুন, এক লুকোনো বন্দুকধারী তার লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে। সে সদরদপ্তরে অনুমতি চেয়ে পাঠালো গুলি করতে। কিন্তু সেই সদরদপ্তর থেকে নির্দেশ এল, দাঁড়াও, আমাদের উচ্চপদস্থের কাছ থেকে অনুমতি নিই আগে। সেই উচ্চপদস্থ তার ওপরের কারও কাছে অনুমতি চাইলেন। এভাবে অনুমতি চাওয়া চলতে লাগল। যদি এভাবে আজীবন চলতে থাকে, আপনার কি মনে হয় গুপ্ত বন্দুকধারী আদৌ কখনো গুলি চালাতে পারবে? এমন একটা জায়গা বা ব্যক্তিকে অবশ্যই লাগবে যেখান থেকে সব আদেশ আসে। যার ওপরে আর কিছু নেই। এই উদাহরণ থেকে আমরা কার্যকারণ-সম্বন্ধের অন্তহীন পশ্চাদযাত্রার যৌক্তিক ভুল ধরতে পারছি। এই উদাহরণটি মহাজগতের বেলায় খাটালে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে, এর অবশ্যই একজন অনাদী বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা থাকবে। সৃষ্ট মহাজগৎ কখনো অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে অনন্তকাল পেরিয়ে সৃষ্টি হতে পারে না। এরকম হলে এই মহাজগৎ আদৌ কখনো অস্তিত্বই পেত না। যেহেতু এর অস্তিত্ব আছে, কার্যকারণ-সম্বন্ধের অনন্তহীন পশ্চাদযাত্রাকে আমরা অযৌক্তিক প্রস্তাব হিসেবে বাতিল করে দিতে পারি।[১৬৬]

মনে করুন, স্টক এক্সচেঞ্জে একজন শেয়ার ব্যবসায়ী বসে আছেন শেয়ারের লেনদেন করার জন্য। কিন্তু বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অনুমতি না পেলে তিনি কিছু করতে পারছেন না। তিনি তার বিনিয়োগকারীর কাছে অনুমতি চাইলেন। সেই বিনিয়োগকারী আবার তার বিনিয়োগকারীর কাছে অনুমতি চাইলেন। এভাবে চলতে লাগল জীবনভর। আপনার কী মনে হয় সেই শেয়ার ব্যবসায়ী কোনো দিন কোনো শেয়ার কিনতে বা বিক্রি করতে পারবে? না। এমন একজন বিনিয়োগকারীকে অবশ্যই লাগবে, যার কিনা অন্য কারও কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেই একই আলোকে, মহাজগতের বেলায় আমরা বলতে পারি, এর সৃষ্টির জন্য অবশ্যই লাগবে একজন চিরন্তন চিরঞ্জীব স্রষ্টা।

ওপরের উদাহরণ দুটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে এই মহাজগতের সৃষ্ট হওয়ার যুক্তিটা কী পরিমাণ অথর্ব। এই মহাজগৎ যদি হয় ক১, আর একে সৃষ্টি করে থাকে ক২, আবার ক২-কে যদি সৃষ্টি করে ক৩, আর এভাবেই যদি চলতে থাকে চিরকাল, তা হলে ক১-এর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব না কখনো। সহজভাবে বুঝুন: ক১ কখন অস্তিত্বশীল হবে? ক২ আসার পরে। ক২ কখন আসবে? ক৩ আসার পরে, ঠিক তো? অনাদিকাল ধরে চলতে থাকবে এই ধারা। ক১-এর আবির্ভূত হওয়াটা যদি নির্ভর করে অনাদিকাল ধরে চলা অন্যান্য সৃষ্ট কিছুর ওপর, তা হলে ক১ কখনোই আলোর মুখ দেখবে না।[১৬৭] প্রাজ্ঞ ইসলামি দার্শনিক ড. জাফার ইদ্রিস লিখেছেন:

> "তখন আসলে কোনো প্রকৃত কারণের ক্রমধারা থাকবে না, থাকবে শুধু অনস্তিত্বের ক্রমধারা... তবে, আসল কথা হলো, আমাদের চারপাশে

> অস্তিত্বশীল জিনিসের বিচরণ। কাজেই, চূড়ান্ত কারণটিকে অবশ্যই হতে হবে সাময়িক কারণের চেয়ে অন্য কিছু।"[১৩৮]

অসৃষ্ট থেকে সৃষ্টি?

তা হলে এর বিকল্প কী? বিকল্প হলো আদি কারণ। বা অন্য কথায় কোনো কারণহীন কারণ, বা অনাদি অনন্ত স্রষ্টা। ১১দশ শতাব্দীর ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক গাজালি সংক্ষেপে বিষয়টিকে বলেছেন এভাবে: "কারণের কারণ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। এটা চলতে পারে সীমাহীনভাবে, যা অযৌক্তিক। অথবা এক পর্যায়ের এর ইতি হতেই হবে।"[১৩৯]

মোট কথা, কিছু একটা সব সময়ই অস্তিত্ববান। হয় সেটা আল্লাহ বা মহাজগৎ। কিন্তু এই মহাজগতের যেহেতু একটা শুরু আছে, এটি নির্ভরশীল (দেখুন অধ্যায় ৬), কাজেই সব সময় এর অস্তিত্ব ছিল না। সব সময় যিনি অস্তিত্ববান, তিনি অবশ্যই আল্লাহ। অধ্যাপক অ্যান্থনি ফ্লিউয়ের দেয়ার ইজ গড বইয়ের পরিশিষ্টে অধ্যাপক আব্রাহাম ভার্গেস খুব সরল কিন্তু জোরালোভাবে বলেছেন,

> "আস্তিক-নাস্তিক একটি বিষয়ে একমত হতে পারে: যদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে, তা হলে এর আগে অবশ্যই এমন কিছু থাকতে হবে যা সব সময় অস্তিত্বশীল। চিরকালীন অস্তিত্ববান এই সত্তা কীভাবে এসেছে? এর উত্তর হলো, এটা কোনোভাবেই আসেনি। এটা সব সময়ই অস্তিত্ববান। এখন পছন্দ আপনার: হয় ঈশ্বর নয় মহাজগৎ। কিছু একটা সব সময়ই ছিল।"[১৪০]

সুতরাং, আমরা বলতে পারি, সব সৃষ্ট বস্তুর জন্য আছেন একজন অনাদি অনন্ত স্রষ্টা। এই যুক্তিটি যে কী জোরালো, তা টের পাওয়া যায় সাহাবি জুবাইর বিন মুত'ইমের মনোভাব থেকে। কুরআনের এই আয়াতটি শোনার পর তিনি বলেছিলেন, "আমার আত্মা যেন প্রায় উড়েই যাচ্ছিল।"[১৪১] জুবাইরের এমন ভাবভঙ্গির কারণ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ মনীষী খাত্তাব বলেছে, "এর মাঝে যে-বলিষ্ঠ প্রমাণটি আছে, সেটা তার সংবেদনশীল মনে খুব নাড়া দিয়েছিল। তার মেধা দিয়ে তিনি সেটা বুঝতেও পেরেছিলেন।"[১৪২]

এতক্ষণ যে-আলোচনা গেল, তা থেকে অনাদি অনন্ত স্রষ্টার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকার জো নেই। এখানে অবশ্য ঈশ্বরের চিরাচরিত ধারণার কথা বলা হয়নি। তবে অনাদি অনন্ত স্রষ্টার বিষয়টি যদি ভালোভাবে খেয়াল করি, তা হলে যে-উপসংহারটি আমাদের মাথায় আসবে, তা আমাদেরকে ঈশ্বরের চিরাচরিত উপলব্ধির দিকেই টেনে নেবে।

চিরন্তন

স্রষ্টা যেহেতু অনাদি অনন্ত, তার মানে তিনি সব সময়ই ছিলেন। যা কখনো শুরু হয়নি, তা সব সময়ই অস্তিত্বশীল; এবং তা চিরকাল ধরে। "আল্লাহ, চিরন্তন আশ্রয়। তিনি

কাউকে জন্ম দেননি, আর না তাকে জন্ম দেওয়া হয়েছে।”—কুরআনের[১৪০] এ আয়াতে জ্বলজ্বল করছে সেই সত্য।

আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে। এ ধরনের কথা বললেই একটি বস্তাপচা নাস্তিকীয় আপত্তি শোনা যায়: আল্লাহকে তা হলে কে সৃষ্টি করেছে? এই অধ্যায়ে আমি যে-যুক্তিটি খোলাসা করছি, সে ব্যাপারে খুবই বড় ধরনের ভুল-উপস্থাপন ও ভুল-অনুধাবনের ফল শিশুসুলভ এই দাবিটি। এই আপত্তির বিপরীতে দুটো সুন্দর জবাব আছে।

প্রথমত, এই মহাজগতের আবির্ভাব সম্বন্ধে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম: এটা কি কোনো সৃষ্ট সত্তার সৃষ্টি? আমরা বলেছি, কার্যকারণ-সম্বন্ধের অসীম পিছুযাত্রার অযৌক্তিকতার কারণে এটা অসম্ভব। খুব সহজেই আমরা বুঝেছি: একজন অয়াদি অনন্ত স্রষ্টাই একমাত্র গত্যান্তর। অনাদি অনন্ত মানে আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেনি। এ-সম্বন্ধে বেশ কিছু উদাহরণ আমি দিয়েছি।

দ্বিতীয়ত, আমরা যেহেতু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, মহাজগতের আবির্ভাবের সেরা ব্যাখ্যা একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব, তা হলে তাঁকে আবার কে সৃষ্টি করল, সেই প্রশ্ন তোলা অবান্তর। মহান আল্লাহ এই মহাজগৎ সৃজন করেছেন। তিনি এর নিয়মে বন্দি নন। সংজ্ঞার্থে তিনি অসৃষ্ট স্রষ্টা; কোনো অনস্তিত্বশীল অবস্থা থেকে তিনি কখনো অস্তিত্ববান হননি। যার শুরু নেই, তা কখনো সৃষ্ট হতে পারে না। অধ্যাপক জন লেনক্স এ-বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> “শুনতে পাই একজন আইরিশ বন্ধু বলছেন, ‘একটা জিনিস খুব বোঝা যাচ্ছে। যদি তাদের কাছে এরচে ভালো কোনো যুক্তি থাকত, তা হলে সেটা তারা ব্যবহার করত নিশ্চয়।’ এমন প্রতিক্রিয়াকে যদি খুব জোরালো মনে হয়, তা হলে একটা প্রশ্নের ধরন নিয়ে ভাবুন কেবল: ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করল? এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা থেকেই বোঝা যায়, প্রশ্নাকারী তার মনমতো এক ঈশ্বরকে কল্পনা করে নিয়েছেন। কোনো একজনের কোনো এক বইয়ের নাম যে দ্যা গড ডিলিউশন (ঈশ্বর-মোহ), এ নিয়ে তবে আর চোখ কপালে তোলার কী আছে। একজন কল্পিত ঈশ্বর তো আসলেই এক মোহ, সংজ্ঞামতে তো সেটাই। ডকিন্সেরও বহু শতক আগে জেনোফেইনই দেখিয়ে গেছেন তা। বইটির শিরোনাম হতে পারত: দ্যা ক্রিয়েটেড-গড ডিলিউশন (সৃষ্ট ঈশ্বর-মোহ)। বইটি তা হলে ১ ফর্মার মধ্যেই শেষ করা যেত। তখন অবশ্য বিক্রিবাট্টায় টান পড়ত... যে-ঈশ্বর এই মহাজগৎ সৃজন করেছেন, এর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তিনি সৃজিত নন—তিনি চিরন্তন। তিনি ‘তৈরিকৃত’ নন। আর তাই বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত

নিয়মকানুনের গণ্ডিত তিনি আবদ্ধ নন। বরং তিনিই সৃষ্টি করেছেন মহাজগতের এসব নিয়মকানুন। ঈশ্বর ও মহাজগতের মাঝে মৌলিক পার্থক্য এখানেই। মহাজগৎকে অস্তিত্বে আসতে হয়েছে, ঈশ্বরকে নয়।"[১৪৪]

পরাজাগতিক

অনাদি অনন্ত এই স্রষ্টা নিজেই সৃষ্টির কোনো অংশ হতে পারেন না কোনোভাবে। কোনো কাঠমিস্তিরি যখন চেয়ার বানান, তিনিও কি তখন চেয়ার হয়ে যান? না। বরং তিনি চেয়ার থেকে আলাদা একজন হিসেবেই বহাল তবিয়তে থাকেন। অনাদি অনন্ত স্রষ্টার বেলাতেও এই উদাহরণ খাটে। তিনি এই মহাজগৎ সৃজন করেছেন। আর তাই এর থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্মতাত্ত্বিক ও প্রাজ্ঞ মনীষী ইবনু তাইমিয়া বলেছেন, "সৃষ্ট" শব্দটি বোঝায় এমন কিছু, যা আল্লাহর সত্তা থেকে ভিন্ন।[১৪৫]

স্রষ্টা যদি নিজেই সৃষ্টির অংশ হতেন, তবে তিনি হতেন পর-নির্ভরশীল। সীমিত শারীরিক গুণাবলি নিয়ে চলতে হতো তাঁকে। তখন আবার তাঁর নিজের অস্তিত্বের পক্ষেই ব্যাখ্যা দিতে হতো। এর মানে তিনি তা হলে আর আল্লাহ হতেন না (দেখুন অধ্যায় ৬)।

মহান আল্লাহর পরাজাগতিক সত্তার সমর্থনে কুরআন বলছে, "তাঁর মতো নেই কিছুই।"[১৪৬]

মহাজ্ঞানী

অনাদি অনন্ত স্রষ্টাকে অবশ্যই হতে হবে মহাজ্ঞানী। কারণ, এই মহাজগৎ বেশ কিছু নিয়মের অধীন। অভিকর্ষজ বল, দুর্বল ও শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তি, বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তি ইত্যাদি নানা শক্তির বিচরণ এখানে (দেখুন অধ্যায় ৮)। এসব নিয়ম থাকার মানে অবশ্যই একজন বিধানদাতা আছে। আর বিধানদাতা মানেই জ্ঞানী। কুরআন বলছে, "আল্লাহ সবকিছুর ব্যাপারেই জানেন।"[১৪৭]

মহাশক্তিধর

একজন অনাদি অনন্ত স্রষ্টা অবশ্যই হবেন মহাশক্তিধর। কারণ, এই বিপুল মহাজগতের স্রষ্টা তো তিনিই। এর মাঝে চলছে সংখ্যাহীন শক্তির খেলা। আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাজগতের পরমাণুর সংখ্যাই ধরুন—প্রায় ১০৮০।[১৪৮] এত বিশাল পরিমাণ পরমাণু থেকে যদি খালি একটি পরমাণু নিয়ে পরমাণু-কেন্দ্র বিভাজন (Nuclear Fission) বিক্রিয়া ঘটান, প্রকাণ্ড শক্তি বের হবে সেখান থেকে। কোনো সৃজিত বস্তু নিজে থেকে এত শক্তি মজুদ করতে পারে না। নির্দ্বিধায় বলা যায়, শুরুতে এটা অবশ্যই এসেছে এক মহাশক্তিধর স্রষ্টা থেকে।

স্রষ্টার যদি কোনো ক্ষমতা না থাকে, তার মানে তিনি অসমর্থ, দুর্বল। স্রষ্টা যে সামর্থ্যবান এবং শক্তিধর, এই মহাজগতের সৃজনই তার সবচে সরল প্রমাণ। মহাজগৎ এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এগুলোর সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে এবার তুলনা করে ভেবে দেখুন স্রষ্টা কী পরিমাণ শক্তির আধার। আল্লাহর শক্তির ইঙ্গিত দিয়ে কুরআন বলে,

"আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, তা-ই সৃষ্টি করেন। সবকিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান।"[১৪৯]

অক্ষম মহাশক্তিধরের ধারণা

আল্লাহর সামর্থ্য সম্বন্ধে ইসলামি অবস্থান এক বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায় আকীদাতুত-তাহাউই গ্রন্থে: "তিনি মহাশক্তিধর। সবকিছুই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর জন্য সবকিছুই অনায়াস।"[১৫০]

তবে আল্লাহর শক্তি সম্বন্ধে সচরাচর একটা আপত্তি পাওয়া যায়: আল্লাহ যদি মহাশক্তিধরই হন, তবে কি তিনি এমন এক পাথর সৃষ্টি করতে পারবেন, যেটা তিনি নিজেই নড়াতে পারবেন না?

প্রশ্নটির জবাব দেওয়ার আগে 'মহাশক্তিধর' কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। এ কথাটির মানে সম্ভাব্য সবকিছুর বাস্তব রূপায়ন। মহাশক্তিধর হওয়া মানে কোনো কিছুতে ব্যর্থ হওয়াও অসম্ভব। কিন্তু এই প্রশ্নকারী বলতে চাচ্ছেন, আল্লাহ যেহেতু মহাশক্তিধর, তিনি তাই সবকিছু করতে পারেন—এমনকি ব্যর্থও হতে পারেন! কথাটা পুরোপুরি অযৌক্তিক এবং উদ্ভট। "একজন মহাশক্তিধর সত্তা মহাশক্তিধর নন"—অনেকটা এমনই কথাটা। কোনো কিছু করতে ব্যর্থ হাওয়াটা মহাশক্তিধর সত্তার বৈশিষ্ট্যের মাঝে পড়ে না। সেদিক থেকে, আল্লাহ কি পারবেন এমন কোনো পাথর সৃষ্টি করতে, যা তিনি নিজেই নাড়াতে পারবেন না—এই ঘটনা অসম্ভব এবং অনর্থক।

প্রশ্নটি কোনো সম্ভাব্য ঘটনার কথাই বলছে না আসলে। "একটি সাদাকালো কাক" বা "একটি বৃত্তীয় ত্রিভুজ"-এর মতো অসম্ভব কল্পকথা এটা। এ ধরনের কথার না আছে কোনো জ্ঞানভিত্তিক মূল্য, না আছে কোনো কাজের অর্থ। তো এমন অনর্থক কথার জবাব দেওয়ার কী দরকার আমাদের? সোজাসুজি বললে হয় এটা কোনো প্রশ্নই না।

> "আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান"—এ আয়াতের আলোচনায় কালজয়ী মনীষী কুরতুবি বলেছেন, আল্লাহর ক্ষমতা মানে সম্ভাব্য সব কাজে তাঁর সক্ষমতা। তিনি লিখেছেন: "এআয়াতটি সাধারণ অর্থে... [অর্থাৎ] এর মানে আল্লাহকে ক্ষমতার গুণে গুণান্বিত করা যাবে। মুসলিম জাতি আল্লাহর মহাশক্তিধর নামটির ব্যাপারে একমত। প্রতিটি সম্ভাবনার ওপর আল্লাহর ক্ষমতা আছে, হোক সেটা অস্তিত্বে আসুক কি না আসুক।"[১৫১]

মোট কথা, আমাদের কল্পনার অতীত ওজনের পাথর আল্লাহ অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারেবন। তবে সেই সঙ্গে তিনি সেটা নড়াতেও পারবেন। কারণ, ব্যর্থতা মহাশক্তিধর আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্য নয়।[১৫২]

ইচ্ছা

বেশ কিছু কারণে অসৃষ্ট এই স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তি থাকা প্রয়োজন।

প্রথমত, তিনি চিরন্তন। এক সসীম মহাজগৎকে তিনি অস্তিত্বশীল করেছেন। তার মানে তিনি চেয়েছেন এটা অস্তিত্বে আসুক। তিনি না চাইলে এটা কোনোভাবেই অস্তিত্বশীল হতে পারত না। কোনো কিছু বাছাই করার সামর্থ্য যার আছে তার অবশ্যই ইচ্ছা থাকবে।

দ্বিতীয়ত, এই মহাজগতে এমন এমন সব সত্তা বিরাজমান, যাদের আছে সচেতন ইচ্ছা এবং ইচ্ছাশক্তি। সেহেতু এদের স্রষ্টারও অবশ্যই ইচ্ছা থাকবে। আগেই বলেছি, যার নিজের মধ্যে যে-জিনিসটি নেই, সে সেটা অন্যকে দিতে পারে না (বা সেটার সম্ভাবনা জাগাতে পারে না)। সুতরাং স্রষ্টার ইচ্ছা আছে।

তৃতীয়ত, মহাজগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আমারা দু-ধরনের ব্যাখ্যা দিতে পারি: একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অন্যটা নিজস্ব। চা বানানোর উদাহরণ দিয়ে খোলাসা করছি বিষয়টা।

চা বানাতে হলে আমাকে পানি গরম করতে হবে। কাপে টি-ব্যাগ চোবাতে হবে। লিকারটা ছড়ানোর সময় দিতে হবে। বিষয়টাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হবে এভাবে: পানিকে ফুটন্ত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ওঠা পর্যন্ত গরম করতে হবে। পানিকে যেতে হবে আংশিক-ভেদ্য পাতলা আবরণের (টি-ব্যাগ) ভেতর দিয়ে। আমার শরীরের কলিজা ও পেশীতে সঞ্চিত সাদা যৌগ ব্যবহার করে আমার অঙ্গ সঞ্চালন করতে হবে সবকিছু করার জন্য। একজন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী আরও সবিস্তারে বলতে পারবেন বিষয়টা। তবে আমার মনে হয়, আমি যা বলতে চাচ্ছি, আপনি তা ধরতে পেরেছেন।

যাহোক, পুরো বিষয়টা আমার নিজের মতোও বলতে পারি। চা খেতে চেয়েছি বলে চা বানিয়েছি। এবারে চলুন মহাজগতের বেলায় এটা খাটাই।

স্রষ্টা কীভাবে মহাজগৎ সৃষ্টি করেছেন সে-সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোনো পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রমাণ নেই। আমরা কেবল আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার ওপরই নির্ভর করতে পারি এজন্য। আর তা হলো, আল্লাহ চেয়েছেন এই মহাজগৎ অস্তিত্বে আসুক। এর পেছনে যদি কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকেও—তারপরও কিন্তু চা বানানোর নিজস্ব ব্যাখ্যার মতো—এই নিজস্ব ব্যাখ্যা নাকচ হয়ে যাবে না।[১৫৩]

আল্লাহর ইচ্ছের বিষয়টি সম্বন্ধে কুরআন বলেছে, "তোমার প্রভু যা ইচ্ছে করেন, তা-ই করেন।"[১৫৪]

প্রাজ্ঞ মনীষী গাযালি আল্লাহর ইচ্ছে থাকার তাৎপর্য বেশ বাঙ্ময়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি জোরালোভাবে বলেছেন, সবকিছুই হয় আল্লাহর ইচ্ছের কারণে। কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছেকে উপেক্ষা করে যেতে পারে না:

> "আমরা সাক্ষ্য দিই, সবকিছুর ইচ্ছাকর্তা তিনি। উদ্ভাবিত প্রতিটি ঘটনার নিয়ন্তা তিনি। দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান জগতে ছোট-বড়, ভালো-খারাপ, সুবিধা-অসুবিধা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, জ্ঞান-অজ্ঞতা, সাফল্য-ব্যর্থতা, বৃদ্ধি-হ্রাস, বাধ্যতা-অবাধ্যতা—কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছে ছাড়া হয় না। তিনি যা ইচ্ছে করেন, তা হয়; যা করেন না, তা হয় না। চোখের প্রতিটি চাহনি, মনের প্রতিটি ছন্নছাড়া ভাবনা—সবকিছুই তাঁর ইচ্ছের অধীন। তিনিই স্রষ্টা, নিয়ন্তা, নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী স্বাধীন কর্তা। কেউ তাঁর আদেশ রদ করুক, বা তাঁর হুকুমে বাড়তি কিছু যোগ করুক, বা তাঁকে মান্য করা থেকে তাঁর কোনো বান্দাকে নিরত করুক—যা-ই করুক—সবই হয় তাঁর সাহায্য ও দয়ায়। তাঁর ইচ্ছে ছাড়া তাঁকে মান্য করার ক্ষমতাও নেই কারও।"[১৫৫]

এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত যুক্তির বিপরীতে কিছু যুক্তি আছে বটে; কিন্তু ওগুলো ঠিক দুপায়ে দাঁড়ানোর মতো শক্তিশালী নয়। এর মানে, ওগুলোর জবাব না দিলেও এই অধ্যায়ের যুক্তিটি যৌক্তিক শক্তিতে যথেষ্ট বলীয়ান। তবে, এরপরও কিছু প্রশ্ন এই যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে: যদি মহাজগতের স্রষ্টা চিরন্তন-ই হবেন, তা হলে এই মহাজগৎও কেন অনাদিকাল থেকে অস্তিত্বশীল হলো না? ঈশ্বর যদি পরমভাবে নিখুঁত আর পরাজাগতিক-ই হবেন, তাঁর সৃষ্টি করার প্রয়োজনই-বা কেন পড়ল? উৎকর্ষের গুণটির অধিকারী হতে কি ঈশ্বরের সৃজিত বস্তুর প্রয়োজন? একটি গবেষণাপত্রে এধরনের প্রশ্নগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পর্যদুস্ত করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটির নাম: The Kalam Cosmological Argument and the Problem of Divine Creative Agency and Purpose।[১৫৬]

এ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে কুরআনে তিনি এক সহজাত ও জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন। এ মহাজগৎ সসীম। তাই এর শুরু আছে। এর যদি শুরু থাকে, তা হলে বলা যেতে পারে এটি এসেছে শূন্যতা থেকে, কিংবা নিজের থেকে, কিংবা অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে, অথবা অসৃষ্ট কোনো সত্তা থেকে। যুক্তিসিদ্ধ জবাব হচ্ছে, এই মহাবিশ্ব অস্তিত্বে এসেছে পরাজাগতিক, মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিধর, ইচ্ছেপূর্ণ অসৃষ্ট স্রষ্টা থেকে। এই স্রষ্টা অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে হবেন একজনই। তাঁর একক অদ্বিতীয় হওয়ার বিষয়টি আলোচনা আসবে দশম অধ্যায়ে।

এই অধ্যায়ের যুক্তিটি দাঁড় করানো হয়েছিল এই মহাজগতের সসীম হওয়ার ওপর ভিত্তি করে। পরের অধ্যায়ে আমরা দেখব, এই মহাজগতের যদি কোনো শুরু না-ও থাকত, তারপরও আল্লাহর অস্তিত্ব হতো অনিবার্য।

অধ্যায় ৬

নির্ভরতা-যুক্তি

মনে করুন, আপনি বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তায় নামতেই দেখলেন সারি সারি ডমিনো (লেগো গুটির মতো চ্যাপ্টা চৌকা এক ধরনের গুটি) ছড়ানো। যতদূর আপনার চোখ যায় শুধু ডমিনো আর ডমিনো। হঠাৎ খুব ক্ষীণ একটা শব্দ শুনতে পেলেন দূর থেকে। ধীরে ধীরে বাড়ছে শব্দের মাত্রা। পরিচিত মনে হচ্ছে শব্দটা: ডমিনোগুলো একটার ধাক্কায় আরেকটার পড়ার শব্দ। ছোটবেলায় কত খেলেছেন এই খেলা! একসময় আপনার চোখের সীমানায় ধরা পড়ল ডমিনোগুলো হেলে পড়ার সেই অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। পদার্থবিজ্ঞানের বুনিয়াদি নীতি কী চমৎকার এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। অচিরেই শেষ ডমিনোটা পড়ে গেল আপনার থেকে কিছু দূর সামনে। ইশ, আরও কিছুক্ষণ যদি চলত! যাহোক, এখনো যথেষ্ট উৎফুল্ল আপনি। ভাবলেন, গিয়ে দেখি তো এমন চমৎকার একটা প্রদর্শনীর আয়োজন কে করলেন আজ এই সকাল বেলা।

ওপরের ছবিটা মাথায় রাখুন।

এবারে আমি আপনাকে কটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। হাঁটতে হাঁটতে আপনি কি প্রথম ডমিনোটির দেখা পাবেন? নাকি হাঁটতেই থাকবেন চিরকাল? অবশ্যই প্রথম ডমিনো টুকরোর দেখা পাবেন আপনি, তাই না? কিন্তু কেন দেখা পাবেন? কারণ, আপনি জানেন, ডমিনোগুলোর এই সারি যদি চিরকাল ধরে চলতে থাকত, তা হলে শেষ ডমিনোটি কখনোই আপনার সামনে এসে পড়ে শেষ হতো না। শেষ ডমিনো টুকরোটি পড়ার আগে অসীম সংখ্যক ডমিনোর টুকরোকে পড়তে হতো আগে। আর সেই অসীম সংখ্যক ডমিনো পড়তে সময়ও লাগত অসীম। মানে, শেষ ডমিনোটি কখনোই আর পড়বে না। সোজা বাংলায় বললে, শেষ ডমিনোটি পড়ার আগে, এর আগের ডমিনোটিকে পড়তে হবে। সেটা পড়তে হলে আবার তার আগেরটিকে পড়তে হবে। এভাবে যদি অনাদি কাল ধরে চলতে থাকে, শেষ ডমিনোটি কখনোই পড়বে না তা হলে।

ওপরের ছবিটি মাথায় রেখেই আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে। ধরুন, একসময় দেখা পেলেন প্রথম ডমিনোটির। ওটা পড়ার কারণেই শুরু হয়েছিল

বাকিগুলোর পড়া। আপনার কি এক মুহূর্তের জন্য মনে হবে এটা 'নিজে নিজে' পড়ে গিয়েছিল? বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়া 'এমনি এমনিই' এটা পড়তে পারে বলে কি মনে হবে আপনার? অবশ্যই না। বাস্তবতা সম্বন্ধে আপনার একেবারে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানই বলে দেবে এটা। কোনো কিছুই নিজে থেকে ঘটে না। সবকিছুর জন্যই কিছু একটা ব্যাখ্যা লাগে। কোনো লোক, বাতাস, অন্য কিছুর ধাক্কার কারণে বা অন্য কোনো কারণে প্রথম ডমিনোটিকে পড়তে হবে। এই 'অন্য কিছু'টা যা-ই হোক না কেন, পড়তে থাকা ডমিনোর ব্যাখ্যায় এটা অনিবার্য।

তো, এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম তার সারকথা হলো: ডমিনোগুলো অসীম সংখ্যক হওয়া অসম্ভব। প্রথম ডমিনোটি কোনো কারণ ছাড়া এমনি এমনি পড়তে শুরু করাও অসম্ভব।

পর-নির্ভরতা যুক্তির সারকথা এই উদাহরণটি। আমাদের মহাজগৎও অনেকটা এই ডমিনোর সারির মতো। এটাসহ এর ভেতরে যা কিছু আছে সবই পর-নির্ভর। যা কিনা নিজেই অনাদিকাল ধরে পর-নির্ভর তার ওপর এরা নির্ভরশীল হতে পারে না কখনো। এদের জন্য একমাত্র আপাত বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে: এরা অবশ্যই এমন কেউ বা এমন কিছুর ওপর নির্ভরশীল, যার অস্তিত্ব—যেভাবেই হোক—এই মহাজগৎ থেকে স্বাধীন। অন্যভাবে বললে, সেই জিনিসটি বা সেই সত্তা কোনোভাবেই মহাজগতের মতো 'পর-নির্ভরশীল' হতে পারবে না। কারণ, তা হলে ডমিনোর সারিতে আরেকটি ডমিনোই যোগ হবে শুধু। সেজন্য আবারও একই ব্যাখ্যা লাগবে। কাজেই, এমন এক স্বাধীন ও অনাদি সত্তা থেকে থাকবেন, সবকিছু যার ওপর নির্ভরশীল। শুনতে খুব সহজ মনে হলেও, যুক্তিটি আরও ভালো করে বোঝার জন্য প্রথমে 'নির্ভরশীল' বলতে কী বুঝিয়েছি তা একটু বলে নিই।

কোনো কিছু পর-নির্ভরশীল একথার মানে কী আসলে?

প্রথমত, এটা প্রয়োজনীয় না। দর্শনশাস্ত্রে 'প্রয়োজনীয়'-এর নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থ আছে। সাধারণত প্রয়োজনীয় মানে আমরা বুঝি আমাদের যা দরকার সেটা। কিন্তু দার্শনিকেরা যখন কোনো কিছুকে প্রয়োজনীয় বলেন, তার মানে এর না থাকাটা অসম্ভব—ভাবাই যায় না। বুঝতে পারছি, বিষয়টা ধরতে আপনাদের ভালোই বেগ পেতে হচ্ছে। কারণ, আমাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানে কোনো কিছুই আসলে প্রয়োজনীয় না। তবে, 'প্রয়োজন থাকার' মানে যে আসলে কী, এর উলটোটা ভাবলে এ সম্বন্ধে ভালো একটা ধারণা লাভ করতে পারি।

কোনো জিনিস অপ্রয়োজনীয় মানে এর অস্তিত্ব থাকার দরকার নেই। বা অন্যভাবে বললে, যদি ভাবা যায় অমুক জিনিসটা না থাকলেও হতো, তার মানে এটা অপ্রয়োজনীয়। যে-চেয়ারটিতে সম্ভবত আপনি বসে আছেন এখন, এটা নিতান্তই

অপ্রয়োজনীয়। কারণ, এমন হাজারো অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারি, যেখানে হয়তো এর উদ্ভব না-ও হতে পারত। আপনি তো না-ও কিনতে পারতেন। এর প্রস্তুতকারী এটাকে না-ও বানতে পারতেন। বিক্রেতা এটা না-ও বিক্রি করতে পারতেন। মোট কথা, এটা না-ই হতে পারত। পর-নির্ভরশীল বস্তুর জন্য 'না-ও থাকতে পারত' এই সম্ভাবনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যে-জিনিসের এমন বৈশিষ্ট্য থাকে, তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যার দরকার পড়ে। যা না-ও থাকতে পারত, তার ব্যাপারে আপনি চাইলেই জিজ্ঞেস করতে পারেন, কেন এটা আছে? খুবই স্বাভাবিক এই প্রশ্ন একটা ব্যাখ্যা দাবি করে। জিনিসটা নিজে থেকে আছে—এমন হতে পারে না। কারণ, এর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। জিনিসটা 'কোনো একভাবে' নিজের ব্যাখ্যা দিতে পারে, এরকম বলার মানে, এতক্ষণ আমরা পর-নির্ভরশীলতার যে-ধর্ম আলোচনা করলাম সেটাকেই অস্বীকার করা। কাজেই ব্যাখ্যাটাকে অবশ্যই হতে হবে বাহ্যিক কিছু। এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা মানে কোনো কিছুর অস্তিত্বের পক্ষে একঝাঁক বাহ্যিক হেতু। চেয়ারের উদাহরণের বেলায় যেমন: প্রস্তুতকারীর চেয়ার বানানো, বিক্রয়কারীর বিক্রি, এবং আপনার কেনা। চেয়ারের অস্তিত্বের পক্ষে এগুলো বাহ্যিক হেতু। সুতরাং, কোনো কিছুর জন্য যদি বাহ্যিক একঝাঁক কারণের প্রয়োজন পড়ে, তার মানে বস্তুটি নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল। যুক্তির একদম বুনিয়াদি, সহজাত ধরন এটা। কারণ, অস্তিত্বে আছে এমন কোনো বস্তু যে না-ও থাকতে পারত—এই প্রশ্ন তোলা যুক্তিক্ষম মনের পরিচয়।

বিজ্ঞানীদের কাজকারবার নিয়েই ভেবে দেখুন। বাস্তব পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা কৌতূহলী—এই ফুলটি কেন এরকম? ওই জীবাণুটি কেন এই রোগ সৃষ্টি করে? মহাজগৎ কেন এই হারে ক্রমাগত সম্প্রসার হচ্ছে? এগুলোর সবই যে আসলে দার্শনিক অর্থে অপ্রয়োজনীয়। এগুলো এখন যেভাবে আছে, সেভাবে না-ও থাকতে পারত—এটাই ন্যায্যতা দেয় এসব প্রশ্নের। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য নিচের উদাহরণটি খেয়াল করুন:

সকালে ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরের সামনের ফ্রিজ খুলে দেখলেন, ডিম রাখার জায়গায় একটা কলম। কলমটা দেখে নিশ্চয় আপনি মনে করেন না যে এটার এখানেই থাকার কথা। এ-ও ভাবেন না যে কলমটা বুঝি আপনাআপনি চলে এসেছে এখানে। আপনার মনে প্রশ্ন জাগে, কলমটা এখানে কীভাবে এল? মনে আপনার এই প্রশ্নটা জাগার কারণ, ডিমের তাকে ওটা থাকাটা অপ্রয়োজনীয়। এখানে ওটা থাকার জন্য এবং এভাবে থাকার জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সেই ব্যাখ্যা একেক রকম হতে পারে। কিন্তু এই যে ব্যাখ্যাটার প্রয়োজন হচ্ছে, এর মানেই হলো কলমটা পর-নির্ভর। কেন ওটা ফ্রিজে, কেনই-বা ডিমের তাকে—এজন্য ওর ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সম্ভাব্য ব্যাখ্যার

মধ্যে হতে পারে: কলমটা কেউ একজন বানিয়েছেন, আপনার ছেলে কোনো বইখাতার দোকান থেকে তা কিনেছে, এরপর সেটাকে সে ফ্রিজে ডিমের তাকে রেখেছে। এগুলো সবই কলমটার ওখানে আসার বাহ্যিক কারণ। ওটা তাই বাহ্যিক কারণের ওপর নির্ভরশীল। আর এই কারণগুলোই ওটার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়ত, কোনো জিনিসের উপদানগুলো বা একেবারে মৌলিক উপাদানগুলোকে যদি ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা যায় তবে সেটা পর-নির্ভর। এর কারণ, সেই জিনিসের বাইরে এমন কিছু থেকে থাকবে যেটা এর সুনির্দিষ্ট বিন্যাসটা নির্ধারণ করেছে। একটা উদাহরণ দিয়ে খোলাসা করছি বিষয়টা:

আপনি গাড়ি করে বাড়ি যাচ্ছেন। যেতে যেতে একটা গোলচত্বর পার করলেন। দেখলেন সেখানে ফুল দিয়ে সাজিয়ে লেখা হয়েছে তিনটি শব্দ: 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। আপনি যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারেন, ফুলের এই বিন্যাসের মাঝে 'অনিবার্য' কিছু নেই। অন্যভাবেও ফুলগুলো সাজানো যেত। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'-এর বদলে 'আমি তোমাকে পছন্দ করি'—এভাবেও সাজানো যেত। কিংবা ধরুন কোনোভাবে সাজানো না-ও থাকতে পারত। ছড়ানো ছিটানো থাকতে পারত বিচ্ছিন্নভাবে। ফুলগুলো যেহেতু অন্যভাবেও সাজানো যেত, তার মানে কোনো একটা বাহ্যিক শক্তি এগুলোর বিন্যাস নির্ধারণ করে দিয়েছে। এইখানে এটা হতে পারে স্থানীয় মালি বা স্থানীয় সরকারি প্রকল্প। আপনি যত যা দেখেন, তার অধিকাংশের বেলায় এটা সত্য। ক্ষুদে পরমাণু থেকে শুরু করে, আপনার ল্যাপটপ কিংবা কোনো জীবাণু—সবকিছুর উপদানগুলোই একটা নির্দিষ্ট তরিকায় সাজানো। তা ছাড়াও প্রতিটি মৌলিক উপাদানের অস্তিত্ব অপরিহার্য না। কোনো কিছুর মৌলিক উপাদান নিজেরা নিজেদের ব্যাখ্যা দিতে পারে না, আর সেজন্যই প্রয়োজন বাহ্যিক ব্যাখ্যা (ওপরের প্রথম সংজ্ঞা দেখুন)।

তৃতীয়ত, কোনো বস্তু যদি তার অস্তিত্বের জন্য এর বাইরের কিছুর ওপর নির্ভর করে, তবে এটি পর-নির্ভর। কথাগুলো সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানেই বুঝে নেওয়ার কথা। অন্যভাবে বললে বলা যায়, নিজের প্রয়োজন যে নিজে মেটাতে পারে না, সে পর-নির্ভর। উদাহরণ হিসেবে পোষা বিড়ালের কথা বলা যায়। বিড়াল নিজে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য ওর চাই বাইরের সাহায্য। এর মধ্যে আছে খাবার, পানি, অক্সিজেন, আশ্রয়।

চতুর্থত, কোনো পর-নির্ভর জিনিসের লক্ষ্যযোগ্য ধর্ম হচ্ছে এর রূপগত গুণ সীমিত। এর মধ্যে আছে বস্তুটির আকার, আকৃতি, রং, তাপমাত্রা, আধান, ভর ইত্যাদি। কেন? কোনো কিছুর রূপগত গুণ সীমিত হওয়ার মানে নিশ্চয় বাহ্যিক কোনো শক্তি এই সীমা বেঁধে দিয়েছে। কেন এর এইসব সীমাবদ্ধতা আছে? কেন এর আকার এরচে

দ্বিগুণ হলো না বা এর আকার বা রং অন্যরকম হলো না? বস্তুটি নিজেই তার মাঝে এসব সীমাবদ্ধতা আরোপ করেনি। আমি যদি হাতে একটা কাপ কেক নিয়ে বলি, অনিবার্য কারণেই এটা এমন, নিশ্চয় আমাকে হেমায়েতপুর পাঠাবেন তা হলে। কারণ, আপনি জানেন বাইরে থেকে কেউ একজন—মানে কেকনির্মাতা—এর আদল, এর রং, এর আকৃতি ঠিক করে দিয়েছে। যেসব জিনিসের রূপগত গুণ সীমাবদ্ধ, তারা নিজে থেকে এই গুণ আরোপ করে না নিজেদের ওপর। রূপগত এই সীমাবদ্ধ গুণের পেছনে অবশ্যই একটা ব্যাখ্যা থাকবে।

সীমিত রূপগত গুণ সমৃদ্ধ প্রতিটি বস্তুই সসীম। এদের এই গুণাবলির জন্য অবশ্যই আগে কিছু একটা থেকে থাকবে। এর মানে সীমিত রূপগত গুণসমৃদ্ধ প্রতিটি বস্তুর একটা শুরু আছে। এদেরকে চিরন্তন ভাবাটা অস্বাভাবিক। কারণ, যেকোনো সীমিত রূপগত গুণসমৃদ্ধ জিনিসের আগে কোনো বাহ্যিক উৎস বা একঝাঁক কারণ অবশ্যই থাকবে যা এর ওপর আরোপ করেছে এসব সীমাবদ্ধতা।

ধরুন, একটি চারাগাছ তুলে ধরে আমি বললাম এটা চিরন্তন। এমন কথা শুনে আকাশ থেকে পড়বেন না আপনি? চারাগাছটির শুরু আপনি নিজ চোখে না দেখলেও, এর রূপগত সীমাবদ্ধতার কারণে আপনি জানেন এটি সসীম। সীমিত রূপগত বস্তু (এই মহাজগৎও) যদি অনাদিকাল থেকেও চলে আসে, তবু এদের পর-নির্ভরতা এবং অপ্রয়োজনীয়তা বাতিল হবে না। কোনো সৃষ্ট জিনিস চিরন্তন হোক কি না-হোক, এই যুক্তি সবকিছুর বেলাতেই খাটবে।

পর-নির্ভরতার সর্বাঙ্গীণ এই সংজ্ঞা খাটালে আমরা বুঝব, এই মহাজগৎ এবং এর মাঝে সবকিছু পর-নির্ভর। কলম, গাছ, সূর্য, ইলেক্ট্রন, কোয়ান্টাম ফিল্ড—আপনার মনে যা কিছু আসে—সব। এগুলো কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই পর-নির্ভর। একথাগুলো যদি সত্য হয়, এই মহাজগৎসহ আমাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রতিটি জিনিসকে তা হলে নিচের তিনটির যেকোনো এক উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়:

- এই মহাজগৎ ও যা কিছু আমরা অনুভব করি, তার সবই চিরন্তন, অনিবার্য এবং স্বাধীন।
- এই মহাজগৎ ও যা কিছু আমরা অনুভব করি, তার সবই অন্য এক পর-নির্ভরশীলের ওপর নির্ভরশীল।
- এই মহাজগৎ ও যা কিছু আমরা অনুভব করি, তা নিজের থেকেই অস্তিত্ববান। আর তাই সেটা চিরন্তন ও স্বাধীন।

তিনটি ব্যাখ্যা নিয়েই আমি এখন আলোচনা করব। দেখব এই মহাজগৎ এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোর পর-নির্ভরতার বিষয়টি কোন ব্যাখ্যাটা সবচে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

এই মহাজগৎ ও যা কিছু আমরা অনুভব করি, তার সবই চিরন্তন, অনিবার্য এবং স্বাধীন

এই মহাজগৎ এবং যা কিছু আমরা অনুভব করি, তা কি অনাদিকাল থেকে অস্তিত্বশীল হতে পারে? স্বাধীন হতে পারে? এই ব্যাখ্যাটি যুক্তিসিদ্ধ না। মহাজগৎ এবং আমাদের অনুভূত সবকিছুর অস্তিত্ব অনিবার্য না। এগুলো না-ও থাকতে পারত। তাদের রূপগত সীমাবদ্ধতাও আছে। যেহেতু তারা নিজেরা নিজেদের এসব সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করেনি, নিশ্চয় বাইরের কিছু তাদের ওপর আরোপ করেছে এগুলো। মহাজগৎ এবং আমাদের অনুভূত সবকিছু নিজেদের অস্তিত্ব দিয়ে নিজেদের কৈফিয়ত দিতে পারে না। তাদের উপাদানগুলো অন্যভাবেও সাজানো যেত। কাজেই, তারা পর-নির্ভর। আর পর-নির্ভর জিনিস স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না।

এই মহাজগৎ যদি চিরন্তনও হতো, তবু এর রূপগত গুণাবলিকে সসীম করতে বাহ্যিক কারণের প্রয়োজন বাতিল হবে না। এ ছাড়া এই মহাজগতের উপাদানগুলো অন্যভাবেও সজ্জিত হতে পারত। কিংবা এই মহাজগৎ অস্তিত্বে না-ও আসতে পারত। এটা তার নিজের অস্তিত্বের দৌলতে নিজেকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। মহাজগতের চিরস্থায়িত্ব 'কোনো একভাবে' এর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে—ওপরের বিষয়গুলো মাথায় রাখলে এমন দাবিকে আমরা আলগোস্তে বাতিল করতে পারি (নিচে এ বিষয়টি আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে)।

সবকিছু অন্য এক পর-নির্ভরশীলের ওপর নির্ভরশীল

এই মহাজগৎ ও যা কিছু আমরা অনুভব করি, তার সবই অন্য এক পর-নির্ভরশীলের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। যেহেতু এগুলো নিজেদের কৈফিয়ত নিজেরা দিতে পারে না, সেহেতু তাদের জন্য আবার অন্য এক পর-নির্ভর কিছুর প্রস্তাব আসলে অনর্থক। কারণ, সেই পর-নির্ভর বস্তুরও তো নিজের কৈফিয়ত প্রয়োজন। পর-নির্ভর জিনিসের জন্য একমাত্র উপযুক্ত ব্যাখ্যা স্ব-নির্ভর কিছু। আর স্ব-নির্ভর কিছুর অস্তিত্ব অনিবার্য।

তারপরও হয়তো কেউ কেউ গোঁ ধরে বলতে পারেন, যা কিছু আমরা অনুভব করি, তা অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল, সেটা আবার অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল—এভাবে অসীম ধারায় চলতে থাকবে। এতক্ষণ যাবৎ মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়ে থাকলে

আপনি নিজেই বুঝবেন এটা যে কত বড় ভুল ধারণা। যেমন ধরুন, এই মহাজগৎকে কি অন্য কোনো মহাজগৎ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়? আর এই ব্যাখ্যার ধারা চলতে থাকবে চিরকাল? একটা ব্যাখ্যা যে লাগছে, সেই সমস্যা কিন্তু এটা দূর করতে পারবে না। যদি অসীম সংখ্যক একে-অন্যের-ওপর-নির্ভরশীল মহাজগৎ থাকেও, আমরা তবু জিজ্ঞেস করতে পারি: কেন মহাজগতের এই অসীম ধারার অস্তিত্ব? এই মহাজগৎ চিরন্তন হোক কি না-হোক, এর অস্তিত্বের জন্য তারপরও একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

নিচের উদাহরণটি খেয়াল করুন। ধরুন, অসীম সংখ্যক মানুষ। প্রত্যেকে তার বাবা-মা'র জৈবিক ক্রিয়ার ফসল। সেই বাবা-মা'ও তাদের বাবা-মা'র জৈবিক ক্রিয়ার ফসল। এভাবে অনন্তকাল ধরে চলছে। তো এখানে যদি জিজ্ঞেস করি: মানুষ এলই-বা কেন? মানুষের এই ধারার যদি কোনো শুরু না-ও থাকে, তারপরও এই ক্রমধারাটির জন্য ব্যাখ্যা লাগবে।[১৫৭]

এই ধরনের আপত্তি থেকে মনে হবে, পর-নির্ভরতার অনন্ত পিছুযাত্রা বুঝি সম্ভব। কিন্তু এটা নিতান্তই অসম্ভব। এই মহাজগৎ যদি অন্য এক মহাজগতের ওপর নির্ভরশীল হয়, আর সেটা যদি হয় আবার অন্য মহাজগতের ওপর নির্ভরশীল, এবং এভাবে যদি চলতেই থাকে, তবে কি এই মহাজগৎ আর আলোর মুখ দেখত? কক্ষনো না। মনে রাখুন, অনন্ত সংখ্যক জিনিসের কোনো শেষ বিন্দু নেই। কাজেই, যদি অসীম সংখ্যক নির্ভরতা থাকে, এই মহাজগতের অস্তিত্ব হতোই না।

সবকিছু এমন এক সত্তার কারণে নিজের অস্তিত্ব লাভ করেছে, যিনি প্রকৃতিগতভাবেই চিরন্তন ও স্বাধীন

আমাদের অনুভূতিজাত সবকিছুই যেহেতু পর-নির্ভর, সুতরাং এদের জন্য সবচে যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হচ্ছে: এগুলো সবকিছু স্ব-নির্ভর কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল। স্ব-নির্ভর সেই সত্তাকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে। না হলে এর জন্য কৈফিয়ত লাগবে। একে চিরন্তনও হতে হবে। যদি চিরন্তন না হয়, সসীম হয়, তা হলে সেও হবে পর-নির্ভর। কারণ, অস্তিত্বের জন্য সসীম জিনিসের কৈফিয়তের প্রয়োজন হয়। এজন্য, আমরা বলতে পারি মহাজগৎ এবং আমাদের অনুভূত সবকিছু নির্ভর করে চিরন্তন ও স্বাধীন এক সত্তার ওপর। একমাত্র মহান আল্লাহর অস্তিত্ব দিয়েই একে সবচে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাও সমর্থন করে নির্ভরতা-যুক্তি। সবকিছুকে অস্তিত্বে আনার নেপথ্যে যে একজন স্বাধীন সত্তা বিদ্যমান, সেকথা প্রমাণ করছে কুরআনের বহু আয়াত। এই যেমন, আল্লাহ বলেছেন:

> "যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, আল্লাহ তার কোনোকিছুর ওপরই নির্ভরশীল নন।"[১৫৮]
>
> "এই যে মানবজাতি! তোমরা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। কেবল তিনিই স্ব-নির্ভর। সব তারিফ তাঁরই প্রাপ্য।"[১৫৯]

কালজয়ী কুরআন ব্যাখ্যাকার ইবনু কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "তারা যা কিছু করে সবকিছুর ব্যাপারে তারা তাঁর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তিনি বিন্দু পরিমাণেও কারও ওপর নির্ভরশীল নন... সত্তাগতভাবে তিনি একেবারেই স্বতন্ত্র। সকল প্রয়োজন থেকে স্বাধীন। তাঁর কোনো অংশীদার বা সহযোগী নেই।"[১৬০]

ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা জন্ম দিয়েছে ইবনু সিনার মতো মনীষীদের। পশ্চিমা দুনিয়ায় তিনি পরিচিত অ্যাভিসিনা নামে। আল্লাহর অস্তিত্বকে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন ওয়াজিবুল-উজূদ—অনিবার্য অস্তিত্ব। বাকি সবকিছুর অস্তিত্বের একমাত্র কারণ হিসেবে তিনি আল্লাহর কথাই উল্লেখ করেছেন। সৃষ্ট সবকিছু আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। তিনি এদের বলেছেন মুমকিনুল-উজূদ।[১৬১] পর-নির্ভর যুক্তিটি আরও অনেক প্রখ্যাত ইসলামি মনীষীই গ্রহণ করেছেন। কিছুটা সংযোজন-বিয়োজন করে ব্যাখ্যা করেছেন। রাজি, গাযালি, হারামাইনের ইমাম জুওয়াইনির মতো খ্যাতনামা সব প্রাজ্ঞ মনীষীরা আছেন এদের মাঝে। যুক্তিটির সারসংক্ষেপ উল্লেখ করে গাযালি লিখেছেন:

> "অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কোনো কিছু অবশ্যই অস্তিত্ববান। কেউ যদি তা অস্বীকার করে, তা হলে সে বোধশক্তি এবং অনিবার্যতার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করল। সত্তাকে অস্বীকার না করাটা তাই অপরিহার্য এক হেতুবাক্য। নীতিগতভাবে যে-সত্তাকে স্বীকার করা হলো, তিনি হয় অনিবার্য নয় সাপেক্ষ... মানে হয় তিনি স্ব-নির্ভর নয় পর-নির্ভর... এখান থেকে আমরা যুক্তি দেখাই: সত্তার অস্তিত্ব যদি অনিবার্য হয়, তা হলে অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু এর অস্তিত্ব যদি সাপেক্ষ হয়, তা হলে প্রত্যেক সাপেক্ষ বস্তুই তো এক অনিবার্য সত্তার ওপর নির্ভর করে; কারণ, সাপেক্ষতা মানেই তো এর অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব—দুটোই সম্ভব। যা কিছুর এমন বৈশিষ্ট্য আছে, কোনো নির্ধারক বা মনোনয়ক শক্তি ছাড়া সে অস্তিত্বে আসতে পারে না। সেই শক্তি অনিবার্য। অপরিহার্য এই হেতুবাক্য থেকে একজন অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত।"[১৬২]

মোট কথা, ইসলামি ধর্মবিশ্বাসে আল্লাহ:

- স্ব-নির্ভর
- সবকিছু তাঁর ওপর নির্ভরশীল
- তিনি সবকিছুর প্রয়োজন পূরণ করেন
- চিরন্তন
- স্বয়ংসম্পূর্ণ
- ওয়াজিবুল-উজুদ (অনিবার্য অস্তিত্ব)

এখন আমি এই যুক্তির পাল্টা কিছু আপত্তি নিয়ে কথা বলব।

মহাজগৎ স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল

নাস্তিকেরা দাবি করেন, আল্লাহ স্ব-নির্ভর, অনিবার্য হতে পারলে মহাজগৎ কেন হতে পারবে না? বেশ কয়েকটি কারণে তাদের এই দাবিটি বেখাপ্পা। প্রথমত, মহাজগতের বেলায় অনিবার্যতার প্রশ্ন নেই। এটা তো না-ও থাকতে পারত। দ্বিতীয়ত মহাজগতের উপাদানগুলো ভিন্নভাবেও সাজানো থাকতে পারত। সেই উপাদানগুলো কোয়ার্ক বা কোনো কোয়ান্টাম ক্ষেত্র যা-ই হোক, এগুলো যেভাবে সাজানো আছে, সেভাবেই কেন হলো?—এই প্রশ্ন তবু খাটবে। কোয়ার্ক বা ক্ষেত্রগুলোর ভিন্ন বিন্যাস যেহেতু সম্ভব ছিল, তার মানে এই মহাজগৎ পর-নির্ভর। মহাজগতের মাঝে যা কিছু আমরা দেখি, তার সবগুলোই রূপগতভাবে সসীম: ছায়াপথ, তারা, গাছপালা, পশুপাখি কিংবা ইলেক্ট্রন—সবই।[১৬৩] তাদের আকার, আকৃতি, রূপ নির্দিষ্ট ধরনের। কাজেই এরা সসীম এবং পর-নির্ভর।

মহাজগৎ নিছক এক ঘটনামাত্র

নাস্তিকদের আরেক ধরনের দাবি হলো, মহাজগৎ নিয়ে নাকি কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। ফাদার কপ্‌লস্টোনের সঙ্গে বিখ্যাত এক বেতার বিতর্কে দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, "আমি বলব, মহাজগৎ স্রেফ আছে, ব্যস।"[১৬৪] এধরনের কথা আসলে বুদ্ধিবৃত্তিক পলায়ন ছাড়া আর কী? ভেসে থাকা সবুজ বলের উদাহরণটি খেয়াল করুন:[১৬৫]

মনে করুন, আপনি স্থানীয় এক পার্কে হাঁটছেন। হঠাৎ দেখলেন, বাচ্চাদের খেলার মাঠের ঠিক মাঝখানে এক সবুজ বল ভাসছে। আপনার কী মনে হবে তখন? দেখেও না দেখার ভান করে থাকবেন? আরে, এ তো এই খেলার মাঠেরই এক অংশ—এমন কথা বলবেন আপনি? অবশ্যই না। আপনার মনে আলবৎ প্রশ্ন জাগবে, কেন এটা এখানে? কেনই-বা এটা এভাবে? বলটিকে এখন মহাজগতের আকারে ভাবুন। প্রশ্নটা

কিন্তু এখনো থাকবে: কেন এই বলটি আছে? কেনই-বা এটা এভাবে আছে? কাজেই মহাজগতের বেলাতেও এই প্রশ্ন অবান্তর নয়।

আর তা ছাড়া এ-ধরনের দাবি উদ্ভটও বটে। খোদ বিজ্ঞানকেই অপমান করে এমন দাবি। বিজ্ঞানমহলে তো মহাজগৎসৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology) নামে একটা গবেষণা ক্ষেত্রই আছে মহাজগতের বুনিয়াদি ধর্ম ও এর অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা নিয়ে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোর এক নিয়মসম্মত ক্ষেত্র এটা। মহাজগৎকে তাই 'নিছকই এক ঘটনার' তকমা দেওয়া এই প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক চর্চাকে অবমাননার শামিল।

বিজ্ঞান একসময় ঠিকই জবাব খুঁজে পাবে!

এই আপত্তি যারা তোলেন, তার বলতে চান, এই অধ্যায়ের যুক্তিটি হচ্ছে 'জ্ঞানের ঘাটতির ঈশ্বর' নামক ভ্রান্ত যুক্তি। তারা বলেন, বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা ঐশী কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই হিসেবে গাওয়া যাবে না; কারণ, বিজ্ঞান একসময় ঠিকই এর ব্যাখ্যা দেবে। তাদের এই যুক্তিটিও বেখাপ্পা। কারণ, পর-নির্ভরতা যুক্তিটি কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এর মাথাব্যথা অধিবিদ্যা নিয়ে। সে বুঝতে চায় এই প্রকৃতি এবং পর-নির্ভরশীল বস্তুগুলোর তাৎপর্যকে। যেকোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ব্যাপারে একে খাটানো যায়। যেমন ধরুন, প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা হিসেবে আমরা যদি বহু মহাজগতের তত্ত্বও দিই, তবু এগুলো সবই হবে পর-নির্ভর।

কেন?

কারণ, এসব ব্যাখ্যার উপাদানগুলোকে ভিন্নভাবে সাজানো যাবে। কেবল তাদের নিজেদের অস্তিত্ব দিয়ে তাদের কৈফিয়ত দেওয়া সম্ভব হবে না। তাদের অস্তিত্বের জন্য বাইরে থেকে অন্য কোনো শক্তি লাগবে। তা ছাড়া তাদের রূপগত সীমিত গুণাবলি তো আছেই। এসমস্ত কারণে তারা পর-নির্ভর। এক পর-নির্ভরশীলকে আপনি অন্য আরেক পর-নির্ভরশীল দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। বিজ্ঞানীমহল যদি স্ব-নির্ভর এবং চিরন্তন কোনো কিছুকে খুঁজে পাওয়ার দাবি করে, এবং মহাজগতের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে, আমি তা হলে এর প্রমাণ চাইব। তখন অবশ্য বেশ মজার একটা ব্যাপার ঘটবে। কারণ, ঠিক যে-মুহূর্তে তারা পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রমাণ হাজির করবে, ঠিক সে-মুহূর্তে তারা নিজেরাই নিজেদের বিরোধিতা করবে। কারণ, পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রত্যেকটি জিনিস রূপগতভাবে সসীম। আর তাই তারা পর-নির্ভরশীল!

বিজ্ঞান কখনো কোনো স্ব-নির্ভর ও চিরন্তন সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারবে না। কারণ, বিজ্ঞান শুধু যে গবেষণাভিত্তিক জগতেই আতশি কাঁচ বিছায় তা না; যেসব বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সে হাজির করে, তার সবই পর্যবেক্ষণযোগ্য পর-নির্ভরশীল বস্তু।

আর তাই যদি বলা হয়, বিজ্ঞান একসময় পর্যবেক্ষণ-অক্ষম কোনো বস্তু আবিষ্কার করবে, সে কথার কোনো মানে হয় না!

বিজ্ঞান আসলে কী সেটা চট করে বুঝে নিই চলুন। বিদ্যাচর্চার বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের কাজকারবারের উত্তর আর ব্যাখ্যা দেওয়া (দেখুন অধ্যায় ১২)। আর ব্যাখ্যা থাকতে পারে কেবল পর-নির্ভর বস্তুর। তার মানে বিজ্ঞানের গণ্ডি কেবল পর-নির্ভর বস্তুর মাঝে। সে কেবল এধরনের ক্ষেত্রেই সমাধান দিতে পারে। এ অধ্যায়ে যে-যুক্তিটি আমরা দিয়েছি, তার অধিবিদ্যাগত দিকটি সে ধরতে পারে না। আমাদের ব্যাখ্যাটি যেহেতু স্ব-নির্ভর এবং চিরন্তন এক সত্তার ব্যাপারে, বিজ্ঞানের হাত তাই সেখানে পৌঁছানোই সম্ভব নয়। কারণ, তার গণ্ডি কেবল অভিজ্ঞতাজাত এবং পর-নির্ভর বস্তুর মাঝে।

আপনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ধরে নিয়েছেন

এই অধ্যায়ের যুক্তিটি আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুমান করে ধরে নেয়নি। অনিবার্যতার ধারণা-বিষয়ক যুক্তিটি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের দিকে নিয়ে যেতে বানিয়ে তোলা হয়নি; বরং মহাজগৎ এবং আমাদের অনুভূত সবকিছুর পর-নির্ভরশীলতাই বলে দিয়েছে, একজন চিরন্তন, স্ব-নির্ভর সত্তার অস্তিত্ব অনিবার্য। আর এই কথাটি আল্লাহর ইসলামি পরিচয়ের সঙ্গে মিলে যায়। দর্শনশাস্ত্রে অনিবার্যতা এবং পর-নির্ভরশীলতার ধারণাগুলো খুবই পরিচিত এবং বেশ আলোচিত (দর্শনশাস্ত্রে 'পর-নির্ভরতা' শব্দটি দিয়ে 'সাপেক্ষতা' বোঝানো হয়)। চুপিসারে ঈশ্বরের ব্যাখ্যাটা ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য বানানো কোনো ধারণা নয় এগুলো।

"ঈশ্বরের জন্য ব্যাখ্যার দরকার নেই?"

এ অধ্যায়ে আলোচিত যুক্তিটি আমাদের বলেছে, এক চিরন্তন, স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব অনিবার্য। আর অনিবার্য সত্তার কোনো কৈফিয়তের দরকার নেই। তাত্ত্বিকভাবে বললে, (পর-নির্ভর বস্তুর মতো) এ ধরনের সত্তার বেলায় বাহ্যিক কোনো কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই। বরং, এর নিজের অস্তিত্বই এর ব্যাখ্যা। অন্যভাবে বললে, এই সত্তার অস্তিত্ব না থাকাটাই অসম্ভব। আর তাই বাহ্যিক কোনো কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই এর।

আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের এই উপলব্ধি যেন কেবল নিউরনের কিছু ক্রিয়াকলাপের মাঝে আটকে না থাকে। তাঁর প্রতি ব্যাকুলতা আর ভালোবাসার একটা আন্তরিক বোধ যেন তৈরি করে আমাদের অন্তরে।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি: আল্লাহর অস্তিত্ব অনিবার্য। বাকি সবকিছুর অস্তিত্বের কারণ কেবল তিনি। তার মানে, মানুষ হিসেবে আমরা কেবল দার্শনিক অর্থেই তাঁর

ওপর নির্ভরশীলই নয়; বরং কথাগুলোর সাধারণ অর্থেও। তাঁকে ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব সম্ভবপর ছিল না। আমাদের যা কিছু আছে, যা কিছু আমরা দেখি, সবই আসলে তাঁর জন্যই।

একটা অসাধারণ ছোটগল্প দিয়ে শেষ করছি এই অধ্যায়টি। আমরা যেহেতু দিনশেষে আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল, দুনিয়া ও পরজীবনের সফলতা তাঁর দয়ার ওপর নির্ভর করছে, কাজেই তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করে দেওয়া উচিত আমাদের। কোনোভাবেই তাঁর ইচ্ছের অন্যথা করা উচিত নয়। গল্পটা শুনুন তা হলে:

মাঠে কাজ করতে বের হয়েছি। সাথে আমার সব সময়ের সঙ্গী ছোট্ট কুকুর: ক্ষেতের ফসল নষ্টকারী বানরগুলোর চিরশত্রু।

তখন তীব্র গরমের মৌসুম। খাড়া রোদের নিচে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এমন হাঁপিয়ে উঠলাম—শ্বাস নেওয়াই দায়। মনে হচ্ছিল, কিছুক্ষণের মাঝেই বুঝি হয় আমি না হয় আমার কুকুর—কেউ একজন বেহুঁশ হয়ে যাব। এমন সময় হঠাৎ এক টিয়াকি গাছ নজরে পড়ল—আল্লাহকে যে কী বলে শুকরিয়া জানাব! গাছটির ডালপালাগুলো একঝাঁক সজীব সতেজ সবুজের ছায়া মেলে ধরল আমাদের সামনে। খুশিতে আমার কুকুরটা শব্দ করে ছুটে গেল গাছের ছায়ায়।

কিন্তু গিয়েই আবার ফিরে এল। জিহ্বা বের করে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে। যেন ফিরে এসেছে আমাকে ডাকতে। ওর শরীরের ধুকপুকানি বাইরে থেকেও বুঝতে পারছিলাম। আহ কী ক্লান্ত বেচারা!

আমি হেঁটে গেলাম গাছটির ছায়ার নিচে। ওর আনন্দ দেখে কে। হঠাৎ কী খেয়াল হলো, আমি ভান করলাম যেন গাছের ছায়া থেকে আবার হাঁটা শুরু করেছি—চলে যাব। করুণ সুরে বেচারা কুকুরটা গোঙাতে লাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য, দুপায়ের মাঝে লেজ চেপে ঠিকই আসতে লাগল আমার পিছু পিছু। বুঝতে পারছিলাম ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। অথচ তারপরও, জীবনের শঙ্কা নিয়ে আমায় অনুসরণ করছিল।

আমার ভেতরটা প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠল। ও তো আমার পিছু নিয়ে নিজের জীবন কুরবান করতে বাধ্য না। তারপরও কেন পিছু নিল? মনে মনে ভাবলাম, ও আমাকে ওর মনিব হিসেবে জানপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। আর তাই, শুধু আমার সাথে থাকতে নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করেছে ও। মন আমার ভিজে উঠল নোনাজলে। আনমনেই বলে উঠলাম, 'প্রভু গো, আমার এই অসুস্থ মনকে আপনি সুস্থ করে দিন। কুকুর বলে যাকে তুচ্ছ করি, ওর মতো আনুগত্য দিন আপনার প্রতি আমার মাঝে। বিনা প্রশ্নে ও যেমন আমার পিছু পিছু এল, আমার মাঝেও আপনাকে অনুসরণ করার, আপনার পথে চলার সেই শক্তি দিন। ঘুণাক্ষরেও যেন কোনো সংশয় উঁকিঝুঁকি না মারে আমার

মনে। আমি তো ওর স্রষ্টা নই। তবু শত কষ্ট সহ্য করেও আমার অনুসরণ করছে ও। প্রভু, আপনিই ওকে দিয়েছেন এই গুণ। প্রভু গো, আমার মতো আর যত যারা আপনার কাছে চায়, তাদের সবাইকে ভালোবাসা আর পরোপকারের গুণদুটো দান করুন।'

এরপর আমি উলটো ফিরে গাছের ছায়ায় চলে গেলাম। এবারে যেন দ্বিগুণ খুশিতে আটখানা হয়ে উঠল আমার ছোট্ট কুকুরটা। দুপা সামনে বিছিয়ে তাকিয়ে থাকল আমার চোখ বরাবর। না-জানি বোবা প্রাণীটা কী কথা বলতে চাইছে আমায়।[১৬৬]

অধ্যায় ৭

সচেতনতা-যুক্তি

আমার বাবা হাঁটতে ভালোবাসেন। হেঁটে বেরিয়ে ভাবুক মানুষকে যেসব প্রশ্ন অস্থির করে রাখে সেগুলো নিয়ে ভাবেন তিনি। একবার ঠিক করলেন লন্ডনের বিখ্যাত স্পিকার কর্নারে যাবেন।

কত বিষয় নিয়ে যে কথা হয় ওখানে। মানুষ, মানুষের জীবন, জগৎ-মহাজগৎ থেকে শুরু করে, রাজনীতি, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব—কোনো কিছুই বাদ যায় না। সব সময় মানুষের শোরগোলে সরগরম থাকে জায়গাটা। অবাধে মন খুলে যেভাবে ইচ্ছে নিজের কথা বলতে পারে এখানে সবাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে দার্শনিক আর তাত্ত্বিক কথাবার্তারও ছড়াছড়ি এখানে। আমার বাবা যেদিন গেলেন, শুনলেন এক কোনায় বেশ আলাপ জমেছে ঈশ্বরে বিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট ভালো কারণ আছে কিনা সে নিয়ে। বাবা সেদিন ওদের আলোচনায় জল ঢেলে বলেছিলেন, "যদি ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করেন, তার মানে নিজেকে অস্বীকার করলেন।" বাবার কাছে কাহিনিটি শুনে এর মাথামুণ্ডু কিছুই সেদিন বুঝিনি। তবে আজ, কয়েক দশক পরে, এই অধ্যায়ে, আমি তার ওই অতলস্পর্শী কথাটাই বিশদ করতে চাই।

বাবা আসলে বোঝাতে চাচ্ছিলেন, আমরা যে আসলে কী (এবং আমরা কী অনুভব করি), যেহেতু সে-জ্ঞান আছে আমাদের, এটাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিদর্শন। ব্যাপক অর্থে বাবা আসলে আমাদের সচেতনতাবোধের কথা বলেছিলেন। সহজ করে বললে, আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা। আমার পছন্দের কোনো চকলেট খেলে, কিংবা কুরআনের তিলাওয়াত শুনলে আমার কেমন লাগে, তা আমি জানি। আমার এই অনুভূতি কিন্তু অন্যজন হুবহু বুঝবে না। চকলেট বা কুরআন তিলাওয়াত শুনলে তাদেরও অন্যরকম অনুভূতি হতে পারে। কিন্তু আমার মনের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিটা শুধুই আমার।

আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সবধরনের তথ্য আপনার কাছে থাকলেও, কমলার জুস খেতে, সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখতে বা কাউকে ভালোবাসলে আমার একান্ত অনুভূতিগুলো অজানাই থেকে যাবে আপনার।

মানব-মস্তিষ্কের জটিল রহস্যময় জগতে বিচরণ করে স্নায়ুবিজ্ঞান। এটা মূলত পারস্পরিক সম্বন্ধের বিজ্ঞান। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন। অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, সেটা বিজ্ঞানীদের জানান। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা তখন এদুয়ের মাঝে পারস্পরিক সম্বন্ধ সেঁটে দেন। অংশগ্রহণকারীর নির্দিষ্ট অনুভূতিটা যে আসলে কী, সে সম্বন্ধ কিন্তু কিছু জানতে পারি না আমরা। স্নায়ুবিজ্ঞান শুধু বলতে পারে কখন সেই অনুভূতি হয়। আপনি বলতে পারেন, অংশগ্রহণকারী তার একান্ত অনুভূতি সম্বন্ধে সরাসরি স্নায়ুবিজ্ঞানীকে জানালেই তো হয়ে গেল। না, এত সহজ নয় বিষয়টা। কারণ, 'ঠান্ডা', 'ব্যথা', 'মিষ্টি', 'সুন্দর', 'দুঃখ'-এর মতো শব্দগুলো প্রত্যেকের মনে আলাদা আলাদা অনুভূতি নিয়ে হাজির হয়। শব্দ তো কেবল কথার অর্থ আর অনুভূতি বোঝানোর এক বাহন। অন্যের সচেতন অনুভূতি পুরোপুরি বুঝতে শব্দকে ছাপিয়ে ভাবতে হবে আমাদের। একান্ত সচেতন অনুভূতির আরেকটি দিক হচ্ছে, কেন অচেতন জৈবিক ও প্রাকৃতিক প্রণালি থেকে ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলো জন্ম নেয়? অচেতন উপদান থেকে কেন একান্ত নিজস্ব অনুভূতি জেগে ওঠে? মন ও স্নায়ুবিজ্ঞানের দর্শনে এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

পণ্ডিত-মহলে এই কথাগুলো সচেতনতার কঠিন সমস্যা নামে পরিচিত। আমরা কে এবং আমাদের সচেতন অনুভূতি সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হলেও, এ বিষয়টি আজও এক ধোঁয়াশা। গবেষণাকর্মী ডেনিয়েল বর সমস্যাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> "পৃথিবীতে বহু কঠিন সমস্যা আছে। কিন্তু একটা আছে আসলেই 'কঠিন সমস্যা।' আত্মসচেতনতার সমস্যা সেটা। মাত্র ১৩০০ গ্রামের মতো স্নায়ুকোষ কীভাবে অবলীলায় মানুষের সচেতন মুহূর্তগুলোকে ঘিরে রাখা অনুভূতি, ভাবনা, স্মৃতি আর আবেগের জন্ম দেয় ভেলকিবাজির মতো। কঠিন এই সমস্যাটি আজও অমীমাংসিত।"[১৬৭]

আমাদের এই একান্ত ব্যক্তিগত সচেতন অনুভূতিগুলো কেবল একজন সর্ব-সচেতন সত্তা দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সেই সত্তা জড় এই মহাজগৎ সৃষ্টি করেছেন চেতন সৃষ্টির সমাহারে। তাদেরকে দিয়েছেন নিজেদের একান্ত অনুভূতি উপলব্ধির ক্ষমতা। এ ছাড়া আর যত ব্যাখ্যা আছে, শুরুতেই তা মুখ থুবড়ে পড়ে। মহাজগৎ সম্বন্ধে নিষ্প্রাণ, বস্তুবাদী মতবাদ এই সমস্যার কোনো সুরাহা করতে পারে না।

ধরুন, জগতের শুরুতে ছিল কেবল বিভিন্ন পদার্থের সরল বিন্যাস। তারপর অনেক অনেক কাল পরে তারা নিজেদের পুনর্বিন্যাস করে সচেতন মানুষের জন্ম দিল। জাদুর মতো শোনায় এসব কথা। পদার্থ নিষ্প্রাণ, উদ্দেশ্যহীন, অচেতন। ওটা কীভাবে এমন কিছুর জন্ম দেবে? আমার কাছে যদি ১০০ টাকা না-ই থাকে, আমি কীভাবে আপনাকে দেব? পদার্থের মধ্যে যদি চেতনা না থাকে, কিংবা চেতনাবোধ দেওয়ার

মতো সম্ভাবনা না থাকে, তা হলে সে এর জন্ম দেবে কী করে। আপনি বলতে পারেন, আমি তো টাকা আয় করে অন্যকে পরে দিতে পারি। সেভাবে পদার্থও কোনো জটিল প্রক্রিয়ায় সচেতনতা 'অর্জন' করে এই বোধের জন্ম দিতে পারে। কথাটা ঠিক না। কারণ, একটা অচেতন প্রণালির সঙ্গে আরেকটা অচেতন প্রণালি মিলে দুটো অচেতন প্রণালিই হয়। এ যেন লোহাকে কাঠ বানানোর মতো। লোহাকে যতভাবেই পুনর্বিন্যাস করুন না কেন, ওটা লোহাই থাকবে। কাঠ আর হবে না।

কঠিন সমস্যাটির চুলচেরা বিশ্লেষণ থাকবে এই অধ্যায়ে। কেন আস্তিক্যবাদী ধারণা, বা আরও একটু বিস্তৃত পরিসরে, আল্লাহর অস্তিত্ব এই কঠিন সমস্যার ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারে, থাকবে সেসব কথাও। 'বিজ্ঞান একসময় ঠিকই এর রহস্য বের করবে'—সচেতনতার সমস্যার বিষয়টি যে এমন না, সেটাও দেখাব এখানে। মস্তিষ্কের সব রহস্যও যদি আমরা জেনে ফেলি, আর শুধু জৈবিক, জড় (কিংবা নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক) ব্যাখ্যার ধরনা দিই, তবুও সচেতনতার কঠিন সমস্যার সুরাহা হবে না।

জটিল সমস্যাটি সম্বন্ধে আরও কিছু কথা

নিজেদের জড়বাদী মতবাদে একগুঁয়েরাও স্বীকার করেছেন এই আপাত অমীমাংসিত সমস্যাটির কথা। ক্রিস্টফ কচ কনসাশনেস: কনফেশানস অফ আ রোমান্টিক রিডাকশনিস্ট বইতে খোলাখুলি স্বীকার করেছেন,

> "জৈববৈদ্যুতিক ক্রিয়াকে কীভাবে মস্তিষ্ক ব্যক্তিগত অনুভূতিতে বদলে দেয়, পানি থেকে প্রতিফলিত আলোকণা কীভাবে জাদুর মতো বর্ণাভ নীলাভ-সবুজ পাহাড়ি হ্রদে বদলে যায়, তা এক ধাঁধা। স্নায়ুব্যবস্থার সঙ্গে চেতনার সম্বন্ধ তাই অধরা। উত্তপ্ত, ক্লান্তিকর বিতর্কের বিষয়... অত্যন্ত সুবিন্যস্ত উপাদানগুলো কেমন করে ধারণ করে অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি, তা তাড়া করে ফেরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে। অথচ অন্য কত জায়গায় সে নিজেকে ব্যাপকভাবে কার্যকর প্রমাণ করেছে।"[১৬৮]

অমীমাংসিত সমস্যাটি কিন্তু মস্তিষ্কের গঠন কিংবা আমাদের সচেতন অনুভূতি কীভাবে মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্বন্ধিত, তা নিয়ে না। ব্যথা পেলে, আমার মস্তিষ্কের কিছু কর্মকাণ্ড দেখলে বোঝা যাবে আমি ব্যথা পাচ্ছি। মস্তিষ্কের সঙ্গে আমাদের অনুভূতির সম্বন্ধকে কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু যে-বিষয়টাতে আমি জোর দিতে চাই, এটা হচ্ছে স্রেফ একটা সম্বন্ধ। মস্তিষ্ক এবং আমাদের সচেতনতা এক জিনিস না। মস্তিষ্ক যদি গাড়ি হয়, সচেতনতা তার চালক। চালক ছাড়া গাড়ি চলবে না। গাড়িতে সমস্যা থাকলে চালক ঠিকমতো তা চালাতে পারবেন না। কোনো কোনো দিক থেকে এ দুটো জিনিস একেবারে ভিন্ন এবং স্বাধীন।

স্নায়ুবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা কোন সমস্যাটার সুরাহা করতে চাচ্ছে, মস্তিষ্ক আর অনুভূতি কেন এক জিনিস না, এসব প্রশ্নেরই জবাব আছে সচেতনতার কঠিন সমস্যায়। আমাদের আছে একান্ত নিজস্ব কিছু অনুভূতি। কোনো নির্দিষ্ট জীবসত্তার একান্ত সচেতন অনুভূতিটি যে কেমন, তা বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। এটাই হচ্ছে সমস্যা। সচেতনতার কঠিন সমস্যা কথাটিকে যিনি জনপ্রিয় করেছেন তিনি অধ্যাপক ডেভিড চ্যালমার। তিনি বলেছেন,

> "অনুভূতির সমস্যাটিই আসল কঠিন সমস্যা। আমরা যখন ভাবি, দেখি, রাশি রাশি সব তথ্য প্রক্রিয়াজাত হয়। তবে এর একটি ব্যক্তিগত দিকও আছে... এর নাম অনুভূতি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন দেখি, তখন দৃষ্টি-সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়কে অনুভব করি: লালিমার আভা, অন্ধকার আর আলোর বিভূতি, প্রকৃতির ত্রিমাত্রিকতা। অন্যান্য বোধশক্তি দিয়ে অনুভব করি অন্যান্য অনুভূতি: বাঁশির শব্দ, ন্যাপথলিনের সুবাস। এরপর আছে শারীরিক ব্যথা থেকে শুরু করে দৈহিক উত্তেজনার অনুভূতি, মনে করিয়ে দেওয়া নানা স্মৃতি। আবেগের অনুভূতি। লাগাতার বিভিন্ন সচেতন চিন্তার অভিজ্ঞতা। এগুলো প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার মাঝেই কিছু একটা আছে। এটাই এগুলোকে গেঁথেছে এক সুতোয়... যদি কোনো সমস্যা আসলেই অনুভূতির সমস্যা হওয়ার দাবিদার হয়, তা হলে এটাই সেটা। 'অনুভূতি'র মূল অর্থ: একটি জীবসত্তা, এবং একটি মানসিক অবস্থা তখনই সচেতন, যখন সেটা নির্দিষ্ট অবস্থায় কিছু একটা অনুভব করে।"[১৬৯]

অনুভূতির জটিল সমস্যাটির সংজ্ঞায় ভিন্ন আরেক মাত্রা যোগ করেছেন অধ্যাপক টরিন অ্যাল্টার। মস্তিষ্কের সচেতন অনুভূতি তৈরির কারণ না জানতে পারার ওপর নজর দিয়েছেন তিনি:

> "এই যে আমি এই শব্দগুলো টাইপ করছি, আমার মস্তিষ্কের মননগত ব্যবস্থা জড়াচ্ছে দৃষ্টিসম্বন্ধীয় এবং শ্রবণ-সম্বন্ধীয় তথ্য প্রক্রিয়াসাধনে। অসাধারণ সব সচেতন অবস্থা চলছে এর সাথে: কিবোর্ড চাপার ট্যাপ-ট্যাপ শব্দের শ্রবণ-সম্বন্ধীয় অনুভূতি, পর্দায় অক্ষরগুলো ভাসমান হওয়ার দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অনুভূতি। আমার মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড কীভাবে এই অনুভূতিগুলোর জন্ম দিচ্ছে? কেন ওগুলোই? অন্য কোনো অনুভূতি নয় কেন? সচেতন অনুভূতির সঙ্গে কেন বাস্তবিক কোনো ঘটনার সংশ্লেষ? এই ধরনের প্রশ্নগুলো অনুভূতির জটিল প্রশ্ন নামে পরিচিত... সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম ও সামর্থ্য ব্যাখ্যার পরও, কম্পিউটার-পর্দায় অক্ষরকে ভাসমান হতে দেখে কেন কিছু একটার অনুভূতি হয়, তা ভেবে কেউ বিস্ময়ে বিমূঢ় হতেই পারেন।"[১৭০]

একটা উদাহরণ দিয়ে সহজ করি বিষয়টা। ধরুন, আপনি একটা স্ট্রবেরি খাবেন। আপনি যে খাচ্ছেন, তার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধটা বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা বের করতে পারবেন। আপনি যে ফল খাচ্ছেন বের করতে পারবেন সেটাও। সেই ফলটা সুস্বাদু না মিষ্টি সেটাও হয়তো বের করতে পারবেন। কিন্তু এতকিছুর পরও, তারা কিন্তু কখনোই বের করতে পারবে না আপনার স্ট্রবেরি খেতে কেমন লাগে, কিংবা আপনার কাছে স্বাদ বা মিষ্টির মানে এবং সেটা আপনার কাছে ঠিক কেমন লাগে। স্ট্রবেরি খাওয়ার শারীরিক পদ্ধতি থেকে আপনার এই একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিটি কেন তৈরি হলো, সেটাও তারা বের করতে পারবেন না।

এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। আমরা কিন্তু কেবল জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ে কথা বলছি না এখানে। স্নায়ুজৈবিকীয় জ্ঞানের ঘাটতির কারণে এই প্রশ্নটি জটিল নয়। কিংবা স্নায়ুজৈবিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে কারও একান্ত অনুভূতি থাকার বিষয়টি যে কেমন তা না বোঝা থেকেও তৈরি হয়নি এই জটিলতা। এটা আসলে সত্তাতত্ত্ববিদ্যাগত বিষয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতির উৎস ও প্রকৃতি নিয়ে এর মাথাব্যথা। শারীরিক (এই ক্ষেত্রে স্নায়ুজৈবিক) এবং একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা দুটো বিষয়। কারও একান্ত সচেতন অনুভূতি থাকার বিষয়টি কেমন সেটা না জানা, এবং শারীরিক প্রক্রিয়া থেকে কীভাবে এই অনুভূতিগুলো জেগে ওঠে সেটা না জানা থেকেই জন্ম নেয় অধিবিদ্যাগত এই প্রশ্নটি: সচেতন অনুভূতির ধরন কেমন? এই অনুভূতিগুলোর আদি উৎস কী?

কিছু ব্যর্থ পদ্ধতি

অনুভূতি এবং এর জটিল সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে বেশ কিছু পরস্পর-বিরোধী পদ্ধতি। এগুলোর মধ্যে আছে জৈবিক, বস্তুবাদী এবং অবস্তুবাদী ব্যাখ্যা। এ অধ্যায়ে আমি দেখাব, কেন এগুলো অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। আর কেনই-বা আস্তিক্যবাদী ভাবধারা এর সবচে ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারে। দার্শনিক ও স্নায়ুবিজ্ঞানীরা যে-সমস্যাটির কোনো সুরাহা করতে পারছেন না, আল্লাহর অস্তিত্ব এর সপক্ষে দেবে যৌক্তিক সমাধান।

জীবতাত্ত্বিক পদ্ধতি

প্রথমে দেখি, জীবতাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলো কেন ব্যর্থ হলো। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে যেসব বইতে জটিল সমস্যাটা সুরাহার চেষ্টা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আছে, ফ্র্যান্সিস ক্রিক ও ক্রিস্টোফ কচ-এর টুওয়ার্ড আ নিউরোবায়োলজিকাল থিওরি অফ কনশাসনেস, বার্নার্ড বার্স-এর গ্লোবাল ওয়ার্কপ্লেইস থিওরি, জেরাল্ড এল্ডারম্যান ও গুলিও টননি-র দ্যা ডায়নামিক থিওরি, রডল্ফ লিনাস-এর থ্যালামকর্টিক্যাল বাইন্ডিং

থিওরি, ভিক্টর লেম্মে-এর রিকারেন্ট প্রসেসিং থিওরি, সেমির জেকি-র মাইক্রোকনশাসনেস থিওরি এবং আন্তোনিয়ো দামাসিও-এর দ্যা ফিলিং অফ ওয়াট হ্যাপেনস থিওরি।

প্রায়োগিক এসব তত্ত্বের মারপ্যাঁচ এবং ঘাটতিগুলো আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয় এখানে (কারণ, এগুলোর মাঝে যেসব দার্শনিক চিন্তা ও ধারণা আছে, সেগুলো নিয়ে নিচে বলা হয়েছে), এগুলোর কোনোটাই অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যাটিকে সর্বাঙ্গীণভাবে আলোচনা করে না। অধ্যাপক ডেভিড চ্যালমার জীবতাত্ত্বিক পদ্ধতির সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তার বইতে। দ্যা কারেক্টার অফ কনসাশনেস বইতে তিনি ৫টি বিপজ্জনক কৌশলের কথা বলেছেন:[১৭১]

প্রথমে আছে অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যাকে এড়িয়ে অন্য কিছু ব্যাখ্যা করা। গবেষকেরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন এই সমস্যাটি খুবই জটিল। কচ নিজেই ব্যর্থ এই কৌশলের কথা মেনে নিয়েছেন। এক ইন্টারভিউতে তিনি বলেছেন, "একান্ত অনুভূতির মতো সত্যিকার কঠিন দিকটা আগে ভুলে যান। কারণ, এর কোনো বৈজ্ঞানিক সমাধান না-ও থাকতে পারে। খেলা, ব্যথা, আনন্দ, নীল রং দেখা কিংবা গোলাপের সুবাস নেওয়ার অনুভূতি—মোট কথা, পরমাণু আর স্নায়ুর ব্যাখ্যা এক জিনিস, আর একান্ত অনুভূতির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।"[১৭২]

দ্বিতীয় কৌশলটি হচ্ছে, অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যাকে অস্বীকার। এই কৌশল বলে আমরা যেন একেকটা যন্ত্র। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আসলে এক মায়া। এই কৌশল বলে মানুষ কেবল এক জীবতাত্ত্বিক যন্ত্র। এদের কোনো একান্ত অনুভূতি নেই। অর্থাৎ আসল সমস্যাটিকে এড়িয়ে এই কৌশল মানুষের সংজ্ঞাকে পাল্টে দিচ্ছে।

তৃতীয় কৌশলটি বলে, আমাদের মস্তিষ্কের জড় কর্মকাণ্ডগুলো বুঝলেই নাকি একান্ত অনুভূতিগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে। কথাটা শোনায় জাদুমন্ত্রের মতো। এসব কর্মকাণ্ড কেন একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির জন্ম দিচ্ছে?—সেই প্রশ্নটি অনুত্তরিতই থেকে যাচ্ছে। আর তা ছাড়া জড় পদ্ধতিগুলো মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি সম্বন্ধে আসলে কিছুই বলে না।

চতুর্থ কৌশলটি হচ্ছে, অনুভূতির কাঠামো ব্যাখ্যা করা। প্রথমত, আমাদের অনুভূতি কেন আছে, সেটার ব্যাপারেই কিছু বলে না এটা। একজন মানুষের নিজস্ব অনুভূতি থাকার মানে কী, অনুভূতির কাঠামোর ব্যাখ্যা দিয়ে তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না।

পঞ্চম কৌশলটি হচ্ছে অনুভূতির মূল ভিত্তি বা স্তরকে আলাদা করে ফেলা। নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া বুঝে অনুভূতির স্নায়বিক ভিত্তিকে আলাদা করাই এই কৌশলের উদ্দেশ্য।

তবে একান্ত অনুভূতি থাকার মানে যে আসলে কী, তা ব্যাখ্যা করতে পারে না এই কৌশল। এ ছাড়া ওসব প্রক্রিয়াগুলো থেকে কেন এসব অনুভূতি জন্ম নেয়, কীভাবেই-বা জন্ম নেয়, তা-ও বলতে পারে না।

মনের দর্শন

জটিল সমস্যাটির সুরাহায় দার্শনিকেরা কীভাবে অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করেছেন, এবারে সেটি দেখব আমরা। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখা জরুরি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন দার্শনিক ধারণা পোরা থাকে। যেকারণে, দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে কথা বললে পর্যবেক্ষণজাত তত্ত্ব নিয়েও কথা বলা হয়ে যাবে। অধ্যাপক আন্তি রেভনসু এ বিষয়টাকে খুব স্পষ্ট করে বলেছেন:

> "বিভিন্ন দার্শনিক বিকল্প সম্বন্ধে প্রায়োগিক বিজ্ঞানীদের সতর্ক থাকা দরকার। কারণ, প্রত্যেকটি প্রায়োগিক তত্ত্বের মধ্যে কোনো-না-কোনো ধরনের দার্শনিক দায়বদ্ধতা অনিবার্যভাবেই থাকে... একজন বিজ্ঞানী এসব দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন কি না থাকুন, তার মনমগজে সামগ্রিক যে-প্রায়োগিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন, সেটা বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তার অতীত দার্শনিক দায়বদ্ধতা বা অনুমানের দিক-নির্দেশেই হয়।"[১৭৩]

অধ্যাপক রিকার্দো মানজোত্তি এবং পাওলো মদারেতোও বলেছেন, স্নায়ুবিজ্ঞান "অধিবিদ্যাগতভাবে নিষ্পাপ নয়"।[১৭৪] "কিছু হেতুবাক্যের আলোকে প্রায়োগিক তথ্যগুলো ব্যাখ্যা করা দরকার।"[১৭৫]

অনুভূতির ব্যাখ্যায় আস্তিক্যবাদী ব্যাখ্যাটিকে চ্যালেঞ্জ ছোড়ার মতো যথেষ্ট সর্বাঙ্গীণ নয় দার্শনিক পন্থাগুলো। মোটা দাগে এগুলোকে ভাগ করা যায় বস্তুবাদী এবং অবস্তুবাদী পন্থায়। নিচে আমরা এসব পন্থাগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানব। কেন এগুলো ব্যর্থ জানব সেটাও।

বস্তুবাদী পন্থা

অনেক গবেষক ও পণ্ডিত জড়বাদ এবং বস্তুবাদকে সমার্থ হিসেবে ব্যবহার করেন।[১৭৬] আমিও তা-ই করব এই বইতে। পরিভাষা দুটোর ইতিহাস ভিন্ন। আর এদের মধ্যে ধারণাগত কিছু পার্থক্যও আছে।[১৭৭] তবে এই পার্থক্য এ-অধ্যায়ে আলোচিত ধারণাটির জন্য কোনো সমস্যা নয়। এ পরিভাষা-দুটো বলে, ভৌত বিজ্ঞান দিয়ে অনুভূতিবোধ ব্যাখ্যা করা যাবে; তবে সেজন্য কিন্তু সচেতন অবস্থাকে সব সময় পদার্থ-কণার সঙ্গে সমান করে দেখাটা জরুরি নয়।

মেরি যুক্তিতর্ক: পদার্থবিদ্যাগত তথ্যগুলোই শেষ নয়

মেরি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ফ্র্যাংক জ্যাকসন একান্ত অনুভূতির ব্যাখ্যায় জড়বাদ এবং বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি টলিয়ে দিয়েছেন। তার যুক্তিতর্কটির সারসংক্ষেপ হচ্ছে:

মেরি সারা জীবন থেকেছে এক সাদাকালো ঘরে। পৃথিবী সম্বন্ধে সে জেনেছে সাদাকালো কম্পিউটার আর টিভি দিয়ে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলি দেখার সময় মানুষের স্নায়ুগুলোতে কী খেলা চলে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সব বস্তুগত তথ্য জানার উপায় আছে মেরির ঘরে। মানবচোখ দিয়ে কোনো কিছু দেখা-সংক্রান্ত সব জ্ঞান জানা আছে তার। কিন্তু রং দেখতে বাস্তবে কেমন সে ব্যাপারটা তার অজানা। একদিন তাকে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো। দরজা খোলামাত্রই সে তাকালো এক লাল গোলাপের দিকে। জীবনে প্রথমবার লাল রং দেখার অভিজ্ঞতা হলো তার। লাল রং দেখার পরেই কিন্তু সে কেবল এর বাস্তব প্রকৃতি অনুভব করল।[১৭৮] দৃষ্টি এবং রং-সম্বন্ধে তার জানা যাবতীয় জড় তথ্যগুলো কিন্তু তাকে লাল রং দেখার নতুন এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রস্তুত করেনি। জড় তথ্যগুলো জেনে সে কখনোই জানতে পারেনি লাল গোলাপ দেখার মানে আসলে কী। কেবল যখন দেখল, তখনই বুঝতে পেরেছে কেমন সেই অভিজ্ঞতাটি।

চ্যালমার নিচের হেতুবাক্যগুলোর ব্যবহার করে দেখিয়েছেন, মেরি যুক্তিতর্ক প্রমাণ করে, বস্তুবাদ অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যার সুরাহা করতে পারে না:

- মেরি সব পদার্থবিদ্যাগত তথ্য জানে।
- মেরি সব তথ্য জানে না।
- অতএব, পদার্থবিদ্যাগত তথ্যই সব না।[১৭৯]

চ্যালমারের যুক্তিতর্ক দেখায়, জড় জগতের জ্ঞান ব্যক্তিগত সচেতন অনুভূতিবোধের সন্ধান দিতে পারে না। বস্তুবাদকে নড়বড়ে করে দেয় এটা। যুক্তিটিকে চ্যালমার একটি সাধারণ নিয়মে ফেলেছেন এভাবে:

- অনুভূতিবোধ সম্বন্ধে তথ্যগুলো পদার্থবিদ্যাগত তথ্য থেকে বের করা যায় না।
- পদার্থবিদ্যাগত তথ্য থেকে যদি অনুভূতিবোধ-সংক্রান্ত তথ্য জানা না যায়, তা হলে বস্তুবাদ মিথ্যা।
- তার মানে বস্তুবাদ মিথ্যা।[১৮০]

জড়বাদ এবং বস্তুবাদ একান্ত অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত জ্ঞানগুলো ব্যক্তিগত অনুভূতির বিষয়টা বোঝাতে পারে না। মস্তিষ্কের নানা ক্রিয়াকর্ম থেকে তার উৎপত্তিই বা হলো কেন তা-ও বলতে পারে না। বস্তুবাদ তাই

অযোগ্য এক হাতিয়ার এক্ষেত্রে। কারণ, পদার্থবিদ্যাগত তথ্য থেকে অনুভূতিবোধের তথ্যগুলো জানা অসম্ভব।

মেরি যুক্তিতর্কটি বেশ কিছু আগ্রহজাগানিয়া আপত্তির জন্ম দিয়েছে। এরকম একটা আপত্তি বলে, মেরি যদি সব পদার্থবিদ্যাগত তথ্য অর্জন করত, তা হলে কতটা কী জানত তা শনাক্ত করা সম্ভব না। এই আপত্তিটা আসলে মেরি যুক্তিটি বোঝেইনি ঠিকভাবে। এটা মনে করছে, সব পদার্থবিদ্যাগত তথ্য জানলে কেমন হতো এই যুক্তি বুঝি তা নিয়ে। অথচ, এই যুক্তিটির নজর লাল রং দেখার অভিজ্ঞতা যদি মেরির না থাকত, তা হলে লাল রং দেখতে কেমন লাগে মেরির পক্ষে সেটা জানার অক্ষমতা নিয়ে। মেরি যুক্তির আপত্তিগুলোকে তাই নজর দিতে হবে লাল রং দেখার পর মেরির অনুভূতি কী হয় সে বিষয়ে; সব পদার্থবিদ্যাগত তথ্য জানালে কী হতো সে বিষয়ে নয়।

মেরি যুক্তি নিয়ে আরেকটি আপত্তি আছে 'সামর্থ্য প্রস্তাব' নামে। এই প্রস্তাব বলে, মেরি কোনো নতুন জ্ঞান অর্জন করেনি; শুধু নতুন এক সামর্থ্য অর্জন করেছে। কেউ যখন সাইকেল চালাতে শেখে, সে সাইকেল সম্বন্ধে নতুন কিছু শেখে না। সে শুধু সাইকেলটা চালানোর সামর্থ্য অর্জন করে। এই আপত্তিটাকেও অযোগ্য বিবেচনা করা হয়।

ঘর থেকে বের হয়ে মেরি যদি নতুন সামর্থ্য অর্জন করতে পারে, তা হলে, ঘর থেকে বের হওয়ার আগে যে-জ্ঞান ছিল না, এমন কোনো জ্ঞানও তার অর্জন করতে পারার কথা। কেউ যখন সাইকেল চালাতে শেখে, সে শুধু তা চালানোর সামর্থ্যই অর্জন করে না, চালাতে গিয়ে নতুন অনেক জিনিসও সে শেখে। ঢাল বেয়ে দ্রুত নামতে থাকলে, এক পর্যায়ে সে শিখবে ব্রেইক বারেবারে চাপলে রিং অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে। নিয়ন্ত্রিতভাবে নামার জন্য আলতো করে ব্রেইক চাপতে হবে দু-সেকেন্ড পরপর।

মেরি যুক্তির বিরুদ্ধে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছোড়ে অধ্যাপক ব্রায়ান লোরের আপত্তি। তিনি বলেছেন, লাল রং সম্বন্ধে নতুন কোনো জ্ঞান অর্জন করেনি মেরি; রংটা সম্বন্ধে তার ইতোমধ্যেই জানা তথ্যটি সম্বন্ধে নতুন ধারণা পেয়েছে শুধু। এই কৌশল বলে, কোনো বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ধারণা জন্ম দেওয়ার মতো কেবল একটি বৈশিষ্ট্যই আছে। এই ধারণাগুলো জড়-ক্রিয়ামূলক এবং ইন্দ্রিয়গোচর ধারণা। সেজন্য, প্রথমবার লাল রং দেখার সময় মেরি নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, বা নতুন কোনো তথ্য শেখেনি। বরং জানা জিনিসটা সম্বন্ধেই নতুন ধারণা পেয়েছে শুধু। ঘর ছাড়ার আগে সে জড়-ক্রিয়ামূলক পরিভাষায় জানত লাল রঙের গুণ সম্বন্ধে। ঘর থেকে বের হয়ে নতুন এক উপায়ে লাল রঙের জড় গুণকে সে শনাক্ত করেছে ইন্দ্রিয়গোচরের পরিভাষায়। কেবল লাল রং দেখতে পেলেই মেরির পক্ষে ইন্দ্রিয়গোচর ধারণা লাভ করা সম্ভব। কারণ, এই ধারণাগুলো কেবল লাল রং দেখতে পেলেই পাওয়া সম্ভব।[১৮১]

জড় গুণ পর্যবেক্ষণ করে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর ধারণা লাভ করতে পারি—এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে লোর তার কৌশলটি প্রয়োগ করেছেন; আর এটাই এর আসল সমস্যা। একটা জড়-ক্রিয়ামূলক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের সময় একান্ত অনুভূতি অনুভব করতে করতে কীভাবে আমাদের মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়গোচর ধারণা লাভ করে—সেই প্রশ্নটা কিন্তু তবু থেকেই যায়। একজন অ-জড়বাদী তাই বলবেন, মেরি যুক্তিটি নিজের অবস্থানে অটল। কারণ, ওপরের প্রশ্নটির জবাব দিতে পারে এটা। বিভিন্ন কিছুর মাঝে জড় এবং ইন্দ্রিয়গোচর গুণ থাকে বলেই আমরা ইন্দ্রিয়গোচর ধারণাগুলো পাই। মোট কথা, একান্ত সচেতন অনুভূতি অনুভব করা থেকে অর্জিত জ্ঞানের ব্যাখ্যায় জড় বৈশিষ্ট্য থেকে ইন্দ্রিয়গোচর ধারণা লাভ করতে পারার দাবিটি অযোগ্য।[১৮২]

আরও বেশ কিছু কারণে লোরের কৌশলটি কোনো নিষ্পত্তিকর কিছু না। এ-সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন মাইকেল তাই-এর কনশাসনেস রিভিজিটেড: ম্যাটেরিয়ালিসম উইদাউট ফেনোমেনাল কনসেপ্টস,[১৮৩] এরহান ডেমিরকিগলু-র ফিজিকালিজম অ্যান্ড ফেনোমেনাল কনসেপ্টস[১৮৪] এবং ডেভিড চ্যালমারের নিবন্ধ: ফেনোমেনাল কনসেপ্টস অ্যান্ড দ্যা এক্সপ্লেনেটরি গ্যাপ।[১৮৫] মেরি যুক্তি নিয়ে কেতাবি আলোচনা আছে প্রচুর। এগুলোর কোনো কোনোটা জড়বাদকে সমর্থন করে, কোনো কোনোটা আবার চ্যালেঞ্জ করে। এগুলো নিয়ে আলোচনার পরিসর নেই এখানে। তবে, কেতাবি আলোচনার কোনোটাই তর্কাতীতভাবে এই অধ্যায়ের যুক্তিকে পর্যদুস্ত করে না।

'বাদ দিন তো সমস্যাটাকে': বর্জনমুখী বস্তুবাদ

বর্জনমুখী বস্তুবাদীদের ধারণা, সবকিছুকেই জড় প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তারা একান্ত সচেতন অনুভূতির অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। তাদের যুক্তি, জড় এবং রাসায়নিক ক্রিয়া চালিত নিউরন দিয়ে গঠিত মানুষের মস্তিষ্ক। আর তাই, এই জটিল প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা কোনো-না-কোনোভাবে অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যা দিতে পারবে।[১৮৬] তাদের দাবি, (জড় বিজ্ঞান বর্তমান কোনো সমাধান দিতে না পারায়) একান্ত অনুভূতিবোধকে ব্যাখ্যায় আমরা 'লোক-মনোবিজ্ঞান'-এর যে-ধারণা গ্রহণ করেছি, তা একসময় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে স্নায়ুবিজ্ঞান "পরিপক্ক" হয়ে গেলে।"[১৮৭] স্নায়ুবিজ্ঞান একান্ত অনুভূতিবোধকে যখন "বিশেষায়িত অঙ্গসংস্থান-সংক্রান্ত অঞ্চলে স্নায়বিক ক্রিয়াকর্ম" দিয়ে বদলে দেবে, তখন হবে এটা।[১৮৮] মোট কথা, বিজ্ঞান একদিন একান্ত অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যা দিতে পারবে। আর তখন সমাধা হবে জটিল সমস্যাটির।

বর্জনমুখী জড়বাদী পন্থার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিশ্লেষণী দার্শনিক প্যাট্রিসিয়া চার্চল্যান্ড বলেছেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উন্নত হওয়ার সাথে সাথে একান্ত অনুভূতিবোধের আপাত-কালীন রহস্যটির জট খুলবে। চার্চল্যান্ডের বক্তব্য,

স্নায়ুবিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্যা থেকে এই সমস্যাকে আলাদা করে দেখার দরকার নেই। তার মতে, গবেষকদের কাছে এমন অনেক অমীমাংসিত সমস্যা আছে। এর জের ধরে কেউ যদি বলেন যে সেগুলো কখনোই সুরাহা হবে না, তা হলে সে কথা অযৌক্তিক। জটিল সমস্যাটি রহস্যে মোড়া বলেই কিংবা জড়বাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ মানেই এই না যে এর বৈজ্ঞানিক সমাধান পাওয়া যাবে না কখনো। চার্চল্যান্ড তার যুক্তির সপক্ষে তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের গর্বিত ইতিহাসকে। ইতিহাস বলে বিজ্ঞান এর আগেও বহু 'জটিল সমস্যা' সমাধান করেছে। তার মানে অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যাটারও সমাধান হবে একদিন।[১৮৯]

একজন নির্দিষ্ট সচেতন সত্তার বেলায় একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি কেমন তা কিন্তু কোনো জড় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলে না আমাদের। এর মানে, বর্জনমুখী বস্তুবাদীদের কাছে একান্ত নিজস্ব অনুভূতি এক মায়া। তারা আসলে অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যাটাকে মানেনই না। কারণ, তাদের দাবি, যেকোনো কিছুর ব্যাখ্যা জড়বস্তু এবং জড় প্রক্রিয়াই সব। কিন্তু তারপরও একান্ত নিজস্ব অনুভূতি থাকার মানে কিন্তু কিছুতেই জড়বস্তু এবং জড় প্রক্রিয়া বলতে পারে না আমাদের। আর তা ছাড়া জড়বস্তু যেহেতু নিজেই অনুভূতিহীন, উদ্দেশ্যহীন এবং অচেতন, সে কখনোই একান্ত নিজস্ব অনুভূতিবোধ আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। প্রথমেই যদি কোনো বস্তুর মধ্যে কোনো জিনিস না থাকে, কিংবা সেই জিনিস বিকাশের সামর্থ্য না থাকে, তা হলে সে কিছুতেই সে জিনিসের উদ্ভব করতে পারে না। জড়বস্তু এবং জড় প্রক্রিয়ার অচেতন। তাদের মাঝে একান্ত নিজস্ব অনুভূতিবোধ নেই। কাজেই তারা এর উদ্ভব ঘটাতে পারে না।

যে-জিনিসটির ব্যাখ্যা চাই, বর্জনমুখী বস্তুবাদ উলটো সেটাকেই শুরুতে এড়িয়ে যাচ্ছে। এজন্য অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যার ব্যাখ্যায় এই মতবাদ নিতান্তই অযোগ্য। তাদের উপসংহারকে একটিমাত্র অযৌক্তিক কথায় বলে ফেলা যায়: আমাদের কোনো নিজস্ব অনুভূতি নেই। সে যাই হোক, আমাদের এই অনুভূতি একান্ত ব্যক্তিগত সত্য। একে অস্বীকার করা হাস্যকর।

ডেনিয়ল ডেনেটে-এর কনসাশনেস এক্সপ্লেনড বইটি প্রকাশের পর জনপ্রিয় হয় বর্জনমুখী বস্তুবাদের ধারা। বইটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত। এখানে ডেনেট অনুভূতিবোধের নতুন সংজ্ঞা দিয়ে এড়িয়ে গেছেন আমাদের একান্ত অনুভূতিবোধকেই। তার মতে আমাদের আসলে কোনো একান্ত অনুভূতিবোধই নেই। আমরা স্রেফ জৈবিক রোবাট। আমরা যেন যন্ত্র। এসব অনুভূতিবোধের ধারণা এক মায়া। ডেনেটের এসব মতের সমালোচনা মাল্টিপল ড্রাফটস তত্ত্ব নামে পরিচিত। অধ্যাপক আন্তি রেভোনসু

তার কনশাসনেস: দ্যা সায়েন্স অফ সাবজেক্টিভিটি বইতে তত্ত্বটির সারকথা তুলে বলেছেন:

> "ডেনেটের তত্ত্বকে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। কারণ, যে-অনুভূতিবোধকে ব্যাখ্যা করার কথা ছিল, সেটাকে তিনি নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে পুরোপুরি ভিন্ন এক অর্থ দিয়েছেন। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত বইটার নাম 'কনশাসনেস এক্সপ্লেনড' (অনুভূতিবোধ ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। তবে অনেকে মনে করেন বইটার নাম হওয়া উচিত ছিল 'কনশাসনেস এক্সপ্লেন্ড অ্যাওয়ে' (অনুভূতিবোধকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে)। বেশির ভাগ মানুষ খুঁজতে চেয়েছেন ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতিবোধ, বস্তু নিরপেক্ষ সত্তা এবং ব্যক্তিনিষ্ঠতার ব্যাখ্যা। কিন্তু ডেনেট এগুলোর সবকিছুকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।"[১৯০]

'অনুভূতিবোধ আছে, তবে তা শুধুই জড়বস্তু': খণ্ডতামূলক বস্তুবাদ

খণ্ডতামূলক বস্তুবাদ স্বীকার করে জড় প্রক্রিয়া এবং একান্ত অনুভূতির মাঝে জ্ঞানের ঘাটতি আছে। তবে এই মতবাদের দাবি, বস্তুবাদী দর্শন এই ঘাটতি দূর করতে পারবে। এই মতবাদ সমর্থকেরা একান্ত অনুভূতির কথা স্বীকার করেন। কিন্তু জড় প্রক্রিয়া থেকে তারা একে আলাদা করতে চান না। তাদের যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে, মস্তিষ্কের কিছু নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু সচেতন অনুভূতির যোগ আছে। সেজন্য তারা মনে করেন, অনুভূতিবোধকে জড় প্রক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা সম্ভব।

খণ্ডতামূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী, একান্ত অনুভূতি আর স্নায়ু-রাসায়নিক কর্মকাণ্ড একই।[১৯১] এখন পর্যন্ত সব একান্ত অনুভূতিকে প্রাকৃতিক ঘটনার রূপে আনার কোনো উপায় নেই। তবে এই মতবাদীরা মনে করেন, স্নায়ুবিজ্ঞান একসময় বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার অনুসরণ করে সুরাহা করে ফেলবে। যেমন একসময় যাকে আমরা 'তাপ' নামে জানতাম, বিজ্ঞানের পরিভাষায় তা এখন 'অণুগুলোর গড় গতিশক্তি'। ঠিক এভাবে স্নায়ুবিজ্ঞান একসময় 'ভালোবাসা'র মতো শব্দকে বদলে দেবে স্নায়ু-রাসায়নিক কোনো পরিভাষা দিয়ে। সারকথা, "আমাদের মস্তিষ্কে ঘটে চলা জটিল একঝাঁক স্নায়বিক কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয় এই অনুভূতিবোধ"।[১৯২]

একান্ত অনুভূতির ব্যাখ্যায় এই মতবাদ যথোপযুক্ত নয়। কারণ, এই মতবাদের ভিত্তি, একান্ত অনুভূতি সত্য হলেও, ভবিষ্যতে স্নায়ুবিজ্ঞানের অগ্রগতি হলে একে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু এটা অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যার কোনো সমাধান করে না। কেবল একগুচ্ছ স্নায়ুর উদ্দীপনা পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় না কোনো জীবসত্তার একান্ত অনুভূতিটা ঠিক কেমন। খণ্ডতামূলক বস্তুবাদ সচেতন অনুভূতির উৎস সম্বন্ধেও কিছু বলে না। স্নায়ু-জীববিজ্ঞান আর একান্ত অনুভূতিবোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অচেতন জড়-প্রক্রিয়া থেকে অনুভূতিবোধের উদ্ভব হয়—এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়।

বর্জনমুখী বস্তুবাদের মতো খণ্ডতামূলক বস্তুবাদও সেই জটিল প্রশ্নের কোনো সুরাহা করতে পারে না। মানুষের একান্ত অনুভূতিবোধের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে আবারও। অধ্যাপক রেভনসু লিখেছেন,

> "মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় বা স্নায়বিক সন্নিবেশে দোলায়মান সংগতিতে স্নায়বিক উদ্দীপনা, সক্রিয়তা এবং অক্রিয়তা এক জিনিস। আর ব্যথার কষ্ট, রঙের অনুভূতি, তীব্র আবেগ বা নিজস্ব চিন্তা অন্য জিনিস। কখনোই এগুলো এক হবে না। সচেতন মানবিক অনুভূতির ব্যক্তিগত দিকটি তাই প্রথমেই ফেলে দেওয়া হয়েছে।"[১৯৩]

বর্জনমুখী বস্তুবাদ এবং খণ্ডতামূলক বস্তুবাদের মাঝে পার্থক্য বেশ মিহি। বর্জনমুখী বস্তুবাদ বলে, একান্ত অনুভূতিবোধ এক মোহ। এর অস্তিত্ব নেই। এগুলো স্নায়ুর উদ্দীপনা ছাড়া আর কিছুই না। খণ্ডতামূলক বস্তুবাদ একান্ত অনুভূতির কথা স্বীকার করে বটে। তবে সেও বলে এগুলো মস্তিষ্কের জড় ক্রিয়াকর্ম শুধু। উভয় পন্থাই একান্ত অনুভূতিবোধের আপন অনুভূতির মামলায় ব্যর্থ।

'আপনি যা করেন, তা-ই এটা': আচরণবাদ

বর্জনমুখী বস্তুবাদের সঙ্গে গলা মেলানো আরেকটি মতবাদ হচ্ছে আচরণবাদ। সে বলে, আচরণগত পরিভাষায় অনুভূতিবোধকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। একজন মানুষের নির্দিষ্ট কোনো অনুভূতি তখনই থাকবে, যখন সেই ব্যক্তির কোনো আচরণ দিয়ে তা খতিয়ে দেখা যাবে (যেমন, শশীকে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করলে যদি সে 'উফ!' শব্দ করে, তা হলে বোঝা যাবে তার ব্যথা করছে)। আচরণবাদ তাই একান্ত অনুভূতিবোধকে অস্বীকার করে। আমরা আসলে কী, সেভাবে অনুভূতিবোধকে ব্যাখ্যা না করে, আমরা কীভাবে সাড়া দিই, তার আদলে ব্যাখ্যা করে। এই পন্থা অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যাকে অস্বীকার করে। কারণ, কোনো ধরনের সাড়া না দিয়ে মানুষের কোনো মানসিক অবস্থা থাকতে পারে বলে সে স্বীকার করে না। দার্শনিক ডেভিড লাং বলেছেন, সব সময় আমাদের একান্ত অনুভূতিগুলো যে আমাদের আচার-আচরণে প্রকাশ পায়—এমন কোনো কথা নেই।[১৯৪]

একটি অনুভূতিকে আচরণবাদ একটি শারীরিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে। এই পন্থার সমস্যা হচ্ছে, অনুভূতিটিই যে আচরণের জন্ম দেয়, এটাকে এড়িয়ে যায় সে। ব্যথা পেয়ে শশী 'উফ!' বলেছে। কাজেই ব্যথা আর 'উফ!' বলা এক জিনিস না।

"স্রেফ কিছু জোগান, মানসিক অবস্থা আর ফল": কার্যবাদ

কার্যবাদীদের মতে, অনুভূতিবোধ মানে যে-কাজ বা ভূমিকা এটা পালন করে। ঠিক কম্পিউটারের মতো কোনো জীবসত্তা বা ব্যবস্থায় একগুচ্ছ সম্বন্ধে থেকে এর উদ্ভব।

কার্য মানে জোগান, মানসিক অবস্থা আর ফলের সম্বন্ধ। যেমন ধরুন, আমি যদি দেখি আমার বাস আসছে (জোগান), বাস ছুটে গেলে অফিসে যেতে দেরি হতে পারে এই চিন্তায় অস্থির হই (মানসিক অবস্থা); আমি তখন দ্রুত বাসের দিকে ছুটে যাই (ফল)। কার্যবাদীরা দাবি করেন, অনুভূতিবোধ ঠিক যেন কম্পিউটার প্রোগ্রামের মতো। মস্তিষ্কের জটিল নকশা থেকে এর উৎপত্তি।[১৯৫]

কার্যবাদ বেশ কিছু আপত্তির মুখে পড়েছে।[১৯৬] অনুভূতিকে যেহেতু ক্রিয়াকলাপ দিয়ে বোঝা সম্ভব না, কার্যবাদ তাই একান্ত অনুভূতিকে নিরীক্ষণ করতে পারে না।[১৯৭] কোনো নির্দিষ্ট জীবসত্তার কোনো একটি মানসিক অবস্থার অনুভূতি কেমন, তা কেবল জোগান, মানসিক অবস্থা আর ফল জানলেই জানা যায় না। কেউ তার দিকে পাগলা কুকুরকে ধেয়ে আসতে দেখলে (জোগান), ভয় পাবে (মানসিক অবস্থা)। বাঁচার জন্য নিরাপদ আশ্রয় নেবে (ফল)। কিন্তু এগুলো জানলেই কিন্তু জানা যাচ্ছে না ভয়ের অনুভূতি কেমন। তা ছাড়া এগুলো থেকে কীভাবে এই মানসিক অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে তাও জানা যায় না। বিপজ্জনক প্রাণী দেখলে কারও মধ্যে ভয়ের যে মানসিক অবস্থা তৈরি হয়, তা যে সত্যিই কেমন, তা কেবল জোগান, মানসিক অবস্থা আর ফল থেকে বোঝার উপায় নেই আমার জন্য। বেশির ভাগ তাত্ত্বিকের মতে, কার্যবাদের বেশ জনপ্রিয়তা থাকার পরও অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যার সমাধানে এটি তেমন কার্যকর না।[১৯৮]

“এটা জটিলতার মাঝে”: উত্থানশীল বস্তুবাদ

বস্তুর আবির্ভাবের ধারণার ওপর ভিত্তি করে গঠিত এই মতবাদ। উপাদানগুলো বিন্যস্ত হয়ে যখন জটিল অস্তিত্বে রূপ নেয়, এবং জটিল কার্যকারণ-ভিত্তিক সম্বন্ধ তৈরি করে—যা থেকে নতুন রূপের সৃষ্টি হয়—তখন কোনো কিছুর আবির্ভাব হয়।[১৯৯] উত্থানশীল বস্তুবাদ দু-ধরনের: শক্তিশালী, দুর্বল।

দুর্বল ধরনটি বলে, আমরা একসময় একান্ত অনুভূতিবোধ বুঝে যাব সব জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বুঝে যাওয়ার পর। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া থেকে অনুভূতিবোধের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা যদি এই দুর্বল ধরনটি দেয়ও, একান্ত অনুভূতি অনুভব করতে কেমন, তা এটা বলতে পারে না। জটিল সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া থেকে কীভাবে অনুভূতিবোধ জাগে, এগুলো বুঝতে পারলেই কি উন্মোচন হবে এর রহস্য? যদি হয়, তা হলে যা আসলে ব্যাখ্যা করা দরকার, সেটাকেই অস্বীকার করবে এটা। একান্ত অনুভূতি যদি থাকে, তা হলে খণ্ডতামূলক বস্তুবাদের মতো উত্থানশীল বস্তুবাদও একই ঝামেলায় পড়বে। একান্ত অনুভূতি কেমন সে সম্বন্ধে না বলেও এর একটা জড় ভিত্তি থাকতে পারে বৈ কি।[২০০]

দুর্বল যুক্তির অন্য একটি ধরন বলে, একান্ত অনুভূতির সমর্থনে থাকা সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে কখনো বুঝতে পারব না আমরা। তবে তাত্ত্বিকভাবে, আমাদের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে, সেটা যদি কখনো পুরোপুরি বুঝতে পারি, তখন আমরা একান্ত অনুভূতিবোধকে বুঝতে পারব। এই ধরনের দুর্বল উত্থানশীল বস্তুবাদ আসলে কিছুই ব্যাখ্যা করে না। আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, যেসব পন্থা কোনো ব্যাখ্যাই দাঁড় করাতে পারে না, তারচে যেসব পন্থা আসলেই অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যাকে ব্যাখ্যা করে তা মেনে নেওয়া বেশি যৌক্তিক।

উত্থানশীল বস্তুবাদের শক্তিশালী ধরনটি বলে, একান্ত অনুভূতি প্রাকৃতিক ঘটনা। তবে এর বাস্তবতা বোঝার জন্য যেকোনো জড়বাদী তত্ত্বই মানুষের উপলব্ধি সামর্থ্যের বাইরে। এর মানে ক থেকে খ কীভাবে এল তা না জেনেও ক থেকে খ নামের নতুন বিষয়ের উদ্ভব হতে পারে। শক্তিশালী বস্তুবাদ বলে, জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া থেকে আমরা নতুন কিছু পেতে পারি। এই নতুন জিনিসটি কীভাবে এল, জানার সেই ঘাটতি সব সময় থেকেই যাবে। তো, উত্থানশীল বস্তুবাদ আসলে অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যার কোনো ব্যাখ্যাই দিতে পারছে না। কারণ, সে স্বীকারই করে নিচ্ছে এটি ব্যাখ্যা করা যাবে না। "এটা স্রেফ ঘটে যায়। এটা এত জটিল—কেউ জানে না।"—উত্থানশীল বস্তুবাদ যেন এভাবেই একটা ওজর দিচ্ছে আমাদের।

রেভনসু বলেছেন, শক্তিশালী উত্থানশীল বস্তুবাদ কখনোই একান্ত অনুভূতিবোধের বিষয়টা ধরতে পারবে না। আমাদের যদি সঠিক তত্ত্বটা দেওয়াও হয়, সেটা "হবে ধেরে ইঁদুরের খাঁচায় চার্লস ডারউইনের অরিজিনস অফ স্পেসিস-এর অনুলিপি রাখলে, ওটা দিয়ে সেই ধেরে ইঁদুর যা করতে পারবে সেরকম।"[২০১]

আমরা যেহেতু অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি, একে তাই রহস্যের বাতাবরণে মুড়ে রাখলে কোনো সমাধান হলো না। কোনো যুক্তিবান মানুষ এ ধরনের অসংগতিপূর্ণ ব্যাখ্যাপন্থা মেনে নিতে পারেন না।

বিজ্ঞান কি কখনো একান্ত অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যা দিতে পারবে?

ওপরে বিভিন্ন জড়বাদী পন্থাগুলোতে দেখেছি, এদের মূল যুক্তি: আমাদের বর্তমান জ্ঞানের ঘাটতিকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোনো একদিন দূর করে দেবে। এধরনের মনোভাব অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট নয়। আমার মতে এটা 'ঘাটতির বিজ্ঞান' নামক ভ্রান্তযুক্তি।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর বিজ্ঞানের দর্শন ঘাঁটলে দেখব, একান্ত অনুভূতিবোধের বিষয়টা বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। নতুন নতুন ঘটনা পর্যবেক্ষণ কিংবা বিদ্যমান পর্যবেক্ষণযোগ্য উপাত্তের ব্যাখ্যায় নতুন তাত্ত্বিক রূপ প্রদান করতে পারার কারণে

এসেছে বিজ্ঞানের এযাবৎকালীন সাফল্যগুলো। কিন্তু কোনো জীবসত্তার নির্দিষ্ট অনুভূতি বোঝার সামর্থ্য বিজ্ঞানের নেই। বিজ্ঞানের গণ্ডি পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত। কারণ, "পর্যবেক্ষণ দিয়ে সমাধানযোগ্য সমস্যার মাঝে নিজের নজর বন্দি রাখতে বাধ্য"[২০২] বিজ্ঞান। একজন তৃতীয় পক্ষীয় দৃষ্টিকোণ যেহেতু একান্ত অনুভূতি (প্রথম পক্ষীয় দৃষ্টিকোণ) পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না, তাই একান্ত অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে না।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সবকিছু জানলেও অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যার সুরাহা সম্ভব নয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম শুধু বলতে পারে কী ঘটছে না ঘটছে; সেটা কেমন তা বলতে পারে না। কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্কের সব স্নায়ু-রাসায়নিক ক্রিয়াকর্ম যদি বের করে সেগুলোর সাথে ব্যক্তির বর্ণিত একান্ত অনুভূতির সম্বন্ধ তৈরি করা হয়, বিজ্ঞান তবুও সেই ব্যক্তির অনুভূতি নির্ণয় করতে পারবে না। জড় প্রক্রিয়া থেকে কেন এটা এল তা-ও বলতে পারবে না।

আজ থেকে দশ বছর পরেও যদি অনুভূতিবোধের ব্যাপারে কোনো নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা জীববিদ্যাগত ব্যাখ্যা হাজির হয়, তবু এটা বলতে পারবে না একজন মানুষের একান্ত অনুভূতি আসলে কেমন। কেনই-বা জড় প্রক্রিয়াগুলো থেকে জন্ম নেয় এসব। মানুষের ব্যক্তিগত সচেতন অনুভূতি বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যায় বস্তুবাদী পন্থাগুলো তাই বিপর্যস্ত। স্নায়ু-শারীরবিজ্ঞানী জন সি. একেলস সুচারুভাবে এই ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত করে লিখেছেন: "আমি বিশ্বাস করি, বৈজ্ঞানিক খণ্ডতাবাদ মানব-রহস্যের চরম অবমাননা করেছে শর্তপূর্ণ বস্তুবাদের দাবি দিয়ে...।"[২০৩]

অবস্তুবাদী পন্থা

পদার্থের বাইরেও যে আরও অনেক কিছু আছে বাস্তব, তা স্বীকার করে এসব পন্থা। ইসলাম এবং সাধারণভাবে আস্তিক্যবাদের কথাও তা-ই। বস্তু এবং শক্তির বাইরেও কিছু আছে। আমরা কেবল শরীরসর্বস্ব প্রাণী নই। আমাদের অস্তিত্বের মাঝে জুড়ে আছে আধ্যাত্মিক নানা বিষয়। সে যাহোক, এসব পন্থার অনেকগুলোই স্রষ্টার অস্তিত্ব না মেনে, কিংবা পাশ কাটিয়ে অনুভূতিবোধকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। আমি এগুলোর বিশ্লেষণ করব। দেখাব অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যা আস্তিক্যবাদ কেন সবচে যুক্তিসিদ্ধ।

'তারা আলাদা। কিন্তু আমরা জানি না কীভাবে': সত্তাগত দ্বৈতবাদ

সত্তাগত দ্বৈতবাদ বলে, দু ধরনের সত্তা আছে: শারীরিক, অশারীরিক। মৌলিকভাবে এই দুই সত্তা আলাদা। কেউ কারও অধীন নয়। অনুভূতিবোধের ব্যাপারে সত্তাগত দ্বৈতবাদ বলে, অনুভূতিবোধ আর মস্তিষ্ক আলাদা। তারা একই উপাদানে তৈরি নয়। একটি শারীরিক, অপরটি অশারীরিক। কিন্তু তারপরও একসাথে কাজ করে এরা।

অনুভূতিবোধের এই ব্যাখ্যাটি বেশ সহজাত। আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অর্থবহ। যেমন কোনো নির্দিষ্ট অনুভূতিবোধে কোনো শারীরিক সাড়া দেখা যায়। আবার কোনো শারীরিক প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে নির্দিষ্ট কোনো অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আমাদের মধ্যে যদি দুঃখের ভাব জাগে, আমার কপাল কুঁচকে যায়, বা আমি কান্না করি। আবার আমি যদি আমার মাথা দেওয়ালে বা টেবিলে আঘাত করি, আমি ব্যথার অনুভূতি পাই।

সত্তাগত দ্বৈতবাদের ব্যাপরে শক্ত একটা আপত্তি আছে। এই মতবাদ বলে, যেহেতু অনুভূতিবোধ আর মস্তিষ্ক পুরোপুরি আলাদা, এরা তাই কীভাবে একসাথে কাজ করে তা জানা অসম্ভব। এই আপত্তিটি পারস্পরিক ক্রিয়া সমস্যা নামে পরিচিত। কোনো কোনো দার্শনিকের মতে, জড় মস্তিষ্ক আর অশরীরী অনুভূতিবোধ কীভাবে যোগাযোগ চালায় সে ব্যাপারে কোনো সংগতিপূর্ণ ব্যাখ্যা নেই।[২০৪] কিন্তু, এই আপত্তিটা আসলে একটি ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়া: ক থেকে কীভাবে খ এল তা যদি জানা না যায়, তা হলে খ-এর কারণ হিসেবে ক-কে বিশ্বাস করা যাবে না। কার্যকারণ-সম্বন্ধীয় এমন অনেক পারস্পরিক ক্রিয়া আছে, যেখানে আমরা একটা জিনিস আরেকটা ঘটাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে ঘটাচ্ছে তা জানি না।

আস্তিক্যবাদী মতের বিরুদ্ধে সত্তাগত দ্বৈতবাদ শক্ত প্রতিপক্ষ। কিন্তু নাস্তিক্যবাদী ভাবকাঠামোয় যদি সত্তাগত দ্বৈতবাদ মেনে নেওয়া হয়, তা হলে বুনিয়াদি কিছু প্রশ্নে ধোঁয়াশা থেকেই যায়: অশরীরী সত্তা কোথা থেকে এল? জড় মহাজগতে এটা কীভাবে আছে? আর তা ছাড়া শরীরী মস্তিষ্ক আর অশরীরী অনুভূতিবোধ কীভাবে যোগাযোগ রাখে সেসম্বন্ধে বেশি সংগতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয় আস্তিকতামূলক ব্যাখ্যা। এজন্য আস্তিকতামূলক দ্বৈতবাদ বেশি সংগতিপূর্ণ পন্থা (নিচে আল্লাহর অস্তিত্ব সেরা ব্যাখ্যা অংশটি দেখুন)।

'এটা এক শুভ দুর্ঘটনা': উপঘটনবাদ

এই তত্ত্ব মোতাবেক অনুভূতি আর জড় অবস্থা দুটো আলাদা। জড় কারণে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। উলটোটা নয়। অর্থাৎ অনুভূতি কার্যকারণভাবে খোজা। উপঘটনবাদের বিরুদ্ধে বহুল প্রচলিত আপত্তিগুলোর মধ্যে আছে, এই মতবাদ যদি সত্য হয়, গরম তাপের কারণে আমার হাতে ব্যথার যে-অনুভূতি হয়, সেটার সঙ্গে হাত সরানোর কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ কিন্তু নেই। আবার ধরুন, কোনো মাতাল যদি আপনার দিকে বোতল ছুড়ে মারে, বোতল আপনার দিকে ধেয়ে আসতে দেখে ভয়ের একটা অনুভূতি হবে বটে, কিন্তু সেজন্য মাথা চট করে নিচু করে নিজেকে রক্ষার কার্যকারণ-সম্বন্ধ তৈরি হবে না। কিছু এলোমেলো দুর্ঘটনার কারণে আপনি রক্ষণশীল পদক্ষেপ নেবেন।

মানব বাস্তবতা সম্বন্ধে আমাদের মৌলিক বোধশক্তির পরিপন্থি এটা। আমরা জানি, একান্ত অনুভূতি আমাদের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আবার শারীরিক কারণেও বিভিন্ন অনুভূতি জন্ম নেয়। উপঘটনবাদ সত্যি হলে মানুষের মনস্তত্ত্ব ধসে পড়বে। মনে করুন, বিষণ্ণতায় ভোগা কোনো রোগী এসে মনোরোগের ডাক্তারকে বললেন, বিষণ্ণতায় ভোগার কারণে দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হন তিনি। এখন ডাক্তার যদি তাকে বলেন, বিষণ্ণতার সঙ্গে দুশ্চিন্তার কোনো সম্বন্ধ নেই—কেমন দাঁড়াবে বিষয়টা?

'সবকিছুই চেতন': সর্বচেতনবাদ

সর্বচেতনবাদ অনেকটা গুণধর্মী দ্বৈতবাদের মতো। এই মতবাদ বলে, একটি উপাদানের (ভৌত উপাদান) অস্তিত্ব আছে। এর মধ্যে আছে দুটো গুণ (জড় এবং অজড় বা একান্ত অনুভূতি)। এই মতবাদ অনুযায়ী পদার্থের একান্ত অনুভূতিগুণ আছে। চেতনবোধ এই মহাজগতের একটি সহজাত গুণ। এটা কার্যকারণের ভূমিকা পালন করে। সর্বচেতনবাদ সমর্থকদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক ডেভিড চ্যালমার ও থমাস ন্যাগেল। পদার্থের প্রতিটি উপদান যেহেতু চেতন-সমৃদ্ধ, মস্তিষ্কের চেতনবোধ তাই এসব চেতনার সম্মিলিত ফল।

সর্বচেতনবাদের একটি ধরন বলে, মানুষের মতো সব পদার্থই চেতন। অন্য ধরনটা বলে, পদার্থের মধ্যে থাকা চেতনবোধ বুনিয়াদি এক অবস্থা। এর আরেক নাম আদিচেতনবোধ।

সর্বচেতনবাদও আপত্তির ঊর্ধ্বে নয়। প্রথমত, পদার্থের মাঝে যে নিজস্ব চেতনবোধ আছে সে-সম্বন্ধে প্রমাণ নেই। প্রোটন, ইলেক্ট্রন, কোয়ার্ক কিংবা পরমাণু চেতনবোধের কোনো চিহ্ন দেখায় না।[২০৫] দ্বিতীয়ত, পদার্থের মাঝে কেমন করে চেতনবোধ আছে, তার অধিবিদ্যাগত কিংবা পদার্থবিদ্যাগত যথোপযুক্ত ব্যাখ্যাও দিতে পারে না এই পন্থা। অনুভূতিগুণ কোথা থেকে এল? পদার্থে কীভাবে এই অনুভূতিগুণ আছে? সর্বচেতনবাদীরা এই উত্তর দিতে পারে না বলে তা দুর্বল করে দেয় যেকোনো অধিবিদ্যাগত বা পদার্থবিদ্যাগত ব্যাখ্যা। তৃতীয়ত, জীবন্ত প্রাণীসত্তার বাইরে কোথাও চেতনবোধের অস্তিত্ব নেই। একটি সত্তা বা 'আমি' ছাড়া ব্যথার মানে কী? কোনো চিন্তার ব্যাপারে সচেতন—এ কথার মানে কী যদি কেউ নাই-ই থাকে চিন্তা করার মতো? এসব প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অনুভূতিবোধ কেবল তখনই অর্থবহ, যখন একীভূত কোনো চেতন সত্তা একাধারে বিভিন্ন ব্যক্তিগত অবস্থা অনুভব করে। চতুর্থত, অসংখ্য চেতন পদার্থ-টুকরো থেকে কীভাবে সমন্বিত একটিমাত্র অনুভূতির জন্ম নেয়? এক একটি চেতন পদার্থ-টুকরো কীভাবে জড়ো হয়ে একটি অর্থবহ, সমন্বিত অনুভূতির জন্ম দেয়? মস্তিষ্ক গঠনকারী জড় অংশগুলোতে থাকা অসংখ্য চেতন উপদানের ফলেই যদি আমাদের চেতন অনুভূতি জন্ম নিত, তা হলে সেটা হতো অসংগতিপূর্ণ, বা কম সমন্বিত।

সচেতন অনুভূতির সমন্বিত অর্থ নিয়ে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক এডওয়ার্ড ফিসার। তিনি বলেছেন, আমাদের অনুভূতিগুলো বহুসংখ্যক চেতন উপাদানের যোগফল নয় শুধু। বইপড়ার সচেতন অনুভূতি দিয়ে নিজের যুক্তিটি দেখিয়েছেন তিনি:

> "অনুভূতিটির আছে একটি সংগতিপূর্ণ তাৎপর্য বা অর্থ। এবং কোনো অনুভূতির একটি দিকের তাৎপর্য বা অর্থ। শুধু আকার, গঠন, রং ইত্যাদি আলাদা আলাদা উপাদান সম্বন্ধে সচেতন নন আপনি, ওগুলো যে একটা বই, সে-সম্বন্ধে সচেতন আপনি। আর আপনিই সচেতন এদের ব্যাপারে। বেশুমার স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ কোনো না কোনোভাবে বইটির কোনো একটি নির্দিষ্ট দিক সম্বন্ধে 'সচেতন'—এমন নয় বিষয়টা।"[২০৬]

মানুষের নিজস্ব অনুভূতির ব্যাখ্যায় এতক্ষণ যেসব পন্থা নিয়ে আলোচনা করলাম, এগুলো নিয়ে আরও অনেক কেতাবি আলোচনা আছে। এখানে আমার উদ্দেশ্য ছিল কেবল সংক্ষেপে ওগুলো তুলে আনা, এবং আস্তিকতাবাদ যেভাবে যথোপযুক্তভাবে একান্ত অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে, এসব মতবাদ যে পারে না, সেগুলো দেখিয়ে দেওয়া।

আল্লাহর অস্তিত্ব সেরা ব্যাখ্যা

একান্ত অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যায় আস্তিকতামূলক ব্যাখ্যা সবচে যথোপযুক্ত। ইচ্ছাশক্তি এবং উদ্দেশ্য সংবলিত একজন সর্ববিধ সচেতন সত্তাকে মেনে নেওয়াটাই সবচে যুক্তিসিদ্ধ। কেন?

অনুভূতিবোধ কোথা থেকে এল?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি উপরোক্ত একটি মতবাদও। প্রাকৃতিক জড় প্রক্রিয়া থেকে যে এর উদ্ভব হতে পারে না তা জানিয়ে অধ্যাপক জে.পি. মরল্যান্ড বলছেন, "অখণ্ড অনুভূতিবোধ যে জড় জগতে আবির্ভূত হতে পারে না, এ-জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানই এর পক্ষে যথেষ্ট কারণ দেয়। অনুভূতিবোধ আবির্ভাবের ব্যাখ্যায় জড় উপাদানগুলোর বিভিন্ন স্থানিক কাঠামোয় জ্যামিতিক পুনর্বিন্যাস মোটেও যথেষ্ট নয়।"[২০৭]

পদার্থ আর অনুভূতিবোধ যদি আলাদা হয়, তা হলে পদার্থ থেকে অনুভূতিবোধের উদ্ভব না হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে, পদার্থের মাঝে যদি অনুভূতিগত গুণ থাকে, তা হলে প্রশ্ন জাগে, কীভাবে সেই গুণের আবির্ভাব হলো? সত্তা-তত্ত্ববিদ্যাগত এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা জরুরি। কারণ, পদার্থ থেকে অনুভূতিবোধ একেবারেই আলাদা। একান্ত সচেতন অনুভূতিকে থাকতে হলে আল্লাহকেই সৃষ্টি করতে হবে এটা। অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যায় একজন সর্ববিধ সচেতন সত্তাকে মেনে নেওয়া অনেক বেশি সংগতিপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আস্তিকতাবাদী ব্যাখ্যা অনেক সমৃদ্ধ। মরল্যান্ড দেখিয়েছেন, "...

আস্তিকতাবাদের সমৃদ্ধ ব্যাখ্যামূলক ভাণ্ডারের সঙ্গে তুলনা করলে... মহাজগতে অখণ্ডনীয়, আসল মানসিক গুণ/ঘটনা আবির্ভাবের ব্যাখ্যায়", অনুভূতিবোধের জড়বাদী ও বস্তুবাদী বর্ণনার কাছে "...কোনো যুক্তিসংগত উপায় নেই...।"[২০৮]

অনুভূতিবোধ কীভাবে জাগতিক দুনিয়ায় প্রবেশ করল সেটারও ব্যাখ্যা দেয় আস্তিকতাবাদ। আত্মার মতো অশরীরী সত্তা কীভাবে মানুষ এবং প্রাণীর শারীরিক দিকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, এবং এমনকী নিয়ন্ত্রণ করে, তা ভেবে অনেকেই অবাক হন। কিন্তু আস্তিকতাবাদ বেশ সহজভাবে ব্যাখ্যা করে এটা। আল্লাহর সর্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তি এবং ঐশী কর্মকাণ্ড এমন এক জগৎ নিশ্চিত করে, যেখানে অবলীলায় যোগাযোগ করতে পারে শরীরী আর অশরীরী সত্তা। চার্লস তালিয়াফেরো ব্যাখ্যা করছেন:

> "অনুভূতিবোধের আস্তিকতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে, এর আবির্ভাবের পেছনে নেই কোনো ভেলকিবাজি, কিংবা ঈশ্বরের বিচ্ছিন্ন কোনো অলৌকিক কর্ম। শরীরী এবং অশরীরী বস্তু, গুণ এবং সম্বন্ধের এক জগৎ থাকবে—ঈশ্বরের এই সর্বাঙ্গীণ ইচ্ছেশক্তির মাধ্যমে জড় মহাজগৎ থেকে উদ্ভব হয় অনুভূতিবোধের। পদার্থগুলোর মধ্যকার সম্বন্ধ, শক্তি, চেতনবোধ, মহাশূন্য-সময়ের নিয়মগুলো, নিঃসন্দেহে উদ্ভব হয়েছে এক অপ্রতিরোধ্য ঐশী কর্ম থেকে।"[২০৯]

অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যায় নাস্তিকতাবাদী এক মতবাদ অনুযায়ী এ যেন আচমকা অস্তিত্ববান হয়েছে কোনো উপযুক্ত পদার্থবিদ্যাগত ব্যাখ্যা ছাড়াই। কিন্তু আস্তিকতাবাদ এই সমস্যার মুখে পড়ে না। অনুভূতিবোধের উদ্ভবকে এখানে দেখা হয় বাস্তবতার অংশ হিসেবে। আল্লাহ্ যেহেতু চেতন সত্তা, চিরজীবী এবং সর্ববিষয়ে সচেতন, তাঁর সৃষ্টজগতের সত্তাগুলো যে নিজেদের ব্যাপারে সচেতন হবে, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? তালিয়াফেরো তাই বলছেন,

> "মৌলিকভাবে বস্তুবাদী মহাজগৎ-সৃষ্টিতত্ত্বের চোখে অনুভূতিবোদের উদ্ভবকে মনে হয় অদ্ভুত। 'এরপর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল'—এমন দাবি করার শামিল এটা। কিন্তু আস্তিকতাবাদের চোখে, অনুভূতিবোধের উদ্ভবকে দেখা যেতে পারে বাস্তবতার আসল প্রকৃতির গভীরে বোনা। প্রাণী ও মানুষের অনুভূতিবোধ কোনো বিচ্ছিন্ন অলৌকিক ঘটনা নয়; বরং বাস্তবতার মৌলিক কাঠামোর প্রতিফলন।"[২১০]

অশরীরী মানসিক অবস্থার সঙ্গে শরীরী মস্তিষ্কের যোগাযোগকে ব্যাখ্যা করে আস্তিকতাবাদ। আল্লাহ যে-বাস্তবতা সৃষ্টি করেছেন, এই যোগাযোগ রক্ষা তার অন্যতম অংশ। তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা বজায় রেখেছে এধরনের পারস্পরিক যোগাযোগ। সোজা বাংলায় বললে, মহাজগতের শুরুতে যদি শুধু পদার্থের অস্তিত্ব থাকত, তা হলে

অনুভূতিবোধ থাকত না। তবে, শুরুতে যদি একজন সচেতন সত্তা সৃষ্টি করে থাকেন মহাজগৎকে, তা হলে অশরীরী মানসিক অবস্থার সঙ্গে শরীরী মস্তিষ্কের যোগাযোগ অর্থ বহন করে।

আমাদের একান্ত অনুভূতি থাকার সামর্থ্য, আমার আমি হওয়ার মানে কী, স্বাদ, শব্দ কিংবা কোনো কিছুর আদল বোঝার অনুভূতির ব্যাখ্যা দেয় আস্তিকতাবাদ। এক চিরজীবী, জীবন্ত সর্ববিধ সচেতন সত্তা যেহেতু সৃজন করেছেন এই মহাজগৎ, তাই আমাদের নিজস্ব অনুভূতি সম্বন্ধে সজাগ থাকার গুণ পাওয়াটা যুক্তিযুক্ত:

> "আল্লাহ—তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবী।"[২১১]
>
> "তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।"[২১২]

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যাগুলোর চেয়ে অনুভূতিবোধ উদ্ভবের ব্যাখ্যায় আস্তিকতাবাদী ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা-ক্ষমতা অনেক বেশি। তবে, এখানে একটা কথা জোর দিয়ে বলতে চাই। স্নায়বিক-সম্বন্ধের রহস্য খুলতে জীব-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছি না আমি। আস্তিকতামূলক প্রতিবেশেও প্রবল ও কার্যকরভাবে স্নায়ু-বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো সম্ভব। অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যা সমাধানে নাস্তিকতাবাদী ব্যাখ্যাগুলো যেহেতু ব্যর্থ, একে পুরোপুরি সমাধার জন্য আমি তাই আস্তিকতাবাদী ব্যাখ্যাকে দার্শনিক ভিত্তিকে হিসেবে যোগ করার পক্ষে। সেদিক থেকে বলতে গেলে, আমার পদ্ধতি দ্বৈতবাদের একটা ধরন। একে বলা যায় আস্তিকতামূলক-দ্বৈতবাদ। এখানে স্নায়ুবিজ্ঞানকে ছোট করে দেখা হচ্ছে না। এই বিষয়ে যাবতীয় গবেষণা-প্রকল্প নিঃসন্দেহে চলবে চমৎকার সব তথ্য আর সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য। তবে, অনুভূতিবোধের ব্যাপারে সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যাদানকারী আস্তিকতামূলক-দ্বৈতবাদ একটি অধিবিদ্যাগত প্রস্তাব। অধ্যাপক তালিয়াফেরোও অনুরূপ অবস্থানের পক্ষপাতী:

> "মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের মনো-শারীরিক যোগাযোগ গবেষণা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ দেখি না। অনুভূতিবোধের সাথে মস্তিষ্কের অবস্থা অধিবিদ্যাগতভাবে শনাক্ত করতে না পারার ব্যর্থতাকে এক মুহূর্তের জন্যও পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কিত গবেষণায় বাধা দেয় না। তা ছাড়া কেউ দ্বৈতবাদী হতে পারেন, এবং অনুভূতিবোধ ও মস্তিষ্কের অবস্থা, ব্যক্তি ও শরীরকে কার্যকরী একক হিসেবে গণ্য করতে পারেন, কেবল এক ধরনের জিনিস অধিবিদ্যাগতভাবে সক্রিয়, এটা বিশ্বাস না করে। মন-দেহ (বা, আমি একে সমন্বিত বলতে পছন্দ করি) দ্বৈতবাদ অধিবিদ্যার এক প্রস্তাব... সমন্বিত দ্বৈতবাদ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক দাবির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রকল্প নয়।[২১৩]

একান্ত অনুভূতির উদ্ভব এবং অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর অস্তিত্ব অনিবার্য। তা ছাড়া অনুভূতিবোধের জটিল সমস্যা এবং একান্ত অনুভূতির অস্তিত্ব ও অনুভবের সামর্থ্য

স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় একজন সর্ববিধ অবহিত সত্তাকে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই মহাজগৎ।

আত্মা সম্বন্ধে জানার গণ্ডি

মুসলিম পাঠকেরা এই ক্ষণে জিজ্ঞেস করতে পারেন, এই যুক্তিতর্কটি মান ইসলামি ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না। হামেশা যে-আপত্তি পাওয়া যায় তা হচ্ছে: কুরআন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে রূহ (মানে আত্মা, প্রাণশক্তি, অনুভূতিবোধ বা শরীরকে যা জীবন্ত রাখে, সেটা) আল্লাহর বিষয় বা আদেশ। এ সম্বন্ধে মানুষকে খুব বেশি জ্ঞান দেওয়া হয়নি। এজন্য আমাদের এ বিষয়ে নীরব থাকা দরকার।

> "তারা তোমাকে আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলো, 'এটা আমার প্রভুর আদেশ। তোমাদেরকে এ বিষয়ে সামান্য কিছু জ্ঞান দেওয়া হয়েছে'।"[২১৪]

আপাত তাত্ত্বিক এই বিরোধ নিরসনে আমাদের বুঝতে হবে, এই আয়াত অনুভূতিবোধ বা আত্মার বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলছে, এর অস্তিত্ব নিয়ে নয়। এই আয়াত বলছে এক অপার্থিব উপাদান, বা আত্মা বা চেতনবোধ শরীরকে জীবন্ত রাখে। এই অধ্যায়ে আমরা এই যুক্তিই তুলে ধরেছি: অনুভূতিবোধের অস্তিত্বকে কেবল এক অবস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ইসলামি উৎস-পাঠগুলোতে এরই মধ্যে যা বলা আছে, তার বাইরে কিছু বলছে না এই অধ্যায়। যেমন, কুরআন বলেছে আমাদের এই জাগতিক দুনিয়া থেকে রূহ আলাদা। এটা শরীরকে জীবন্ত রাখে। এটা এক একীভূত 'আমি'। আল্লাহ একে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এখানের কিছুই প্রচলিত সঠিক ইসলামি মূলনীতি-বিরোধী কিছু বলছে না।

মোট কথা, আমার মতে, আল্লাহ যে আমাদের নিজেদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে বলেছেন, সেকথা খেয়াল রাখা দরকার। তা হলে আমরা বুঝব, যদি আল্লাহ না থাকেন, আমাদের মাঝে কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতিবোধ থাকত না। অন্যভাবে বললে, আল্লাহকে অস্বীকার করা মানে নিজেকেই অস্বীকার করা!

> "তারা কি নিজেদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে না?"[২১৫]

অধ্যায় ৮

পরিকল্পিত মহাজগৎ

মনে করুন, এক সকালে ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে ঢুকলেন নাস্তা তৈরি করতে। রান্নাঘরে ঢুকতেই আপনার চক্ষু ছানাবড়া! ঘরের টেবিলে দুটো সেঁকা পাউরুটির ওপর আপনার পছন্দের চকলেট ছড়ানো। শুধু তাই না! চকলেটগুলো দিয়ে সুন্দর করে লেখা হয়েছে 'আমি তোমায় ভালোবাসি'। আপনার চোখমুখ নিশ্চয় বিস্ময়ে-আনন্দে ফেটে পড়তে চাইবে!

আচ্ছা একবারের জন্যও কি আপনার মনে হবে, চকলেটগুলো দৈবাৎ এমনি এমনি এভাবে সেজেছে? নাকি আপনি ভাববেন, আপনার সঙ্গী কিছুটা আগে ঘুম থেকে উঠে এসব করেছে? পৃথিবীর একজন বুদ্ধিমান মানুষও বলবে না যে কোনো উদ্দেশ্য বা কারণ ছাড়া এমনি এমনি হয়ে গেছে এটা। কোনো উদ্দেশ্যহীন দৈবঘটনাকে কেউ দাঁড় করাবে না এমন তাজ্জব ঘটনার ব্যাখ্যা হিসেবে।

এই মহাজগতের বিষয়টিও আলাদা নয়। এর সৃষ্টিশৈলী সুবিন্যস্ত, নিখুঁত। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় এটি কোনো এক মহাপরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনা। প্রাণের অস্তিত্বের জন্য এতে আছে একদম নিপুণ সব প্রাকৃতিক নিয়ম। মানব জীবন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এক নির্দিষ্ট নিয়মে তা সাজানো। এই নিয়মগুলো যদি অন্যরকম হতো, কিংবা তারা, গ্রহ এবং অন্যান্য বিভিন্ন আকারের জড় বস্তুগুলোর মাঝে জীবনের উন্মেষ উপযোগী বিন্যাস না থাকত, তা হলে আজ এই বই আর পড়া হতো না আপনার। বই কী পড়বেন, মানুষেরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন।[২১৬] মনে করুন, অ্যামেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার এক নভোচর আপনি। সময়টা ২০৭০ সাল। আমাদের মিল্কি ওয়ে ছায়াপথের বাইরে অন্য এক ছায়াপথে এই প্রথম কেউ যাবেন পৃথিবীর মতো এক গ্রহে। আপনার কাজ প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজা। তো একসময় আপনি সেই গ্রহে নামলেন। নভোযান থেকে বের হয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল শুধু পাথুরে আবহ। লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনি একসময় বিশাল গ্রিনহাউজের মতো কিছু একটা খুঁজে পেলেন। কাছে যেতে দেখলেন মানুষের মতো কিছু প্রাণী ওখানে হাঁটছে, খাচ্ছে, খেলছে, কাজ করছে।

ওটার ভেতর আরও দেখলেন সবুজ গাছপালা, সবজি। ওদের এক প্রতিনিধি এসে আপনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে ভেতরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানালেন আপনাকে। এ কথা ও কথায় আপনার নতুন 'এলিয়েন' বন্ধু জানালেন, এই কাঠামোর মধ্যে সঠিক পরিমাণ অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে। খাবার-দাবার এবং জীবনের জন্য অপরিহার্য গাছপালার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি এবং রাসায়নিক উপাদানের ব্যবস্থাও আছে এখানে। শুনে তাক লেগে গেল আপনার। জিজ্ঞেস করলেন, জীবন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কীভাবে এমন পূর্ণাঙ্গ কার্যকর এক পরিবেশ ব্যবস্থা তৈরি করলেন তারা। ওদের একজন প্রতিনিধি বললেন, "দৈবক্রমে ঘটে গেছে।"

এমন উদ্ভট কথার মাজেজা ধরার চেষ্টা করলেন আপনি। কোনোভাবেই এটা কোনো দৈব ঘটনা হতে পারে না। অবশ্যই এটা কোনো বুদ্ধিমান সত্তার কাজ হবে।

এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই আরেক প্রতিনিধি জানালেন, "উনি একটু মজা করছিলেন।" সবার মাঝে হাসির রোল পড়ে গেল তার কথা শুনে।

পাথুরে গ্রহে ছোট্ট এক পরিবেশ-ব্যবস্থা দেখে যদি আমাদের মনে হয়, এটা অবশ্যই পরিকল্পিত, তা হলে এই বিশাল মহাজগতের বেলায় কী সিদ্ধান্তে আসা উচিত আমাদের?

এই মহাজগৎ এবং এর মাঝে সবকিছু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এতে আছে কোটি কোটি তারা আর ছায়াপথ। অগণিত সেসব ছায়াপথে আরও কত অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র। তারই মাঝে অতি ক্ষুদ্র এক গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী। এখানেও আছে কোটি কোটি প্রাণ। জ্যোতির্মণ্ডলীয় বিভিন্ন বস্তু আর প্রাকৃতিক নিয়মের সতর্ক সুবিন্যাসের কারণে যদি এসব প্রাণের আবির্ভাব ঘটে, তা হলে এগুলোর ব্যাপারে কী সিদ্ধান্তে আসা চাই আমাদের?

কোনোভাবেই এগুলো দৈবক্রমে ঘটেনি।

পরিকল্পিত মহাজগৎ সম্বন্ধে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

এই যুক্তিটির ইসলামিক ভিত্তি আছে। জ্যোতির্মণ্ডলীয় বিভিন্ন বস্তু, রাত ও দিনের আবর্তন, গাছপালা, পশুপাখি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ আছে কুরআনে। অত্যন্ত সুনিপুণভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এগুলো: "সূর্য আর চাঁদ নিখুঁত হিসেবে পরিভ্রমণ করে। তৃণলতা আর গাছপালা তাঁর পরিকল্পনার বশবর্তী। আকাশকে তিনি ওপরে তুলেছেন। এরপর স্থাপন করেছেন মীযান।"[২১৭]

আরবি মীযান শব্দটির একাধিক অর্থ আছে। এর মানে পাল্লাও হয়, ঐশী নিপুণতাও হয়। এই শব্দ থেকে বোঝা যায় এই মহাজগৎ নিপুণ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং

সংগতিপূর্ণভাবে সৃষ্টি হয়েছে। মহাজাগতিক এই নিপুণতা, শৃঙ্খলা এবং সংগতির কথা বলা আছে কুরআনের আরও বেশ কিছু জায়গায়:

> "মহাকাশমালা আর পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনে অবশ্যই নিদর্শন আছে সমঝদার মানুষদের জন্য।"[২১৮]

> "তাঁর আদেশবলে রাত-দিন, সূর্য, চাঁদ আর তারকারাজি—সবকিছুকে তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে। বিচক্ষণ মানুষদের জন্য অবশ্যই ইশারা আছে এখানে।"[২১৯]

একজন পরিকল্পনাকারী বা সৃষ্টিকারীর প্রয়োজন তুলে ধরতে ইসলামি জ্ঞানভান্ডার উল্লেখ করেছে মহাজগতের পরিকল্পিত নকশার কথা। উন্মুক্ত বিতর্কেও প্রাজ্ঞ মনীষীরা ব্যবহার করেছেন একে। গাজালি লিখেছেন, "এই আসমান-জমিনের সব বিস্ময়, গাছপালা আর পশুপাখির আদলের চমৎকারিত্ব নিয়ে কোনো কূপমণ্ডুকও যদি ভাবনাচিন্তা করে, নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা সাজানো বিস্ময়কর এই জগতের পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য যে একজন স্রষ্টা আছেই আছে—তা নিয়ে সে কোনোভাবেই অন্ধ থাকতে পারে না।"[২২০]

ইসলামের অন্যতম মনীষী ইমাম আবু হানীফা একবার এক নাস্তিকের সঙ্গে যুক্তিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। মহাজগতের সুনিপুণ পরিকল্পনা-যুক্তির একটি ধরন সফলভাবে ব্যবহার করেছিলেন তিনি:

> "'আলোচনা শুরুর আগে আমাকে একটা বিষয় বলুন তো। ধরুন, ফোরাত নদী করে একটা নৌকা উপকূলে গেল। তারপর মালামাল আর খাবার বোঝাই করে ফিরে এল। নোঙর ফেলে এরপর সব খালাস করল। সবচে মজার ব্যাপার কী—এগুলো সবই হলো একা একা। কেউ এই নৌকা বায়নি। কেউ এসব মালামাল আর খাবার বোঝাই করেনি। মাল-খালাসও নিয়ন্ত্রণ করেনি। বলুন তো কীভাবে সম্ভব এটা?'

> "তারা বলল, 'অসম্ভব। কিছুতেই এটা হতে পারে না।'

> "তিনি বললেন, 'নৌকার বেলায় যদি এটা সম্ভব না হয়, তা হলে এই বিপুলা জগৎ কীভাবে একা একা ঘুরছে?'"[২২১]

কুরআনের এসব আয়াত এবং প্রাজ্ঞ মনীষীদের আলোচনায় পাওয়া যায় গত দশকের পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারের প্রতিধ্বনি। এসব আবিষ্কারে দেখা যায়, প্রাণের টিকে থাকার জন্য মহাজগতের প্রাকৃতিক নিয়মগুলো সুনিপুণভাবে নির্ধারিত। মানুষের অস্তিত্বের জন্য এখানে আছে নির্দিষ্ট এক শৃঙ্খলা। অনেক পদার্থবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক এবং দার্শনিকেরা এই নিপুণতাকে বলেছেন, 'চুলচেরা হিসেব' (Fine-tuning)।

চুলচেরা হিসেব

মহাজগতের চুলচেরা সঠিক হিসেবের বেশ কিছু দিক আছে। প্রথমত, মহাজগতের নিয়মগুলো যদি না থাকত, তা হলে প্রাণ, বিশেষ করে জটিল অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। দ্বিতীয়ত, এই মহাজগতে এক অসাধারণ শৃঙ্খলা দেখা যায়। জ্যোতির্মণ্ডলীয় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুগুলো এমনভাবেই সাজানো হয়েছে, যাতে প্রাণ ধারণ করা যায় এখানে। জটিল, চেতন প্রাণের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই যে মহাজগতের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার পক্ষে শক্ত দাবি পেশ করে চুলচেরা সঠিক হিসেবের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য।

প্রাকৃতিক নিয়ম

প্রাণের অস্তিত্বের জন্য অবশ্যই কিছু নিয়ম থাকতে হবে। এই নিয়মগুলো যদি সামান্য পরিমাণেও উনিশ-বিশ হয়, পরিণাম হবে নিষ্ঠুর প্রাণহীন এক মহাবিশ্ব।

অভিকর্ষজ তরণ

দুটো পদার্থের মাঝে যে-আকর্ষণ বল কাজ করে সেটা অভিকর্ষজ তরণ। এটা ছাড়া বস্তুগুলোকে এক করার মতো কোনো শক্তি খুঁজে পাওয়া যেত না। তার মানে কোনো তারকা (কিংবা গ্রহ)-এর অস্তিত্ব থাকত না। আর তারকা ছাড়া প্রাণের অস্তিত্বের জন্য স্থায়ী কোনো শক্তির উৎস থাকত না।[২২২] মহাজগৎ হতো অন্ধকার, শূন্য।

তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি

মহাজগতের সবকিছুর মাঝে অনন্য এই শক্তিটির প্রভাব আছে। এই শক্তির বলেই পদার্থগুলো পায় শক্তি, আদল এবং কাঠিন্য। এটা ছাড়া পরমাণুর অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। কারণ, ইলেক্ট্রনগুলোকে তখন কেউ তাদের অক্ষে ধরে রাখতে পারত না। আর পরমাণু না থাকলে কোনো জীবনও থাকা সম্ভব হতো না। পদার্থের চার্জ বা আধানকে আকৃষ্ট করে রাসায়নিক বিক্রিয়াও ঘটায় এই শক্তি। প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না এই শক্তিটির উপস্থিতি ছাড়া।[২২৩]

তড়িৎ-চুম্বকীয় বলয়ের একটি মজার দিক হলো, এর শক্তির দিক একটি হলেও, বহু প্রয়োজন পূরণ করে এটা। 'ইনফিনাইট মাইন্ডস: আ ফিলোসোফিকাল কসমলজি' বইতে অধ্যাপক জন লেসলি লিখেছেন,

> "তড়িৎ-চুম্বকীয় বলয়ের শক্তির দিক একটি। কিন্তু বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সচল করে এটা। কোটি কোটি বছর ধরে দৃঢ়ভাবে জ্বালিয়ে রাখে তারাগুলোকে। তারার মাঝে ঘটায় কার্বন সংশ্লেষণ। লেপ্টন যেন কোয়ার্ককে বদলে না দেয়, সেটা নিশ্চিত করে। তা না হলে পরমাণু গঠিত হতে পারত না। প্রোটন যেন

খুব দ্রুত নিঃশেষ না হয়, বা একে অপরকে তাড়িয়ে না দেয়, তা নিশ্চিত করে এটা। এগুলো প্রতিটি প্রক্রিয়ার জন্য তো ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু এই একটা শক্তিই কীভাবে একাধিক প্রক্রিয়াকে সচল রাখে?"[২২৪]

লেসলির প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক উত্তর হতে পারে: এসব প্রয়োজন পূরণের জন্য নিপুণভাবে সমন্বয় করা হয়েছে এই শক্তিকে।

শক্তিশালী নিউক্লিয়ার শক্তি

নিউক্লিয়ারগুলো গঠিত ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তি সংবলিত প্রোটন দিয়ে। একারণে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে স্রেফ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কথা এগুলোর। কিন্তু শক্তিশালী নিউক্লিয়ার শক্তির কারণে তা হয় না। যদি এটা অন্যরকম হতো, "মহাজগতে সম্ভবত দানবীয় কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হতো।"[২২৫]

দুর্বল নিউক্লিয়ার শক্তি: অভিকর্ষজ তরণের চেয়ে দুর্বল নিউক্লিয়ার শক্তি বেশি শক্তিশালী। কিন্তু খুব কম দূরত্ব জুড়েই এর কার্যকারিতা। তারাগুলোর জ্বালানি এবং এর উপাদানগুলোর গঠনে ভূমিকা রাখে এটা। তেজস্ক্রিয় রূপান্তরের পেছনেও কাজ করে এই শক্তি। পরমাণু-সংযোজনে (Nuclear Fusion) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কারণেই অবিরাম জ্বলছে সূর্য। শক্তিটা যদি সামান্য কমবেশি হতো, তারার গঠন আর সম্ভব হতো না।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর এই যে এত চুলচেরা হিসেব উদাহরণ—তা থেকে একজন মানুষের মনে এই প্রশ্নগুলো জাগা খুবই স্বাভাবিক: প্রাকৃতিক এসব নিয়ম কোথা থেকে এল? এ ধরনের নিয়ম না হয়ে অন্য ধরনের নিয়ম হলো না কেন? অচেতন, যুক্তিহীন, উদ্দেশ্যহীন এবং এলোমেলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকে কীভাবে প্রাণের অস্তিত্বের উপযোগী করে এসব নিয়ম বানাল?

কোনো 'শ্রেষ্ঠ' গণিতবিদ বা মহাজাগতিক সত্তাই যে এসব নিয়মের প্রণেতা, একজন বিচক্ষণ মানুষের অবশ্যই তা মেনে নেওয়ার কথা।

মহাজাগতিক শৃঙ্খলা

মহাজগৎ জুড়ে শৃঙ্খলার যে-প্রদর্শনী, জ্যোতির্মণ্ডলীয় সংগতি, তা শুধু সাধারণ মানুষকে নয়, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতো প্রতিভাধরকেও করেছে অভিভূত। একবার তিনি বলেছিলেন:

> "আমি নাস্তিক নই। নিজেকে আমি সর্বেশ্বরবাদীও মনে করি না। বিশাল-বইঘরে-ঢোকা ছোট্ট এক শিশুর অবস্থানে আছি আমরা। সেখানে বহুভাষার অসংখ্য বইয়ের সংগ্রহ। শিশুটি জানে, কেউ না কেউ অবশ্যই লিখেছে এসব বই। কিন্তু সে জানে না কে সেই লেখক। যেসব ভাষায় লেখা হয়েছে বইগুলো,

> তা-ও সে বোঝে না। বইগুলো যেভাবে সাজানো, এর মাঝে এক রহস্যময় শৃঙ্খলা আছে বলে ক্ষীণ এক সন্দেহ তার মাঝে। কিন্তু সেটা যে আসলে কী তা সে ধরতে পারছে না। ঈশ্বরের প্রতি সবচে বুদ্ধিমান মানুষের মনোভাবও এমন বলে আমি মনে করি। আমরা দেখি এই মহাজগৎ বিস্ময়করভাবে সাজানো। নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের অধীনে চলছে। কিন্তু এসব নিয়মের খুব সামান্যই বুঝতে পারি আমরা। রহস্যে-মোড়া যে-শক্তি নক্ষত্রপুঞ্জকে চালায়, আমাদের সীমিত বোধশক্তি সেগুলো ধরতে পারে না।"[২২৬]

রিচার্ড ডকিন্সের মতো অকপট নাস্তিকও জগতের শৃঙ্খলা নিয়ে অভিভূত। পরিকল্পনা তত্ত্বকে বাতিল করে দিয়ে নিজের মতো এক প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা অবশ্য তিনি দাঁড় করিয়েছেন এজন্য। তবে আইনস্টাইনের মতো তিনিও অভিভূত না হয়ে পারেননি:

> "আজ যখন এই কথাগুলো লিখছি, আমি মনে করি, বেঁচে থাকতে পেরে আমি ভাগ্যবান; আপনিও। যে-গ্রহে আমরা বাস করি, আমাদের ধরনের জীবনের জন্য তা একেবারে নিখুঁত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। উজ্জ্বল আলোয় রোদ পোহাচ্ছে। পরিমিত পরিমাণে পানির ব্যবস্থা আছে। মৃদুছন্দে ঘুরছে। সবুজ আর সোনালি-ফসলের-উৎসবে-রাঙা এক গ্রহ... দৈবচয়নের ভিত্তিতে এমন উপযোগী সব বৈশিষ্ট্যে ভরা একটি গ্রহ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?"[২২৭]

এই মহাজগৎ অবশ্যই "বিস্ময়করভাবে সুবিন্যস্ত"। খুঁটিনাটি সব বিষয়ও এখানে সুশৃঙ্খল। এই শৃঙ্খলার ক্ষানিক উনিশ-বিশ হলেই আর প্রাণের বিকাশ সম্ভব হতো না এখানে। পাঠকের ভাবনার খোরাক দিতে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি:

আমাদের গ্রহের অবস্থান

আমাদের গ্রহে প্রাণের বিকাশের অন্যতম কারণ সূর্য থেকে এর একেবারে নিখুঁত দূরত্ব। বাসযোগ্য অঞ্চল নামে পরিচিত জায়গায় পৃথিবীর অবস্থান। এই অঞ্চল হচ্ছে "এমন এক জায়গা, যেখানে কেন্দ্রীয় তারা থেকে আসা তাপ গ্রহের উপরিতলে এমন এক তাপমাত্রা দেয়, যাতে সাগরের পানি জমে বরফ হয় না, আবার উত্তপ্ত হয়ে ফোটেও না।"[২২৮] আমাদের গ্রহটি বর্তমান অবস্থা থেকে যদি সূর্যের সামান্য কাছে থাকত, তা হলে অধিক উত্তপ্ত হতো; আবার সামান্য দূরে থাকলে তা হতো খুব ঠান্ডা। ফলে মানব-জীবনের মতো জটিল প্রাণের বিকাশ হতো অসম্ভব।

বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যাকর্ষণ বল

আমাদের সৌরজগতে দানবাকারের গ্যাসীয় গ্রহ বৃহস্পতি না থাকলে জীবন ধারণের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ত। ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানী পিটার ওয়ার্ড বলেন, "বৃহস্পতি ছাড়া পৃথিবীতে আজ প্রাণের অস্তিত্ব না থাকার যথেষ্ট শঙ্কা ছিল।"[২২৯] বৃহস্পতি গ্রহ

মহাজাগতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা ধূমকেতু আর গ্রহাণুকে প্রবল মধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে সে টেনে নেয় নিজের দিকে। এমন বন্ধুবৎসল দানবকার গ্যাসীয় গ্রহ না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের উন্নত বিকাশ হয়তো সম্ভব হতো না।

নাসা স্যাগান গবেষণাকর্মী রেবেকা মার্টিন বৃহস্পতির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে বলেছেন, "নিকটস্থ পাথুরে গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা জাগাতে সঠিক জায়গায় সঠিক আকারের দানবাকৃতির গ্রহ থাকা জরুরি। এখান থেকে উৎপন্ন হয় গ্রহাণু বেড়ি। আমাদের গবেষণায় দেখেছি, এখন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা গ্রহজগৎগুলোর মধ্যে অল্পকিছুতেই এমন গ্রহ আছে... আমাদের গবেষণা বলছে, আমাদের সৌরজগৎ সম্ভবত বিশিষ্ট ধরনের।"[২৩০]

বৃহস্পতি গ্রহ না থাকলে, গ্রহাণু আর ধূমকেতুগুলোর মাঝে লাগাতার সংঘর্ষে পৃথিবীতে জীবন ধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত।

জোয়ারভাটা

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের আকার তুলনামূলক বড়। পৃথিবীতে ঘটা জোয়ারভাটার কারণ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। চাঁদ এখন যেখানে আছে, আদিতে চাঁদের গঠনের পর এটা তারচে কাছে ছিল; তবে বেশিদিনের জন্য নয়। কৌণিক ভরবেগের কারণে চাঁদ যদি না সরত, আমাদের গ্রহে এর পরিণতি হতো মারাত্মক। পৃথিবীর উপরিতল গরম হয়ে যেত। চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতো প্রাণের বিকাশ। অধ্যাপক ওয়ার্ড বলেছেন, চাঁদ বর্তমান অবস্থার চেয়ে কাছে থাকলে পৃথিবীর ভূত্বক নরম হতো। তখন ঘর্ষণজনিত তাপ উৎপন্ন হতো। আর তাতে সম্ভবত গলে যেত উপরিতল: "নিকটস্থ চাঁদ থেকে মহাসাগরীয় জোয়ারভাটা (এবং ভূত্বকীয় প্রসারণ-সংকোচন) হতো বিশাল। ভূত্বকের নমনীয়তা, সাথে ঘর্ষণজনিত তাপের কারণে পাথুরে উপরিতল সম্ভবত গলে যেত।"[২৩১]

পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের ঢলকে স্থিতিশীল করা

পৃথিবীর অক্ষকে স্থিতিশীল করার পেছনেও আছে চাঁদের অবদান। অধ্যাপক ওয়ার্ড বলছেন, "লাখো-কোটি বছর ধরে গ্রহের নড়াচড়ার ফলে ঢলের দিকের পরিবর্তন হয়। অনেকটা ঘূর্ণনরত বস্তুর ধীর ও ধারাবাহিক ঘূর্ণন-অক্ষ সরে যাওয়ার মতো। তবে কক্ষপথ তলের তুলনায় ঢলের কোণ প্রায় স্থির থাকে।"[২৩২]

লাখো-কোটি বছর ধরে পৃথিবীর এই কোণ একই আছে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে। চাঁদের আকার যদি ছোট হতো, সূর্য ও বৃহস্পতির সাপেক্ষে এর অবস্থান হতো অন্য জায়গায়। তখন "পৃথিবীর তাপমাত্রার দীর্ঘমেয়াদি স্থিতি" সম্ভব হতো না।[২৩৩] পৃথিবীর চাঁদ যদি না থাকত, তা হলে এখানকার জলবায়ু হতো পরিবর্তনশীল এবং

বৈরী। শুধু ছোট ছোট প্রাণসত্তার আবির্ভাব হতো তা হলে। জটিল জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না।

এসবকিছু বিবেচনা করলে প্রাকৃতিক নিয়ম আর আমাদের সৌরজগতের সুশৃঙ্খল প্রদর্শনের সেরা ব্যাখ্যা কী হতে পারে তা হলে? অল্প কিছু সম্ভাবনাই বাকি থাকে: দৈবঘটনা, প্রাকৃতিক অনিবার্যতা, বহু মহাজগৎ অথবা পরিকল্পনা।

দৈবঘটনা

দৈবভাবে মহাজগতের চুলচেরা হিসেব একেবারে অনুপুঙ্খ হওয়ার মানে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং আমাদের সৌরজগতের লীলা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই হয়ে গেছে। আকস্মিক, এলোমেলো এবং বিশৃঙ্খল কারণের ফল এগুলো। কিন্তু এই ধরনের কথাবার্তা পাগলের প্রলাপের মতো। ব্রুস লির ছবিটি খেয়াল করুন।[২৩৪]

যদি বলি, দৈবক্রমে হয়ে যাওয়া ঘটনার ফল এটা—চিত্রপটে কিছু কালি পড়ে এমন একটি ছবি তৈরি হয়ে গেছে—আমি নিশ্চিত, শোনার সাথে সাথেই এমন আষাঢ়ে ধারণাকে বাতিল করে দেবেন আপনি। কারণ, আপনার অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক জ্ঞান বলে এটা অসম্ভব। যদি বলি স্ট্যাচু অফ লিবার্টিও কোনো উদ্দেশ্যহীন দৈবঘটনার ফসল, আমাকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবার কথা না আপনার।

দৈবঘটনার তত্ত্বপ্রকল্পটি শুধু অযৌক্তিকই না, সুস্থ আলোচনার পথেও বাধা। কারণ, দৈবঘটনার অজুহাত তুলে তখন তা হলে যে কেউ যেকোনো দাবি করতে পারবে। যেমন ধরুন, আমি আমার নাস্তিক বন্ধুকে বলতে পারি, আমি যে-নারীকে মা বলি, তিনি আমার মা নন। আমার মা হলেন প্লুটোতে জন্মানো এক বিশাল গোলাপি হাতি। এক বিশাল পালকে করে তিনি এখানে উড়ে এসেছেন। আমার নাস্তিক বন্ধু নিঃসন্দেহে আমাকে উন্মাদ বলবেন। কিন্তু আমি জবাবে বলতে পারব, "দৈবক্রমে হতেই পারে।" এভাবেই দৈবঘটনার তত্ত্বপ্রকল্প কবুল করলে সব ধরনের দাবিই সম্ভব। আমাদের জ্ঞানগর্ভ এবং দৈনন্দিন আলোচনায় তখন ব্রাত্য হয়ে পড়বে যুক্তির ভূমিকা। দৈবক্রমের দোহাই দিয়ে আমি বলতেই পারি ইসলাম সত্য। আমি আমার জ্ঞানতাত্ত্বিক অধিকার-সীমার ভেতরে থেকেই এমন দাবি করতে পারি। কারণ, দৈবঘটনা তত্ত্বপ্রকল্প কবুল করা মাত্রই, যে-কারও জন্য যেকোনো কিছু দাবি করার দরজা খুলে যায়।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর চুলচেরা হিসেবের বৈধ ব্যাখ্যায় কোনো নাস্তিক যদি দৈবঘটনা তত্ত্বপ্রকল্প গ্রহণ করেন, তাকে তা হলে বুদ্ধিবৃত্তিক ভণ্ডামির দায়ে অভিযুক্ত করতে হবে। কারণ, তাদের প্রতিদিনকার জীবনে বেশুমার কাজকর্মের বেলায় তারা দৈবঘটনাকে গ্রহণযোগ্য যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান না। মনে করুন, কোনো নাস্তিক তার সন্তানকে বললেন, রাতে ঘুমানোর আগে যেন কোনো বিস্কিট না খায়। কিন্তু

কয়েক ঘণ্টা পর তিনি সন্তানের ঘরে ঢুকে দেখলেন, সে মেঝেতে পড়ে ঘুমাচ্ছে। ঠোঁটের আশেপাশে বিস্কিটের গুড়ো লেগে আছে। আর তার পাশেই পড়ে আছে খোলা বিস্কিটের বয়াম। এসব দেখে তার মনে কী জাগবে? ঘুণাক্ষরেও কি দৈবঘটনার চিন্তা মাথায় আসবে? অবশ্যই না। আমাদের আর্থিক লেনদেন, আদালতের বিচার, রাজনীতি এসব ক্ষেত্রে দৈবঘটনার তত্ত্বপ্রকল্প খাটালে কী অবস্থা হবে চিন্তা করতে পারেন? নৈরাজ্যে ছেয়ে যাবে সব।

আল্লাহর অস্তিত্বের বেলায় বেশির ভাগ নাস্তিক তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মাত্রা তুঙ্গে নিয়ে রাখে। কিন্তু তাদের নিত্যদিনের বেলায় ব্যবহার করে ভিন্ন মাত্রা। কারণ, অনস্বীকার্য সত্যকে গো ধরে অস্বীকার করার পেছেন আছে এক আবেগি কারণ—কেউ কেউ বলেন আধ্যাত্মিক কারণ। আল্লাহর আনুগত্যকে অহংকারবশে অস্বীকার করার বিষয়টিকে আড়াল করার জন্যও কোনো কোনো নাস্তিক আশ্রয় নেন কথিত যুক্তিতর্কের (দেখুন অধ্যায় ১৫)।

কিন্তু তারপরও একটা দৈবঘটনার সুযোগ আছে!

কোনো কোনো নাস্তিক তবু বলতে চান মহাজাগতিক শৃঙ্খলা কোনো পরিকল্পনার ফল নয়। শুনতে যত অযৌক্তিকই মনে হোক, এমন ধারণাই লালন করেন কেউ কেউ। তারা বলতে চান, প্রাণ-ধারণকারী এই মহাজগৎ অস্তিত্বে এসেছে এক অদ্ভুত 'সৌভাগ্যময় দুর্ঘটনার' কারণে।

আপত্তিটার জবাবের জন্য সম্ভাব্যতার মূলনীতিটি খেয়াল করুন। একটি তত্ত্বপ্রকল্পের অধীনে কোনো একগুচ্ছ উপাত্ত যদি অসম্ভাব্য হয়, তা হলে সম্ভাব্য অন্য একটি তত্ত্বপ্রকল্পের সমর্থনে সেগুলো প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। আবারও বলছি মূলনীতিটি: একটি তত্ত্বপ্রকল্পের অধীনে কোনো একগুচ্ছ উপাত্ত যদি অসম্ভাব্য হয়, তা হলে সম্ভাব্য অন্য একটি তত্ত্বপ্রকল্পের সমর্থনে সেগুলো প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে খোলাসা করছি মূলনীতিটি।[২৩৫]

মনে করুন, আসিফ নামের এক ছেলের বাবা জহির না বাতেন সেটা যাচাই করা হবে। মা বলছেন, এই ছেলের বাবা জহির হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তিনিও নিশ্চিত না। তাদের দুজনকে নিয়ে পিতৃত্বের পরীক্ষা করতে চান তিনি। ওদিকে বাতেন মনে করছেন তিনিই বাবা।

ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গেল ছেলে আসিফের ডিএনএ মিলছে জহিরের ডিএনএর সঙ্গে। এই প্রমাণের আলোকে মায়ের তত্ত্বপ্রকল্প অনেক বেশি সম্ভাব্য। অন্যদিকে বাতেনের অনুমান একেবারেই বাতিল। ওপরের সম্ভাব্যতার মূলনীতি অনুসারে, দুটো ডিএনএ পরীক্ষাই মায়ের অনুমানকে সমর্থন করছে। কারণ, তার অনুমান সত্য হওয়ার

জন্য ছেলে আসিফের ডিএনএ-র সঙ্গে প্রথমত জহিরের ডিএনএ মিলতে হতো। এবং বাতেনের ডিএনএ-র সঙ্গে মিলতে পারবে না। অতএব, প্রাপ্ত প্রমাণ বাতেনের অনুমানের বদলে উপাত্তগুলো মায়ের অনুমানকে সমর্থন করছে।

মহাজগতের চুলচেরা সঠিক হিসেব-সংক্রান্ত উপাত্তগুলো দৈবঘটনার চেয়ে পরিকল্পনা দিয়ে সবচে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আকস্মিক, এলোমেলো এবং বিশৃঙ্খল একগুচ্ছ কারণের চেয়ে, কোনো এক ধরনের বুদ্ধিমান 'পূর্ব-পরিকল্পনা'র সংশ্লেষ থাকটা চুলচেরা হিসেবকে বেশি সমর্থন করে। আমি যে-যুক্তি তুলে ধরেছি, তার ওপর সম্ভাব্যতার মূলনীতি খাটালে দেখব, দৈবঘটনা তত্ত্বপ্রকল্পের বেলায় উপাত্তগুলো কোনো অর্থ বহন করে না; বরং পরিকল্পন তত্ত্বপ্রকল্পকে সমর্থন করে এগুলো।

প্রাকৃতিক অনিবার্যতা

প্রাকৃতিক অনিবার্যতার মানে, মহাজাগতিক শৃঙ্খলা যেমন আছে তেমনই হওয়ার কথা। কিন্তু দুটো মূল কারণে এটা সত্যি নয়।

এই তত্ত্বপ্রকল্প মানতে গেলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আমাদের প্রাণ-ধারণে অসম্ভব কোনো মহাজগতের অস্তিত্ব কখনোই সম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা তো আসলে সেরকম নয়। ভিন্ন ধরনের নিয়ম-সংবলিত অন্য এক মহাজগৎ সৃষ্টি হয়ে থাকতেই পারে।[২৩৬] পদার্থবিদ পল ডেভিস বলেছেন, "জড় মহাজগৎ যেমন আছে তেমন হওয়ার দরকার ছিল না। এটা অন্যরকমও হতে পারত।"[২৩৭]

অন্যদিকে, মহাজগৎকে প্রাণ-বিকাশে সহায়ক হতেই হতো বলে যারা দাবি করেন, তাদের কাছেও এর পক্ষে জোরালো প্রমাণ নেই। ছেঁকা পাউরুটির উদাহরণটি মনে করুন। ছেঁকা পাউরুটির ওপর চকলেটগুলো 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'র মতো করে সাজানো দেখে, এটা তো হতেই হতো, বললে কী দাঁড়াবে বিষয়টা? যেকোনো সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বলবেন, এটা নির্জলা মিথ্যা। কারণ, পাউরুটি ছেঁকা হয়ে না-ও থাকতে পারত। আবার ওপরে চকলেটের বদলে মাখনও থাকতে পারত।

বহু মহাজগৎ

একাধিক মহাজগতের অস্তিত্বের প্রস্তাব করে চুলচেরা হিসেবকে ব্যাখ্যা করা যাবে বলে যুক্তি দেন কেউ কেউ। তারা বলেন, সংখ্যাহীন মহাজগতের মাঝে আমাদের মহাজগৎ একটা। যদি বেশুমার মহাজগতের অস্তিত্ব থাকে, তা হলে এগুলোর যেকোনো একটার মাঝে প্রাণের বিকাশ তো হতেই পারে। ওপরে আমরা চিত্রকর্মের যে-উদাহরণ দিলাম, সেটা খেয়াল করলে বুঝবেন, এই ধরনের যুক্তি যে কত অসার।

বহু মহাজগতের প্রবক্তরা বলতে চান, চিত্রপটের ওপর বারে বারে রং ছিটিয়ে গেলে একসময় না একসময় ব্রুস লির ছবি আঁকা হলেও হতে পারে।

বহু মহাজগৎ তত্ত্বের আরও কিছু ধরন আছে। এখানে সবগুলো আলোচনা করার অবকাশ নেই। কিন্তু সাধারণভাবে এই তত্ত্বকে বাতিল করতে কিছু মৌলিক বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

প্রথমত, বহু মহাজগৎ তত্ত্ব অবাঞ্ছিত। অযথা এটা কোনো কিছুকে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সংখ্যায় বৃদ্ধি করছে। অধ্যাপক রিচার্ড সোয়াইনবার্ন লিখেছেন, "যেখানে কেবল একটা সত্তা (ঈশ্বর)-কে মেনে নিলেই একটা মহাজগতের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, সেখানে এক লক্ষ কোটি (কার্যকারণগতভাবে সংযুক্ত) মহাজগতের দাবি করা পাগলপনা।"[২৩৮]

দ্বিতীয়ত, বহু মহাজগৎ তত্ত্বের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। অধ্যাপক অ্যান্থনি ফ্লিউ বলছেন, "নিজস্ব প্রাকৃতিক নিয়ম-সংবলিত বহু মহাজগৎ যৌক্তিকভাবে সম্ভব বললেই, ওরকম মহাজগৎ অস্তিত্বে চলে আসে না। বহু মহাজগতের পক্ষে বর্তমানে কোনো প্রমাণ নেই। এটা নিছক অনুমান।"[২৩৯]

বহু মহাজগতের ধারণা শুধু কি প্রমাণহীন? এটা অবৈজ্ঞানিকও। সিডনি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি'র ডক্টোরেইট-ডিগ্রি-পরবর্তী গবেষক ল্যুক এ. বার্নস বলেছেন, বহু মহাজগৎ তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ-শক্তির বাইরে:

> "বিজ্ঞানের ইতিহাস বারবার আমাদের শিখিয়েছে, গবেষণামূলক পরীক্ষা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়। বহু মহাজগৎ যে আসলেই আছে—সেই তত্ত্বপ্রকল্প কখনোই পরীক্ষা করা যাবে না। আমাদের মহাজগতে সুপরিক্ষিত কোনো তত্ত্ব বড়জোর একটি মহাজগৎ-উৎপাদনকারী কার্যপদ্ধতি অনুমান করতে পারে। কিন্তু তারপরও পর্যবেক্ষণের নাগালের বাইরে কিছু প্রশ্ন থেকেই যাবে। যেমন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অবস্থা অধি-মহাশূন্যে আছে কি না... আর নতুন এক মহাজগৎ প্রসব হওয়ার প্রক্রিয়াটি যে পর্যবেক্ষণ করা যাবে না তা প্রায় নিশ্চিত।"[২৪০]

বহু মহাজগৎ তত্ত্বের সবচে প্রচলিত রূপটিতে বলা হয়, একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বা একগুচ্ছ নিয়মের অধীনে মহাজগৎগুলো সৃষ্টি হয়েছে। বেশির ভাগ মহাবিশ্বতাত্ত্বিক এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ এই রূপটির পক্ষপাতী। তো তারা আসলে বলতে চান, আমাদের মহাজগৎসহ বাকি মহাজগৎগুলোর উদ্ভব হওয়ার জন্য পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলোকে থাকতেই হতো আগে থেকে। কিন্তু এই তত্ত্বরূপের সমস্যা হচ্ছে, আল্লাহর পরিবর্তে কোনো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া মহাজগৎ সৃষ্টি করেছে—এমন কথা গিলতে বিশ্বাসের পারদকে অনেক উঁচুতে চড়ানো লাগে। কারণ, তখন আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হয়

কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলো ভেলকিবাজির মতো নিজেদের প্রকাশ করেছে। এসব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলো কোথা থেকে উদয় হলো—এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাটা আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক অধিকারের মধ্যে পড়বে তখন। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, প্রাণের বিকাশে উপযোগী মহাজগৎ সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকেই স্বয়ং 'সুপরিকল্পিত' হতে হবে।[২৪১]

তো, আমার কাছে মনে, এই রূপতত্ত্বের প্রবক্তাগণ মহাজগতের চুলচেরা হিসেব ও শৃঙ্খলার কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে একে বরং ব্যাখ্যাতিত করে তুলছেন। সে যাই হোক, মহাজগৎ তত্ত্ব সত্য হলেও আল্লাহর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এটা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না (দেখুন অধ্যায় ৬)।

মহাজগৎ অবশ্যই সুপরিকল্পিত উদ্ভাবন!

দৈবঘটনা, অনিবার্যতা কিংবা বহু মহাজগৎ রূপতত্ত্ব দিয়ে মহাজগতের প্রাকৃতিক নিয়ম বা অসাধারণ সুশৃঙ্খলাকে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এটা যে সুপরিকল্পিত উদ্ভাবন, সেটাই সেরা ব্যাখ্যা। জগৎ সৃষ্টির নেপথ্যে উদ্দেশ্যমূলক 'পূর্ব-পরিকল্পনা' এবং বুদ্ধিমত্তার ব্যাখ্যা অনেক বেশি সংগতিপূর্ণ এবং যুক্তিসিদ্ধ। কোনো লোক বাগানে ঢুকে সারি সারি রঙিন ফুলের সমাহারে "আমি তোমাকে ভালোবাসি" কথাটি দেখে যদি ভাবেন, এ নিশ্চয় মালির তৈরি—এই যুক্তি একদিকে যেমন সহজ অন্যদিকে প্রবল।

তবে, এই যুক্তির বিপরীতে কিছু আপত্তি আছে। সেগুলো দেখব এখন।[২৪২]

পরিকল্পনাকারীকে কে পরিকল্পনা করল?

রিচার্ড ডকিন্সের দ্যা গড ডিলিউশান বইতে পাওয়া যায় আপত্তিটা: "...কারণ, পরিকল্পনাকারী রূপতত্ত্ব সাথে সাথেই পরিল্পনাকারীকে কে পরিকল্পনা করল সেই বড় সমস্যা তৈরি করে।"[২৪৩] এই যুক্তি দাবি করে, কোনো পরিকল্পনাকারী যদি থাকেন, তা হলে সেই পরিকল্পনাকারীরও একজন পরিকল্পক থাকবেই।

প্রথম কথা হচ্ছে, বিজ্ঞান-দর্শনের একটা বুনিয়াদি মূলনীতি হচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার জন্য কোনো ব্যাখ্যাকে যদি সম্ভাব্য সেরা বলে বোঝা যায়, তা হলে সেই ব্যাখ্যার জন্য আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। নিচের উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে সেটা:

মনে করুন, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পর ঢাকার বনানী এলাকা খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা রিকশা আর গাড়ির ভাঙা অংশ পেলেন। এগুলো দেখে যদি তারা সিদ্ধান্ত নেন, কোনো ক্রিয়ার ফসল নয় এগুলো; অজ্ঞাত কোনো এক সভ্যতার চিহ্ন—তাদের সে-সিদ্ধান্ত অবশ্যই সঠিক। কিন্তু যদি কোনো সংশয়বাদী যুক্তি ছোড়েন, না, আমরা যেহেতু সেই সভ্যতা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, এমন সিদ্ধান্তে আমরা আসতে

পারি না—তার এই কথার কারণে কি প্রত্নতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে যাবে? অবশ্যই না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যুক্তিটাকে যদি খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিই, বিজ্ঞান আর দর্শন যে-ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকেই ধসিয়ে দেবে তা হলে। বহির্জগতের অস্তিত্ব থাকার মতো বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধের জন্যও যদি ব্যাখ্যা খুঁজি, আমাদের বৈজ্ঞানিক যাত্রা কি আদৌ সচল থাকবে? প্রতিটি ব্যাখ্যার বেলায় যদি এই প্রশ্ন তাক করি, ব্যাখ্যার অসীম পিছুযাত্রায় খেই হারাব আমরা। আর বিজ্ঞানের সামগ্রিক উদ্দেশ্য—ব্যাখ্যা করার চেষ্টা—তখন শুরুতেই মাঠে মারা যাবে।[২৪৪]

পরিকল্পনাকারী নিশ্চয় আরও জটিল হবেন

অন্য আপত্তিটা বলে, ব্যাখ্যা হতে হবে যথাসম্ভব সরল। অর্থাৎ উত্তর পাওয়ার পর তা যেন আরও বেশি প্রশ্ন তৈরি না করে। এজন্য মহাজগতের পরিকল্পনা ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, ঈশ্বরকে অবশ্যই মহাজগতের চেয়ে বেশি 'জটিল' হতে হবে। মহাজগতের পরিকল্পক হিসেবে ঈশ্বরের ব্যাখ্যা তাই সমস্যাটাকে আরও এক ধাপ কঠিন করে ফেলে।

আপত্তিটা আল্লাহ সম্বন্ধে ইসলামি ধারণাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। ইসলামি ধর্মতত্ত্বে আল্লাহর ধারণা খুবই সরল। তিনি স্বতন্ত্র সত্তা। কুরআনে আল্লাহ সম্বন্ধে বলা অত্যন্ত সরল এই কথাগুলো ভেবে দেখুন: "বলো, তিনিই আল্লাহ—স্বতন্ত্র এক সত্তা। আল্লাহ চিরন্তন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'"[২৪৫]

ঈশ্বরের সরল ধারণা সম্বন্ধে অধ্যাপক অ্যান্থনি ক্লিউ মন্তব্য করেছেন, ঈশ্বরের ধারণা "এতই সরল—বড় বড় তিন একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রত্যেক অনুসারীই বোঝে সেটা।"[২৪৬]

আল্লাহর সত্তা কি আঙ্গিকভাবে জটিল?

ঈশ্বরের বহু শারীরিক অংশ আছে—এমন ধারণা এই যুক্তির আরেকটি সমস্যা। যে-সত্তার সামর্থ্য অনেক জটিল, আঙ্গিকভাবেও তাকে জটিল গড়নের হতে হবে—এমন চিন্তা থেকে তৈরি হয়েছে এমন ধারণা। তারা ভাবেন, ঈশ্বর যদি লাখো-কোটি মানুষের প্রার্থনা শোনেন, বিশাল এই মহাজগতের নিয়ন্ত্রণ করেন, জগতের কোন কোণে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, তার সব জানেন, তবে তাকে অবশ্যই জটিল আঙ্গিকের হতে হবে। কিন্তু ধারণাটা ঠিক নয়। জটিল সামর্থ্য থাকলেই কোনো কিছুর গড়ন জটিল হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। একটি সাধারণ ক্ষুর আর বৈদ্যুতিক ক্ষুরের কথাই ভাবুন।

দুটোই চুল কামাতে পারে। এই দিক থেকে দুটোর সামর্থ্যই এক। অথচ গঠনের দিক দিয়ে বৈদ্যুতিক ক্ষুর অনেক বেশি জটিল। কিন্তু চাইলেই সাধারণ ক্ষুর দিয়ে এমন অনেক কাজ করা যায়, যেটা আঙ্গিকভাবে জটিল বৈদ্যুতিক ক্ষুর দিয়ে করা যায় না। কয়েকটা উদাহরণ দিই দেখুন: ফলের খোসা ছিলা, কিংবা কার্ডবোর্ড কাটা—চাইলে বাঁকা করেও কাটা যায়, ছিদ্রও করা যায়।

গাড়ির চেয়ে মানুষের গঠন নিঃসন্দেহে অনেক জটিল। কিন্তু মানুষের গঠন বেশি জটিল বলেই মানুষ অধিকতর সরলভাবে গাড়ির নকশা করতে পারবে না—এমন তো না বিষয়টা। ওপরের যুক্তিটাকে খোঁড়া করার জন্য আমার মনে হয় এই সরল বিবেচনাই যথেষ্ট।

'জ্ঞানের ঘাটতির কারণে ঈশ্বর'?

'জ্ঞানের ঘাটতির কারণে ঈশ্বর' আপত্তিটা নাস্তিকদের বহুল ব্যবহারে মলিন একটা যুক্তি। প্রচলিত নাস্তিকীয় আলোচনায় কোনো বাছবিচার ছাড়াই বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এটা। এই যুক্তি দাবি করে, বর্তমানে যে-ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিজ্ঞান একসময় ঠিকই ব্যাখ্যা করবে ঈশ্বরের অপ্রয়োজনীয়তাকে। পরিকল্পনা যুক্তির বিপরীতে অবশ্য এই যুক্তির ধার নেই তেমন। চারটি কারণে:

- কোনো নাস্তিক পুরুষ বা নারী এই যুক্তি দেওয়ার সময় আসলে স্বীকার করেন, এযাবৎ যে-পরিমাণ বৈজ্ঞানিক উপাত্ত হাতে আছে আমাদের, তার ভিত্তিতে একজন পরিকল্পক থাকাই মহাজগতের পরিকল্পনার সেরা ব্যাখ্যা। তবে এখনো আশা আছে, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি পরিকল্পনা যুক্তিকে খণ্ডন করবে। বিজ্ঞানের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু না এটা। এ ধরনের বিশ্বাস আর "বিজ্ঞান এই বিষয় ধরতে পারছে না, তবে আমাদের আশা আছে"—এ ধরনের কথার মাঝে ফারাক নেই কোনো।
- 'জ্ঞানের ঘাটতির কারণে ঈশ্বর' আপত্তির একটা মূল হেতুবাক্যের ভ্রান্তি খেয়াল করলে, নাস্তিকদের বিড়ম্বনা বেড়ে যায় আরও। বিজ্ঞান সব সময় আমাদের জ্ঞানের ঘাটতিকে নেভায় না; বরং কখনো কখনো আরও চড়িয়ে দেয়। এক শ বছর আগে আমরা বিশ্বাস করতাম, কোষগুলো বুঝি কেবল প্রোটোপ্ল্যাজমের থকথকে ফোঁটা। কিন্তু ১৯৫০ সালে এসে আমরা জানলাম সবগুলো কোষ আসলে বিশাল তথ্যভান্ডার। এই আবিষ্কার

আমাদের জ্ঞানের ঘাটতি নেভানোর বদলে, প্রথম কোষের আবির্ভাব কীভাবে হলো এই প্রশ্ন জাগিয়ে ঘাটতি বরং আরও চড়িয়ে দিয়েছে।

- বিজ্ঞান আসলে কোন ধরনের প্রশ্নের সদুত্তর দেয় সেটা ভাবতে বলব নাস্তিকদের। মহাজগতে ঘটে চলা কলাকৌশল, কীভাবে সবকিছু কাজ করে, প্রাকৃতিক নিয়ম—এগুলোই দেখায় বিজ্ঞান। কিন্তু যেসব জিনিসের গভীর অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় তাৎপর্য আছে, সেগুলোর জবাব দিতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ বিজ্ঞান। মহাজগতের চুলচেরা হিসাব, এর শুরু (দেখুন অধ্যায় ৫), প্রাণের উৎস, অনুভূতিবোধের প্রকৃতি ও উদ্ভব (দেখুন অধ্যায় ৭)—এগুলোর কোনো কিছুরই উত্তর দিতে পারেনি বিজ্ঞান। গভীর অধিপদার্থবিদ্যাগত তাৎপর্য আছে এমনসব বিষয়ের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সুনাম নেই বিজ্ঞানের (দেখুন অধ্যায় ১২)।
- নাস্তিকেরা মনে করেন, আল্লাহর ব্যাখ্যাটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গোছের কিছু। কিন্তু মহাজাগতিক পরিকল্পনাকারীর বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া আসলে দার্শনিক (বা অধিপদার্থবিদ্যাগত) ব্যাখ্যা। এর লক্ষ্য মহাজগতের চুলচেরা হিসেবের ব্যাখ্যা।

আরও কিছু কথা আছে।

কোনো কোনো নাস্তিক মনে করেন, 'জ্ঞানের ঘাটতির কারণে ঈশ্বর' যুক্তিটা অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত; বিজ্ঞান একসময় জ্ঞানের এই ঘাটতি পূরণ করবে তা থেকে নয়। কীভাবে চুলচেরা সঠিক হিসেব নিয়ে এক মহাজাগতের সৃষ্টি হলো, তা না জানাটা অজ্ঞতা থেকে যুক্তি। তারা আরও বলেন, পরিকল্পনা-যুক্তি মনে করে, জ্ঞানের ঘাটতি ফুরোবে না কখনো। যুক্তিটার এ ধরনের সূত্রায়ন ধারণা করে, সব ধরনের ঘাটতির একটা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা থাকবে (বা থাকতেই হবে)।

পরিকল্পনা ব্যাখ্যা অধিপদার্থবিদ্যাগত ব্যাখ্যা। মহাজগতের চুলচেরা হিসেবের গুণ সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সেরা ব্যাখ্যা এটা। তা ছাড়া পরিকল্পনা ব্যাখ্যাকে সেরা ব্যাখ্যার সিদ্ধান্তে আসার প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সেরা ব্যাখ্যার সিদ্ধান্তে আসার প্রক্রিয়াটি অজ্ঞতা থেকে দেওয়া যুক্তি না; বরং একঝাঁক উপাত্ত বা পারিপার্শ্বিক তথ্যকে সংগতিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার অপরিহার্য উপায় অবলম্বনে দেওয়া এটা। বাছবিচারহীনভাবে 'জ্ঞানের ঘাটতির কারণে ঈশ্বর' আপত্তি তোলার বদলে পরিকল্পনা ব্যাখ্যা কেন সেরা ব্যাখ্যা নয় তা দেখানো উচিত নাস্তিকদের। তাদের উচিত যুৎসই কোনো বিকল্প ব্যাখ্যা হাজির করা সবার যাচাইয়ের জন্য।

সম্ভাব্য বলে কিছু নেই!

কেউ কেউ আপত্তি দেখান, এই অধ্যায়ে দেওয়া পরিকল্পনা-যুক্তিটি অর্থহীন। কারণ, মহাজগতের চুলচেরা হিসাব এবং মহাজাগতিক সুশৃঙ্খলার বেলায় 'সম্ভাব্যতা' খাটানো যাবে না, গাণিতিক সম্ভাব্যতা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, আমাদের কাছে কেবল একটি মহাজগৎই আছে পর্যবেক্ষণের জন্য। গাণিতিক সম্ভাব্যতার জন্য আমাদের লাগবে একটি সম্ভাব্যতা বিভাজন। একটা ঘটনা যতভাবে হতে পারে, সেটাকে সম্ভাব্য সব ফলাফল দিয়ে ভাগ করে যা পাওয়া যায় তা-ই গাণিতিক সম্ভাব্যতা। যেহেতু আমাদের পর্যবেক্ষণ করার মতো আর কোনো মহাজগৎ নেই, অতএব, কোনো সম্ভাব্য ফলাফল নেই। কাজেই গাণিতিক সম্ভাব্যতা খাটানো যাবে না। একারণে পরিকল্পনা-রূপতত্ত্ব অনাবশ্যক।

এই আপত্তিটি বেমানান। পরিকল্পনা-যুক্তিটিকে গাণিতিক সম্ভাব্যতা বলে ভুল জ্ঞান করছে আপত্তিটা। এখানে যে সম্ভাব্যতার কথা বলা হয়েছে তা গাণিতিক নয়; জ্ঞানতাত্ত্বিক।[২৪৭] সম্ভাব্য ফলাফলের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে এই সম্ভাবনা দাঁড় করানো হয়নি; বরং আমাদের নাগালে যেসব উপাত্ত আছে তার বিবেচনায় কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার যৌক্তিক গ্রহণযোগ্যতাকে নির্দেশ করে এটা। সাধারণভাবে বললে, জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্ভাবনায় থাকে একটি রূপতত্ত্ব (র) এবং একটি প্রমাণ (প্র)। কোনো নির্দিষ্ট 'প্র'-এর জন্য 'র' যত বেশি হবে, 'প্র'-এর সত্য হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। নিচের অপরাধ-সংক্রান্ত ঘটনা থেকে এটা বোঝা যাবে ভালো:

মনে করুন, এক নিহত ব্যক্তির পাশে ছুরি পড়ে আছে। মেঝেতে এবং তার শরীরে রক্তের দাগ ছড়িয়ে আছে। গোয়েন্দা মনে করছেন, এই খুনের পেছনে লোকটার স্ত্রী দায়ী। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলেন তিনি: ঘটনার সময়ে তার স্ত্রী অন্য কোথাও ছিলেন না। তার আঙুলের ছাপ এবং ছুরিতে ডিএনএ শনাক্ত করেছেন তিনি। গোয়েন্দা সিদ্ধান্তে এলেন, এই খুনের জন্য তার স্ত্রীর দায়ী হওয়ার সম্ভাবনা সবচে বেশি। গোয়েন্দার অনুমানের পক্ষে প্রমাণগুলো সমর্থন দিচ্ছে। এটা একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্ভাব্যতার উদাহরণ।

মহাজগতের প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর চুলচেরা হিসাব এবং মহাজাগতিক সুশৃঙ্খলার পক্ষে পেশ করা একটি উদাহরণও গাণিতিক সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, যদি নিয়মগুলো অন্যরকম হতো, জীবনের-বিকাশ-উপযোগী মহাজগতের সম্ভাবনা হতো প্রায় অসম্ভব। কোনো বস্তু পরিকল্পিত হওয়া সম্বন্ধে আমাদের যে-স্বাভাবিক জ্ঞান আছে, সেটা এই মহাজগতের পরিকল্পিত হওয়ার ব্যাপারটাকেই সমর্থন করে।

মহাজগতের বেশির ভাগ অংশই তো অবাসযোগ্য! কোথায় কথিত পরিকল্পনা?

বিশাল মহাজগতের তুলনায় এর খুব সমান্য কিছু অংশই প্রাণ ধারণের উপযোগী। তো, এটা যদি কোনো পরিকল্পকের পরিকল্পিতই হবে, তা হলে এ অবস্থা কেন হবে? এর বেশির ভাগ অংশই তো বাসযোগ্য হওয়ার কথা।

গোটা মহাজগৎই প্রাণের বাসযোগ্য হওয়া উচিত—এমন ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই আপত্তি। ইসলামি ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী এই ধারণা বেঠিক। বাকি মহাজগতের তুলনায় প্রাণ ধারণ-উপযোগী আমাদের এই গ্রহ যে খুবই তুচ্ছ, তা স্পষ্ট করে বলা আছে ইসলামি জ্ঞানভান্ডারে।

আল্লাহ কেন এক ত্রুটিপূর্ণ মহাজগতের পরিকল্পনা করলেন?

ওপরের আপত্তিটার ধারাবাহিকতায় আসে এই আপত্তি। আপত্তিকারকেরা বলেন, আল্লাহই যদি মহাজগতের পরিকল্পনা করবেন, তা হলে এখানে 'ভুল পরিকল্পনা'র নমুনা পাওয়া যাবে কেন? অন্য কথায়, এই মহাজগতের পরিকল্পনা কেন এমনভাবে করা হলো যে কেবল সামান্য কিছু অংশ প্রাণ বিকাশের উপযোগী?

মহাজগতের পরিকল্পিত হওয়াকে অস্বীকার করে না এই আপত্তি; তবে পরিকল্পনাকারীর সামর্থ্যের দিকে আঙুল তোলে। আপত্তিটার পেছনে একটা মূল ধারণা হলো, আল্লাহ তো নিখুঁত সত্তা। তো তিনিই যদি পরিকল্পনাকারী হবেন, তা হলে তাঁর সৃষ্টজগতে মানুষের বসবাসের জন্য আরও পরিসর থাকার দরকার ছিল। ধারণাটা একেবারেই অথর্ব।

গোটা মহাজগতের উদ্দেশ্য কেবল মানুষের প্রাণ ধারণ নয়। বরং, মহাজগৎ সৃষ্টির অনেকগুলো উদ্দেশ্যর মাঝে একটা উদ্দেশ্য সামান্য এক অংশে প্রাণের বিকাশ-উপযোগী ক্ষুদ্র এক গ্রহ সৃষ্টি। মানব বসবাসের ব্যাপারে এটাই ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি। মহাজগতের প্রতিটি কোণ জীবন ধারণের উপযোগী নয় এবং এই জীবন ধারণ অনন্তকাল ধরেও চলবে না। (পৃথিবী বাদে অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব অবশ্য অস্বীকার করে না এই কথা। মূল কথা হচ্ছে, মহাজগতের প্রতিটি জায়গা জীবন ধারণের উপযোগী হতে হবে বলে কোনো কথা নেই।) এই দৃষ্টিকোণ থেকে মহাজগতের পরিকল্পনা এর উদ্দেশ্যের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে। সুতরাং ওপরের তর্কটা ভুল।

দুর্বল নৃতাত্ত্বিক আপত্তি

দুর্বল নৃতাত্ত্বিক আপত্তি বলে, মহাজগতের প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সুশৃঙ্খলার চুলচেরা হিসেবে দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, প্রাণের বিকাশের জন্য এগুলোর

হিসেব ঠিকঠাক না হলে আমাদের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব আছে যেহেতু, আমাদের অস্তিত্ব বিকাশে উপযোগী মহাজগৎ দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর তাই মহাজগতের চুলচেরা হিসেবের কোনো ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

পুরো আপত্তিটার সার-সংক্ষেপ এরকম:

- যদি আমাদের অস্তিত্ব থাকে, তা হলের আমাদের অস্তিত্বের উপযোগী বৈশিষ্ট্য মহাজগতে অবশ্যই থাকবে।
- আমাদের অস্তিত্ব আছে।
- সুতরাং, আমাদের অস্তিত্বে থাকার উপযোগী বৈশিষ্ট্য মহাজগতের আছে।

সিদ্ধান্তটি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই কোনো। কিন্তু আবারও একটি বেমানান বিরোধের খোঁজ পেলাম আমরা। আমাদের অস্তিত্ব যে মহাজগতের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায়, সেটার ব্যাখ্যা দাবি করে না চুলচেরা হিসেব। আমাদের অস্তিত্ব কীভাবে মহাজগতের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায় সেই ব্যাখ্যা খোঁজে সেটা। অন্য কথায়, আমাদের অস্তিত্ব বিকাশে উপযোগী বৈশিষ্ট্যের অসম্ভাব্যতার ব্যাখ্যা খোঁজে এটা।

নৃতাত্ত্বিক এই আপত্তি কেন বেখাপ্পা, নিচের গল্পটা থেকে বোঝা যাবে ভালো করে।[২৪৮]

মনে করুন, একদিন গাড়ি চালিয়ে বাসায় যাওয়ার পথে, ভুল করে নির্জন শিল্প এলাকায় গিয়ে পৌঁছালেন। আপনার গাড়িটাও হঠাৎ বিকল হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে আপনি হাঁটা শুরু করলেন সাহায্যের জন্য কাউকে খুঁজতে। হঠাৎ তেজস্ক্রিয়তা-রোধী পোশাকের কিছু সশস্ত্র লোক এসে আপনার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল। আপনার মাথার ওপর একটা ব্যাগ চাপিয়ে আপনাকে ফেলে রাখল গাড়ির পেছনের ডালায়। কয়েক ঘণ্টা পরে সেখান থেকে বের করে এক ভবনের দিকে নিয়ে গেল জোর করে। মাথার ওপর থেকে ব্যাগ সরিয়ে বসিয়ে দিল একটা চেয়ার।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে আপনি পরখ করলেন ঘরটা। সবদিকে সাদা দেওয়াল আর উজ্জ্বল আলো। সামনে বিশাল বড় এক যন্ত্র। দেখতে দানবীয় অতি-আধুনিক ওয়াশিং মেশিনের মতো। পিনপতন নীরবতা। হঠাৎ শুনলেন কোত্থেকে যেন একটা দরাজ কণ্ঠ হুকুম করছে, সিঁড়ি বেয়ে যন্ত্রটার ভেতরে ঢুকতে। আপনাকে জানানো হলো, নতুন উদ্ভাবিত এই সময়-যন্ত্রে অংশ নেওয়া প্রথম ব্যক্তি আপনি। না বলার সুযোগ নেই কোনো। যন্ত্রে ঢুকে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড তাপমাত্রার আঁচ পেলেন। অনেক শব্দ। চারপাশ ঘোলাটে হয়ে গেল। জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন আপনি। কিছুক্ষণ বাদে হুঁশ ফিরে দেখলেন আপনি পৌঁছে গিয়েছেন ১৬২৫ সালে। একটা গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে আপনাকে। ১০ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় একশ নেটিভ অ্যামেরিকান। তির তাক করে আছে আপনার দিকে। তিরন্দাজ হিসেবে তারা কি না আবার খুবই দক্ষ।

চলন্ত ঘোড়া থেকে চোখ বন্ধ করেও নিশানা ভেদ করতে পারা। শুনলেন কেউ ১০ থেকে উলটো গুনছে। এরপর 'ফায়ার' বলে হুংকার ছাড়ল। প্রত্যেক রেড ইন্ডিয়ানের নিশানা আপনার বুক বরাবর। কিন্তু চোখ খুলে নিজেকে স্বর্গে আবিষ্কার করার বদলে দেখলেন সবাই তাদের নিশানা ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এখন আমি দুটো জিনিসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমত, তাদের নিশানা ব্যর্থ হওয়ায় আপনি যে বেঁচে আছেন এখনো, তা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই; আর আপনি যদি বেঁচেই না থাকতেন, তা হলে তো জানতেই পারতেন না।

দ্বিতীয়ত, আপনার প্রচণ্ড অবাক হওয়া উচিত। কারণ, তাদের ব্যর্থ হওয়ার অসম্ভাব্যতার ওপর ভিত্তি করে বেঁচে আছেন আপনি।

নৃতাত্ত্বিক মূলনীতি প্রথম যুক্তিটা দেখায়। আর এ অধ্যায়ে যে-যুক্তি আলোচিত হয়েছে সেটা দেখায় দ্বিতীয় যুক্তিটি। আমাদের অস্তিত্বের উপযোগী গুণ থাকায় এ মহাজগতে আমরা বেঁচে আছি বলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে এই গুণের অসম্ভাব্যতা অবাক হওয়ার মতো। আর তাই নৃতাত্ত্বিক নীতি আসল উদ্দেশ্য ধরতে ব্যর্থ।

আপনি ভাবছেন জীবন বিশেষ কিছু

মহাজগতের চুলচেরা সঠিক হিসেব যুক্তিকে 'মানবকেন্দ্রিক' চিন্তা থেকে উদ্ভূত বিবেচনা করে মজার এক আপত্তি তোলা হয়। অর্থাৎ এই যুক্তি যারা দেন, তারা বলেন, মানবজীবন বিশেষ কিছু। এই প্রাণের বিকাশে প্রয়োজন জগতের চুলচেরা হিসেব। যদি কোনো সচেতন প্রাণ না থাকত, আমরা তা হলে বলতাম, এই মহাজগৎ তারকারাজি আর গ্রহ-উপগ্রহের জন্য চুলচেরা হিসেব পরিমাপ করে সৃষ্টি। জ্যোতির্মণ্ডলীয় বস্তু না থাকলে বলতাম অ-পারমাণবিক উপদানের জন্য হিসেব করে সৃষ্টি। তার মানে এই যুক্তিকে মহাজগতের যেকোনো কিছুর বেলায় খাটানো যাবে। সুতরাং এটা কোনো ভালো যুক্তি নয় একেবারেই।

এই আপত্তির জবাব দেওয়া যায় দুভাবে:

- মানব-অস্তিত্বের জন্য এই মহাজগৎ যদি চুলচেরা হিসেব করে না-ও সৃষ্টি হতো, কেবল মহাজগতের অস্তিত্বের জন্যও এই যুক্তি ব্যবহার করা যেত। মহাজগতে একে তো আছে জটিল সব জ্যোতির্মণ্ডলীয় বস্তু, তার ওপর অত্যন্ত জটিল সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে মহাজাগতিক বিভিন্ন বস্তু। এই জটিলতা ব্যাখ্যার দাবি করে। এমন একটি মহাজগৎ যদি না

থাকত, এলোমেলো সব উপাদানে ভরতি শূন্য এক মহাজগৎ থাকত, তা হলে চুলচেরা পরিমাপের প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু জটিল মহাজাগতিক শৃঙ্খলার জন্য এই মহাজগতে সবকিছু ঠিক করা হয়েছে চুলচেরা হিসেব করে। কাজেই এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

৩ প্রাণ, এবং বিশেষ করে মানুষের প্রাণ, খুবই জটিল। এমন জটিল এক সত্তার অস্তিত্বের পেছনে ব্যাখ্যা খোঁজা যুক্তিবান মানুষের পরিচয়। প্রাকৃতিক নিয়ম এবং মহাজাগতিক সুশৃঙ্খলার চুলচেরা পরিমাপের কারণে টিকে আছে এই অস্তিত্ব।

অন্য-ধরনের-প্রাণের-অস্তিত্ব আপত্তি

কেবল কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব—এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে চুলচেরা-পরিমাপ-যুক্তিটা দাঁড়িয়ে আছে বলে হামেশা আরেকটা আপত্তি শোনা যায়। পদার্থের নিয়মগুলো যদি অন্যরকম হতো, তা হলে কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের অস্তিত্ব না-ও থাকতে পারত। তখন অ-কার্বন ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব হতে পারত। কাজেই, ভিন্ন মহাজাগতিক শৃঙ্খলের অধীনেও বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশ ঘটতে পারত।

আমাদের চুলচেরা হিসাবের যুক্তিটা ওপরের তত্ত্বপ্রকল্পকে খুঁটি করে দাঁড়িয়ে নেই; বরং দাঁড়িয়ে আছে দুটো যৌক্তিক ধারণার ওপর।

প্রথমত, সচেতন বুদ্ধিমান প্রাণ কার্বন-ভিত্তিক হোক কি না হোক, এর জন্য শক্তির উৎস প্রয়োজন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিনা কোনো তারকার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়; আর তারকা না হলে প্রাণের জন্য থাকত না কোনো শক্তির উৎস।

দ্বিতীয়ত, সচেতন প্রাণের জন্য এক ধরনের জটিলতা প্রয়োজন। যেমন, শক্তিশালী নিউক্লিয়ার শক্তি যদি সামান্য এদিক-সেদিক হতো, তা হলে হাইড্রোজেন ছাড়া আর কোনো পরমাণুর অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। শুধু হাইড্রোজেন থেকে জটিল সচেতন প্রাণের বিকাশের কথা চিন্তাও করা যায় না। প্রাকৃতিক নিয়মগুলো অন্যরকম হলে কোনো ধরনের স্থিতিশীল এবং জটিল প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। দুটোই অত্যন্ত যৌক্তিক এবং সংগতিপূর্ণ ধারণা।[২৪৯]

চুলচেরা পরিমাপ বা পরিকল্পনা-যুক্তিটা অন্যতম সহজাত যুক্তি। এটি এত জোরালো আর সহজ যে, একে চ্যালেঞ্জ করা কঠিন। আপনার পাউরুটি নিজের থেকে সেঁকা হয়ে, আপনার প্রিয় চকলেট দিয়ে নিজের ওপরে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' কথাটি দৈবক্রমে সাজিয়েছে—এটা প্রমাণ করা যেমন কঠিন, চুলচেরা-হিসাব যুক্তিকে ফেলে দেওয়াটাও তেমন কঠিন। একটা উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা থাকার বিষয়টা অত্যন্ত পরিষ্কার আমাদের আলোচনা থেকে। রুটির ওপরে তিনটি শব্দে গড়া বাক্যের চেয়ে

এই মহাজগৎ অনেক বেশি জটিল। অনেক বেশি সূক্ষ্ম পরিমাপের প্রদর্শনী এখানে। সচেতন প্রাণের বিকাশে কোনো এক মহাজাগতিক পরিকল্পক যে সুশৃঙ্খল এবং নিখুঁত পরিমাপ গড়ে দিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানায় এই যুক্তি।

অধ্যায় ৯

আল্লাহ এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা

কর্মব্যস্ত এক দিন শেষে ঘরে ফিরেছেন। ক্লান্তি কাটাতে চালু করেছেন টিভি। এলোমেলোভাবে চ্যানেল পাল্টাচ্ছেন একটা একটা করে। হঠাৎ একটা শিরোনামে চোখ আটকে গেল: পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করেছে অমুক।

আচ্ছা বলুন তো, লোকটি যা করেছে তা কি নৈতিকভাবে খারাপ? আপনার মতো সুবোধ প্রতিটি মানুষ নিশ্চয় বলবেন, হ্যাঁ, অবশ্যই খারাপ। আচ্ছা, কাজটা কি ব্যক্তিনিরপেক্ষতার নিরিখেও নৈতিকভাবে খারাপ? আবারও, প্রায় সবার মতোই বললেন, হ্যাঁ।

তা হলে শেষ প্রশ্ন: কেন এটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ?

ব্যক্তিনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা

প্রশ্নটির জবাব দেওয়ার আগে 'ব্যক্তিনিরপেক্ষতা' শব্দটার মানে বুঝে নিই আগে। বাইরের কারও দ্বারা প্ররোচিত বা প্রভাবিত না হয়ে, কোনো বিষয় সম্পর্কে একান্ত নিজ বিবেচনা বা মত উপস্থাপন করাকে বলা হয়ে ব্যক্তিনিরপেক্ষতা। নীতিবোধের বেলায় ব্যক্তিনিরপেক্ষতা মানে, কোনো বিষয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির বোধবিবেচনা বা অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল নয়। ১+১=২ এর মতো গাণিতিক সত্য, বা সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে—এমন বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে কে কী ভাবলেন, না ভাবলেন, তাতে যায় আসে না কিছু। এগুলো সত্যই। নীতিবোধ আমাদের ভেতর থেকেই আসুক কিংবা বাইরে থেকে—অবশ্যই কোনো না কোনো ভিত্তি থাকতে হবে এগুলোর। সেক্ষেত্রে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি আমাদের জন্য। এসব নীতিবোধগুলো কোথা থেকে এলো? এগুলোর প্রকৃতি কীসে ব্যাখ্যা করে? প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি দরকার। সেটা পেলে এদের ব্যক্তিনিরপেক্ষতার ধরন এবং এগুলো কোথা থেকে এলো সে-সম্বন্ধিত ভিত্তির খোঁজ পাওয়া যাবে। দর্শনশাস্ত্রে এটা নৈতিক সত্তাতত্ত্ববিদ্যা নামে পরিচিত।

আরেকটি উপায়ে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক সত্যকে চেনা যায়। এগুলো মানুষের ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে। ধর্ষণ নৈতিকভাবে অপরাধমূলক কাজ। এখন দুনিয়ার সব মানুষ মিলেও যদি বলে, না, এটা নৈতিকভাবে সঠিক, তবুও কিন্তু এটা অপরাধই থাকবে।

কিছু নীতিবোধ কেবল ব্যক্তিনিরপেক্ষই নয়, নৈতিক দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের। এর মানে, কিছু কাজ আছে যা করা আমাদের কর্তব্য। আবার কিছু কাজ আছে যা করা উচিত নয় আমাদের। মানুষের প্রকৃতির মাঝেই নৈতিক দায়িত্ববোধ নির্মিত আছে। আবার কিছু রয়েছে যেগুলো আসে আমাদের বাইরে থেকে। আমাদের নৈতিক ভাষা আমাদের সত্তাতীত কিছু বলে ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক ইয়ান মারখাম: "'কর্তব্য' শব্দটার মাঝে পোরা আছে এক নৈতিক সত্যের বোধ। এটা আমাদের জীবন ও জগতের উর্ধ্বে... নৈতিক ভাষার মৌলিক চরিত্র সর্বজনীন, বাহ্যিক।"[২৫০]

প্রশ্নে ফিরে যাই।

ধর্ষণ অপরাধ হওয়ার বিষয়টা কেন ব্যক্তিনিরপেক্ষ? কারণ, এটা নীতিবোধের প্রশ্ন। আর আল্লাহ আছেন বলে নীতিবোধগুলো মানুষের ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে।[২৫১]

কথাটা নিয়ে আরও বিশদ আলোচনার আগে আরেকটা বিষয় খোলাসা করে নিই। ব্যক্তিনিরপেক্ষতার সঙ্গে নির্দিষ্ট বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। নাস্তিকেরা নীতিবোধ দেখান না, বা ভালো আচরণ করেন না, কিংবা যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তার কোনো নীতিবোধ নেই—এমন কথাও আমি বলছি না। আমার যুক্তিটা হচ্ছে: আল্লাহর অস্তিত্ব না থাকলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক সত্যেরও অস্তিত্ব থাকবে না। দৃশ্যকল্প থেকে আল্লাহকে বাদ দিলে এসব নীতিনৈতিকতা নেমে যাবে নিছক সামাজিক প্রথার স্তরে। মানুষকে খুন করা অপরাধ, বা ন্যায়কে সমর্থন জানাতে হবে—এ ধরনের নীতিবোধগুলো নিছক সামাজিক প্রথায় পরিণত হবে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করলে। জনসম্মুখে কেন বায়ুত্যাগ অনুচিত—ঠিক এরকম সামাজিক রীতিনীতির পর্যায়ে নেমে যাবে নীতিনৈতিকতাগুলো, যার পেছনে শক্ত কোনো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় না।

ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধের জন্য সুমহান আল্লাহই যে একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি—সেই সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের যুক্তিপ্রমাণটি। কারণ, তিনি এই মহাজগৎ এবং সৃষ্টিসুলভ ক্ষুদ্র-স্বার্থের উর্ধ্বে। অন্য আর কোনো ব্যাখ্যা এমন মজবুতভাবে দাঁড়াতে পারে না। অধ্যাপক ইয়ান মারখামও অনুরূপ সুরে বলেছেন, "আমাদের জীবনের গভীরে লুকিয়ে থাকা রহস্যময় কর্তব্যবোধকে ব্যাখ্যা করেন ঈশ্বর। নৈতিক দাবির সর্বজনীন প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা তিনিই করতে পারেন এবং তিনিই কেবল সর্বজনীন আদেশ দিতে পারেন। কারণ, তিনিই একমাত্র জীবন-জীবিকার উর্ধ্বে।"[২৫২]

ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ এক সর্বোচ্চ সুনিপুণ সত্তা। তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞানী, ক্ষমতাধর এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভালো। নিখাদ ভালোত্ব তাঁর সত্তাগত প্রকৃতি। তাঁর একটি নাম 'আল-বার', মানে সকল ভালোর উৎস। আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি হুকুম তাঁর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। আর তাঁর ইচ্ছা কখনোই তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ না। এজন্য তিনি যা আদেশ করেন, তা অবশ্যই ভালো। কারণ, তিনি সত্তাগতভাবে ভালো। এর সংজ্ঞাও দেন তিনি:

> "বলো, 'আল্লাহ কোনো অনৈতিকতার আদেশ করেন না।'"[২৫৩]

মজার ব্যাপার কী, যেসব নাস্তিক আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তারাও কিন্তু বোঝেন, ঐশী সত্তার অনুপস্থিতিতে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধের কোনো মূল্য নেই। প্রভাব-বিস্তারকারী নাস্তিক জে.এল. ম্যাকি ইথিকস: ইনভেন্টিং রাইট অ্যান্ড রং বইতে এই অবস্থানের কথাই যেন তুলে ধরেছেন:

> "ব্যক্তিনিরপেক্ষ মূল্যবোধ বলে কিছু নেই... মূল্যবোধগুলো ব্যক্তিনিরপেক্ষ না হওয়ার দাবি বলতে... কেবল নৈতিক ভালোত্বকে বোঝায় না... বরং ঠিক-বেঠিক, কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা, কোনো কাজ সমাজের চোখে ঘৃণ্য হওয়া, ইত্যাদির মতো নৈতিক মূল্যবোধ এবং মূল্যবোধহীনতাকেও বোঝায়।"[২৫৪]

ম্যাকির নেওয়া অবস্থানটি নাস্তিকদের মূলধারার সঙ্গে মেলে না। তা ছাড়া এটা মানুষের সহজাত-প্রবণতা-বিরোধীও। তবে নাস্তিকীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিণামটা ঠিকই বুঝেছেন তিনি: যদি আল্লাহ না থাকেন, তা হলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভালো বলে কিছু নেই।

ইউথিফ্রোর উভয়-সংকট

অনেক নাস্তিক ওপরের যুক্তিটির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন প্লাতো বা ইউথিফ্রোর উভয়-সংকট টেনে। এখানে বলা হয়: ঈশ্বর আদেশ করেছেন বলে কি কোনো কিছু নৈতিকভাবে ভালো, নাকি নৈতিকভাবে ভালো বলে ঈশ্বর তা আদেশ করেছেন?

আল্লাহকে যারা মহাশক্তিধর মনে করেন, তাদের অনেককেও এই সংকট বেশ ভালোই ঝামেলায় ফেলে দেয়। কারণ, তাদেরকে এখান থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে হয়: হয় নীতিবোধ আল্লাহর আদেশ দ্বারা সংজ্ঞায়িত, অথবা ওটা তাঁর আদেশের বাইরের কিছু।

নীতিবোধ যদি আল্লাহর আদেশের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়, তা হলে কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ তা একনায়কসুলভ সিদ্ধান্ত। তা হলে মানুষ হিসেবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ খারাপ বলে কিছু শনাক্ত করার প্রয়োজন নেই আমাদের। তার মানে, নিরপরাধ একটা শিশুকেও খুন করাটা প্রকৃত অর্থে খারাপ না। আল্লাহ তাঁর খেয়ালমাফিক এর গায়ে 'খারাপ'-এর তকমা লাগিয়েছেন বলে খারাপ।

সংকটের আরেক দিক হচ্ছে নৈতিক মানদণ্ড পুরোপুরি আল্লাহর সত্তা এবং প্রকৃতি থেকে স্বাধীন। খোদ আল্লাহও এই মানদণ্ড অনুযায়ী চলতে বাধ্য। কিন্তু কোনো বিশ্বাসী এই ধরনের কথা মেনে নেবেন না কোনোভাবেই। কারণ, এ কথা মানলে আল্লাহকে আর মহাশক্তিধর বলা যায় না। কারণ, তিনি তখন এমন কিছু মানদণ্ডের অধীন, যা তাঁর বহিস্থ।

আপাত চোখে যুক্তিটাকে খুবই যুৎসই মনে হচ্ছে। কিন্তু সামান্য ভাবনাচিন্তা করলেই এই সংকটের গোমর নজরে পড়ে। এর কারণ দ্বিমাত্রিক চিন্তাধারার বাইরে তৃতীয় আরেকটি চিন্তা আমাদের নজরের আড়ালে পড়ে রয়েছে। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শাব্বির আখতার দ্যা কুর'আন অ্যান্ড দ্যা সেক্যুলার মাইন্ড বইতে ব্যাখ্যা করেছেন বিষয়টি:

> "তৃতীয় বিকল্পটি হচ্ছে ধর্মগ্রন্থে পাওয়া নৈতিকভাবে অটল পরিচয়ের আল্লাহ। মমতা যে-ভালো, আর যৌন অবাঞ্ছিত আচরণ যে-খারাপ—সর্বোত্তম এই সত্তা খেয়ালখুশিমতো সে ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন না। প্রকৃতিগতভাবে ও মৌলিকভাবে তিনি এমন এক সত্তা, যিনি সব সময় ভালোরই আদেশ দেন।"[২৫৫]

অধ্যাপক আখতার আসলে বলতে চাচ্ছেন, নৈতিক মানদণ্ড আছে অবশ্যই। তবে উভয় সংকটে যেমনটা বলা হয়—আল্লাহর থেকে ওটা বহিস্থ কিছু নয়। তাঁর সত্তাগত প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিকভাবেই আসে এটা। মুসলিম এবং সাধারণভাবে আস্তিকেরা, বিশ্বাস করেন, সুমহান আল্লাহ অনিবার্যভাবে এবং নিখুঁতভাবে কল্যাণময়। তাঁর প্রকৃতির মাঝেই আছে নিখুঁত যৌক্তিক নৈতিক মানদণ্ড। এর মানে, কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করা কারও ব্যক্তিগত খারাপ লাগার কারণে খারাপ নয়। কাজটা ব্যক্তিগতভাবে কোনো একজনের বা গোটা দুনিয়ার কাছে ভালো মনে হলেও ভালো হয়ে যাবে না। এটা বরং আল্লাহ-নির্ধারিত ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অনিবার্য ও নৈতিক মানদণ্ডের দরুন খারাপ।

অন্যদিকে, এর মানে আল্লাহ নিজে এই মানদণ্ডের অধীন নন। কারণ, এটা তাঁর সত্তার মধ্যেই আছে। এটা কেবল তাঁর সত্তাগত প্রকৃতির অর্থ প্রকাশ করছে। কোনোভাবেই এটা তাঁর বহিস্থ কিছু না।

এ কথার পর একজন নাস্তিকের স্বভাবসুলভ জবাব হবে: "আল্লাহকে ভালো হিসেবে বর্ণনা করতে আপনাকে তো আগে ভালো কী সেটা জানতে হবে। কাজেই আপনি সমস্যাটার সমাধান করেননি।" এ কথার সহজ উত্তর হচ্ছে: কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ তা নির্ধারণই করেন খোদ আল্লাহ। সবচে নিখুঁত এবং নৈতিকভাবে সর্বোচ্চ ভালো এক সত্তা তিনি। নৈতিক সত্যগুলো তাঁর আদেশের মাধ্যমে প্রকাশিত

হওয়া তাঁর ইচ্ছের চূড়ান্ত রূপ। এসবই তাঁর নিখুঁত, প্রাজ্ঞ, পবিত্র এবং কল্যাণময় প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

ব্যক্তিনিরপক্ষে নীতিবোধের জন্য বিকল্প ভিত্তি আছে কোনো?

কিছু নীতিবোধ কেন ব্যক্তিনিরপেক্ষ তার জবাব দিতে অনেক নাস্তিক বিকল্প ব্যাখ্যার হদিস দেন। এসব বিকল্প ব্যাখ্যার মধ্যে অন্যতম জীববিজ্ঞান, সামাজিক চাপ এবং নৈতিক বাস্তবতাবাদ।

জীববিজ্ঞান

আমাদের ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধকে কী জীববিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে? এক কথায় বললে: না, পারে না। জীববিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক নির্বাচনকে যদি নীতিবোধের ভিত্তি গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা হলে এর পরিণামে যে কী হতে পারে, তার এক মজার 'পরম উদাহরণ' দিয়েছেন চার্লস ডারউইন। তার যুক্তি, যদি ভিন্ন ধরনের জৈবিক অবস্থার ফল হতাম আমরা, তা হলে যেসব জিনিসকে আমরা নৈতিকভাবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ মনে করি, তা হতো একেবারেই অন্যরকম: "মৌচাকের মৌমাছির মতো অনুরূপ অবস্থা যদি মানব-প্রজাতির উদ্ভব ঘটাত, কর্মী মৌমাছির মতো তা হলে আমাদের অবিবাহিত নারীরা তাদের ভাইদের মেরে ফেলাকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করত। মায়েরা তাদের প্রজননক্ষম কন্যাদের মেরে ফেলত। কেউ এতে বাধা দেওয়ার কথা ভাবত না।"[২৫৬]

অন্যভাবে বললে, নীতিবোধ যদি জৈবিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল হতো, সেগুলো তখন আর ব্যক্তিনিরপেক্ষ হতো না। নার্স হাঙরের অনুরূপ অবস্থা থেকে যদি আমাদের উদ্ভব হতো, আমরা তা হলে নিজেদের সঙ্গীদের ধর্ষণ করাকে মেনে নিতাম।[২৫৭]

কেউ কেউ আবার বলেন, আমাদের ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধের ভিতটা নির্দিষ্টভাবে গড়ে দেয় প্রাকৃতিক নির্বাচন। কিন্তু এটাও সঠিক না। কেননা, ধারণাগতভাবে, আমাদের টিকে থাকা এবং প্রজননের জন্য প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধু নৈতিক বিধি গঠনের সামর্থ্য দিতে পারে। নীতিবোধ-সংক্রান্ত দার্শনিক ফিলিপ কিচার লিখেছেন, "প্রাকৃতিক নির্বাচন খুব সম্ভব আমাদের জন্য যা করেছে—বিভিন্ন সামাজিক বিন্যাস এবং নৈতিক নিয়ম তৈরি করার সামর্থ্য দিয়েছে।"[২৫৮]

জীবতত্ত্ব আমাদের নীতিবোধকে ভিত্তি দেয়—এ কথা বললে আমাদের নীতিবোধ হয়ে পড়ে অর্থহীন। ওগুলো হয়ে ওঠে স্রেফ কিছু অযৌক্তিক এবং অচেতন জৈবিক পরিবর্তনের ফল। অন্যদিকে এগুলো আল্লাহর হুকুমের ফলে এলে একটা অর্থ থাকে। কারণ, নৈতিক বোধসম্পন্ন হওয়ার মানে তখন এগুলোর প্রতি অনুগত থাকা। বা অন্যভাবে বললে, আমাদের কিছু নৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। আমরা সেগুলোর

ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। এক গোছা পরমাণুর কাছে নিশ্চয় কোনো দায়বদ্ধতা থাকতে পারে না আপনার।

সামাজিক চাপ

দ্বিতীয় বিকল্প সামাজিক চাপ বা জনমত। দার্শনিকভাবে, আমার মনে হয় এ জায়গায় বহু নাস্তিক ও মানবতাবাদী কঠিন সমস্যার মুখে পড়ে। প্রথমত, নীতিবোধ তখন হয়ে পড়ে আপেক্ষিক। কারণ, অনিবার্য সামাজিক পরিবর্তনের অনুগত হয় ওগুলো। দ্বিতীয়ত, নীতিবোধের মাঝে খাল কেটে নিয়ে আসে অযৌক্তিকতাকে। জনমতকে যদি নীতিবোধের ভিত্তি বলে মেনে নিই, জার্মানিতে তা হলে ১৯৪০ সালে নাৎসিরা যা করেছে, তার বিরুদ্ধে নীতিগতভাবে আমাদের অবস্থানকে কীভাবে সমর্থন করব? কীভাবে বলব ওরা যা করেছে তা নৈতিকভাবে ভুল? আমরা পারব না। যদি বলেন, জার্মানির কেউ কেউ তো অন্তত লড়েছে নাৎসিদের বিরুদ্ধে; আমি বলব, খারাপের সমর্থনে বিশাল জনমত ছিল তখন। ইতিহাসে এরকম আরও বহু অনাচারের ঘটনা আছে।

নৈতিক বাস্তবতাবাদ

শেষ বিকল্পটা নৈতিক বাস্তবতাবাদ। এর আরেক নাম নৈতিক ব্যক্তিনিরপেক্ষতা। এর মানে, নীতিবোধ আমাদের ব্যক্তিনিরপেক্ষ বোধবিবেচনা এবং আবেগ থেকে স্বাধীন ও বাহ্যিক। তবে নৈতিক বাস্তবতাবাদ এবং এই অধ্যায়ে যা বলা হচ্ছে তার মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, নৈতিক বাস্তবতাবাদীরা নীতিবোধের জন্য কোনো ভিত্তির প্রয়োজন স্বীকার করেন না। তার মানে মমতা, সুবিচার এবং সহনশীলতার মতো নীতিবোধগুলো স্রেফ ব্যক্তিনিরপেক্ষ।

এই অবস্থানের ব্যাপারে বেশ কিছু সমস্যা আছে। প্রথমত, সুবিচার কেবলই আছে—এ কথার মানে কী? বা শুধু ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধ আছে— এ কথার মানে কী? এ অবস্থান সহজাত-জ্ঞান বিরোধী এবং অর্থহীন। 'সুবিচার' নিজের থেকেই আছে এর মানে আমরা জানি না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নীতিবোধগুলো যদি ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে হয়, তা হলে এজন্য যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা লাগবে। তা না হলে কীভাবে এগুলো ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে?—সে প্রশ্ন রয়েই যাবে।

দ্বিতীয়ত, নীতিবোধ কেবল মমতা বা সুবিচার শনাক্ত করার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা দরদি এবং ন্যায়পর হতে বাধ্য। কিন্তু নৈতিক বাস্তবতাবাদের অধীনে এধরনের বাধ্যবাধকতা অসম্ভব। কেননা, কোনো নির্দিষ্ট নীতিবোধ ব্যক্তিনিরপেক্ষ—একথা জানলেই আমরা তা প্রয়োগ করতে বাধ্য হই না। এগুলো মানা হলে কিংবা এগুলোর প্রতি এক ধরনের দায়িত্ববোধ থাকলেই কেবল অর্থবহ হবে সেগুলো। কেন আমাদের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, নৈতিক বাস্তবতাবাদ তার পেছনে

কোনো কারণ দিতে পারে না। কিন্তু নীতিনৈতিকতা যদি আল্লাহর আদেশে হয়, তখন এগুলো কেবল ব্যক্তিনিরপেক্ষই হয় না, দায়ও আরোপ করে। কারণ, আল্লাহর আদেশ মানা আমাদের কর্তব্য।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার, ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধের জন্য আল্লাহর অস্তিত্ব অনিবার্য। তিনি জীবন-জগতের ঊর্ধ্বে। তাঁর আদেশের মাধ্যমে তিনি সর্বজনীন নীতিবোধ জারি করতে পারেন।

তারা যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা নাকচ করে দেন?

শেষ চেষ্টা হিসেবে, বুদ্ধিবৃত্তিক বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে কোনো কোনো নাস্তিক নীতিনৈতিকতাকে নাকচ করে বাঁচতে চান। নীতিনৈতিকতার ব্যক্তিনিরপেক্ষতাকে কেউ স্বতঃসিদ্ধ মনে না করলে এই যুক্তি খাটবে না বটে। কিন্তু এটা দুফলা তরবারির মতো। নীতিবোধের ব্যক্তিনিরপেক্ষতাকে যে-মুহূর্তে একজন নাস্তিক বাতিল করে দেন, ধর্মের দিকে—বিশেষ করে ইসলামের দিকে—তার আর আঙুল তাক করার অধিকার থাকে না। কেকেকে, আইএস, এমনকি উত্তর কোরিয়ার স্বৈরাচারতন্ত্রের দিকে আঙুল তোলাও নিষিদ্ধ হয়ে যায় তার জন্য।

কিন্তু অদ্ভুত বৈপরীত্যের বিষয় হলো, বহু নাস্তিকেরা ঠিক এটাই করেন। নৈতিকতার প্রশ্নে ব্যক্তিনিরপেক্ষতায় মোড়ানো সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে এর সঙ্গে তাদের সতর্কীকরণ একটা বার্তা জুড়ে দেওয়া উচিত: "এটা আমার ব্যক্তিগত মত।" তখন অবশ্য তাদের নৈতিক দ্বিমত বা নিষ্ঠুরতা হবে অর্থহীন। সে যাই হোক, মনের গহনে প্রতিটা সুস্থজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ খুন, ধর্ষণ, নির্যাতনের মতো নীতিবিরোধী কাজের ব্যক্তিস্বার্থ নিরপেক্ষতাকে অস্বীকার করেন না।

যুক্তিটাকে ভুল বোঝা

কোনো কোনো নাস্তিক, এমনকি কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিও, নৈতিক জ্ঞানতত্ত্বকে নৈতিক সত্তাতত্ত্বের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে ভুল বোঝেন। কীভাবে আমরা বুঝব কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ—সেই যুক্তি কিন্তু দেখানো হয়নি এ-অধ্যায়ে। এটা নৈতিক জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়। এ-অধ্যায়ে আমরা বলেছি, নৈতিকতাবোধ কোথা থেকে এলো এবং এর ধরন সম্বন্ধে। এটা নৈতিক সত্তাতত্ত্বের বিষয়।

আল্লাহর আদেশ নীতিবোধগুলোকে ওঠায় ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে, দেয় সত্তাতাত্ত্বিক ভিত্তি। সেই নীতিবোধগুলো যে কী সেটা নৈতিক জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা।

সোজা বাংলায় আমাদের এ অধ্যায়ের যুক্তিটি এরকম: কোনো কিছু যদি ভালো হয়, তা কী ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে ভালো? যদি তা ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে ভালো হয়, তবে

আল্লাহর অস্তিত্ব অনিবার্য। কারণ, ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভালোর একমাত্র উৎস তিনি। কোনো কিছু যে ভালো, তা কীভাবে জানব, সে-কথা বলে না এই যুক্তি।

পরম নীতিবোধ বনাম ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধ

কৌতূহলী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ধর্মতাত্ত্বিক একটা সুযুক্তিপূর্ণ বিষয় তুলে ধরতে পারেন। ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় (এবং প্রকৃত অর্থে দুনিয়ার তাবত বিচার-ব্যবস্থায়) কিছু কিছু পরিস্থিতিতে খুন করা নৈতিকভাবে বৈধ (যেমন নিজেকে বা নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে)। তার মানে, কোনো কিছুই ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে খারাপ নয়। খুব মজার চিন্তা কিন্তু এটা। তবে পরম নীতিবোধকে এখানে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে—দুটো দুই ধরনের।

পরম নৈতিকতা মানে—পরিস্থিতি যা-ই হোক—কোনো কাজ হয় ভালো নয় খারাপ। যেমন, খুন করাকে যিনি পরমভাবে ভুল মনে করেন, আত্মরক্ষার স্বার্থেও খুন করাকে বেঠিক মনে করবেন তিনি। কিন্তু, ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা স্বীকার করবে, পরিস্থিতির কারণে কোনো কোনো কাজ নৈতিকভাবে ভালো-খারাপ হতে পারে। যেমন, যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া কাউকে খুন করা বেঠিক। কিন্তু কখনো কখনো কাউকে হত্যা করা ন্যায্য। স্থানীয় কোনো স্কুলে কোনো লোক যদি নির্বিচারে গুলি করে শিশুদের খুন করতে থাকে, তা হলে ওই লোককে হত্যা করা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে। আমার যুক্তিপ্রমাণটি পরম নীতিবোধ নিয়ে নয়।

নীতিবিষয়ক আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে দুটো কথা

নীতিবিষয়ক আপেক্ষিকতাবাদীরা নীতিবোধকে সাংস্কৃতিক প্রথার সঙ্গে আপেক্ষিক দাবি করেন। এ অধ্যায়ের যুক্তির ব্যাপারে তারা বলবেন, পরম ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতার আলোচনা প্রমাণ করে নৈতিকতা ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়; আপেক্ষিক। নৈতিকতাকে যারা ব্যক্তিস্বার্থ-নিরপেক্ষ মনে করেন, তারা বলবেন, লোকে যা বিশ্বাস করে, অনুভব করে, বা যে-কাজ করে তা অপ্রাসঙ্গিক। এগুলো ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতার গায়ে কোনো আঁচড় দেয় না (আর এটাই কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ-নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা)।

নীতিবিষয়ক আপেক্ষিকতাবাদ শুরুতেই দেউলিয়া। কারণ, ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যকে খণ্ডন করতে সাংস্কৃতিক চর্চার হাত ধরছে সে। ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধের সংজ্ঞা বলছে এগুলো অনুভূতি, বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক চর্চা থেকে মুক্ত। কাজেই ওগুলোকেই আবার নীতিবোধের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা খণ্ডনে ব্যবহার করা নিরর্থক।

নাস্তিকদের জন্য চমৎকার কিছু ভাবনার খোরাক আছে এ অধ্যায়ে। নাস্তিকেরা যদি কিছু নীতিবোধকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবেন, তা হলে হয় তাদের আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতেই হবে। কারণ, ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধের জন্য কেবল তিনিই যৌক্তিক ভিত্তি। তা না হলে জোরালো কোনো বিকল্প দিতে হবে। আর যদি তা না পারেন, তা হলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভালো-খারাপ চিনতে পারায় তাদের সহজাত স্বভাবকে বাতিল করতে হবে। ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধ জিনিসটাকে একেবারেই ফেলে দিতে হবে তাদের অভিধান থেকে। একবার যদি তারা সেটা করেন, তা হলে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আঙুল তাক করা, ইসলাম সম্বন্ধে তাদের নৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নেমে যাবে ব্যক্তিগত মতের পর্যায়ে।

নীতিবোধ থেকে যুক্তিটি আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে ইসলামি ধারণাকে পূর্ণ সমর্থন দেয়। তিনি সর্বোচ্চ কল্যাণময়, প্রাজ্ঞ। তাঁর আদেশ তাঁর নিখুঁত প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং, তাঁর আদেশমালা নিখাদভাবে কল্যাণময়। আল্লাহর সম্বন্ধে এসব জানাটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতাকে ভিত্তি দেয়।

অন্যভাবে বললে, আল্লাহকে জানা মানে ভালোকে জানা।

অধ্যায় ১০

স্রষ্টা একজনই

মনে করুন, আপনি এক অভিযাত্রী। এক নভোযানে করে অন্য এক গ্রহে গিয়েছেন মানুষের মতো সৃষ্টিদের দেখতে। গ্রহে নামামাত্র আপনার গাইডের দেখা পেলেন। তিনি জানালেন, আপনার নভোযান নেমেছে গ্রহের সীমানাহীন দেশ স্ফিঙ্গায়। আপনার মনে কিছুটা খটকা জাগল। গাইডকে জিজ্ঞেস করলেন, এই গ্রহে আর কোনো দেশ আছে কি না। তিনি একগাল হেসে জানালেন, "হ্যাঁ, দুটো।"

আপনি বললেন, "দুটো দেশের মধ্যে যদি সীমানাই না থাকে, তা হলে আপনারা কীভাবে বোঝেন কোন দেশে আছেন?"

আপনার দিশারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "হুম, আমরাও এই সমস্যায় ভুগছি। কোনো সীমানা নেই। আর দুই দেশের বৈশিষ্ট্য একই রকমের।"

"আপনাদের তা হলে এদুটোকে এক দেশ বানানো উচিত। কারণ, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে।"

বেলা পড়তে খাবারের জন্য একদল কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলেন আপনারা। খেতে খেতে এক কর্মকর্তা দেশের রাজাদের তারিফ করলেন। শুনে আপনি জিজ্ঞেস করলেন, "তার মানে এখানে রাজা এক জনের বেশি?"

"হ্যাঁ। দুজন রাজা আমাদের।"

আপনি হতবুদ্ধ হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের আইন-কানুন আর সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষায় সংগতি ধরে রাখেন কীভাবে?"

"তারা সব সময় একমত হয়। তাদের ইচ্ছে একই।"

"তা হলে, আপনাদের রাজা দুজন নন; একজনই। কারণ, একই ইচ্ছার অধীনে কাজ করছেন তারা।"

কেবল একজন স্রষ্টা থাকার পক্ষে এ অধ্যায়ে আমি পাঁচটি যুক্তি তুলে ধরব। ওপরের গল্পটিতে আছে তার তিনটি। গল্পের প্রথম অংশ যে-যুক্তিটির সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছি, আমি সেটাকে বলি 'ধারণাগত পার্থক্য'। এর মানে, একই বস্তুর

একাধিক অস্তিত্বের জন্য এমন কিছু ধারণা থাকতে হবে যা একটাকে অন্যটা থেকে আলাদা করবে। যেমন ধরুন, যদি বলি টেবিলে দুটো কলা আছে, আপনি নিজে পর্যবেক্ষণ করেই কথাটা যাচাই করতে পারবেন। আপনি দুটো কলা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ এখানে এমন কিছু ধারণা আছে যা আলাদা আলাদা। যেমন, কলা দুটোর আকার, টেবিলের ওপর দুটো কলার নিজ নিজ অবস্থান। কলা দুটোকে আলাদা করার মতো কিছুই যদি না থাকত, তা হলে কিন্তু বলা যেত না যে দুটো ভিন্ন কলা আছে ওখানে। এ বইতে এযাবৎ যুক্তি দেখানো হয়েছে একজন মহাশক্তিধর, মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবগত, পরাজাগতিক এক অনিবার্য অসৃষ্ট স্রষ্টার ব্যাপারে। কেউ যদি এই সত্তাকে এক না বলে একাধিক দাবি করেন, তা হলে এমন কিছু ধারণা লাগবে, যা তাদের আলাদা করে। যদি আলাদা করা না যায়, তার মানে আসলে একজন স্রষ্টার কথাই বলা হচ্ছে। একজন স্রষ্টার জন্য যা সত্য, তা যদি অপরজনের জন্যও সত্য হয়, তা হলে আমরা আসলে একজন স্রষ্টার বর্ণনা দিয়েছি; দুজনের নয়।

গল্পের দ্বিতীয় অংশ আছে বর্জন যুক্তি এবং সংজ্ঞামূলক যুক্তির সারাংশ। বর্জন যুক্তি বলে কেবল একটি ঐশী ইচ্ছা থাকাই সম্ভব। যদি দুজন স্রষ্টা থাকেন, এবং তাদের কেউ একজন একটি গাছ সৃষ্টি করতে চান, তা হলে তিনটি সম্ভাবনা হতে পারে। প্রথমত, দুজনের ইচ্ছে হবে একে অন্যের বিপরীত; তখন কোনো গাছই সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু সৃষ্টি যেহেতু আছে, যৌক্তিকভাবে এটা অসম্ভব। এরা যদি একজন আরেকজনের ইচ্ছার বিরোধিতা করতেন, তা হলে কোনো সৃষ্টিই সম্ভব হতো না। দ্বিতীয়ত, গাছ সৃষ্টি করে একজন স্রষ্টা অপর স্রষ্টার ইচ্ছাকে পরাভূত করবেন। তৃতীয় সম্ভাবনা, তারা দুজনেই একই গাছ একই তরিকায় সৃষ্টির ব্যাপারে একমত হবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্ভাবনার মানে: সত্যিকার অর্থে কেবল একটি ইচ্ছেই আছে। আর আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা কেবল একজন স্রষ্টাকে বোঝায়।

সংজ্ঞামূলক যুক্তি বলে একজনের বেশি স্রষ্টার অস্তিত্ব অসম্ভব। কেননা স্রষ্টা যদি একজনের বেশি হতেন, মহাজাগতিক সুসংগতি হতো সুদূর পরাহত। একজন স্রষ্টার যুক্তি তুলে ধরার পাশাপাশি, আল্লাহর চিরাচরিত ধারণাকে নিশ্চিত করছে এ-বই। আল্লাহর সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণা আমাদের বলে দেয় যে, বাইরের কেউ তাঁর ইচ্ছেকে দমাতে পারে না। তার মানে দুটো সার্বভৌম ও চূড়ান্ত ইচ্ছা থাকতে পারে না।

এই অধ্যায় নিচের যুক্তিগুলো বিস্তরভাবে বলা হবে। পাশাপাশি আরও দুটো যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করা হবে যে, স্রষ্টা হতে হবে একজনই:

- বর্জনমূলক যুক্তি
- ধারণামূলক পার্থক্য

- ওকামের ক্ষুর
- সংজ্ঞামূলক যুক্তি
- আকাশবাণী যুক্তি

বর্জনমূলক যুক্তি

এই যুক্তি বলে, যেহেতু কেবল একটা সার্বভৌম ইচ্ছা থাকা সম্ভব, সেহেতু বহু স্রষ্টা থাকা অসম্ভব। স্রষ্টার যে একটি ইচ্ছে থাকতে হবে সে ব্যাপারে এরই মধ্যে আলোচনা করেছি (দেখুন অধ্যায় ৫)। কয়টা ইচ্ছে থাকতে পারে সে-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে খুব সুন্দরভাবে আমরা এই আলোচনার গভীরে যেতে পারি।

আলোচনার খাতিরে ধরে নিই দুজন স্রষ্টা আছে। 'ক' স্রষ্টা একটা পাথর নড়াতে চাইলেন। 'খ' স্রষ্টাও একই পাথর নড়াতে চাইলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তিন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে:

- স্রষ্টাদের একজন আরেকজনকে পরাভূত করে পাথরটাকে অন্য একদিকে সরাবেন।
- দুজনই দুজনকে বাতিল করে দেবেন। পাথরটা কোনোদিকে সরবে না।
- দুজনই একই দিকে পাথরটাকে নড়াবেন।

প্রথম দৃশ্যে থেকে বোঝা যায় কেবল একটি ইচ্ছে কার্যকর হয়। দ্বিতীয় সম্ভাবনা বলে কোনো ইচ্ছেই কার্যকর নয়। কিন্তু এটা অসম্ভব। সৃষ্টির অস্তিত্ব যেহেতু আছে, ইচ্ছেকে অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। তৃতীয় সম্ভাবনাটিও আসলে একটি ইচ্ছের কথা বলছে। যেহেতু একটি ইচ্ছেই কার্যকর, সুতরাং একজন স্রষ্টার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াই অধিক যুক্তিসিদ্ধ।

কেউ যদি আপত্তি তোলেন, কেন, দুটো আলাদা সত্তারও তো একই ইচ্ছে থাকতে পারে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করব, কীভাবে জানলেন দুটো সত্তা আছে? যুক্তিটাকে অজ্ঞতামূলক যুক্তি হিসেবে শোনায়। কারণ, এমনতর দাবির পক্ষে প্রমাণ নেই কোনো। এটা আমাদের নিয়ে যায় দ্বিতীয় যুক্তির দিকে:

ধারণাগত পার্থক্য

দুজন স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকতে হলে, কোনো না কোনোভাবে আলাদা হতে হবে তাদের। যেমন, দুটো গাছ হলে, তাদের আকার, রূপ, রং বা বয়স—কোনো না কোনোভাবে একটা আরেকটা থেকে আলাদা হবে। বাহ্যিকভাবে যদি একও হয়, অন্তত একটা ব্যাপার থাকতেই হবে যা দুটোকে আলাদা করবে। সেটা হতে পারে তাদের অবস্থান।

জমজের বেলাতেও খাটাতে পারেন এটা। কোনো একভাবে তারা দুজন আলাদা বলেই আলাদা করে আমরা তাদের চিনতে পারি। দুজন যে একই জায়গা দখল করছে না, কেবল ওটুকু থেকেও বোঝা যায় তাদের স্বাতন্ত্র্য।

যদি একাধিক স্রষ্টা থাকতেন, তা হলে তাদের আলাদা করে চেনার জন্য কিছু একটা থাকত। সম্ভাব্য সবকিছুতেই যদি তারা একই হন, তা হলে তাদের দুজন বলি কীভাবে? একটি যদি অপরটির হুবহু হয়, তা হলে একটির বেলায় যা সত্য, অপরটির বেলাতেও তা সত্য। 'ক' আর 'খ' যদি দুটো বস্তু হয়, তাদের সবকিছু যদি একই হয়, কোনোভাবেই যদি আমরা তাদের আলাদা করতে না পারি, তবে তারা আসলে একটিই বস্তু। আমরা এটাকে একটা রূপতত্ত্ব হিসেবে তুলে ধরতে পারি: 'ক'-এর বেলায় যা যা সত্য, 'খ'-এর বেলাতেও যদি তা-ই তা-ই সত্য হয়, তা হলে 'ক' আর 'খ' একই।

এবারে চলুন এই রূপতত্ত্বকে স্রষ্টার বেলায় খাটাই।

মনে করলাম দুজন স্রষ্টা আছেন। একজন আ, আরেকজন ঈ। আ-এর বেলায় যা যা সত্য, ঈ-এর বেলাতেও তা-ই তা-ই সত্য। আ যেমন মহা শক্তিধর, প্রাজ্ঞ, ঈ-ও তেমন। বাস্তবে তা হলে স্রষ্টা হলো কজন? একজন। কারণ, তাদের আলাদা করার মতো কিছু নেই। কেউ যদি আপত্তি তুলে বলেন, দুজন আলাদা, তা হলে তিনি আসলে অন্য কোনো স্রষ্টার কথা বলছেন না; বলছেন কোনো সৃষ্ট বস্তুর কথা। কারণ, স্রষ্টার সঙ্গে মানানসই বৈশিষ্ট্য এটার থাকবে না—তা না হলে আর আলাদা হচ্ছে কীভাবে?

দুজন স্রষ্টা থাকার ব্যাপারে কেউ যদি এরপরও গোঁ ধরে থাকেন, বলেন যে একজন আরেকজনের চেয়ে আলাদা, আমি তবে জিজ্ঞেস করব: "তারা কীভাবে আলাদা?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া মাত্রই তিনি অজ্ঞতামূলক যুক্তির ডেরায় প্রবেশ করবেন। কারণ, নিজের ভুল সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাকে এখন মনগড়া প্রমাণ বানাতে হবে।

ওকাম-এর ক্ষুর

কিছু যুক্তিবিমুখ এবং জেদি মানুষ এরপরও বহু স্রষ্টার কথা বলবেন। ওকাম-এর ক্ষুরের আলোকে এই তর্ক সুযুক্তিপূর্ণ নয়। চতুর্দশ শতাব্দীর যুক্তিবিদ এবং ফ্র্যান্সিসীয় ভিক্ষু উইলিয়াম অফ ওকাম একটা দার্শনিক মূলনীতি দেন। নীতিটি হচ্ছে: 'Pluralitas non est poneda sine necessitate'। বাংলায়, 'বিনা প্রয়োজনে বহুতাকে সত্য বলে মানা যাবে না'। অন্যভাবে বললে, সবচে সহজ এবং সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা সেরা ব্যাখ্যা।

স্রষ্টা যে দুই বা তিন বা সহস্রাধিক স্রষ্টার সমন্বয়—এ সম্বন্ধে প্রমাণ নেই কোনো। কাজেই সবচে সহজ ব্যাখ্যা স্রষ্টা একজন। বহু স্রষ্টার ধারণা এই যুক্তির সর্বাঙ্গীণতায় কিছুই যোগ করে না। অন্যভাবে বললে, একাধিক স্রষ্টা যোগ করলে যুক্তিটার

ব্যাখ্যামূলক ক্ষমতা বা পরিসর কিছুই বাড়ে না। একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টা মহাজগৎ সৃষ্টি করেছেন কথাটা যতটুকু সর্বাঙ্গীণ, দুজন মহাশক্তিধর স্রষ্টাকে সেই একই কাজের জন্য আখ্যায়িত করাটাও ততটুকুই সর্বাঙ্গীণ। স্রষ্টা যেহেতু মহাশক্তিধরই, একজনই যথেষ্ট। আমি বরং বলব, একাধিক স্রষ্টার তর্ক তুললে ব্যাখ্যামূলক ক্ষমতা ও পরিসর কমে যায়। কারণ, সমাধানের চেয়ে এটা আরও বেশি সমস্যা জাগায়। যেমন, এধরনের বহু ঈশ্বরবাদের অযৌক্তিকতায় আঙুল তোলে নিচের প্রশ্নটা: বহু চিরন্তন সত্তা কীভাবে সহাবস্থানে আছেন? পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছার ভবিষ্যৎ আশঙ্কা কী? তারা কীভাবে যোগাযোগ করেন?

একজন স্রষ্টার যুক্তিটির বিরুদ্ধে বহুল প্রচলিত একটা আপত্তি হচ্ছে: মিশরের পিরামিডের বেলায় যদি এই যুক্তি খাটাই, তা হলে ওগুলো কেবল একজন বানিয়েছেন—এমন এক হাস্যকর মত গ্রহণ করতে হবে আমাদের। তাদের এই যুক্তিটি ওকামের মূলনীতিটার অপপ্রয়োগ। কারণ, সর্বাঙ্গীণতার বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছে এটা। একজন লোক পিরামিড বানিয়েছেন, এটা সবচে সহজ এবং সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা না। সমাধান দেওয়ার বদলে এটা বরং আরও বেশি প্রশ্ন দাঁড় করায়—কীভাবে কেবল একজন মর্ত্যের মানুষ পিরামিড তৈরি করতে পারেন? এরচে একাধিক মানুষ এটা সৃষ্টি করেছেন—এমন কথাই অনেক বেশি সর্বাঙ্গীণ। তো, কেউ আবার বলতে পারেন, এই মহাজগৎ এত জটিল যে কেবল একজন স্রষ্টা এটা সৃষ্টি করেছেন—এমন কথা খুবই হাস্যকর। তাদের কথায় বাহ্যত যুক্তির মতো কিছু একটা আছে বলে মনে হলেও এটা বাস্তবতা-বিবর্জিত। একাধিক স্রষ্টার চেয়ে কেবল একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টা মহাজগৎ সৃষ্টি করেছেন—এ ব্যাখ্যা অনেক বেশি সরল। কারণ, একাধিক স্রষ্টার প্রসঙ্গ টানলেই আগের অনুচ্ছেদের প্রশ্নগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

আপত্তিকারক বলতে পারেন, ঠিক আছে, কোনো সাধারণ মানুষ নয়, একজন মহাশক্তিধর মানুষ এটা বানিয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, মহাজগতের ভেতর এমন মহাশক্তিধর কোনো সত্তা নেই। আর পিরামিড যেহেতু একটা ভবন, এবং ভবন বানায় কোনো কর্মদক্ষ কারণ (এক বা একাধিক ব্যক্তির কর্ম), সুতরাং পিরামিড অবশ্যই অনুরূপ কোনো কারণ বানিয়ে থাকবে। এটা আবার আমাদের মূল বিষয়ে নিয়ে যায়। পিরামিড বানাতে একাধিক কারণের প্রয়োজন।

সংজ্ঞামূলক যুক্তি

এই যুক্তির অনিবার্য দাবি: একাধিক স্রষ্টা থাকলে মহাজগতে সৃষ্টি হতো নৈরাজ্য। মহাজগতে বস্তুগত শৃঙ্খলার যে-মাত্রা দেখি আমরা, তা খুঁজে পাওয়া যেত না।

কুরআনেও পাওয়া যায় এ-প্রতিধ্বনি: "যদি আসমানসমূহ আর জমিনে আল্লাহ ছাড়া আরও অনেক উপাস্য থাকলে দুটোই ধ্বংস হয়ে যেত।"[২৫৯]

কুরআনের কালজয়ী ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরুল-জালালাইন' বলছে: "মহাকাশ এবং পৃথিবী তাদের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলত। কারণ, অভ্যন্তরীণ বিবাদ হতোই। একাধিক শাসক থাকলে সচরাচর যেমন হয়: বিভিন্ন বিষয়ে একে অন্যের বিরোধিতা করে, একমত হয় না।"[২৬০]

কেউ বলতে পারেন, কিন্তু গাড়ি? গাড়ি তো একজন বানায় না। একজন চাকা লাগায়, একজন এঞ্জিন বসায়, আরেকজন কম্পিউটার ব্যবস্থা বসায়। মহাজগৎও তো এভাবে সৃষ্টি হতে পারে, তাই না? এ উদাহরণে দেখা যাচ্ছে জটিল জিনিসও একাধিক কারিগর বানাতে পারেন।

দেখুন, আগের অধ্যায়ে মহাজগতের উদ্ভব সম্বন্ধে সবচে যুক্তিসিদ্ধ যে-ব্যাখ্যা তুলে ধরেছি, তা কিন্তু শুধু 'স্রষ্টা'র ধারণা নিয়ে নয়; ঈশ্বরের সামগ্রিক ধারণা সম্বন্ধে। একাধিক স্রষ্টার বিমূর্ত ধারণাগত সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু একাধিক আল্লাহ থাকা সম্ভব না। কারণ, সংজ্ঞা মোতাবেক আল্লাহ এমন এক সত্তা, তাঁর নিরঙ্কুশ ইচ্ছেকে বাইরের কোনো কিছু দমাতে পারে না। দুই বা ততোধিক ঈশ্বর থাকলে, তাদের ইচ্ছে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতোই। সৃষ্টি হতো নৈরাজ্য, অরাজকতা। অথচ আমাদের মহাজগতে দেখি গাণিতিক নিয়ম আর শৃঙ্খলার শাসন। কাজেই, কেবল একটি নিরঙ্কুশ ইচ্ছের ফল হিসেবে একে দেখাটাই অর্থবহ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওপরে গাড়ির যুক্তিটাও কিন্তু ঐশী একত্বের কথা বলে। গাড়িটাকে কার্যক্ষম হতে, এটি বানানোর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককেই কিন্তু মূল পরিকল্পনাকারীর সামগ্রিক 'ইচ্ছা' মেনে চলতে হবে। তার নকশা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ইচ্ছেকে বেঁধে দিয়েছে। সংজ্ঞা মোতাবেক আল্লাহর ইচ্ছেকে যেহেতু বাইরের কেউ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে না, কাজেই একের অধিক ঐশী ইচ্ছে থাকা সম্ভব না।

কেউ কেউ আবার বলতে পারেন, একাধিক ঈশ্বর একটি ইচ্ছের ব্যাপারে একমত তো হতেই পারেন। কিংবা তাদের আলাদা আলাদা শাসনক্ষেত্রও থাকতে পারে। একথার মানে দাঁড়ায় তাদের ইচ্ছেশক্তি সীমিত এবং বশীভূত। তার মানে, সংজ্ঞা মোতাবেক এরা আল্লাহ নন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিক—পশ্চিমা দুনিয়া যাকে চেনে অ্যাভেরোজ নামে—সেই ইবনু রুশ্‌দ যুক্তিটার সারাংশ তুলে বলেছেন:

> "[ওপরের] আয়াতের অর্থটা প্রাকৃতিকভাবে [মানুষের] স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মাঝে খোদাই করা। দুজন রাজা থাকলে, এবং একজনের কর্ম অন্যের থেকে

আলাদা হলে, [তাদের পক্ষে] একই নগর পরিচালনা সম্ভব না। কারণ, দুটো একই ধরনের সত্তা থেকে একই পদক্ষেপ বের হতে পারে না। যদি তারা একসঙ্গে কার্যকর থাকেন, তা হলে নগর বরবাদ হয়ে যাবে—যদি-না একজন সক্রিয় হন এবং অপরজন নিষ্ক্রিয় থাকেন। কিন্তু ঐশী গুণ থাকা কারও সম্বন্ধে [নিষ্ক্রিয় থাকার] বিষয়টা বেমানান। একই উপস্তরে যখন একই ধরনের দুটো কর্ম মেশে, সেই উপস্তর যে-বিকৃত তা নিয়ে সন্দেহ নেই।”[২৬১]

আকাশবাণী যুক্তি

আকাশবাণী থেকে খুব সহজেই আল্লাহর একত্বের প্রমাণ দেওয়া যায়। আল্লাহ যদি মানবজাতিকে তাঁর কথা ঘোষণা করেন, এবং এই কথা যদি তাঁর থেকেই এসেছে বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে নিজের সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা সত্য। তবে একজন সংশয়বাদী এই যুক্তির কিছু নেপথ্য ধারণার দিকে আঙুল তুলতে পারেন। মানবজাতির কাছে আল্লাহর নিজেকে ঘোষণা এবং আকাশবাণীর অবতরণ প্রক্রিয়াসহ নানা বিষয় নিয়ে সন্দেহ করতে পারেন তিনি।

শেষের সংশয়টা দূর করি আগে। আল্লাহ যদি মানবজাতির কাছে তাঁর জানান দিয়ে থাকেন, দুভাবে তা বের করার উপায় আছে: অভ্যন্তরীণভাবে, বাহ্যিকভাবে। ‘অভ্যন্তরীণভাবে’ বলতে বুঝিয়েছি, কেবল নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে, ভাবনাচিন্তা করে বুঝতে পারবেন আপনি। আর ‘বাহ্যিকভাবে’ বলতে বোঝাচ্ছি বাইরের কোনো যোগাযোগের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া। অভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া বেশ কিছু কারণে অসম্ভব:

- প্রতিটি মানুষ আলাদা। মনোবিদরা একে বলেন, ‘ব্যক্তিগত পার্থক্য’। এগুলোর মধ্যে আছে মানুষের ডিএনএ, অভিজ্ঞতা, সামাজিক পরিবেশ, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অনুভূতিজাত সামর্থ্য, লিঙ্গ পার্থক্য এবং আরও অনেক কিছু। নিজের মনের ভাবনাচিন্তা বা সহজাত জ্ঞান দিয়ে কোনোকিছুকে নিজের চিন্তাধারার সাথে মিশিয়ে নেওয়ার সময় এসব পার্থক্য মূল ভূমিকা পালন করে। আর তাই ভাবনাচিন্তার কারণে একেকজনের সিদ্ধান্ত হবে একেকরকম। আল্লাহর পরিচয় পেতে যদি এগুলো ব্যবহার করা হয়, তাঁর সম্বন্ধে তা হলে একেক ধরনের ধারণা বের হওয়া অসম্ভব নয়। ইতিহাস সাক্ষী দেয় এর। ৬০০০ খ্রিষ্টপূর্ব সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আল্লাহ সম্বন্ধে আনুমানিক ৩ হাজার ৭ শ নাম ও ধারণার হদিস পাওয়া যায়।
- আল্লাহর অস্তিত্ব যে আছে, সে সিদ্ধান্তে আসতে যেহেতু ‘সাধারণ বুদ্ধি’ ব্যবহার করা হয়েছে (দার্শনিকেরা একে বলেন ‘যৌক্তিক চিন্তাভাবনা’;

আর মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকেরা বলেন 'সহজাত ভাবনা'), সেহেতু তাঁর অস্তিত্ব স্বীকারের বদলে তিনি কে এবং কেমন—যদি সেটা বের করতে যাই তা হলে সেটা হবে বিভ্রান্তিকর। কারণ, আমাদের যুক্তিসামর্থ্যের সীমা আছে। বাস্তব জগতে আমাদের বিমূর্ত ভাবনাচিন্তা খাটিয়ে আমরা কেবল বুঝতে পারব একজন স্রষ্টা আছেন, তিনি মহাশক্তিধর ইত্যাদি। এর বাইরে কিছু চিন্তা করতে গেলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। কুরআন জিজ্ঞেস করে, "যা জানো না, তোমরা কি আল্লাহকে নিয়ে তা-ই বলো?"[২৬২] কেবল নিজে নিজে ভাবনাচিন্তা করে আল্লাহ কী সেটা বুঝতে গেলে তা হবে অনেকটা কোনো ইঁদুরের ছায়াপথ বুঝতে চাওয়ার চেষ্টার মতন। মানুষ চিরন্তন, স্বতন্ত্র বা মহাশক্তিধর নয়। আর তাই আল্লাহ কী সেটা নিজে নিজে ভাবনাচিন্তা করে বোঝা সম্ভব নয় তাদের। সুতরাং, একমাত্র আল্লাহর প্রেরিত বার্তার মাধ্যমেই তাঁকে সঠিকভাবে জানা যেতে পারে।

সহজ একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন বিষয়টি। দরজায় কড়া নাড়লে আপনি বোঝেন, কেউ একজন এসেছে। কারও আসার জন্য যদি অপেক্ষা না করেন, তা হলে কিন্তু স্রেফ দরজার কড়া নাড়া থেকে বুঝতে পারবেন না কে এসেছে; যিনি এসেছে তাকে বলতে হবে ওপাশ থেকে। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানটাও অনুরূপ। আল্লাহ যদি কিছু বলে থাকেন, বা ঘোষণা দিয়ে থাকেন, তা অবশ্যই মানুষের বোধগম্য কিছু হবে। এর বাইরে আমরা অন্য কিছু বললে তা হবে নিছক কল্পনা।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যিক সেই যোগাযোগের নাম কুরআন (দেখুন অধ্যায় ১৩)। ঐশী ভাষ্য হওয়ার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া একমাত্র গ্রন্থ এটি। সেই মানদণ্ডগুলো কী তা হলে?

☙ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ এবং সহজাত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সংগতিপূর্ণ হতে হবে গ্রন্থটাকে। যেমন ধরুন, কোনো গ্রন্থ যদি বলে ঈশ্বর হলেন এক চল্লিশ পা বিশিষ্ট হাতি, আপনি চোখ বন্ধ করে বলতে দিতে পারেন এটা আল্লাহর বাণী না। কারণ, আল্লাহকে হতে হবে মহাজগতের উর্ধ্বে এবং স্বাধীন। একটা হাতির রূপ যা-ই হোক না কেন, এটা পরনির্ভর। এর শারীরিক বৈশিষ্ট্য সীমিত। সীমিত শারীরিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত প্রতিটা বস্তু পরনির্ভর। কারণ, এদের বাইরের কোনো উৎপাদক তাদের মাঝে এসব সীমাবদ্ধতা পুরে দিয়েছে। আল্লাহ প্রচলিত অর্থে 'শারীরিক' নন। আবার তিনি পরনির্ভরও নন। কাজেই, সীমাবদ্ধ শারীরিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত কোনো কিছুই আল্লাহ হতে পারে না (দেখুন অধ্যায় ৬)।

- এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু বাহিরে-ভেতরে সবদিক দিয়ে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। ২০ পৃষ্ঠায় যদি বলে ঈশ্বর একজন, আবার ৩৪০ পৃষ্ঠায় গিয়ে যদি বলে ঈশ্বর তিনজন, এটা হবে তা হলে অভ্যন্তরীণ অসংগতি। আবার ধরুন, যদি বলা হয় মহাজগতের বয়স ৬ হাজার বছর, বাহ্যিক-বিচারে সেটাও হবে অসংগতি। কারণ, বাস্তবতা বলে মহাজগৎ এর চেয়ে আরও অনেক পুরনো (তবে, বাস্তবতা সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলাতে পারে; দেখুন অধ্যায় ১২)।
- এ গ্রন্থে অবশ্যই থাকতে হবে কিছু পরাজাগতিক সংকেত। আকাশবাণীর মাঝে অবশ্যই এমন কিছু বিষয় থাকতে হবে, যা থেকে বোঝা যাবে এটা ঐশী—প্রাকৃতিকভাবে যা ব্যাখ্যার অযোগ্য। এক কথায়, এটা যে আল্লাহর তরফ থেকে, সে ব্যাপারে প্রমাণ থাকতে হবে।

কুরআন যে ঐশী গ্রন্থ, সে সম্বন্ধে সংকেত আছে এতে। প্রাকৃতিকভাবে এই গ্রন্থের কিছু কিছু নিদর্শন ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। এ ধরনের কিছু সংকতের মাঝে আছে:

- কুরআনের ভাষিক এবং সাহিত্যিক অতুলনীয়তা (দেখুন অধ্যায় ১৩)।
- কুরআনে এমন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আছে, যা তখনকার মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না কোনোভাবেই।
- এর সম্পূর্ণ ভিন্ন বিন্যাস ও কাঠামো।[২৬৩]

মোট কথা, মানুষের কাছে আল্লাহ যা বলেছেন, তা জানার একমাত্র উপায় যেহেতু বহিরাগত আকাশবাণী, এবং কুরআনই যে সেই আকাশবাণী তা যদি প্রমাণ করা যায়, তা হলে আল্লাহ সম্বন্ধে এটা যা বলে তা সত্য। তাঁর একত্বের ব্যাপারে কুরআন সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে: "পূর্বের ধর্মগ্রন্থদের অনুসারীদের সঙ্গে সম্ভাব্য সেরা উপায়ে যুক্তিতর্ক করবে; তবে ওদের মাঝে যারা জুলুমবাজ তাদের সঙ্গে নয়। আর বলবে, 'আমাদের কাছে এবং আপনাদের কাছে যা প্রত্যাদেশ হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি। আমাদের ইলাহ এবং তোমাদের ইলাহ একজনই। আমরা তাঁর প্রতি সমর্পিত'।"[২৬৪]

আল্লাহর একত্ব প্রমাণে কিছু যুক্তি এগুলো। এ বিষয়টা যদি সত্যিকার অর্থে বুঝে নেয় কেউ, মানুষের বিবেকে তা গভীরভাবে নাড়া দেয়। এক আল্লাহ যদি সৃষ্টি করে থাকেন আমাদের, তার মানে সবকিছুই আমাদের দেখা দরকার তাঁর একত্বের আলোকে; আমাদের অনৈক্য আর বিভাজনের চোখে না। আমরা এক মানব-পরিবার। এই চিন্তা আমাদের সমাজকে বদলে ফেলতে পারে যুগান্তকরভাবে। আমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসি, তাঁকে বিশ্বাস করি, তা হলে তিনি যত-যা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর প্রতি

মমতা আর দয়া দেখানো জরুরি হয়ে পড়ে আমাদের জন্য। আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন:

> "যারা দয়াময়, সবচে দয়াবান তাদের দয়া করবেন। দুনিয়ার বুকে যা কিছু আছে, সেগুলোর প্রতি দয়াময় হও। আকাশে যিনি আছেন, তিনিও তা হলে তোমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন।"[২৬৫]

অধ্যায় ১১

বিপদ-আপদ এবং খারাপ সম্বন্ধে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ছোটবেলায় যতবার দাদার হুইস্কি খাওয়ার চেষ্টা করতাম, ততবার বাবা-মা'র বকা খেতাম।

হুইস্কি যারা দেখেছেন তারা তো জানেন, কী ঘন সোনালি এক পানীয়। কারও চোখ ওদিকে না গিয়ে পারে না। আমিও দাদাকে খেতে দেখে চোখ ফেরাতে পারতাম না। লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করতাম। আর বেশির ভাগ সময়েই ধরা পড়ে বাবা-মা'র বকা খেতাম। কেন যে তারা শুধু শুধু বকেন, সেটা বুঝতে পারতাম না। কত খারাপ ধারণা করতাম তাদের নিয়ে মনে মনে! তবে বড় হওয়ার পর বুঝি, কেন তারা বারণ করতেন। আমার তখনকার পাকস্থলী ও কলজে ৪০ শতাংশ অ্যালকোহল ভরা পানীয় সহ্য করার অবস্থায় ছিল না। কিন্তু সেই বয়সে আমি তো এটা জানতাম না। তাই বুঝতে পারিনি কেন আমার বাবা-মা নিষেধ করতেন আমাকে।

দুনিয়াতে যেসব দুঃখ-কষ্টের ঘটনা ঘটে, অন্যায়-অবিচার হয়, সেসব নিয়ে আল্লাহ সম্বন্ধে নাস্তিকদের ধারণাও ঠিক এমন।

মানুষের কষ্ট-যাতনা কিংবা তাদের ওপর হওয়া অন্যায়-অবিচারকে ছোট করে দেখার জন্য আমার ছোটবেলার ঘটনাটি বলিনি এখানে। মানুষ হিসেবে অন্যের প্রতি দরদি তো হতেই হবে। ভাবতে হবে তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উপায়। ছোটবেলার ঘটনাটা বলেছি আসলে একটা ধারণাগত বিষয় তুলে ধরতে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর অনেক নাস্তিকের উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা খাঁটি। সেই চিন্তা থেকেই তারা বলে থাকেন, দুনিয়াতে ঘটে চলা অন্যায়-অবিচার আর দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে একজন মহাশক্তিধর, দয়াময়[২৬৬] ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানানসই না। তিনি যদি দয়াময়ই হবেন, তা হলে তো তিনি চাইবেন অন্যায় আর যাতনা থামাতে। আর তিনি যদি মহাশক্তিধরই হবেন, তা হলে তো অবশ্যই এসব থামাতে পারার ক্ষমতা তাঁর আছে।

কিন্তু যেহেতু অন্যায়-অরাজকতা চলছে, কষ্ট-যাতনার অন্ত নেই, তার মানে হয় তিনি মহাশক্তিধর নয়, অথবা দয়াবান নয়; কিংবা দুটোর কিছুই না তিনি।

অন্যায় ও দুর্দশা-কেন্দ্রিক নাস্তিকদের এই যুক্তি খুবই দুর্বল। কারণ, দুটো বড় ধরনের মিথ্যা অনুমান থেকে এমন যুক্তি দেন তারা। প্রথম দুর্বলতা আল্লাহর প্রকৃতি নিয়ে। কুরআনে আল্লাহর যত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা আছে, সবগুলোকে বাদ দিয়ে কেবল দয়াবান এবং মহাশক্তিধর—এই দুটো বৈশিষ্ট্যকে আলাদা করা হয় এখানে। দ্বিতীয় দুর্বলতা: তাদের ধারণা, আল্লাহ কেন অন্যায় এবং দুর্দশা চলতে দেন, তা বোঝার কোনো সামর্থ্য তিনি আমাদের দেননি।[২৬৭] কিন্তু তা ঠিক নয়। আল্লাহ কেন অন্যায়-দুর্দশা ঘটতে দেন, সে সম্বন্ধে বহু কারণ খুঁজে পাওয়া যায় ইসলামি প্রত্যাদেশে। আসুন তবে নাস্তিকদের এই দুটো অনুমান নিয়েই কথা বলি।

আল্লাহ কি শুধুই দয়াবান ও মহাশক্তিধর?

কুরআন বলে, আল্লাহ 'আল-কাদীর', মানে মহাশক্তিধর। তিনি 'আর-রাহমান', মানে সবচে দয়াবান; এবং মমতাবানও। ইসলাম বলে মানুষ যেন মহাশক্তিধর, দরদি এবং কল্যাণকামী এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু নাস্তিকেরা মোটাদাগে আল্লাহর সর্বাঙ্গীণ ইসলামি ধারণার ভুল ব্যাখ্যা করেন। তিনি কেবলই সবচে দয়াবান ও মহাশক্তিধর নন; তাঁর আছে আরও অনেক নাম ও বিশেষত্ব। এগুলো সবকিছু মিলিয়েই আল্লাহর একত্ব (দেখুন অধ্যায় ১৫)। যেমন, তাঁর একটি নাম 'আল-হাকীম', মানে মহাবিজ্ঞ। বিজ্ঞতা যেহেতু আল্লাহর প্রকৃতির একটা অংশ, কাজেই তিনি যা কিছুই ইচ্ছে করেন না কেন, তাতে অবশ্যই থাকবে ঐশী বিজ্ঞতার ছাপ। অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা দিয়ে যখন কিছু ব্যাখ্যা করা যায়, তার মানে এটা ঘটার পেছনে কারণ আছে। তো, নাস্তিকদের এই যুক্তি আল্লাহকে কেবল দুটো বিশেষত্বের ঘেরাটোপে চিন্তা করে। আল্লাহ সম্বন্ধে ইসলামি ধারণাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেন তারা। এভাবে তারা জড়িয়ে পড়েন অবান্তর একমুখী সংলাপে।

'দ্য ইয়াং অ্যাথিইস্ট'স হ্যান্ডবুক' বইয়ের লেখক আলম শাহ্‌া অন্যায় ও দুঃখ-দুর্দশার ঐশী ব্যাখ্যাকে বলেছেন, বুদ্ধিবৃত্তিক অজুহাত:

> "বেশির ভাগ সাধারণ বিশ্বাসীকে অন্যায়-অবিচারের সমস্যাটা হতবুদ্ধি করে দেয়। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, তারা সাধারণত উত্তর দেন, 'আল্লাহর লীলাখেলা বোঝা দায়' বলে। কখনো কখনো তারা বলেন, 'দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করেন'। এর জবাবে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'এভাবে অন্যায়মূলকভাবে কেন আমাদের পরীক্ষা করতে হবে তাঁকে?', জবাবে পাওয়া যায়, 'আল্লাহর লীলাখেলা বোঝা দায়'। এই হলো ব্যাপার।"[২৬৮]

অন্য অনেক নাস্তিকের মতো আলম অজ্ঞতামূলক যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি ঐশী বিজ্ঞতা ধরতে পারছেন না বলে এটা নেই তা তো না। বাচ্চাদের কথা হলে ভিন্ন কথা। বেশি বেশি চকলেট খাওয়ার জন্য অনেক বাচ্চাই বাবা-মা'র বকা শোনে। বাবা-মাকে তখন খুব খারাপ মনে হয় তাদের। চিৎকার করে, কান্না করে, হাত-পা ছুড়ে দাপাদাপি করে। কিন্তু কেন যে তার বাবা-মা না করল, সেটা তারা বোঝে না তখন (যেমন বেশি মিষ্টিজাতীয় খাবার দাঁতের জন্য ক্ষতিকর)।

নাস্তিকদের এমন দাবি আল্লাহর প্রকৃতি ও সংজ্ঞাকেও বোঝে ভুলভাবে। আল্লাহ যেহেতু পরাজাগতিক সত্তা, সর্বজ্ঞ এবং বিজ্ঞ, কাজেই সসীম মানুষ যে ঐশী প্রজ্ঞার সবকিছু বুঝে উঠবে না, সেটাই তো স্বাভাবিক। আমরা যদি তাঁর প্রজ্ঞাকে পুরোপুরি বুঝতেই পারতাম, তা হলে আমাদের আর তাঁর মাঝে পার্থক্য হতো কোথায়? এমন উদ্ভট কথা বলে অস্বীকার করা হয় আল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক প্রকৃতিকে। তাঁকে নামিয়ে ফেলা হয় মানুষের স্তরে। কিন্তু বিশ্বাসী মুসলিমেরা সৃষ্ট কোনো সসীম আল্লাহতে বিশ্বাস করেন না। ঐশী প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করা মানেই বুদ্ধিবৃত্তিক অজুহাত দেওয়া নয়। কারণ, কোনো রহস্যজনক অজ্ঞাত কিছুর ধরনা দেওয়া হয় না এখানে। বরং আল্লাহর আসল প্রকৃতি সত্যিকারভাবে বুঝে অনিবার্য যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসা হয়। আল্লাহর কাছে আছে গোটা ছবি, আমাদের কাছে আছে ছোট্ট এক পিক্সেল।

প্রথম অধ্যায়ে একটা জিনিসের উল্লেখ করেছিলাম। অন্যায় ও দুঃখ-দুর্দশার যুক্তিটি 'আত্মঅহংবাদিতা' নামক নাস্তিকদের মননগত এক পক্ষপাতকে ফাঁস করে। নিজেদের চোখে ছাড়া অন্য চোখে কিছু দেখতে পারে না এধরনের লোকজন। কোনো কোনো নাস্তিক মননগত এই পক্ষপাতে জর্জরিত। অন্যায় ও দুঃখ-দুর্দশার পেছনে কোনো ভালো কারণ থাকতে পারে—এ কথা যারা বুঝতে পারেন না, তাদের প্রত্যেকেরই এই সমস্যা আছে। এজন্য তারা আল্লাহকে অস্বীকার করেন। তাদের মতে, অন্যায় ও দুঃখ-দুর্দশা ঘটানোর অনুমতি দেওয়ার কারণে তাঁর সমর্থন করা যায় না। আল্লাহর যদি ন্যায্যতা না-ই থাকে, তাঁর দয়া আর শক্তি নিছক মায়া। সুতরাং ঈশ্বরের চিরাচরিত ধারণা বাতিল।

কিন্তু এখানে আসলে নাস্তিকেরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আল্লাহর ধারণার ওপর চাপিয়েছেন। মানুষ যেভাবে ভাবে, আল্লাহরও সেভাবে ভাবা উচিত—তাদের কথা অনেকটা এমন। কিন্তু এটা তো অসম্ভব। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের তুলনা হয় কীসে? তিনি অতিপ্রাকৃতিক এক সত্তা। বিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পুরো আধার তাঁর কাছে। সে তুলনায় মানুষ কী?

এ জায়গায় এসে নাস্তিকেরা বলতে পারেন, আসল সমস্যাটা বুদ্ধিবৃত্তিক চাতুরতায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আস্তিকেরা যদি বলেন, আল্লাহর প্রজ্ঞা এতই বিশাল যে তা

পুরোপুরি বোঝা সম্ভব না, তা হলে যেকোনো 'রহস্যজনক' কিছুকে আমরা ঐশী প্রজ্ঞার ধোঁয়া তুলে ব্যাখ্যা করতে পারি। তাদের এই জবাবের সাথে আমি সহানুভূতিশীল। কিন্তু অন্যায় এবং দুঃখ-দুর্দশার প্রসঙ্গে তাদের এই যুক্তি মিথ্যা।

নাস্তিকেরাই তো শুরুতে আল্লাহর গুণাবলিকে আশ্রয় করেছেন। সেজন্য তাদের তো উচিত ছিল তাঁর সবগুলো গুণকেই পাশে রেখে কথা বলা। কেন শুধু শক্তি আর দয়া? প্রজ্ঞার মতো অন্য গুণাবলিকেও যদি তারা মাথায় রাখতেন, তা হলে তো শুরুতেই কোমর ভেঙে যায় এই যুক্তির। কারণ, তখন তাদের দেখাতে হতো দুর্দশা আর অন্যায়ে ভরা এক দুনিয়া কীভাবে ঐশী প্রজ্ঞার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সেটা। কিন্তু এটা প্রমাণ করা অসম্ভব। কারণ, আমাদের বাস্তব জীবনে এমন অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে, যেখানে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতার পরিচয় পাই। আমরা আত্মসমর্পণ করি আমাদের বোধের অগম্য প্রজ্ঞার কাছে। অনেক সময়ই আমরা যেসব বাস্তবতাকে যৌক্তিকভাবে মেনে নিই, তা বুঝতে পারি না। এই যেমন, ডাক্তারের কাছে গেলে তাকে একক কর্তৃপক্ষ বলে স্বীকার করি। আমরা তার চিকিৎসায় আস্থা রাখি। তিনি যে ওষুধ দেন তা মেনে নিই বিনাপ্রশ্নে। এরকম আরও বহু উদাহরণ থেকে বুঝি, আল্লাহর প্রজ্ঞাকে উল্লেখ করে সমস্যাটা এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। বরং, তিনি যা, তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে সেভাবেই। কেবল দুই-একটা গুণাবলিতে আটকে রাখা হয়নি তাঁকে। তিনি যেহেতু সর্বজ্ঞ, তাঁর নাম ও গুণাবলিগুলো যেহেতু সর্বোচ্চ অর্থে পরম, কাজেই তিনি যত-যা করেন, তার সবকিছুর পেছনেই আছে প্রজ্ঞা—আমরা তা বুঝি কি না বুঝি।

আমাদের অনেকেই তো বুঝি না বিভিন্ন রোগব্যাধি কীভাবে ছড়ায়। কিন্তু তাই বলে কি ওগুলো নেই?

অসামান্য সব কাহিনি আর আখ্যান দিয়ে কুরআন গেঁথে দেয় এই ভাবনাগুলো। নবি মূসা ﷺ এবং খিজিরের ঘটনাটিই দেখুন। প্রথমে মূসা নবি তাঁকে এমন কিছু কাজ করতে দেখেন, যা বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল রীতিমতো অন্যায়। কিন্তু মহামতি খিজির

প্রথম থেকেই এসব ঘটনার পেছনের যেসব কারণ জানতেন। মূসা নবি ﷺ যেইমাত্র তা জানতে পারলেন, সাথে সাথে বুঝে গেলেন সব:

"নিজেদের ফেলে আসা পায়ের ছাপ দেখে দেখে পেছনে ফিরে চলল তারা। যেতে যেতে তারা খুঁজে পেল আমার এক বান্দাকে। আমার তরফ থেকে তাকে আমি দিয়েছিলাম দয়া, শিখিয়েছিলাম জ্ঞান।

"মূসা তাকে বলল, 'আপনাকে সঠিক পথের যে-জ্ঞান শেখানো হয়েছে, তার কিছু শেখার জন্য কি আমি অনুসরণ করতে পারি আপনার?'

"সে বলল, 'আপনি তো আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। যে-বিষয়গুলো আপনার জ্ঞানের বাইরে, সেসব বিষয়ে ধৈর্য রাখবেনই-বা কীভাবে!'

"'আল্লাহ্ চান তো, আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। কোনোভাবে আপনার অন্যথা হবে না।'

"'ঠিক আছে, যদি অনুসরণ করেনই—আমি নিজে থেকে কিছু না বললে আমাকে কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন না।'

"তারা চলতে শুরু করলেন। পথে এক নৌকায় উঠে এর তলা ফুটো করে দিলেন। মূসা বলল, 'কী আশ্চর্য, কেন ফুটো করলেন? আপনি কি নৌকার যাত্রীদের ডুবোতে চান? খুব খারাপ করলেন কাজটা আপনি।'

"লোকটি বলল, 'আমি কি বলিনি, আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না!'

"'মাফ করবেন। ভুলে গিয়েছিলাম। আপনাকে অনুসরণের কাজটি আমার জন্য আর কঠিন করবেন না।'

"এরপর তারা আবার শুরু করল পথচলা। সামনে এক বালককে পেয়ে হত্যা করল লোকটি। মূসা বলল, 'সে কী! এক নিরপরাধ ছেলেকে কীভাবে হত্যা করতে পারলেন আপনি? সে তো কাউকে খুন করেনি। খুব জঘন্য একটা কাজ করেছেন আপনি।'

"লোকটি বলল, 'আমি কি বলিনি, আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না!'

"'এরপর যদি আর একটা প্রশ্নও করি, আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। আমার কাছ থেকে আপনি একটা কারণ পেলেন।'

"আবার শুরু হলো তাদের পথচলা। যেতে যেতে তারা পৌঁছাল এক নগরে। বাসিন্দাদের কাছে কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু ওরা তাদের মেহমানদারি করল না। তারা দেখল একটা দেওয়াল যেন প্রায় পড়েই যাচ্ছে। লোকটি সেটা ঠিক

করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি কিন্তু চাইলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিকও নিতে পারতেন।'

"লোকটি বলল, 'আপনার সঙ্গে এখানেই আমার সাঙ্গ হলো। যে-বিষয়গুলোতে ধৈর্য ধরে রাখতে পারছিলেন না, সেগুলো এখন জানাচ্ছি আপনাকে।'

"'ওই নৌকোটা ছিল কিছু গরিব লোকের। সাগরে ওটা দিয়েই জীবিকার ব্যবস্থা হতো তাদের। এক রাজা জোরপূর্বক সব ভালো নৌকো ছিনিয়ে নিচ্ছিল। তাই ওটার তলা ফুটো করে দিয়েছিলাম।

"'ছোট ছেলেটার বাবা-মা ছিলেন নিখাদ বিশ্বাসী। সে তার অন্যায়-অবাধ্যতা আর অবিশ্বাস দিয়ে তাদের ক্ষতি করবে বলে আশঙ্কা করেছি। আমি চাইলাম, এর বদলে তাদের প্রভু অনেক পবিত্র এবং বেশি দরদি কোনো সন্তান দিন।'

"'আর দেওয়ালটি ছিল দুই এতিম ছেলের। ওর নিচে লুকানো ছিল ওদের সম্পদ। তাদের বাবা ছিলেন খুবই ধার্মিক এক ব্যক্তি। তোমার প্রভুর ইচ্ছা ছিল, ওরা বড় হয়ে নিজেদের সম্পদ খুঁড়ে বের করুক তোমার প্রভুর তরফ থেকে দয়া হিসেবে। এগুলোর কোনো কিছুই আমি নিজের খেয়ালে করিনি। আপনি যেসব বিষয়ে ধৈর্য ধরে রাখতে পারছিলেন না, এই হলো তার ব্যাখ্যা'।"[২৬৯]

আল্লাহর প্রজ্ঞার তুলনায় আমাদের সসীম জ্ঞানবুদ্ধির ব্যাপারটা তো আছেই, এই কাহিনিতে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খোরাক পাই আমরা।

আল্লাহর ইচ্ছেকে বুঝতে হলে বিনয়ী হতে হবে আমাদের। মূসা ﷺ জানতেন, খিজিরকে আল্লাহ এমন কিছু জ্ঞান দিয়েছেন যা তার নেই। ভদ্রতার সাথে তিনি বলেছিলেন সেসবের কিছু জ্ঞান তাকে শিখিয়ে দিতে। খিজির তার ধৈর্য নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু মূসা নবি তাকে আশ্বস্ত করেছেন কথার ব্যত্যয় হবে না। (ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে মূসা নবির মর্যাদা খিজিরের উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন একাধারে নবি ও রাসূল। তারপরও বিনয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন খিজিরের সঙ্গে।)

এ-ঘটনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে: জগতের অন্যায়-অবিচার আর দুঃখ-দুর্দশাকে মানসিকভাবে সামলাতে ধৈর্যের প্রয়োজন। খিজির জানতেন মূসা তাঁর সাথে সবুর করে থাকতে পারবেন না। কারণ, তিনি এমন কিছু কাজ করবেন, বাইরে থেকে দেখলে যেগুলোকে মূসা অন্যায় মনে করবেন। তিনি সবুর করে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন বটে। কিন্তু কাজগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য অন্যায় দেখে নিজের রাগ সংবরণ করতে পারেননি। সবশেষে অবশ্য খিজির সবগুলো ঘটনার পেছনে ঐশী প্রজ্ঞা ব্যাখ্যা করেছেন। জগতের অন্যায় এবং দুঃখগুলোকে সামলাতে গেলে আমাদের মাঝেও দরকার অনুরূপ বিনয় ও ধৈর্য।

উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কালজয়ী মনীষী ইবনু কাসীর বলেছেন, আপাত অন্যায় ও দুঃখ-যাতনার পেছনের বাস্তবতা সম্বন্ধে খিজিরকে জ্ঞান দিয়েছিলেন আল্লাহ; মূসা নবিকে সেটা দেওয়া হয়নি। "আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না।"—খিজিরের একথা সম্বন্ধে ইবনু কাসীর লিখেছেন,

> "আপনার কানুন-বিরোধী কাজ করতে দেখলে আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না আপনি। কারণ, আল্লাহ আমাকে যে-জ্ঞান দিয়েছেন, আপনাকে তা দেননি। আপনাকে যে-জ্ঞান দিয়েছেন আমাকে আবার তা দেননি।"[২৭০]

মোট কথা, আল্লাহ প্রজ্ঞা অসীম এবং পূর্ণ। অন্যদিকে আমাদের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান—যাই বলি না কেন, সামান্য। তাঁর কাছে আছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ ভান্ডার। আমাদের আছে ছিটেফোঁটা। সেই আংশিক জ্ঞান দিয়ে দেখি আমরা। আত্মঅহংবাদের ফাঁদে পড়ার মানে কোনো ধাঁধার একটা অংশ জেনেই পুরোটা জানার দাবি করার মতো। আর তাই, 'যে-বিষয়গুলো আপনার জ্ঞানের বাইরে, সেসব বিষয়ে ধৈর্য রাখবেনই-বা কীভাবে!'—একথার ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর বলেছেন, এর মানে এমন এক ঐশী প্রজ্ঞা, আমাদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই: "আমি জানি, আপনি ন্যায্যভাবেই আমার নিন্দা করবেন। কিন্তু আল্লাহর প্রজ্ঞা ও গুপ্ত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে-জ্ঞান আমার আছে, তা নেই আপনার।"[২৭১]

সবকিছুই মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাসটি যে কতটা জোর দেয় মনে, চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, আল্লাহর প্রজ্ঞা তাঁর সুনিপুণতা এবং কল্যাণকাঙ্ক্ষার মতো অন্যান্য গুণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। তার মানে, অন্যায় ও যাতনাগুলো ঐশী উদ্দেশ্যের একটা অংশ। চতুর্দশ শতাব্দীর মনীষী ইবনু তাইমিয়্যা অল্প কথায় সে বিষয়টা তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে: "পরম খারাপ বলে কিছু সৃষ্টি করেন না আল্লাহ। কল্যাণের নিরিখে তাঁর সৃষ্ট সবকিছুতেই থাকে এক প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য। তবে, হতে পারে কিছু লোকের জন্য সেখানে কিছু অকল্যাণ আছে। এটা আংশিক, আপেক্ষিক অকল্যাণ। সম্পূর্ণ বা পরম অকল্যাণের বেলায় আল্লাহ দায়মুক্ত।"[২৭২]

আগের অধ্যায়ে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধকে কিন্তু বাতিল করে না এই ধারণা। সবকিছুই যদি চূড়ান্ত কল্যাণের নিমিত্ত হয়, অন্যায় যদি 'আংশিক' হয়, তা কিন্তু ব্যক্তিনিরপেক্ষ অন্যায়ের ধারণাকে খারিজ করে না। আমরা দেখেছি, ব্যক্তিনিরপেক্ষ অন্যায় পরম নয়; এটা বরং নির্দিষ্ট পরিবেশ এবং নিয়ামকের সাপেক্ষে খারাপ। সুতরাং, কোনো কিছু ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে খারাপ হতে পারে নির্দিষ্ট নিয়ামক বা পরিবেশের সাপেক্ষে। আবার একই সাথে কল্যাণময় ও প্রজ্ঞাময় চূড়ান্ত ঐশী উদ্দেশ্যের অংশও হতে পারে।

ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: "সুমহান আল্লাহ যদি সবকিছুর স্রষ্টা হন, তা হলে ওগুলোর মাঝে যে-প্রজ্ঞাপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে তার নিরিখেই তিনি সৃষ্টি করেন ভালো আর খারাপ। আর একারণেই তাঁর কাজকর্মগুলো কল্যাণময় এবং নিখুঁত।"[২৭৩]

Essay sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya শীর্ষক প্রবন্ধে আঁরি লাস্তও এই কথা বলেছেন:

> "আল্লাহ মূলত তত্ত্বাবধায়ক। জগতে আসলে খারাপের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। যা কিছু আল্লাহ ইচ্ছে করেন, তা এক সার্বভৌম সুবিচার এবং অপরিসীম কল্যাণের সাথে সুসংগতিপূর্ণ। তবে শর্ত হচ্ছে, এগুলোকে সমগ্রতার বিচারে দেখতে হবে। বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁর সৃষ্টির যে খণ্ডিত এবং অপূর্ণ জ্ঞান আছে, তার ভিত্তিতে নয়...।"[২৭৪]

অন্যায় এবং দুঃখ-দুর্দশার কী কারণ দিয়েছেন আল্লাহ?

আমরা যদি বলতে পারি, কেন আল্লাহ অন্যায় ও দুর্গতি হতে দেন, তা হলে দ্বিতীয় আপত্তিটার একটা মোক্ষম জবাব দেওয়া যাবে। আনন্দের বিষয়, ইসলামি জ্ঞানভান্ডারে এ সম্বন্ধে প্রচুর কারণ আছে আমাদের জন্য।

আমাদের উদ্দেশ্য উপাসনা

ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগ মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহকে জেনে, তাঁর উপাসনায় নিবেদিত হয়ে এক গহন মানসিক শান্তি অর্জনই মূল উদ্দেশ্য (দেখুন অধ্যায় ১৫)। ঐশী এই উদ্দেশ্য পূরণে লাভ হবে অনন্তকালের সুখ আর সত্যিকার আনন্দ।

এটাই যদি হয় আমাদের মূল উদ্দেশ্য, মানবজীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতাগুলো তখন গৌণ। কুরআন বলছে, "জিন ও মানবজাতিকে আমি কেবল আমার উপাসনার জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[২৭৫]

ধরুন, একজন মানুষ কখনো কোনো অন্যায়ের স্বীকার হননি। কোনো কষ্টযাতনা ভোগ করেননি। সব সময় কাটিয়েছে সুখের সাগরে। এভাবে থাকতে থাকতে তিনি ভুলে গেছেন আল্লাহকে। বিসর্জন দিয়েছেন নিজেকে সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যকে। অন্যদিকে অপর এক মানুষের কষ্টগুলো তাকে নিয়ে গেছে আল্লাহর কাছে। পূরণ করিয়েছে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ইসলামি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যে-মানুষ কখনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেনি, যার সুখ তাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, এমন মানুষের চেয়ে যে-মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা তাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে গেছে, সে ঢের ভালো।

জীবন এক পরীক্ষা

আমাদের যাচাই করাও সৃষ্টির এক উদ্দেশ্য। জীবনে দুঃখ ভোগ, কষ্টকর সময় পার হওয়া এই যাচাইকরণের এক অংশ। এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, জান্নাতের চিরসুখ লাভ সহজ হয়। কুরআন বলেছে মৃত্যু ও জীবন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, "যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, কাজে-কর্মে তোমাদের মাঝে কে সেরা। তিনি মহাশক্তিধর, বারংবার ক্ষমাশীল।"[২৭৬]

জগতে আমাদের অস্তিত্বকে, একেবারে মৌলিক পর্যায়ে ভুল বোঝেন নাস্তিকেরা। আমাদের আচার-আচরণকে যাচাই করতে এবং আমাদের মাঝে সুন্দর সব গুণাবলি অর্জন করতে এই দুনিয়া এক পরীক্ষাগার। জীবনে যদি ধৈর্যের পরীক্ষা না-ই দিতে হয় কখনো, তবে ধৈর্যগুণ লাভ করবেন কীভাবে? কোনো বিপদের মুখোমুখি যদি না হই, তবে সাহসী হবেন কীভাবে? কেউ যদি মমতার কাঙালই না হয়, তবে আপনি মমতাগুণ ঝরাবেন কার উপরে? জীবন এক পরীক্ষা হলেই কেবল উত্তর পাওয়া যায় এসব প্রশ্নের। আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চ্যালেঞ্জ থাকা দরকার। আমরা এখানে ভোগবিলাস করতে আসিনি; ওটা জান্নাতে হবে।

এ-জীবন কেন পরীক্ষার হল?

আল্লাহ যেহেতু পরিপূর্ণ কল্যাণময়, তিনি চান আমাদের সবাই যেন তাঁকে বিশ্বাস করে জান্নাতে তাঁর সান্নিধ্যে হাসিল করতে পারি চিরস্থায়ী আনন্দ। আমাদের সবার জন্যই যে তিনি বিশ্বাসকে পছন্দ করেন তা স্পষ্ট করে বলেছেন, "তাঁর বান্দাদের জন্য তিনি কুফরকে সমর্থন করেন না।"[২৭৭]

এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে বোঝা যায়, মহান আল্লাহ চান না কেউ জাহান্নামে যাক। কিন্তু, তাই বলে সবাইকে যদি জান্নাতে পাঠাতেন, তা হলে সুবিচারের নামগন্ধ হারিয়ে যেত। তখন মূসা নবি আর ফিরাউন, হিটলার আর ঈসা নবিকে মাপা হতো একই পাল্লায়। জান্নাতে যারা যাবে, তারা যেন যোগ্যতাগুণে যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য একটা প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এ-জীবন যে কেন পরীক্ষার হল তা বোঝা যায় এ থেকে। সত্যিই কারা চির সুখ লাভের যোগ্য, তা যাচাই করার এক নিক্তি এই জীবন। আর তাই নানা দ্বন্দ্বমুখর সংঘাতে পূর্ণ আমাদের জীবন। এগুলো পরীক্ষা করে আমাদের কাজকর্ম, আমাদের নিয়ত।

এদিক থেকে দেখলে ইসলাম আমাদের মনে অন্যরকম এক শক্তি জোগায়। অন্যায়-অবিচার, ক্ষতি, সমস্যা—এগুলোকে সে দেখে পরীক্ষা হিসেবে। আমাদের আনন্দ-বিনোদনের সুযোগ আছে অবশ্যই, তবে আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর আরাধনা। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলো যদি আল্লাহর মমতার নিদর্শন হয়,

তা হলে এগুলো কী আমাদের মনে অন্যরকম শক্তি জোগায় না? নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তাকে পরীক্ষা করেন।"[২৭৮]

জান্নাতের অনন্ত আনন্দ অর্জনের এক বীথিকা এ-জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলো। এজন্য আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন, তাদের পরীক্ষা করেন। তাঁর সেই ঐশী ভালোবাসা আর মমতার চূড়ান্ত ঠিকানা জান্নাত। কুরআনে বেশ সুন্দরভাবে আল্লাহ বলেছেন একথাগুলো: "তোমাদের আগেকার মানুষদের মতো দুঃখ ভোগ না করেই কি জান্নাতে যাবে বলে ভেবেছ? দুর্ভাগ্য আর দুর্দশায় তারা এতটাই জর্জরিত ছিল, এমনকি ওদের রাসূল আর তার সঙ্গী-বিশ্বাসীরা পর্যন্ত ফরিয়াদ করেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য আর কখন আসবে?' আল্লাহর সাহায্য খুব কাছেই।"[২৭৯]

ইসলামের সৌন্দর্যের দিক কী, আমাদের ভালোমন্দ আমাদের চেয়েও ভালো জানেন আল্লাহ। আগেভাগেই আমাদের মনে তিনি শক্তি জুগিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন কী করলে মুক্তি পাবো এসব দুর্দশা থেকে: "আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপান না।"[২৮০]

সর্বোচ্চ চেষ্টার পরেও যদি দুর্দশা কাটাতে না পারি, তবু যে পূর্ণ প্রতিদান পাবো তা নিশ্চিত করে আল্লাহর মমতা ও সুবিচার। হয় তা হবে এই দুনিয়ায়, অথবা পরজীবনে।

আল্লাহকে জানা

অন্যায়-অবিচার, দুঃখ-দুর্দশাগুলো আমাদেরকে সাহায্য করে আল্লাহর বিশেষত্বগুলো বুঝতে। অসুখে যদি না-ই ভুগি, তা হলে তিনি যে নিরাময়দাতা, সেই বৈশিষ্ট্যের কদর বুঝব কীভাবে? ইসলামে তাই আল্লাহকে জানলে সাময়িক দুর্গতিতে পড়ে যে-কষ্ট পোহাই তা যেন উজিয়ে যায়। কারণ, এতে আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়। নিয়ে যায় জান্নাতে।

বৃহত্তর কল্যাণ

অন্যায় ও দুঃখভোগের কারণে বৃহত্তর কল্যাণ আসে। এর অন্য নাম দ্বিতীয় মাত্রার কল্যাণ। প্রথম মাত্রার কল্যাণ হচ্ছে শারীরিক সুখ ও আনন্দ। আর প্রথম মাত্রার অকল্যাণ হচ্ছে শারীরিক যন্ত্রণা ও দুঃখ।

সাহসিকতা বিনয়, ধৈর্য—এগুলো দ্বিতীয় মাত্রার কল্যাণের কিছু উদাহরণ। এখন প্রথম মাত্রা অকল্যাণ (যেমন কাপুরুষতা) না থাকলে দ্বিতীয় মাত্রার কল্যাণ (যেমন সাহসিকতা) আসবে কীভাবে? কুরআন মোতাবেক সাহসিকতা ও বিনয়ের মতো গুণের সঙ্গে খারাপের তুলনা হয় না: "ওদের বলো, 'ভালোর সঙ্গে খারাপের তুলনা হয়

না—তা সে-খারাপের আধিক্য তোমাকে যতই ধাঁধিয়ে দিক না কেন। বুঝদার লোকেরা, সফল হতে হলে আল্লাহর প্রতি সচেতন হও।"[২৮১]

স্বাধীন ইচ্ছা

আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা। এর মানে ভালো ও খারাপ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে আমাদের। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যেসব খারাপ কাজ করে তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে এখানে। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, আল্লাহ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিলেনই-বা কেন? আমাদের জীবন-পরীক্ষাগুলো অর্থবহ হতে হলে স্বাধীন ইচ্ছে থাকার দরকার অবশ্যই। পরীক্ষার হলে ছাত্রকে দিয়ে জোর করে যদি সঠিক উত্তরই দেওয়ানো হতো, তা হলে আর সেই পরীক্ষার কী মানে? ঠিক সেভাবে জীবনের পরীক্ষায়, মানুষকে তার নিজের মনমতো কাজ করতে দিতে হলে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া জরুরি ছিল।

আমরা যেন ভালোটা বেছে নিই, তা যদি আল্লাহ সব সময় নিশ্চিত করতেন, তা হলে ভালো-খারাপের কোনো দাম থাকত না আর। ধরুন, কেউ গুলিভরা পিস্তল মাথায় ঠেকিয়ে আপনাকে দান করতে বলল। আপনি বাধ্য হয়ে কিছু টাকা দান করলেন। এর কি কোনো নৈতিক মূল্য আছে?

নেই।

কোনো সত্তা নিজ ইচ্ছায় কিছু করলেই কেবল মূল্য থাকে ভালো কাজের।

দুনিয়া-বিরাগ

আমাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য আল্লাহর আরাধনা, তাঁর কাছে আসা। এজন্য ক্ষণিকের এই দুনিয়া থেকে নিজেদের নিরাসক্ত করা অন্যতম মূলনীতি। আরবিতে পৃথিবীকে বলে দুনিয়া। শব্দটার মানেই নীচু বা হীনাবস্থা। যাবতীয় সীমাবদ্ধতা, যন্ত্রণা, ক্ষয়ক্ষতি, কামনা, অহং, অপচয় আর খারাপের জায়গা এটা। দুনিয়াবি যন্ত্রণা থেকেই বুঝি এর হীনাবস্থা। এ থেকে নিরাসক্ত হতে শিখি। কাছে আসি আল্লাহর।

প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, "সকল খারাপের শেকড় দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা।"[২৮২] আল্লাহর কাছে আসার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দুনিয়া-বিরাগ হওয়া অত্যাবশ্যক। এভাবেই লাভ হবে জান্নাত।

দুনিয়ার ক্ষণকাল আর মায়াবী ভোগবিলাসের কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে কুরআন: "জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন নিছক আমোদ-প্রমোদ, বিচ্যুতি, সাজসজ্জা, অন্যের ওপর দম্ভ এবং সয়সম্পদ আর সন্তান বাড়ানোর প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়।"[২৮৩]

যাহোক, সৃষ্টির ইতিবাচক দিকের সাথে যেন আবার দুনিয়ার ধারণাকে গুলিয়ে না ফেলি। সৃষ্টির ইতিবাচক দিকের মাঝে আছে এর সৌন্দর্য আর বিস্ময়। মানুষের ভাবনাচিন্তা আর উপলব্ধির খোরাক জোগায় এগুলো। এসবের পেছনে যে এক ঐশী শক্তি, দয়া আর প্রজ্ঞা আছে, জাগিয়ে তোলে সেই বিশ্বাস।

নিরপরাধ মানুষের যন্ত্রণাভোগ সাময়িক

বৃহত্তর ভালোর বিষয়টি মেনে নিলেও দেখা যায় কিছু মানুষ দিনের পর দিন বিনাঅপরাধে ভুগে চলছেন। ইসলামে তাই আল্লাহ শুধু এই দুনিয়াতে খারাপ এবং যন্ত্রণাকে ন্যায্যতা দেন না; এগুলো বরং পুষিয়েও দেন। দিনশেষে যন্ত্রণাভোগকারী নিরপরাধ প্রতিটি বিশ্বাসীকে দেওয়া হবে অনন্ত আনন্দের জান্নাত। যত দুঃখ-যন্ত্রণা তারা ভোগ করেছে দুনিয়ায়—এমনকি তা যদি হয় সারা জীবনও—সবকিছু মুছে যাবে আজীবনের তরে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন:

> "...পৃথিবীতে সবচে বেশি কষ্ট-ভোগ-করা এক জান্নাতযাত্রী লোককে নিয়ে এসে এক পলকের জন্য জান্নাতে পরশ দেওয়া হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'আদম-সন্তান, কখনো কষ্ট দেখেছ? জীবনে কখনো দুর্দশায় ছিলে?' সে বলবে, 'প্রভু গো কক্ষনো না। আল্লাহর কসম, আমি জীবনে কখনো কষ্ট পাইনি। কখনো দুর্দশা চোখে দেখিনি'।"[২৮৪]

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি

নাস্তিকতাবাদে অন্যায়ের কোনো উদ্দেশ্য নেই। পৃথিবীতে রাজত্ব করা উদ্দেশ্যহীন এই শক্তি কোনো বাছবিচার ছাড়া বাছাই করে তার শিকার। অন্যায় ও যন্ত্রণাভোগীদের কষ্ট উপশমে কোনো মানসিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই নাস্তিকতাবাদে। সে এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। কেউ সারা জীবন যন্ত্রণায় ভুগে ভুগে শেষ ঠিকানা নেবে মাটির গর্তে। জীবনভর এই যে তাদের এত যন্ত্রণাভোগ, এত ত্যাগ আর কষ্ট—এর কোনো দাম নেই তার কাছে। কখনো আগের কোনো কাজের পরিণাম হিসেবে ঘটে মন্দ কিছু। যারা দুর্ভোগ পোহায়, তাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকে না নাস্তিকতাবাদী দর্শনে। মানবীয় বা ঐশী—কোনো ধরনের ইচ্ছাকে তারা দায়ী করতে পারে না। কারণ সবকিছুকেই নাস্তিকেরা নামিয়ে আনেন উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো এবং যুক্তিহীন কিছু জড় ক্রিয়াকর্মে। নাস্তিকতাবাদের যৌক্তিক পরিণাম তাই খুবই হতাশাজনক।

বিশ্বাসীদের জীবনের অভিযাত্রাকে সুবিধাজনক করতে ইসলামে আছে বেশুমার মূলনীতি আর ভাবনা-ধারা। বিশ্বাসীদের আশা আর ধৈর্য দিয়ে শক্তি জুগিয়েছেন নবি

মুহাম্মাদ ﷺ। যত যন্ত্রণায় আমরা ভুগি, সবই আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির উপায়। জান্নাতের পথে এগিয়ে নেওয়ার নিমিত্ত। যেখানে গেলে ভুলে যাব আমরা অতীতের শত বঞ্চনা:

> "একজন মুসলিম যত বিপদেই পড়ুক—এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তার কিছু না কিছু অপরাধ মার্জনা করেনই; এমনকি যদি কাঁটা ফুটে তবুও।"[২৮৫]

> "বিশ্বাসীদের অবস্থা খুবই আশ্চর্যজনক! তার সব হালই ভালো। বিশ্বাসীদের ছাড়া আর কারও বেলায় হয় না এমন। তার কোনো কল্যাণ হলে সে কৃতজ্ঞ হয়—সেটা তো তার জন্য ভালোই। আবার ক্ষতি হলে সে সবুর করে—সেটাও তার জন্য ভালো।"[২৮৬]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুরারোগ্য ব্যাধির মতো বিষয়গুলোও দেখা হয় আশা, দয়া আর ক্ষমার চোখে। ইসলামে রোগব্যাধি মানে একধরনের আত্মশুদ্ধি। এগুলো মসৃণ করে অসুস্থ ব্যক্তির জান্নাতে যাবার পথ। নবি মুহাম্মাদ ﷺ অসুস্থদের দেখতে উৎসাহ জুগিয়ে বলেছেন, "ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, অসুস্থকে দেখতে যাও, ক্রীতদাসদের মুক্ত করো।"[২৮৭] রোগীদের যারা দেখাশোনা করেন, তাদেরকে দয়া আর ক্ষমার চাদরে বিজড়িত করা হয়। আর এগুলো সহজ করে দেয় জান্নাতে যাওয়ার পথ। এ বিষয়ে নবিজির অনেক কথা আছে। যেমন, কেউ যদি প্লেগ, পেটের অসুখে মারা যায়, তবে তিনি শহিদ বলে গণ্য হন। আর সব শহিদ[২৮৮] যাবেন জান্নাতে। অসুস্থ রোগীকে যিনি দেখতে যান তার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "রোগীর পাশে বসা না পর্যন্ত তিনি দয়ার মাঝে ভেসে থাকেন। আর বসার সাথে সাথে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলেন দয়া-মাঝারে।"[২৮৯] এরচেও আরও বেশি হৃদয়ে শিহরণ জাগানো একটি কথা আছে নবিজির। তিনি বলেছেন, যারা রোগীকে দেখতে যায় তারা যেন সেখানে খুঁজে পায় আল্লাহকে:

> "বিচারদিনে মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ বলবেন, 'আদম-সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে আসোনি।' মানুষ বলবে, 'পালনকর্তা! আপনিই তো গোটা দুনিয়ার পালনকর্তা। আপনাকে আমি কীভাবে দেখতে যাবো? আপনি কীভাবে অসুস্থ হবেন?' মহাশক্তিধর আল্লাহ বলবেন, 'তুমি তো জানতে, আমার অমুক অমুক দাস অসুস্থ। কিন্তু তাকে তুমি দেখতে যাওনি। তুমি জানতে না, যদি তাকে দেখতে যেতে, তার পাশে আমাকে খুঁজে পেতে'?"[২৯০]

সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা যাওয়া মুসলিমরাও পাবেন শহিদি মৃত্যুর মর্যাদা। কারণ, পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারীদের ইসলাম শহিদ হিসেবে বিবেচনা করে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "ডুবে মরা প্রত্যেকে শহিদ।"[২৯১]

ভূমিকম্পের কারণে ভবন ধসে নিহত হওয়া মুসলিমরাও জান্নাতি বলে গণ্য হবেন (কোনো কোনো 'আলিম এমনকি বিমান বা গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহতদেরও এর মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত করেন)। “ধসে পড়া (ভবনে) যার মৃত্যু হয়েছে”[২৯২] তাকেও নবিজি শহিদ বলেছেন।

কিন্তু আল্লাহ তো চাইলে যন্ত্রণাহীন এক দুনিয়া বানাতে পারতেন

এতক্ষণ পর্যন্ত করা বিস্তারিত আলোচনা শেষেও শোনা যায় কেউ কেউ বলেন, “কিন্তু আল্লাহ তো চাইলেই যন্ত্রণাহীন এক দুনিয়া বানাতেই পারতেন।” এই কথা আসলে শুরুর কথাটাই নতুন মোড়কে বলা। কাজেই এখানেও উত্তর একই: ঐশী প্রজ্ঞা। এ ধরনের আপত্তি যারা তোলেন, তারা আসলে অন্যায় আর যন্ত্রণা কেন হয়, সেটাই বুঝতে পারেন না প্রথমে। তাদের ধারণা, একজন দয়াময় ও মহাশক্তিধর আল্লাহর উচিত সব অন্যায় ও যন্ত্রণা রোধ করা। যাহোক, এ বিষয়ে শুরুতেই বলেছি। এখনো কারও মধ্যে যদি এ বিষয়ে মনে অস্পষ্টতা থাকে, অধ্যায়টি প্রথম থেকে আবার পড়ার অনুরোধ করব।

অধ্যায় ১২

বিজ্ঞান কি আল্লাহকে বাতিল প্রমাণ করেছে?

মনে করুন, এক চমৎকার জায়গায় গিয়েছেন। করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভবনের বিশালতায় আপনি মুগ্ধ। ভাবলেন, ভেতরে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখবেন। একটা ঘরে ঢুকতেই দেখলেন শত শত চেয়ার আর একটা টেবিল শ্রেণিঘরের মতো সাজানো। নিমেষেই উবে গেল আপনার সব উৎসাহ। এসব শ্রেণিঘর দেখার চেয়ে তো বন্ধুদের সঙ্গে টঙের দোকানে চা খাওয়া ভালো।

চা খেতে খেতে বন্ধু জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কেমন দেখলি প্রাসাদটা?"

"ধুর। একটা রুমে গিয়ে দেখি ক্লাসরুমের মতো সাজানো চেয়ার-টেবিলে ভরা। কী আর দেখব বল।"

"আর কোনো রুম দেখিস নাই?"

"দেখে কী হবে? বাকি সব রুমও এরকমই হবে।"

ভেবে বলুন তো, আপনার উত্তরটা কি যৌক্তিক? একটা ঘর অমন ছিল বলে বাকি সব ঘরও কি অমন হবে? অবশ্যই না। কিন্তু বিজ্ঞান আল্লাহকে মিথ্যে প্রমাণ করেছে বলে দাবি করা নাস্তিকেরা কিন্তু ঠিক এরকম যুক্তিধারাই অনুসরণ করেন।

বস্তুগতভাবে পর্যবেক্ষণ করে সুরাহা করা যায়, এমনসব বিষয়ই কেবল বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সংজ্ঞামতে, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি এই জড় মহাজগতের ঊর্ধ্বে। কাজেই সরাসরি তাঁকে পর্যবেক্ষণ অসম্ভব। নাস্তিকেরা বলতে পারেন, তা হলে পরোক্ষভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের সমর্থন বা অসমর্থন পাওয়া তো যেতে পারে। কিন্তু এটাও ভুল। কোনো ধরনের পরোক্ষ পর্যবেক্ষণ আল্লাহর অস্তিত্বকে নাকচ করতে পারে না। এ ধরনের কথা বলার মানে, কোনো পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনা যেন অপর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনাকে বাতিল করতে পারে। ওপরের উদাহরণের মতো একই অপযুক্তি ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে।

বিজ্ঞান যে নাস্তিকতাবাদের দিকে নিয়ে যায় না, বেশির ভাগ বিজ্ঞান-দার্শনিকই স্বীকার করেন সেটা। হিউ গাউচ যেমন বলেছেন, "বিজ্ঞান নাস্তিকতাবাদ সমর্থন করে",

বিজ্ঞান বড়জোর নীরব থাকতে পারে এ বিষয়ে। অথবা আল্লাহর অস্তিত্ব যে আছে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কিছু প্রমাণের পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু করা তো সাজে না বিজ্ঞানের।

এ নিয়ে "গো ধরলে... অতি উৎসাহির খাতায় উচ্চ নম্বর পাওয়া গেলেও যুক্তির খাতায় খুব বেশি নম্বর মিলবে না।"[২৯৩] ঠিকই বলেছেন তিনি। কারণ, যে-ভাবনা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল, তা কীভাবে অপর্যবেক্ষণযোগ্য কিছুকে বাতিল করবে?

কিছু নাস্তিক কেন মনে করেন বিজ্ঞান আল্লাহকে মিথ্যে প্রমাণ করতে পারে?

বিজ্ঞান বদলে দিয়েছে দুনিয়াকে। চিকিৎসা থেকে শুরু করে যোগাযোগ-ব্যবস্থা—বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রায় যে-পরিমাণ উন্নতি ঘটিয়েছে, তা পারেনি গবেষণার অন্য আর কোনো ক্ষেত্র। এই জয়যাত্রা প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিচ্ছে সে। পৃথিবী ও মহাজগৎ সম্বন্ধে আমাদের জানাশোনার পরিধি বাড়িয়ে চলছে অবিরত। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সফলতার জের ধরে অনেক নাস্তিকেরা গ্রহণ করেছেন অসংগত ও মিথ্যা ধারণা। এসব ধারণার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র দিচ্ছি নিচে:

- কিছু নাস্তিকের ধারণা, সত্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি বিজ্ঞান। আমাদের সব প্রশ্নের জবাব আছে তার কাছে। আল্লাহর অস্তিত্ব নেই বলতে এখান থেকেই উদ্বুদ্ধ হন নাস্তিকেরা। আল্লাহকে যেহেতু পর্যবেক্ষণ করা যায় না, আর তাদের কাছে সত্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি যেহেতু বিজ্ঞান, তার মানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই। যেসব জিনিস আমাদের বোধের অগম্য, সেগুলোর কারণ হিসেবেও আল্লাহর প্রয়োজন নেই—এমন কথা বলতেও নাস্তিকদের উদ্বুদ্ধ করে এই ধারণা। তাদের এই ধারণা নির্জলা মিথ্যা। কারণ, বিজ্ঞানের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। অনেক কিছুরই জবাব সে দিতে পারে না। জ্ঞান লাভের এমন অনেক উৎসই আছে যার ন্যায্যতা দিতে পারে না বিজ্ঞান; কিন্তু তবু ওগুলো জ্ঞানের অপরিহার্য এবং মৌলিক উৎস। এ থেকে আমরা বুঝি, জগৎ ও বাস্তবতার সত্য জানতে বিজ্ঞান একমাত্র উপায় না।
- বিজ্ঞান এতই কামিয়াব, তাই বৈজ্ঞানিক ফতোয়াগুলো অবশ্যই সত্য—এ হচ্ছে দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যদি সত্যই হয়, আর আল্লাহর মতো অলক্ষযোগ্য কোনো বাস্তবতাকে যদি বিজ্ঞান ধরতে না পারে, তার মানে তাঁর অস্তিত্ব নেই। এই ধারণার নেপথ্য যুক্তিটা ঘোলাটে। বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে সাধারণ এক অজ্ঞতাকে ফাঁস করে দেয় এটা। সোজাভাবে

বুঝুন, কোনো কিছু কাজ করে মানেই তো এই না যে এটা সত্য। বিজ্ঞান-দর্শনের এক মৌলিক ধারণা এটা। অথচ কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সফল বাস্তব প্রয়োগ প্রমাণ থেকেই সেটাকে সর্বোচ্চ অর্থে সত্য বলে মানেন অনেক সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিকও।

২০১০ সালে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে বিশ্ব নাস্তিক অধিবেশনে আমি একবার কথা বলেছিলাম রিচার্ড ডকিন্সের সাথে। তার সাথে সেদিন তেমন বেশি কথা হয়নি। অধিবেশনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে পড়াশোনা না করে স্রেফ "বিজ্ঞান চর্চা করুন"। একথা তিনি কেন বললেন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে। তিনি এর তেমন কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তার প্রকাশিত কাজগুলো সমীক্ষা করে বোঝা যায়, বিজ্ঞান "কাজ করে"—এটাই অন্যতম কারণ।[২৯৪] কথাটা বেশ সহজাত মনে হলেও মিথ্যা। কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত কার্যকর হলেই যুক্তিসিদ্ধভাবে তা সত্য হয়ে যায় না।

৩ তৃতীয় ভ্রান্তধারণাটা হচ্ছে বিজ্ঞান নিশ্চয়তা প্রমাণ করে। বিজ্ঞান যদি সরাসরি আল্লাহকে প্রমাণ করতে না পারে, আর নিশ্চয়তা প্রমাণে এটিই যদি হয় একমাত্র পদ্ধতি, তা হলে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। কোনো কিছুকে যখন একবার সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তকমা লাগানো হয়, আকাশবাণী যদি কোনো-না-কোনোভাবে এর বিরোধী হয়, তা হলে আকাশবাণীকেই বাতিল করতে হবে আমাদের।

উপরোক্ত ভুলধারণার কারণে এমন ধারণা লালনে উদ্বুদ্ধ হন নাস্তিকেরা। এখানে ভুল কোথায়? কোনো কিছুকে বিজ্ঞানীরা যখন তত্ত্ব বলেন, তারা একে পরম বলেন না। বলেন না যে এটার পরিবর্তন হবে না কখনো; বলেন, আমাদের সীমিত পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে এটাই সেরা ব্যাখ্যা। তবে পূর্বের পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফলের বিপরীত নতুন কোনো পর্যবেক্ষণের সম্ভাবনা থাকে সব সময়ই। বিজ্ঞানের সৌন্দর্য তো এখানেই: এটা পাথরে খোদাই করা নয়। আর তাই, আকাশবাণী আর বিজ্ঞানের মাঝে যদি অসংগতি পাওয়া যায় সেটা কোনো বড় সমস্যাই না। কারণ, বিজ্ঞানের ধারণা বদলাতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের সীমিত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, পর্যবেক্ষণলব্ধ ঘটনার ব্যাপারে আমাদের বর্তমান জ্ঞান আকাশবাণীর বিপরীত, তবে এটা বদলাতে পারে।

বিজ্ঞানকে মুগুর হিসেবে ব্যবহার করে ধর্মকে এক হাত নেওয়ার মনোভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এই দৃষ্টিভঙ্গি। কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া। এগুলোর পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ধর্মীয় আলোচনাকে পর্যদুস্ত করতে ব্যবহৃত বেশির ভাগ যুক্তিতর্কগুলো অধিকতর জটিল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও তত্ত্বের ওপর আশ্রিত। যেমন ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ। কোনো ধর্মীয় পাঠ আপাতদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও তত্ত্বের বিরোধী মনে হলেই আকাশবাণীকে বাদ দিয়ে কেবল বিজ্ঞানকে মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার আকাশবাণীকে মেনে নিতে হলে বিজ্ঞানকে ছুড়ে ফেলতে হবে এমন কোনো কথাও নেই। দুটোকে মেনে নেওয়াই আপনার জ্ঞানতাত্ত্বিক অধিকারের মাঝে পড়ে। সঠিক পন্থা হবে, বিজ্ঞানকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস না করে এবং একে সর্বোচ্চ ধরে না নিয়েও আমাদের কাছে থাকা সেরা ব্যাখ্যা হিসেবে মেনে নেওয়া। আবার একই সাথে, আকাশবাণীকেও মেনে নিতে পারেন আপনি। কারণ, সেজন্যও যথেষ্ট ভালো কারণ আছে (দেখুন অধ্যায় ১৩)।

চতুর্থ ভুল ধারণাটি নাস্তিকদের চোখে এক চশমা পরিয়ে দেয়। এই চশমা দিয়েই তারা দেখেন সবকিছু। এর নাম প্রকৃতিবাদ। দুধরনের প্রকৃতিবাদ আছে: দার্শনিক, পদ্ধতিগত। দার্শনিক প্রকৃতিবাদ মানে জগতের সব ঘটনাকে জড় প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই। পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলে, কোনো কিছু বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিবেচিত হলে, তা কখনোই ঈশ্বরের ঐশী কর্ম বা শক্তিকে নির্দেশ করবে না। নাস্তিকেরা এ দুধরনের প্রকৃতিবাদকে গুলিয়ে ফেলেন। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে বুঝতে বেখেয়ালে দার্শনিক প্রকৃতিবাদের অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে গ্রহণ করেন। কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞান-সমর্থিত হতে হলে এটাকে যে ঈশ্বরের সৃজনশীল ক্ষমতা বা প্রজ্ঞার নজির ধরা যাবে না (পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ), এ বিষয়টাকে তারা মিশিয়ে ফেলেন তাঁর সৃষ্টিশীল ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা নেই (দার্শনিক প্রকৃতিবাদ)—এর সঙ্গে।

এই অধ্যায়ের বাকি অংশে আমরা উপরোক্ত ধারণাগুলো নিয়ে কথা বলব। এজন্য সবচে ভালো হয় মৌলিক ব্যাপারগুলো দিয়ে শুরু করলে। অর্থাৎ বিজ্ঞান কী, এর সীমাবদ্ধতা কী কী, এবং বিজ্ঞান-দর্শনের কিছু বয়ানের জট খোলা।

বিজ্ঞান কী?

ল্যাটিন scientia শব্দটি থেকে এসেছে সায়েন্স শব্দটি। এর মানে জ্ঞান। বাংলায় আমরা বলি, বিজ্ঞান।। জড় জগৎ কীভাবে কাজ করে তা বোঝার মানবীয় চেষ্টার নাম বিজ্ঞান। গণিতবিদ ও বিজ্ঞান-দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বেশ সুন্দরভাবে বলেছেন, বিজ্ঞান হচ্ছে—"পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কারের চেষ্টা; এবং এর ওপর ভিত্তি করে যুক্তি দেখানো... পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিয়ম সম্বন্ধে।"[২৯৫]

রাসেলের সংজ্ঞাকে ধরে চলুন আরও সবিস্তারে দেখি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে।

বিজ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট পরিসর আছে। এর গণ্ডি জড় জগতের মাঝে সীমাবদ্ধ। কেবল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও ঘটনা নিয়ে তার কাজকারবার। আর তাই আত্মা কী? এর মানে কী?—এ ধরনের প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বাইরে।

প্রাকৃতিক জগৎকে ব্যাখ্যা করা বিজ্ঞানের লক্ষ্য। প্রাকৃতিক জগৎ কীভাবে কাজ করে তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া তার উদ্দেশ্য। পরীক্ষাযোগ্য রূপতত্ত্ব তৈরি করে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে বিজ্ঞান। কোনো রূপতত্ত্বকে পরীক্ষাযোগ্য হতে হলে যৌক্তিকভাবে একে কিছু নির্দিষ্ট প্রত্যাশা তৈরি করতে হবে।

নিচের রূপতত্ত্বটি খেয়াল করুন: "অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কুস্তিগিরদের সামর্থ্য বাড়ায় কফি।" এই রূপতত্ত্ব পরীক্ষাযোগ্য, কারণ নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট প্রত্যাশা তৈরি করে এটা:

- কফি সামর্থ্য বাড়ায়
- কফি সামর্থ্য কমায়
- সামর্থ্যের কোনো বদল হয় না

বিজ্ঞানের অন্যতম সৌন্দর্যের দিক কী, সত্য রূপতত্ত্বগুলোকে এটা শুধু যাচাই-ই করে না; বরং পরীক্ষণ এবং যাচাই করাকে করে বাধ্যতামূলক। এজন্য বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে কেবল পরীক্ষাযোগ্য হলেই হয় না, সেগুলোকে পরীক্ষিতও হতে হয়। মাত্র একগুচ্ছ ফলাফলই কাম্য নয়। সত্যিকার বিজ্ঞান মানে বিভিন্ন বিজ্ঞানী যতবার সম্ভব পরীক্ষাটি পুনরায় করে দেখবেন।

অবশ্যই বিজ্ঞান মানে শুধু এটুকু নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মৌলিক বিষয়গুলো বোঝার জন্য এটুকু আলোচনা যথেষ্ট আমাদের জন্য। বিজ্ঞান সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ এক ধারণাকে ব্যবহার করে কিছু নাস্তিক এমন ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বিজ্ঞান নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়; এখানে তার জবাব দেওয়া যাবে এখন।

ধারণা ১: বাস্তবতা সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ে বিজ্ঞানই একমাত্র উপায়; এটা সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে

এই দাবির পোশাকি নাম বিজ্ঞানবাদ। একথা দিয়ে বোঝানো হয়, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা না গেলে কোনো কথাই আর গ্রহণযোগ্য না। নাস্তিক ও মানবতাবাদীদের সঙ্গে বিভিন্ন আলাপে আমি দেখেছি, এই মতকে তারা যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখে। অথচ জগতের সব সত্য জানার জন্য বিজ্ঞান একমাত্র তরিকা নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আমাদের দেখিয়ে দেয়, এটা সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। বিজ্ঞানের মূল সীমাবদ্ধতাগুলোর মধ্যে আছে:

- এর গণ্ডি বস্তুগত পর্যবেক্ষণের মাঝে সীমাবদ্ধ
- নৈতিকভাবে দুর্বোধ্য
- ব্যক্তিগত বিষয়ে যেতে পারে না
- কেন ঘটে তার জবাব দিতে পারে না
- কিছু অধিবিদ্যাগত প্রশ্নের সুরাহা করতে পারে না
- অনিবার্য সত্যকে প্রমাণ করতে পারে না

এসব সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বিজ্ঞানবাদ আত্মঘাতী ধারণা। কারণ, এটা বলে কোনো কিছুকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা না গেলে তা সত্য নয়। কিন্তু তাদের এই কথাই কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণের উপায় নেই কোনো। এ যেন, "বাংলা ভাষায় তিন শব্দের চেয়ে বড় কোনো বাক্য নেই"—এধরনের আত্মঘাতী কথা বলার মতো। কারণ, এই বাক্যতেই যে তিন শব্দের চেয়ে বেশি শব্দ আছে।[২৯৬]

পর্যবেক্ষণের মাঝে সীমাবদ্ধ

কথাটা শুনে মনে হয় খুবই সত্য, কিন্তু বিষয়টা সামগ্রিকভাবে বুঝে আসে না অনেকের। বিজ্ঞানীরা সব সময়ই তাদের পর্যবেক্ষণের মাঝে সীমিত। যেমন ধরুন, কোনো বিজ্ঞানী যদি ইঁদুরের বাচ্চার ওপর ক্যাফেইনের প্রভাব বের করতে চান, তিনি তখন পরীক্ষার সময় হাতে থাকা ইঁদুরের সংখ্যা ও ধরনের মাঝে বদ্ধ। বিজ্ঞান-দার্শনিক এলিয়ট সোবার তার 'এম্পিরিজম' প্রবন্ধে স্পষ্ট করেছেন বিষয়টি: "যেকোনো সময়েই বিজ্ঞানীরা তাদের নাগালের মাঝে থাকা পর্যবেক্ষণের বলয়ে বন্দি... পর্যবেক্ষণ যেসব সমস্যার সুরাহা করতে পারে, বিজ্ঞান যে তার মনোযোগ কেবল এসবের মাঝে রাখতেই বাধ্য, এটাই সীমাবদ্ধতা।"[২৯৭]

শুধু তাই না, ভবিষ্যৎ কোনো পর্যবেক্ষণ আগের পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফল বদলে দিতে পারে, এই সত্যের কাছেও হাত-পা বাঁধা বিজ্ঞানের (নিচের 'ইনডাকশনের সমস্যা' দেখুন)। আরেকটা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, আজ যা পর্যবেক্ষণ করা যায় না, ভবিষ্যতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার বিজ্ঞানের অগ্রগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একারণে জড় জগৎ সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জানাশোনা নিয়ে কখনোই নিশ্চিত, চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় কোনো অবস্থান গ্রহণ করতে পারব না আমরা। কারণ, আরও উন্নত পর্যবেক্ষণের কারণে যেকোনো সময়ে এটা বদলে যেতে পারে।

নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ

নৈতিকভাবে বিজ্ঞান নিরপেক্ষ। তবে এর এই নয় যে, বিজ্ঞানীদের কোনো নীতিনৈতিকতা নেই। বিষয়টা হচ্ছে নীতিবোধকে কোনো ভিত্তি দিতে পারে না বিজ্ঞান (দেখুন অধ্যায় ৯)। অর্থবহতা এবং নীতিবোধের ব্যক্তিনিরপেক্ষতার পক্ষে বিজ্ঞান কোনো পাটাতন হতে পারে না। নীতবোধের ক্ষেত্রে কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ বিজ্ঞান তা নির্ণয় করতে পারে না। নৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানার জন্য যে সামগ্রিক প্রক্রিয়া, বিজ্ঞান তার একটা অংশ হতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞান একাকী সেগুলোর কোনো ভিত্তি দিতে কিংবা নাকচ করতে পারে না।

কোনো বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞান বলতে পারে বস্তুটি কী, কেমন বা এর গঠন প্রক্রিয়া কী; কিন্তু কী হওয়া উচিত বা উচিত নয়—তা বলার কোনো ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। "কী হয়েছে তা থেকে আপনি কখনো কী হওয়া উচিত ছিল তা জানতে পারবেন না"—এ কথাটা দার্শনিক মহলে বহুল ব্যবহারে মলিন হলেও, এর মাঝে কিছু সত্য আছে। কোনো মানুষের শরীরে ছুরি ঢোকার পর কী কী হয় বিজ্ঞান প্রায় তার সবই বলতে পারে আমাদের। কিন্তু কাজটা নৈতিক না অনৈতিক তা বলার সামর্থ্য নেই বিজ্ঞানের। ছুরি চালানোর পর বের হওয়া রক্ত, অনুভূত ব্যথা কিংবা শারীরিক ক্ষতি জীবন বাঁচানোর জন্য অস্ত্রপচারের কারণেও হতে পারে, আবার খুনের কারণেও হতে পারে। তো মূল কথা হচ্ছে, মানুষের শরীর-কাটা-সংক্রান্ত সব প্রক্রিয়া জানলেও সেটা আমাদের কোনো নৈতিক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় না।

নবম অধ্যায়ে চার্লস ডারউইনের একটা বিষয় বলেছিলাম। নৈতিকতা এবং বিজ্ঞান (নির্দিষ্ট করে বললে জীববিজ্ঞান) নিয়ে তিনিও বিবেচনা করেছেন। জৈবিক প্রক্রিয়া থেকে নৈতিকতার উদ্ভব হলে তার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে তার এক দারুণ উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। আমরা যদি ভিন্ন কিছু জৈবিক পরিস্থিতির অধীনে গড়ে উঠতাম, তবে নৈতিকতা সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি হতো খুবই আলাদা।[২৯৮] তো ডারউইন সম্ভবত যা বলতে চাচ্ছেন, যদি কেবল পূর্বের জৈবিক পরিস্থিতির কারণে

কোনো কিছুকে নৈতিক বলে রায় দিই আমরা, তা হলে আমাদের সেই জৈবিক পরিস্থিতি অন্যরকম হতো, আমাদের নৈতিক মানদণ্ডও হতো ভিন্ন। নীতিবোধের ভিত্তি ও অর্থবহতায় তার এই মন্তব্যের প্রভাব খুবই গভীর।

প্রথমত, জৈবিক বা জড় কিছু পরিস্থিতিকে নৈতিকতার ভিত্তি বানালে সেটা তাহলে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয় হয়ে যায়। কারণ, ওগুলো অনিবার্য পরিবর্তনের অধীন থাকে (এবং ছিল)। কিন্তু যেসব নীতিবোধ ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সহজাত ও অনস্বীকার্য সেগুলোর সঙ্গে এটা সাংঘর্ষিক (দেখুন অধ্যায় ৯)।

দ্বিতীয়ত, আমাদের নীতিবোধের তাৎপর্য যদি জৈবিক পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে ওগুলোর আর কী মানে থাকে? যেহেতু ভিন্নভাবে গড়ে উঠলে আমাদের নীতিবোধ ভিন্ন হতো, সুতরাং আমাদের নীতিবোধ তার অর্থবহতা হারাত। কারণ, আমাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে অনিবার্য বলে কিছু আর থাকত না তখন। কারণ ওটা যে স্রেফ দৈবঘটনা ও জড় প্রক্রিয়ার ফসল।

'দ্য মোরাল ল্যান্ডস্কেইপ' বইতে মুখরা নাস্তিক এবং স্নায়ুবিজ্ঞানী স্যাম হ্যারিস ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধ সম্বন্ধে আমাদের বোধবিবেচনাকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞান কীভাবে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তার সমমনা কিছু নাস্তিক এই কাজের প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু অন্য অনেক নাস্তিক এবং আস্তিকের কাছে তীব্র সমালোচনার মুখেও পড়েছেন।

হ্যারিস বলেছেন, চূড়ায় আছে নৈতিক কল্যাণ, আর খাদে আছে নৈতিক অকল্যাণ। প্রশ্ন হলো, তিনি কীভাবে জানলেন কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ? চূড়া দিয়ে ভালো থাকাকে বোঝাচ্ছে, আর খাদ দিয়ে যন্ত্রণাকে। তার আলোচনার অপরিণত সারাংশ মনে হতে পারে একথাগুলোকে। তবে সত্যি বলতে কী, হ্যারিস খারাপকে যন্ত্রণার সঙ্গে মিলিয়েছেন, আর কল্যাণকে ভালো থাকার সঙ্গে। আর এখানেই তিনি ব্যর্থ।

অন্যের ক্ষতি করে মানুষ ভালো থাকতে পারে—এটা যদি দেখানো যায়, তা হলেই কিন্তু ধসে পড়ে তার নৈতিক ছবিটা। আবার কিছু জিনিস আছে, দেখে মনে হবে আমরা তো ভালোই আছি। কিন্তু নৈতিকভাবে ন্যক্কারজনক। এভাবেও হ্যারিসের যুক্তিকে বাতিল করে দেওয়া যায়। যেমন ধরুন, গর্ভনিরোধী ব্যবহার করে পরিবারের কারও সঙ্গে যৌনাচার। এখানে উভয়েই কিন্তু নিজেদের ভালো লাগাকে বাড়িয়েছেন (কারণ, স্বেচ্ছায় নিজেদের কামনা পূরণে সম্মত হয়েছেন দুজনেই)। আর এখানে ক্ষতির আশঙ্কা নেই, গর্ভনিরোধী ব্যবহার করায় জিনগত ত্রুটি নিয়ে বাচ্চা জন্মাবে না। অধ্যাপক ক্রাউসের সঙ্গে বিতর্কেও এ বিষয়টা আমি তুলেছিলাম। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক নিজেই নিজের অবস্থানের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নন (তিনি বলেছিলেন, এটা যে খারাপ

সেটা তার কাছে স্পষ্ট না। নৈতিকভাবে তিনি এর নিন্দা করতে পারছেন না)।[২৯৯] তো এরকম কিছু জিনিস আছে যা আমাদের আনন্দ-উল্লাসকে বাড়িয়ে তোলে; কিন্তু নৈতিকভাবে ন্যক্কারজনক। এই উদাহরণের সঙ্গে আপনি একমত না হলেও এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে বিষয়টা বোঝানোর জন্য।

'র‍্যাশনাল মোরালিটি' বইতে নাস্তিক ও বিজ্ঞান-দার্শনিক রবার্ট জনসন অনুরূপ সমালোচনা করেছেন হ্যারিসের দেওয়া যুক্তির। জনসন যুক্তি দেখিয়েছেন, নৈতিকতাগুলো বাস্তবিক ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ হতে ন্যায্যতার খামতি আছে হ্যারিসের পন্থায়:

> "হ্যারিস আসলে অনুমান করছেন, 'কল্যাণ'-সংক্রান্ত নৈতিকতার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এটা স্বীকার করায় যে-সমস্যা তৈরি হয়, তার ফাঁদেই আটকা পড়ে আছেন তিনি। পাথরের নিচের মাটি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কি আমরা কোনো নৈতিকতা খুঁজে পাবো? না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়মাবলির মতো বিষয়গুলো নিরীক্ষা করতে গেলে কি এর অস্তিত্ব খাটাতে পারব? না। এসব নৈতিকতা যে স্বাধীনভাবে আছে, আমাদের এই সহজাত জ্ঞানকে খুঁটি দিচ্ছে: আমাদের সহজাত জ্ঞান... সমস্যাটাকে খুব সহজেই বলা যায়: নৈতিকতা বর্তমানে কীভাবে সংজ্ঞায়িত, হ্যারিস তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন বলেই এই না যে, নৈতিকতাকে সেজন্য বাস্তবিক হিসেবে নেওয়া উচিত। হ্যারিস নিজেই তো স্বীকার করেছেন, আমরা এমন অনেক কিছুরই অনুমতি দিই যা অনৈতিক...।"[৩০০]

আপনি ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে পারেন না

বিভিন্ন ধারণাকে পরীক্ষা করা নিয়ে গর্ব করে বিজ্ঞান। পরীক্ষা ছাড়া কোনো বিজ্ঞান নেই। কিন্তু একটা সময়ে এসে আস্থার কাছে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। যেমন ধরুন, কোনো মানুষ কী সংকল্প করেছে তা কীভাবে বুঝব? একজন মানুষের অনুভূতি বুঝব কীভাবে? বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেখাতে পারেন, মিথ্যা শনাক্তকারী যন্ত্র দিয়ে ধরা যায় কেউ মিথ্যা বলছে কি না। তারা আরও দাবি করতে পারেন, শারীরিক এবং আচরণগত নির্দেশকের গোটা এক বিন্যাস নির্দিষ্ট কিছু অনুভূতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (এটা যদিও সত্য নয়; নিচে আলোচনা থাকছে এ নিয়ে)। তাদের কথায় একটা যুক্তি আছে বটে; কিন্তু বিষয়টি এত জলবত তরলং নয়। বন্ধুত্বের কথাই ভেবে দেখুন উদাহরণ হিসেবে।

মনে করুন, আপনার বন্ধু জিজ্ঞেস করল আপনার সারা দিন কেমন গেল। আপনার কেমন লাগছে। আপনি বললেন, দিনটা খুব ভালো গেছে। আপনার খুব ভালো লাগছে। ধরুন, পরেরদিনও সে এসে আপনাকে একই কথা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু এবারে আপনাকে বলল, যদি আপনার শরীরে মিথ্যা শনাক্তকারী যন্ত্র লাগান, তবেই সে

আপনার কথা বিশ্বাস করবে। এতে কি আপনার বন্ধুত্বে ক্ষতি হবে? যদি প্রতিদিনই সে এরকম যন্ত্র লাগিয়ে আপনার জবাব খতিয়ে দেখতে চায়, তাতে আপনাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরবে না? অবশ্যই ধরবে। আমাদের কথাবার্তায় যদি পরস্পর আস্থাভাজন থাকি, তবেই না টিকে থাকে বন্ধুত্ব।

মানুষের আবেগের উদাহরণও দেওয়া যায়। কেউ হতাশাগ্রস্থ হলে কীভাবে বুঝি? আমাদের কাছে কি হতাশা শনাক্ত করার যন্ত্র আছে কোনো? শারীরিক উপাত্ত কিছু ইঙ্গিত দেয় বটে; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বেশির ভাগ তথ্যই থাকে রোগী আর মনোবিদের আলাপচারিতায়। আর এজন্য দরকার পড়ে রোগীর উত্তরে আস্থা রাখা। কাজেই, মানবজীবনের নির্দিষ্ট কিছু ভুবনে কেবল পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট নয়। বন্ধুত্ব এবং মানসিক সুস্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলোতে আস্থাও অনেক বড় বিষয়। বিজ্ঞানকে তাই শুধু পরীক্ষার ওপর নির্ভর করলে চলে না, আস্থাও রাখতে হয়।

বিজ্ঞান কাজ করতে পারে কেবল পরোক্ষ উপাত্ত নিয়ে। আবেগ-অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার মতো বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ উপাত্ত। সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বিজ্ঞানের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসনের মেরি যুক্তিতে দেখেছি, সব পরোক্ষ জড় তথ্য জানা থাকা মানেই সব তথ্য জানা থাকা নয়। এগুলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। কোনো প্রাণীসত্তার একান্ত ব্যক্তিগত কোনো অনুভূতি ঠিক কেমন তা আমাদের বলতে পারে না বিজ্ঞান (দেখুন অধ্যায় ৭)। তা জানার একমাত্র উপায় ব্যক্তির নিজের বর্ণনার ওপর আমাদের আস্থা (তবে তারপরও কিন্তু তার সেই অনুভূতি আসলেই কেমন তা বুঝতে পারব না আমরা)। সোজা কথায় বিজ্ঞান ব্যক্তিগত বিষয়কে পরীক্ষা করতে পারে না।

'কেন'-এর উত্তর দিতে পারে না

আমার খালা এসে আপনার দরজায় কড়া নেড়ে ঘরে-তৈরি সুন্দর এক চকলেট কেক দিয়ে গেলেন। উপহারটি সানন্দে গ্রহণ করে টেবিলে রাখলেন আপনি। হাসিমুখে খালাকে বিদায় দিয়ে আপনি টেবিলে বসলেন কেক খেতে। হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল, তিনি আমার জন্য কেক বানালেন কেন? আপনার সামনে যে-উপাত্ত আছে, মানে কেক, বিজ্ঞানী হিসেবে ওটা ছাড়া আর কিছু নেই এই প্রশ্নের উত্তর জানতে। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বের করলেন, কেকটা খুব সম্ভব ১৭৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সেঁকা হয়েছে। এর মাঝে কোকো পাওডার, চিনি, ডিম আর দুধ দেওয়া আছে। এতকিছু জানার পরও কিন্তু জানতে পারছেন না কেন তিনি আপনার জন্য বানালেন এটা। একমাত্র তাকে জিজ্ঞেস করেই পাওয়া যাবে এর উত্তর।

এ উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি, বিজ্ঞান আমাদেরকে 'কী' ও 'কীভাবে' সম্বন্ধে বলতে পারে। কিন্তু 'কেন' সম্বন্ধে বলতে পারে না। এখানে 'কেন' বলতে ঘটনার পেছনে উদ্দেশ্য বোঝানো হয়েছে।

পৃথিবীতে পাহাড় কেন আছে? ভূতাত্ত্বিক সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান 'কেন'-এর একটা জবাব দিতে পারে। কিন্তু পাহাড়-পর্বত গঠনের পেছনের উদ্দেশ্য সে বলতে পারে না। কেউ কেউ তো উদ্দেশ্যর ধারণাটিকেই অস্বীকার করেন না পেরে।

কেন-এর প্রশ্ন এলেই আসে উদ্দেশ্যের প্রশ্ন। সেকেলে ধর্মীয় চিন্তার অজুহাতে উদ্দেশ্যকে অনেক নাস্তিক মনে করেন মায়াজাল। কিন্তু জগতে আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনো বাস্তব ও কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি নয় এটা। কথিত বিজ্ঞানের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, জড় প্রক্রিয়া দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এগুলোর ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। একের পর এক পড়তে থাকা ডমিনো গুটির একটা গুটি আমরা। আমাদেরও পড়তে হবে, কারণ, আমাদের পেছনের ডমিনো গুটি পড়েছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি শুধু যে আমাদের সহজাত জ্ঞান-বিরোধী তাই না, দৈনন্দিন নানা কর্মকাণ্ডে আমরা যেভাবে বোধবিবেচনা খাটাই তার সঙ্গেও একেবারে বেমানান। ধরুন, এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এসে দেখলেন লেখা আছে: "এই বই লেখার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই"। এমন কথাকে কি আদৌ গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন?

অধিবিদ্যাগত কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না

বিজ্ঞান কিছু অধিবিদ্যাগত প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। তবে সেগুলো আবার পর্যবেক্ষণ করা যায় বলেই। যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিজ্ঞান জবাব দিয়েছে এই মহাজগতের শুরু সম্বন্ধে। কিন্তু কিছু বৈধ প্রশ্নের জবাব সে বৈজ্ঞানিকভাবে দিতে পারে না। যেমন: কারণভিত্তিক যুক্তিতে পূর্বের হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে কেন সিদ্ধান্ত আসে? পরকালীন জীবন কি আছে? আত্মার অস্তিত্ব আছে? একটি সচেতন প্রাণসত্তার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ঠিক কেমন? কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে কেন?

প্রশ্নগুলো প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণযোগ্য জগতের বাইরে বলে বিজ্ঞান এসবের উত্তর দিতে অপারগ।

অনিবার্য সত্য

গণিত ও যুক্তির মতো অনিবার্য সত্যকে প্রমাণ করতে পারে না বিজ্ঞানবাদ। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, একটি বৈধ কারণভিত্তিক যুক্তিতে হেতুবাক্য থেকে অবধারিতভাবে সিদ্ধান্ত আসে। নিচের যুক্তিতর্কটা খেয়াল করুন:

৩ সীমিত পর্যবেক্ষণ থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত ধ্রুব নয়।

- বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো সীমিত পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া।
- কাজেই, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ধ্রুব নয়।

এই যুক্তির বৈধতা (একে আবার নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না) কোনো পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে নয়। এর বৈধতা বলতে যুক্তিতর্কগুলোর যুক্তিযুক্ত ধারাকে বোঝানো হচ্ছে। এর সঙ্গে হেতুবাক্যগুলো সত্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। সিদ্ধান্ত এবং হেতুবাক্যগুলোর মধ্যে একটা যুক্তিসিদ্ধ সম্বন্ধ আছে। কোনো পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে এই সম্বন্ধ তৈরি হয়নি। এটা ঘটছে আমাদের চিন্তাজগতে। বিজ্ঞান কি এই হেতুবাক্যগুলো আর সিদ্ধান্তের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা দিতে পারে?

না, পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আমাদের মনের বিচারশক্তির প্রত্যক্ষ একটা প্রভাব আছে। পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে না থাকলেও আমরা কোনো কিছু উপলব্ধি করতে পারি। এ ধরনের যুক্তিচিন্তা খাটাতে আমাদের মনের যুক্তিসিদ্ধ একটা কাঠামো বা প্রকৃতি আছে। কোনো ধরনের পর্যবেক্ষণই পারবে না কারণভিত্তিক যুক্তির যৌক্তিক ধারার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে।

৩+৩=৬-এর মতো গাণিতিক সত্যও অনিবার্য সত্য। এগুলোও কোনো খাঁটি পর্যবেক্ষণগত সাধারণ নিয়ম নয়।[৩০১] যদি জিজ্ঞেস করি, ১ কুবুলা আর ১ কুবুলা মিলে কী হয়, আপনি বলবেন ২ কুবুলা। জীবনে কখনো কুবুলার নাম না শুনলেও, বা ওই জিনিসটা যে আসলে কী তা না বুঝলেও আপনি জানেন এদের একটার সঙ্গে আরেকটা যোগ করলে দুই-ই হবে।

জ্ঞানের অন্যান্য উৎস

জ্ঞানের অন্যান্য উৎসকে ন্যায্যতা দিতে পারে না বিজ্ঞান। এই যেমন সাক্ষীসবুদের কথাই ধরুন। "অন্য কারও বক্তব্য থেকে কীভাবে আমরা জ্ঞান ও যুক্তি-সমর্থিত বিশ্বাস অর্জন করি"—সাক্ষীসবুদ সেই জ্ঞানতত্ত্বের এক শাখা।[৩০২] "অন্যরা আমাদের কী বলল তার ভিত্তিতে" কীভাবে আমরা অর্জন করি "জ্ঞান"—সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর দিতে চেষ্টা করে জ্ঞানের এই শাখা।[৩০৩] অধ্যাপক বেনইয়ামিন ম্যাকমাইলার প্রামাণিক সাক্ষ্য-সংক্রান্ত জ্ঞানের সার উল্লেখ করে বলেছেন:

> "কিছু জিনিস আমি জানি। বৃহত্তর হুস্টন এলাকায় কপারহেড সবচে বিষধর সাপ। আমি জানি, ওয়াটারলু যুদ্ধে নেপোলিয়ন হেরেছিলেন। একথাগুলো যখন লিখছি, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি গ্যালন পেট্রোলের দাম ৪.১০ ডলার... জ্ঞানতাত্ত্বিকেরা যেবিষয়কে সাক্ষীসবুদ বলেন, তার ভিত্তিতে আমি

> জানি এগুলো। অর্থাৎ অন্য কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির বলা কথার ভিত্তিতে এগুলো জানি আমি।"[৩০৪]

ম্যাকমাইলারের বলা সারাংশটি বেশ স্বতঃস্ফূর্ত। কিছু জ্ঞান কেন শুধু সাক্ষ্যভিত্তিক তারও প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে। পৃথিবী যে গোলাকার, এ উদাহরণটিও দেওয়া যায়।

পৃথিবী যে গোলাকার আমাদের বেশির ভাগেরই সেই বিশ্বাস কিন্তু গণিত বা বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়া নয়। পুরোটাই সাক্ষ্য-নির্ভর। আপনি হয়তো বলবেন, "আমি ছবিতে দেখেছি", "বিজ্ঞানের বইতে পড়েছি", "আমার সব শিক্ষক একথাই বলেছেন", "সর্বোচ্চ পাহারের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি পৃথিবীর বর্তুলতা দেখতে পারি", ইত্যাদি। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক আতশি কাঁচে আমাদের এই সবগুলো কথাই হবে সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানের অন্তর্গত। ছবি দেখে জ্ঞান অর্জনও সাক্ষ্যভিত্তিক। কারণ, কর্তৃপক্ষ বা যে-মানুষ বলেছেন এটা পৃথিবীর ছবি, আপনি তার কথা মেনে নিয়েছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যবই থেকে জানলেও তা হতো সাক্ষ্যভিত্তিক। কারণ, লেখকের কথা আপনি বিশ্বাস করছেন। আপনার শিক্ষকদের কথা বললেও একই কথা। সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আপনার বর্তমান বিশ্বাসকে যুক্তিভিত্তিকভাবে প্রমাণ করার চেষ্টাও সাক্ষ্যভিত্তিক। কারণ, আমাদের অনেকেই এমন কাজ কখনো করিনি। সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে যে আপনি পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার প্রমাণ পাবেন—সেটাও তো জেনেছেন অন্যের কথার ওপর ভিত্তি করে। যদি অন্যের কথা না শুনে নিজের মনের কৌতূহলেই নিজে থেকে করে থাকেন, তবু কিন্তু পৃথিবীর গোলাকার হওয়াকে প্রমাণ করে না এটা। চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলে পৃথিবীর কিছু অংশ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। তাই বলে পৃথিবী পুরোটাই গোলাকার এটা প্রমাণ হয় না এ থেকে (এটা হতে পারে অর্ধবৃত্তাকার বা ফুলের মতো কোথাও গোলাকার, কোথাও সোজা)। মোট কথা, আমাদের বেশির ভাগের জন্যই পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করা সাক্ষ্য-নির্ভর জ্ঞানের অংশ।

সাক্ষ্যনির্ভর জ্ঞান ছাড়া জ্ঞান অর্জন পূর্ণতা পায় না। জ্ঞানতত্ত্বের অধ্যাপক সি.এ.জে. কোডি এবিষয়টির সারসংক্ষেপ উল্লেখ করে এমন কিছু জিনিসের তালিকা করেছেন, যা কেবল সাক্ষ্য থেকেই জানা যায়:

> "...আমাদের অনেকেই কখনো বাচ্চার জন্ম হওয়া দেখেনি, রক্ত-চলাচল পরীক্ষা করে দেখেনি, দেখেনি পৃথিবীর আসল ভূ-চিত্র, জমিনে কার্যকর বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়মের নমুনা, কিংবা দেখেনি আমাদের জ্ঞানের পেছনে যে পর্যবেক্ষণ থাকে, আকাশে থাকা দীপনগুলো যে আসলে অনেক দূরে দূরে থাকা জ্যোতির্মণ্ডলীয় বস্তু...।" [৩০৫]

সাক্ষ্য-নির্ভর জ্ঞানের তাৎপর্য সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রোয়জন (এ সম্বন্ধে সবিস্তারে পড়তে অধ্যায় ১৩ দেখুন)।

মোট কথা, বাস্তবতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই একমাত্র তরিকা—বিজ্ঞানবাদের একথা মিথ্যে। বিজ্ঞানবাদ আত্মঘাতী। নৈতিক সত্য, যৌক্তিক ও গাণিতিক সত্য এবং সাক্ষ্যের মতো জ্ঞানের অনিবার্য উৎসের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না এটা। গবেষণার জন্য বিজ্ঞান এক সীমাবদ্ধ পদ্ধতি। সব প্রশ্নের উত্তর সে কখনোই দিতে পারে না।

ধারণা ২: এটা যেহেতু কাজ করে তাই সত্য

স্রেফ কোনো কিছু কার্যকরী বলেই তা যে সত্য হবে এটা কোনো যুক্তির কথা না। কিন্তু তারপরও, বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে, রিচার্ড ডকিন্সের মতো তারকারা প্রকাশ্যেই প্রচার করেন, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো যেহেতু কার্যকর, তাই এগুলো সত্য। একবার এক গণবক্তৃতায় তাকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল, বিজ্ঞানের প্রতি নিশ্চয়তার মাত্রা আমরা কতটুকু দিতে পারি। বরাবরের মতোই তার উত্তর ছিল অপরিণত। তার এমন চিন্তাধারা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর। ফ্লেজিস্টন (phlogiston) তত্ত্বের উদাহরণ দেওয়া যায় এটা প্রমাণে।

একসময় রসায়নবিদেরা বলেছিলেন, সব সহজ-দাহ্য বস্তুর মাঝে ফ্লেজিস্টন নামক এক উপাদান আছে। তত্ত্ব মোতাবেক, দাহ্য বস্তু জ্বলতে থাকলে ফ্লেজিস্টন নির্গত করে। যে-বস্তু যত বেশি দাহ্য, তার মাঝে থাকে তত বেশি ফ্লেজিস্টন। বিজ্ঞান-মহল তত্ত্বটিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। তত্ত্বটি এত বেশি কার্যকর ছিল, ১৭৭২ সালে ড্যান রাদারফোর্ড একে ব্যবহার করে আবিষ্কার করেছিলেন নাইট্রোজেন। তিনি সেসময় এর নাম দিয়েছিলেন 'ফ্লেজিস্টিকৃত বায়ু'। কিন্তু পরে দেখা গেল তত্ত্বটা ভুল। ফ্লেজিস্টন বলে কিছু নেই। এরকম আরও উদাহরণ আছে। এসব উদাহরণ বলে, কোনো কোনো তত্ত্ব বেশ আলোড়ন তুলতে পারে, নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য মেলে ধরতে পারে; কিন্তু পরে একসময় হয়ে যেতে পারে মিথ্যা। তার মানে, কোনো কিছু ভালো কাজ করে মানেই তা সত্য হয়ে যায় না। কোনো কোনো অপ্রশিক্ষিত আপত্তিকার যুক্তি দেখাতে পারেন, এটা একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ। আধুনিক বিজ্ঞানের বেলায় এটা খাটে না। তারা বলেন, ফ্লেজিস্টন তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ কোনো তত্ত্ব ছিল না। এর মাঝে বেশ কিছু ধারণা ছিল। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান এসব ঝামেলার মাঝে খেই হারায় না। তাদের এই কথাও সত্য না। সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হিসেবে ডারউইনীয় বিবর্তনকে নিন উদাহরণ হিসেবে। মূলধারার প্রায় সব পণ্ডিতেরা একে বলেছেন নিছক অনুমান-নির্ভর। একে আপেক্ষিকভাবে অনুমানভিত্তিক বিবেচনা করেছেন। এর মূল ধারণা নিয়েও আছে বিতর্ক।[৩০৬]

যাত্রীর আসনে কে বসে আছে তার কোনো পরোয়া করে না বৈজ্ঞানিক পলটিগুলো। একসময় যা মনে হয় সুস্পষ্ট, অকাট্য, পর্যবেক্ষণযোগ্য তা-ও সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘুরে যায় সময়ের আবর্তনে। ইউরোপে নিয়ানডার্থাল খুলি নিয়ে হওয়া গবেষণা থেকে এ-সম্পর্কিত একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ পাওয়া যাবে। ডারউইনীয় জীববিজ্ঞানীরা যুক্তি দেখাতেন, আমাদের মনুষ্য-প্রজাতির পূর্বপুরুষ অবশ্যই এই নিয়ানডার্থালেরা। পাঠ্যবই, প্রামাণ্যচিত্র এবং জাদুঘরে 'বৈজ্ঞানিক সত্য' হিসেবে এটা শেখানো হতো। কিন্তু আধুনিক ডিএনএ পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে জীববিজ্ঞানীরা ১৯৯৭ সালে ঘোষণা করলেন, নিয়ানডার্থালেরা আমাদের অগ্রজ হতে পারে না।

বিজ্ঞানের সব দিক, এমনকি অন্যান্য জ্ঞানক্ষেত্রে যেসব উপতত্ত্বগুলো বৃহত্তর তত্ত্বের জন্ম দেয়, সেগুলোও একসময় তাদের সিদ্ধান্তগুলো পুনর্বিবেচনা করবে। বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে এই প্রবণতা। কাজেই 'বৈজ্ঞানিক সত্য'কে অমোঘ বলাটা ভুল। অবাস্তবিকও। সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব 'কাজ চলছে' এবং 'আনুমানিক' প্রকৃতির। বৈজ্ঞানিক পরম সত্য বলে কিছু থাকার দাবি যদি কেউ করেন, তা হলে তা হতে পারে 'কোয়ান্টাম বলবিদ্যা' আর 'সাধারণ আপেক্ষিকতা'র মতো যে-দুটো বিষয়কে পদার্থবিদেরা সত্য বলে মানেন; অথচ মৌলিক পর্যায়ে এ-দুটোও কিনা সাংঘর্ষিক—এগুলোকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন তারা? পরম অর্থে দুটোই সত্য হতে পারে না। এটা জেনেই পদার্থবিদেরা কার্যকরী রূপ হিসেবে দুটোকে মানেন। এগুলো ব্যবহার করে এগিয়ে যান। এখন সুপ্রতিষ্ঠিত বলেই কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে চূড়ান্ত ভাবার ধারণাটা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য বিভ্রান্তিকর, অবাস্তব এবং বিপজ্জনক।

বিজ্ঞান-দার্শনিক ও ঐতিহাসিকেরা এধরনের ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বিজ্ঞান-দার্শনিক গিলিয়ান বার্কার ও ফিলি কিচার এবিষয়টি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: "বিজ্ঞান সব সময়ই সংশোধনযোগ্য। এজন্য বৈজ্ঞানিক 'প্রমাণ'-এর কথা বলাটা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, এ ধরনের শব্দ এমন ধরনের সিদ্ধান্তের চিত্র ফোটায়, যেন তা পাথরে খোদাই করা।"[৩০৭]

ধারণা ৩: বিজ্ঞান নিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়

বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে কোনো কোনো নাস্তিকের বড় ধরনের বিভ্রান্তি আছে। বিজ্ঞান একবার কোনো কিছুকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত দাবি করলে, তারা সেটাকে পরম সত্য বলে ধরে নেন। মনে করেন আর কখনো তা বদলাবে না। কিন্তু এটা আসলে বিজ্ঞানের প্রাথমিক অমীমাংসিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের ঘাটতিকেই প্রকাশ করে। আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক এরকম একটি বিষয় কার্য থেকে কারণ বিচার (induction)।

বিজ্ঞানীরা বহুভাবে কোনো তত্ত্ব প্রমাণ করেন। বা তাদের হাতে থাকা পর্যবেক্ষণযোগ্য উপাত্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসেন। তবে এগুলোর বেশির ভাগেরই ভিত্তি কার্যভিত্তিক যুক্তি। অথচ তারপরও কিন্তু কার্যভিত্তিক যুক্তি নিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যেতে পারে না।

কার্যভিত্তিক যুক্তি

যা আমরা পর্যবেক্ষণ করিনি, সে-সম্বন্ধিত জ্ঞান নিয়ে কার্যভিত্তিক যুক্তির কাজকারবার। আমাদের জ্ঞান অর্জন, নির্দিষ্ট করে বললে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনে অন্যতম ভূমিকা পালন করে এটা। আমরা যা পর্যবেক্ষণ করেছি তার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যা পর্যবেক্ষণ করিনি তা নিয়ে। বর্তমান ও অতীতের বেলাতে খাটানো যায় এটা। যেমন:

অতীত

- হেতুবাক্য: অতীতে আমি যেসব পেশিবহুল মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছি, শুনেছি তারা প্রচুর পরিমাণ আমিষ খেয়ে খেয়ে পেশি ফুলিয়েছেন।
- সিদ্ধান্ত: অতীতে সব পেশিবহুল মানুষেরা প্রচুর পরিমাণে আমিষ খেয়ে পেশি ফুলিয়েছেন।

বর্তমান

- হেতুবাক্য: আমার বন্ধু সব সময়ই দেখেছে কুকুরেরা বেশ বান্ধব।
- সিদ্ধান্ত: সব কুকুরের বান্ধব।

ভবিষ্যৎ

- হেতুবাক্য: অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সব রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন প্রচারাভিযানে একজন ডেমক্র্যাট প্রার্থী ছিলেন।
- সিদ্ধান্ত: পরবর্তী রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন প্রচারাভিযানেও একজন ডেমক্র্যাট প্রার্থী থাকবেন।

এই সিদ্ধান্তগুলোর কোনোটাই কারণভিত্তিক যুক্তি না। আর তাই এগুলো প্রকৃত নিশ্চয়তার মাত্রায় পৌঁছায় না। ওপরের কার্যভিত্তিক যুক্তিগুলো থেকে কেন অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্তগুলো আসে না তার ব্যাখ্যা দিচ্ছি এখন:

- অতীতে নিরামিষভোজী পেশিবহুল মানুষেরা শুধু নিরামিষ খেয়েই পেশি বানিয়েছেন।
- হতে পারে কিছু কুকুর অবান্ধব।

৫। ভবিষ্যতে, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে পারে। ডেমক্র্যাটরা হারিয়ে যেতে পারে। আবির্ভাব হতে পারে নতুন দলের।

কার্যভিত্তিক যুক্তির অনিশ্চিত প্রকৃতির কারণে বহু দার্শনিক জ্ঞান আহরণের উপায় হিসেবে কার্য থেকে কারণ বিচারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দর্শনশাস্ত্রে বিষয়টা জ্ঞানতাত্ত্বিক ন্যায্যতা নামে পরিচিত। কার্য থেকে কারণ বিচারের সমস্যাটাও তৈরি হয়েছে এই প্রশ্ন থেকে। এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি: কার্যভিত্তিক যুক্তি আর কার্যভিত্তিক চিন্তা এক জিনিস নয়। এ ধরনের চিন্তা নির্দেশ করে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারকে, কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো সেটা না। ধরুন, বাগানে আপনি ব্যাঙ দেখলেন। এরপর সেটাই হুবহু বললেন, আপনার বাগানে ব্যাঙ আছে। এখানে আপনি অজানা কোনো ঘটনার সিদ্ধান্ত নেননি (আপনি বলেননি যে বাগানের সবটুকু অংশ দেখেছেন, বা কাল আরেকটা ব্যাঙ দেখবেন)।

কার্য থেকে কারণ বিচারের সমস্যা

এই সমস্যার সূত্র পাওয়া যায় গ্রিক, সংশয়ী-দার্শনিক-চিন্তাধারা পূর্ণসন্দেহবাদ বা পাইরোবাদে (Pyrrhonism)।[৩০৮] তবে বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে কার্যভিত্তিক যুক্তির ব্যর্থতা সর্বাঙ্গীণভাবে তুলে ধরেছিলেন ডেভিড হিউম। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, আমাদের চিন্তার প্রকৃতির ভিত্তি কারণ ও কার্য। আর কারণ ও কার্যের ভিত্তি অভিজ্ঞতা। তার মতে, কারণ ও কার্য সম্বন্ধে আমাদের বোধশক্তির ভিত্তি যেহেতু অভিজ্ঞতা, এটা তাই নিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাবে না। হিউমের যুক্তি: কোনো পর্যবেক্ষণসীমানার বাইরের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সীমিত সংখ্যক অভিজ্ঞতা ব্যবহার করলে সংশয়হীনতার জন্ম দেবে না।[৩০৯]

ওপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যায়, কার্যভিত্তিক যুক্তি সিদ্ধান্ত নেয় নির্দিষ্ট কিছু থেকে সাধারণের দিকে গিয়ে। মানে, যে-বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি, তা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয় সীমিত সংখ্যক অভিজ্ঞতা থেকে। কার্যভিত্তিক যুক্তি সেজন্য কারণভিত্তিকভাবে বৈধ না। এখানে হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে আসে না।

কার্য থেকে কারণ বিচারের অনিশ্চয়তার মাঝেই হিউম তার যুক্তিকে আটকে রাখেননি। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন এগুলো কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। "ভবিষ্যৎ অতীতের মতোই হবে"[৩১০]—এমন কথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কার্যভিত্তিক যুক্তি। এর মানে প্রকৃতি বুঝি অপরিবর্তনশীল। এমন ভ্রান্ত অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করার একমাত্র উপায় কার্যভিত্তিক যুক্তি। হিউম যুক্তি দেখিয়েছেন, এই তর্কটি প্যাঁচালো। কারণ, অনুমানটি যে-বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে, আমরা সেটারই সত্যতা

নিরূপণ করতে চাচ্ছি। কোনো কার্যভিত্তিক যুক্তিকে এই অনুমান দিয়ে সত্য প্রমাণ করার মানে, কার্য থেকে কারণ-বিচারমূলক যুক্তিকে কার্যভিত্তিক যুক্তি দিয়েই সত্য প্রমাণ করা। কারণ, প্রকৃতি তো অপরিবর্তনশীল নয়।[৩১১]

মোট কথা, হিউমের যুক্তি হচ্ছে আমরা কার্যভিত্তিক যুক্তির ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারব না। প্রকৃতির অপরিবর্তনশীল হওয়ার অনুমানটি কার্যভিত্তিক যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়া। কাজেই কার্যভিত্তিক যুক্তির সত্যতা যাচাইয়ে এই অনুমানের ব্যবহার "যেন আপনার ঋণ পরিশোধের কথা রাখার দায়ভার নিলেন কথা রাখার ওয়াদা করে।"[৩১২]

বিজ্ঞানের বিষফোঁড়া হিসেবে কার্যভিত্তিক যুক্তি

কার্যভিত্তিক যুক্তি সংশয়হীনতার জন্ম দিতে পারে না বলে বিজ্ঞানের জন্য এক বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়ায় এটা। বিজ্ঞানীরা যেসব উপাত্ত পর্যবেক্ষণ করেন, তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যাপকভাবে নির্ভর করেন কার্যভিত্তিক যুক্তির ওপর। কিন্তু সব পর্যবেক্ষণ যেহেতু সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণযোগ্য উপাত্তগুচ্ছের ওপর নির্ভরশীল, কাজেই সীমিত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া সিদ্ধান্ত সংশয়মুক্ত হবে না।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন অনেক নজির আছে, যেখানে দেখা যায় এর পরিবর্তনশীল চিত্র। বিজ্ঞানের প্রতিটি ময়দানে জারি থাকা তত্ত্বগুলো অতীতের চেয়ে আলাদা। ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সামির ওকাশা যুক্তি দেখিয়েছেন, যেকোনো বৈজ্ঞানিক বিষয়ই বাছাই করি না কেন, আমরা "নিশ্চিত থাকব, সেই বিষয়ের জারি থাকা তত্ত্বগুলো ৫০ বছর আগের চেয়ে আলাদা। ১০০ বছর আগের চেয়ে খুবই আলাদা।"[৩১৩]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মহাজগতের নিউটনি নকশা নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ ছিল বেশ ছিমছাম পরিপাটি। এটা যেহেতু কাজ করে বলে 'বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত', দুশো বছর ধরে কেউ একে চ্যালেঞ্জ করেননি। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ জগৎ সম্বন্ধে নিউটনি দৃষ্টিভঙ্গিকে তছনছ করে দিয়েছে। নিউটনি বলবিদ্যা সময় ও স্থানকে মেনে নিয়েছিল স্থির উপাদান হিসেবে। কিন্তু অ্যালবার্ট আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন, এগুলো আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল। তো, একসময় বৈপ্লবিক এক পালাবদলের পরে 'নিউটনি নকশা'র জায়গা দখল করেছে 'আইনস্টানি নকশা'। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে হালকা নজর বোলালেই বোঝা যায়, কার্য থেকে কারণ বিচারের সমস্যাঃ নতুন পর্যবেক্ষণ সব সময়ই আগের সিদ্ধান্তের সাংঘর্ষিক হতে পারে।

বিজ্ঞান ও ঐশী গ্রন্থের দ্বন্দ্ব

আমরা দেখেছি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোর প্রকৃতি কার্যভিত্তিক। আর কার্যভিত্তিক যুক্তি সংশয়মুক্ত হয় না। এর মানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলোকে পরম বিবেচনা করার কোনো কারণ নেই। কোনো কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়। কিছু কিছু বিষয় অবশ্য আছে, যেগুলো নিয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই: পৃথিবীর গোল আকার, মাধ্যাকর্ষণের উপস্থিতি বা অক্ষগুলোর উপবৃত্তাকার হওয়া।

ঐশী গ্রন্থের সত্যতা উপস্থাপনের অক্ষমতা নিয়ে অনেক নাস্তিক হাসিতামাশা করেন। বিজ্ঞান ও ধর্মীয় চিন্তা নিয়ে অনলাইন-অফলাইনে প্রচুর আলোচনা জমে। প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ নিয়ে তর্ক-বিতর্কমূলক অনুষ্ঠানও করা হয় মূলধারার কিছু টেলিভিশন চ্যানেলে। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে এক মিথ্যা বিরোধ জাগানো হয়েছে এভাবে। হয় ধর্ম নয় বিজ্ঞান—যেকোনো একটা বেছে নেওয়ার মতো এত জলবত তরলং নয় বিষয়টা।

প্রাকৃতিক জগতে যুক্তির প্রয়োগ ঘটানোই বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। জগৎ কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে চায় বিজ্ঞান। কুরআনেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ আছে। স্বীকার করি, বৈজ্ঞানিক কিছু সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সরাসরি কিছু বিরোধ ঘটেছে কুরআনের সঙ্গে। কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি হলেই আতঙ্কিত হওয়া বা বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলেনি বলে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করার কারণ নেই কোনো। কুরআনের ভুল প্রমাণে এধরনের পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোরও যৌক্তিকতা নেই কারও। এরকম করার মানে দাঁড়াবে এমন দাবি করা যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো পরম অর্থে সত্য, কখনো বদলাবে না। অথচ বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ আমাদের আলোচনায় দেখেছি: কথাটা নির্জলা মিথ্যা। ইতিহাস আমাদের বারেবারে দেখিয়েছে, বিজ্ঞান তার সিদ্ধান্তকে সংশোধন করে। একথায় বিশ্বাস করলে কেউ বিজ্ঞান-বিরোধী হয়ে যায় না। অতীত সিদ্ধান্তগুলোকে বিজ্ঞানীরা যদি চ্যালেঞ্জ না ছুড়তেন, তা হলে কী নতুন কোনো অগ্রগতি হতো? বিজ্ঞান তাই আসলে চিরন্তন সত্যের সংগ্রহশালা নয়। আর তা কখনো হওয়ার কথাও ছিল না।

কুরআন যে আল্লাহরই বাণী, তার সত্যতা প্রমাণে যেহেতু বেশ ভালো ভালো যুক্তি আছে (দেখুন অধ্যায় ১৩), তাই মানুষের সীমাবদ্ধ কোনো জ্ঞানের সাথে যদি কুরআনের বিরোধ দেখা দেয়, তা হলে তা খুব বড় ধরনের খটকা তৈরি করার কথা নয়। মনে রাখবেন, আল্লাহ দেখেন গোটা চিত্র, আমরা দেখি গোটা ছবির সামান্য এক পিক্সেল হয়তো।

১৯৫০ সাল পর্যন্ত আইনস্টাইন-সহ সব পদার্থবিদ বিশ্বাস করতেন মহাজগতের কোনো শুরু নেই। এটা চিরন্তন। সব উপাত্ত এরই সায় দিয়েছে। অথচ এটা কুরআনের কথার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। কুরআনে স্পষ্ট করা বলা আছে এই মহাজগতের শুরু

আছে। অত্যাধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র বাতিল করে দিয়েছে 'স্থির অবস্থা' (অনাদি মহাজগৎ) রূপ। জায়গা করে দিয়েছে মহা বিস্ফোরণ রূপকে (মহাজগতের শুরু আছে; আনুমানিক ১, ৩৭০ কোটি বছর আগে এর শুরু)। তার মানে বিজ্ঞান সুর মিলিয়েছে কুরআনের সঙ্গে। সূর্যের বেলাতেও তা-ই হয়েছে।

কুরআন বলেছে সূর্যের নিজস্ব অক্ষ আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দ্বিমত করেছিলেন, তারা বলেছিলেন এটা স্থির। কুরআন ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে সবচে সরাসরি বিরোধ ছিল এটা। অথচ হাবল দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাদের আগেকার মতো সংশোধন করেছেন। তারা দেখেছেন, মিল্কি ওয়ে ছায়াপথের কেন্দ্রে ঘুরছে সূর্য।

এর মানে এই না যে কুরআন কোনো বিজ্ঞানের পাঠ্যবই। এটা চোখের সামনে নিদর্শন মেলে ধরার বই। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর কোনো বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নেই। এখানে বলা বেশির ভাগ বিষয়ই খালি চোখে দেখা যাবে, বোঝা যাবে। এক অতিলৌকিক ক্ষমতা আর জ্ঞানের বিষয়টি উন্মোচন করাই উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ-সংবলিত আয়াতগুলোর। কোনো বৈজ্ঞানিক বিবরণকে ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য নয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সময়ের ঘূর্ণিপাকে বদলাতে পারে; কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর পেছনে যে এক শক্তি আর জ্ঞানের ছাপ আছে, সেটা চিরকালীন বাস্তবতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, কুরআন ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মাঝে বিরোধ সম্ভবত চলতেই থাকবে। কারণ, এরা যে জ্ঞানের দুই ভিন্ন ধারা।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা যেন আবার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো অস্বীকার না করেন। ওটাও হবে অযৌক্তিক। বরং, সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য এবং ঐশী সত্য—দুটোই মেনে নিতে হবে— আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে যদি বিরোধ থাকে তবুও। কার্যকরী রূপ হিসেবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোকে মেনে নেওয়া যায়। সাথে মাথায় রাখতে হবে এগুলো বদলাতে পারে, এগুলো পরম সত্য নয়। অন্যদিকে কুরআনকে কেউ তার বিশ্বাসের অংশ হিসেবে মেনে নিতে পারেন। কুরআনের কোনো বক্তব্যের সঙ্গে কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে মেলবার সম্ভাবনা যদি না দেখা যায়, সেজন্য কুরআনকে বাদ দিয়ে আজকের দিনের বিজ্ঞানকেই ধ্রুব মনে করার কারণ নেই। উলটো দিকে বিজ্ঞানকেও বাতিল করার প্রয়োজন নেই। দুটোকেই গ্রহণ করা আপনার জ্ঞানতাত্ত্বিক অধিকার। বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে এবং প্রমাণকে তার নিজের কথা নিজেকে বলতে দেওয়াই বিজ্ঞান ও আকাশবাণী সম্বন্ধে মাঝামাঝি অবস্থান। বিজ্ঞানের সত্য বিশ্বাস করার বেলায় অবশ্য চোখকান অন্ধ রাখা যাবে না। যে-প্রমাণ আমরা পেয়েছি, আর যে-সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি—তা-ই যে ধ্রুব

ও শেষ সত্য, এমন মনোভাব রাখা যাবে না। কারণ, আমরা দেখেছি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে।

তো মোটকথা, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে আমরা বাস্তবিকভাবে এবং কার্যকরী রূপ হিসেবে নিতে পারি। কুরআনের কোনো বক্তব্যের সঙ্গে যদি না মেলে (দুটোর মাঝে সামঞ্জস্যের চেষ্টা করার পর), আপনার বিশ্বাসের মাঝে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটাকে জায়গা দেওয়ার দরকার নেই। ঠিক একারণে ডারউইনীয় বিবর্তন একেবারে অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই মুসলিমদের। সময়ের জন্য তারা এটাকে সেরা কার্যকরী রূপ হিসেবে মেনে নিতে পারেন। তবে বুঝতে হবে, এর কিছু কিছু দিক কুরআনের কথার সঙ্গে না মেলার কারণে সেই অংশটুকু তারা গ্রহণ করতে পারছে না। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। অধুনা কোনো কিছু সেরা কার্যকরী রূপ বলেই তা পরম সত্য নয়। আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং ঐশী জ্ঞানের উৎস সম্পূর্ণ আলাদা। একটা সসীম মানবীয় প্রচেষ্টা, আরেকটা অসীম ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর কথা। কুরআনকে বাতিল করতে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ব্যবহার করলে আমাদের নিজেদের সোপর্দ করতে হবে জ্ঞানতাত্ত্বিক অক্ষমতার কাছে। অথচ বাস্তবতা সম্বন্ধে আমাদের বোধশক্তি খণ্ডিত—আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; আল্লাহর জ্ঞান অসীম। কাজেই দুটোর মধ্যে বিরোধ দেখা গেলে ওপরের কৌশল অবলম্বনই সেরা উপায়।

ইসলামি কার্যভিত্তিক যুক্তি?

পর্যালোচক বা বিশেষজ্ঞ কেউ আমাদের এই আলোচনা পড়ে থাকলে খেয়াল করবেন, (তাত্ত্বিক এবং দার্শনিকদের মাঝে) বিজ্ঞান সম্বন্ধে এটাই মূলধারার দৃষ্টিভঙ্গি হলেও, ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বের সম্ভাব্য সমালোচনার দিকটিও সামনে নিয়ে আসে এটা। তারা যুক্তি দেখাতে পারেন, কুরআন-হাদিস সংরক্ষণে কার্যভিত্তিক যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই মুসলিমরাও এমন গুরুত্বপূর্ণ (নস্) উৎসপাঠের সংশয়হীনতা দাবি করতে পারে না।

তাদের এই তর্ক উপযুক্ত নয়।

ওপরে আমরা এক জায়গায় কার্যভিত্তিক বিচার আর কার্যভিত্তিক যুক্তির মাঝে পার্থক্য দেখিয়েছি। কার্যভিত্তিক বিচার সংশয়হীনতা দেয় মৌলিক জ্ঞানের ব্যাপারে। যেমন ধরুন, আমি যদি 'খ'-এর মাঝে 'ক'-এর উপস্থিতি দেখি, তার মানে 'খ' 'ক'-কে তার মাঝে আসার অনুমতি দিচ্ছে। আমি দেখেছি কাক ওড়ে। তার মানে অনিবার্যভাবেই কিছু কাক ওড়ে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, এ ধরনের বিচার আসলে পর্যবেক্ষণেরই 'প্রতিবিম্ব'। এখনো যা দেখা হয়নি, তা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে সোজাসাপ্টা কথাটা বলা হচ্ছে এখানে। কুরআন ও হাদিস সংরক্ষণে এ ধরনের বিচার ব্যবহার করা

হয়েছে। যেমন ধরুন, নবিজির কোনো সঙ্গী তাঁর কাছে থেকে কুরআনের কোনো আয়াত শুনে, হুবহু তা-ই পুনরাবৃত্তি করেছেন। যে-আয়াত তিনি কখনো শোনেননি, সে সম্বন্ধে নিজের মতো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। যেমন, কোনো সঙ্গী "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন" (আমরা শুধু আপনারই 'ইবাদাত করি) শুনে বলবেন না যে, "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (বলো, আল্লাহ এক)। সুতরাং এই আপত্তি টেকে না। কারণ, কুরআন হাদিস সংরক্ষণে যে-ধরনের বিচার ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে তা ভুলভাবে বোঝা হয়।

ধারণা ৪: পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদের সাথে দার্শনিক প্রকৃতিবাদ গুলিয়ে ফেলা

দার্শনিক প্রকৃতিবাদ বলে মহাজগৎ যেন এক আবদ্ধ ব্যবস্থা। এর বাইরের কোনো কিছু এখানে হস্তক্ষেপ করে না। অতিপ্রাকৃতিক কোনো ঈশ্বর বা কিছু নেই। দার্শনিক প্রকৃতিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হচ্ছে: সব ঘটনা জড় প্রক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে। অন্যদিকে, পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ বলে, কোনো কিছুকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে বর্ণনা করতে ঈশ্বরের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা বা কর্মকাণ্ডের ধরনা দেওয়া যাবে না।

নাস্তিকদের মাঝে যারা মনে করেন বিজ্ঞান নাস্তিকতাবাদের দিকে নিয়ে যায়, তারা দার্শনিক প্রকৃতিবাদের অবৈজ্ঞানিক অনুমানটা লালন করেন। দার্শনিক প্রকৃতিবাদের চশমা এঁটে জগৎটাকে বুঝতে চান তারা। চোখে হলুদ কাঁচের চশমা লাগিয়ে রাখলে জগৎটাকে তো হলুদই মনে হবে, তাই না? ঠিক সেভাবে, চোখে যদি দার্শনিক প্রকৃতিবাদের চশমা আঁটান, তা হলে আল্লাহ-বিহীন এক মহাজগৎই চোখে পড়বে বারবার।

দার্শনিক প্রকৃতিবাদ মানুষের চিন্তার গতিপথকে পালটে দেয়। সহজ ভাষায় এটা এক ধর্মবিশ্বাস। নাস্তিক অধ্যাপক মাইকেল রুস স্বীকার করেছেন সেটা: "যদি স্বীকারোক্তি চান, আমি কিন্তু সব সময়ই বলেছি, প্রকৃতিবাদ এক বিশ্বাস...।"[৩১৪] প্রশ্ন হচ্ছে কেন?

প্রকৃতিবাদ অন্ধের মতো বিশ্বাস করে যে সবকিছু বস্তুগত প্রণালি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথচ এর মাঝে লুকিয়ে আছে এমন কিছু বেয়ারা সত্য যা খোদ তত্ত্বটিকেই পদানত করে। আর সেজন্য এটা অসংগত।[৩১৫]

মনে করুন, আমরা আজ সন্ধ্যা ৭টায় এক রেস্তোরাঁয় দেখা করেছি। পরেরদিন পুলিশ এসে আমাকে গ্রেফতার করল। তাদের অভিযোগ, গতকাল ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় আমি একজনকে খুন করেছি। এখানে বেয়ারা সত্যটা হচ্ছে, খুনের সময় আমি আপনার সঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। আমি কোথায় ছিলাম সেটার প্রমাণ পাওয়ায় আমার

ওপর থেকে পুলিশের সন্দেহ দূর হলো। আপনি ভাবতে পারেন, দার্শনিক প্রকৃতিবাদের বেলায় এমন কী বেয়ারা সত্য আছে যা একে অসংগত করছে?

আগের বেশ কিছু অধ্যায়ে এ-সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করেছি। অনুভূতিবোধের কঠিন সমস্যা (দেখুন অধ্যায় ৭), মহাজগতের সসীমতা এবং পরনির্ভরতা (দেখুন অধ্যায় ৫ ও ৬), ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতার অস্তিত্ব (দেখুন অধ্যায় ৮), নিয়মগুলোর চুলচেরা সঠিক পরিমাপ এবং মহাজগতের শৃঙ্খলা (দেখুন অধ্যায় ৯)-সহ আরও অনেক কিছুর যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না দার্শনিক প্রকৃতিবাদ। যে-দর্শন বাস্তবতাকে তার নিজের কথা বলতে বাধা দেয়, সেই দর্শন মানুষ কেন অন্ধের মতো গিলবে? প্রকৃতিবাদী এই ধারণা বহু নাস্তিক বিনা বিচারে সত্য বলে মেনে নেন। একারণে তারা যে আস্তিক্যবাদী যুক্তিগুলো বাতিল করে দেন, তাতে চোখ কপালে তোলার কিছু নেই আসলে! সবকিছুই প্রাকৃতিক প্রণালি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে—এই ভ্রান্ত অনুমান এবং অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ না করার অন্ধ মানসিকতার কারণে তারা ভালো ভালো যুক্তিগুলোকে বাতিল করে দেন।

আস্তিক্যবাদ, বিশেষ করে ইসলামি বিশ্বাসের জন্য পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ কোনো সমস্যা নয়। কারণ, গোটা মহাজগতের নেপথ্যে যে প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ড আছে, এবং সেগুলো যে ঐশী ইচ্ছেরই প্রতিফলন—সে কথাই বলে ইসলাম। কিন্তু কিছু নাস্তিক পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদকে গুলিয়ে ফেলেন দার্শনিক প্রকৃতিবাদের সঙ্গে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আর তত্ত্বগুলো আল্লাহর ক্ষমতা ও সৃষ্টিশীলতাকে নির্দেশ করে না বলেই (পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ) আল্লাহর অস্তিত্ব লীন (দার্শনিক প্রকৃতিবাদ) হয়ে যায় না। বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানী স্কট সি. টড বলেছেন, “প্রকৃতিবাদের নাগালের বাইরে থাকা বাস্তবতাকে মেনে নিতে ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞানীরা স্বাধীন।”[৩১৬]

বিজ্ঞান কি তা হলে আল্লাহকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে?

ওপরের আলোচনার আলোয় উত্তরটা নেতিবাচক। গবেষণার জন্য বিজ্ঞান এক চমৎকার পদ্ধতি। মানবজাতির অসামান্য কল্যাণ করেছে এটা। কিন্তু এর কোনো সিদ্ধান্তই চিরস্থায়ী নয়। পদ্ধতি হিসেবে এটা আল্লাহর অস্তিত্বকে সরাসরি বাতিল করতে পারে না, সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। বাস্তবতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে এটি একমাত্র তরিকাও না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু নাস্তিকের বেশির ভাগ অনুমান অসংগত। বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে মোটাদাগের ভুল বোঝার পরিণাম সেটা।

অধ্যায় ১৩

কুরআনের ঐশী রচয়িতা

এযাবৎ আমাদের আলোচনা ছিল আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর-অস্তিত্ব-বিরোধী কিছু যুক্তির ভ্রান্তি নিয়ে। আমরা দেখেছি, তাঁর অস্তিত্ব অনিবার্য। তিনি মহাজগতের একক স্রষ্টা, বস্তুগত পরিকল্পনা এবং নৈতিক নিয়মাবলির প্রণেতা। এতক্ষণ আমরা কথা বলেছি ঐশী বাস্তবতা নিয়ে। এখন কথা হচ্ছে, এমন এক স্রষ্টা যদি সত্যিই থেকে থাকেন, তা হলে কীভাবে চিনব তাঁকে?

আকাশবাণী বা প্রত্যাদেশ হিসেবে কুরআন কতটুকু সত্যতা বহন করে, তা যাচাই করব এ-অধ্যায়ে। আগের অধ্যায়গুলোতে কুরআনের বেশ কিছু আয়াত এসেছে তথ্যসূত্র হিসেবে। তবে এখানে আমরা আল্লাহর কথার যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করব।

আমাদের বেশির ভাগ জ্ঞান কিন্তু অন্যের কথার ওপর নির্ভরশীল। জীবনে এমন অনেক সত্য আমরা স্বীকার করি, যেগুলো বেশির ভাগ সময়েই অন্য কারও কাছ থেকে শোনা। অ্যামাজনের গহিন জঙ্গলে যে-আদিবাসীদের বসবাস তাদের কি কখনো দেখেছি আমরা? পাতার মধ্যে যে-সালোক-সংশ্লেষণ হয় সেটাই বা দেখেছি কজন? কিংবা ধরুন সূর্য থেকে আসা অতি বেগুনি রশ্মি? অথবা আপনার-আমার পাশে ঘুরঘুর করা জীবাণু? আপনার মাকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে এ বিষয়টা আরও খোলাসা করছি।

একজন অপরিচিত মানুষ হিসেবে, আমার কাছে কীভাবে আপনি প্রমাণ করবেন, যাকে আপনি মা বলেন, তিনিই আপনাকে জন্ম দিয়েছেন? জানি প্রশ্নটা শুনতে খুব উদ্ভট লাগছে। কিন্তু সাক্ষ্যের মতো জ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিককে স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে এই প্রশ্ন।

প্রশ্নটার উত্তরে আপনি বলতে পারেন, "আমার মা আমাকে তা-ই বলেছেন", "আমার জন্মসনদ আছে", "আমার বাবা বলেছেন, তিনি ওখানে ছিলেন", বা "আমার মায়ের হাসপাতালের নথি খতিয়ে দেখেছি"। কথাগুলো বৈধ; কিন্তু এগুলো সবই অন্যের কথার ওপর ভিত্তি করে। সংশয়ী মন তাতে তৃপ্ত না-ও হতে পারে। শেষ ভরসা হিসেবে 'ডিএনএ কার্ড' বা ভিডিও প্রমাণ এনে নিজের বিশ্বাসের পক্ষে দলিল পেশ

করতে পারেন। কিন্তু কথা কী, আমাদের বেশির ভাগ মানুষই কিন্তু এভাবে ডিএনএ পরীক্ষা করে নিজের বাবা-মা'র ব্যাপারে নিশ্চিত হন না। ভিডিও দেখেও না। মা বলেছেন—তা-ই বিশ্বাস করি। প্রায় ৯৯.৯৯ ক্ষেত্রে এমনই বিষয়টা। আর ভিডিওতে দেখানো বাচ্চাটি যে আপনিই—তা-ই বা নিশ্চিত হলেন কীভাবে? সেটাও তো অন্যের কথা শুনে বিশ্বাস করতে হয়। ঠিক এখানেই জ্বলজ্বলে রূপে আবির্ভূত হয় সাক্ষ্যের মতো জ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি।

জ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সেরা ব্যাখ্যা। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, বিবৃতি থেকে যুক্তিবিচারের মাধ্যমে ভিত্তি পায় আমাদের বেশির ভাগ বিশ্বাস। এরপর সেগুলোর পক্ষে খোঁজা হয় সেরা ব্যাখ্যা। আপনার মায়ের উদাহরণটি নিয়ে আসি আবার।

ধরুন, আপনার মা গর্ভাবস্থার একদম শেষ পর্যায়ে আছেন। ডাক্তারের দেওয়া প্রসবের তারিখ চলে গেছে গত মাসে। তো হঠাৎ তার পানি ভাঙা শুরু হলো। গর্ভস্থ পেশির সংকোচন শুরু হয়েছে। আপনার বাবা এবং উপস্থিত চিকিৎসা-কর্মী নিশ্চিতভাবে অনুমান করলেন প্রসব-ব্যথা এটা।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন।

কয়েক বছর পরের ঘটনা। আপনার মা দেখলেন মেঝেতে একটা খোলা বিস্কুটের মোড়ক পড়ে আছে। আপনার মুখের চারপাশে, কাপড়ে বিস্কুটের গুড়ো লেগে আছে। তিনি বুঝলেন, মোড়ক খুলে নিজেই বিস্কুট খেয়েছেন আপনি।

ওপরের দুটো উদাহরণে যে-সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে, তা অনিবার্য সত্য বা তর্কাতীত নয়। কিন্তু উপস্থিত সব তথ্য বিবেচনায় ওগুলোই ঘটনাগুলোর সেরা ব্যাখ্যা। এধরনের চিন্তাধারা সেরা ব্যাখ্যার অনুমান নামে পরিচিত।

এই দৃশ্যপটের অবতারণা কেন করলাম?

কুরআন যে আরবি ভাষার এক অননুকরণীয় প্রকাশ তা প্রমাণে, এই উদাহরণগুলোতে যে-ধারণা ও মূলনীতি পোরা আছে, তা ব্যবহার করব। অনুনকরণীয় বলতে বোঝানো হচ্ছে, কুরআনের ভাষিক ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো নকল বা অনুকরণ করা অসম্ভব। ভাষা-অলংকারের বেলায় এর সাহিত্যিক রূপ ও ধরন একেবারে স্বতন্ত্র। তো, আমার উদাহরণগুলোর সাথে এর যোগসূত্র কী?

নিচের রূপরেখাটি খেয়াল করুন:

সপ্তম শতকে আরবে নবি মুহাম্মাদের কাছে অবতীর্ণ হয় কুরআন। সময়টা তখন সাহিত্যিক ও ভাষিক নিপুণতার স্বর্ণযুগ নামে পরিচিত। মাতৃভাষায় অনুপমভাবে নিজেদের প্রকাশ করত আরবেরা। নিজেদের মাঝে কোনো কবির আবির্ভাবে গর্বে ফেটে পড়ত তারা। কবিতা ছিল তাদের ধ্যান-জ্ঞান। কাব্যিক প্রতিভা আর ভাষিক

মুনশিয়ানাই ছিল তাদের জীবন-জীবিকা। ওটা ছাড়া যেন দম বন্ধ হয়ে আসত তাদের। কিন্তু সেই তাদের সামনে যখন কুরআনের আয়াত পাঠ করা হতো, ওরা দম নেওয়ার কথা ভুলে যেত। ভাষা হারিয়ে ফেলত। বিবশ হয়ে যেত। ওদের বড় বড় কবিদের নীরবতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষের মতো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ওরা। কুরআনের বয়ানের মতো কোনো কিছু বানানো তো দূরের কথা; দিন দিন অবস্থার অবনতিই হয়েছে শুধু। সেসময়ের বাঘা বাঘা কবিদের কুরআন চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে, এর অনন্য ভাষিক ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুকরণে কিছু রচনা করতে। কিন্তু তারা নাকানিচুবানি খেয়েছে। কোনো কোনো বিশিষ্ট কবিরা কুরআনকে মেনে নিয়েছিলেন আল্লাহর কথা হিসেবে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই বেছে নিয়েছিল সম্পর্ক ছিন্ন, মারামারি, নিপীড়ন আর অপ-প্রচারের পথ। যুগে যুগে বিশেষজ্ঞরা চেয়েছেন কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে। কিন্তু তারাও নতস্বরে বলেছেন কুরআন অননুকরণীয়। ভাষা-সাহিত্য পণ্ডিতেরা কেন বিফল হয়েছেন, দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা।

আচ্ছা, একজন অনারব বা আরবি ভাষায় অদক্ষ কেউ কী করে কুরআনের অননুকরণীয়তার কদর বুঝবে? এখানেই আমাদের প্রয়োজন পড়ছে সাক্ষ্যের।

অতীত-বর্তমানের আরবিভাষা বিশেষজ্ঞদের থেকে লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানের ভিত্তিতে মেনে নেওয়া হয়েছে কুরআনের অননুকরণীয়তা। স্বভাবতই তখন প্রশ্ন আসে, কে তা হলে এর প্রণেতা? এখানে এসে সাক্ষ্য থেমে যায়। শুরু হয় অনুমান। সেরা ব্যাখ্যার অনুমানটিকে বুঝতে হলে আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কুরআনের অননুকরণীয় প্রকৃতির সম্ভাব্য যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলোকে। কুরআন হয় কোনো আরব লিখেছেন, নয় কোনো অনারব, মুহাম্মাদ ﷺ অথবা স্বয়ং আল্লাহ। এ অধ্যায়ে উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলো নিয়ে যেসব আলোচনা আসবে, তাতে বোঝা যাবে, কোনো আরব-অনারব বা মুহাম্মাদ ﷺ যদি এর রচয়িতা হতেন, তা হলে এর অনুকরণ সম্ভব হতো। যেহেতু হয়নি, তার মানে আল্লাহকে এর রচয়িত হিসেবে মেনে নেওয়া সেরা ব্যাখ্যার অনুমান।

উপরোক্ত ভূমিকার মূল অনুমানঃ জ্ঞানের এক বৈধ উৎস সাক্ষ্য। এবং বাস্তবতা সম্বন্ধে উপসংহার টানতে গেলে হেতুবাক্য বা পরিলক্ষিত ঘটনা থেকে সিদ্ধান্তে আসার প্রক্রিয়া যৌক্তিক এবং যথাযোগ্য পদ্ধতি। এই অধ্যায়টি আপনাদের সাক্ষ্যের জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় করাবে; তুলে ধরবে সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানগ্রহণের যৌক্তিকতা। উপযুক্ত ব্যাখ্যা অনুমানের কার্যকারিতার বিষয়টিও ফুটিয়ে তুলবে। কুরআনের অননুকরণীয়তার বেলায় এ-দুটো ধারণা খাটাবে। এই অধ্যায়ে আমরা আরও দেখব, যেহেতু কেউ কুরআনের অনুকরণ করতে পারেননি, কাজেই এর রচয়িতা হিসেবে আল্লাহই সেরা

ব্যাখ্যা। আরবি ভাষা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা, এমনকি ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলেও এটা বুঝতে পারবেন পাঠকেরা।

সাক্ষ্যের জ্ঞানতত্ত্ব

অধ্যায় ১২-তে আমরা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করেছি জ্ঞানের উৎস হিসেবে সাক্ষ্যের অনিবার্যতা এবং মৌলিকতা নিয়ে। জ্ঞানতাত্ত্বিকেরা এ সম্বন্ধে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন। এগুলোর মাঝে আছে: সাক্ষ্য কখন প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হয়? সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান কি জ্ঞানের অন্য কোনো উৎসের ওপর ভিত্তি করে? নাকি এটা মৌলিক? জ্ঞানতত্ত্বের এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কিংবা সুরাহা করার পরিসর নেই এখানে। তবে এ বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষেপে পাঠকদের একটা ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। তা হলে তারা বুঝতে পারবেন, সাক্ষ্য জ্ঞানের এক বৈধ উৎস।

সাক্ষ্য কি মৌলিক

অধ্যায় ১২-তে সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানগ্রহণের কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছিলাম আপনাদের সামনে। অন্যের কথার ওপর আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক নির্ভরতাকে উন্মোচন করে দিয়েছে উদাহরণগুলো। লেখা-প্রসঙ্গে স্পষ্টভাষী নাস্তিক লরেন্স ক্রাউসের সঙ্গে আমার এক উন্মুক্ত আলাপের কথা মনে পড়ল। পর্যবেক্ষণ যে জ্ঞানের একমাত্র উৎস নয় সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, এ সম্বন্ধে তার পূর্বানুমানটা কী তা বের করা। সাক্ষ্যের বিষয়টা তুলে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বিবর্তন বিশ্বাস করেন কি না। তিনি বললেন, করেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, এর সব পরীক্ষা তিনি নিজে করেছেন কি না। তিনি না-সূচক উত্তর দিয়েছিলেন।[৩১৭] কোনো কিছু আমরা কেন বিশ্বাস করি, সে সম্বন্ধে তার অনুমানের এক গুরুতর দিক উন্মোচন করেছে তার স্বীকারোক্তি। আমাদের অনেকের অবস্থাও এমন। আমাদের বেশির ভাগ বিশ্বাসই গড়ে ওঠে অন্যের কথার ওপর ভিত্তি করে। কেবল বৈজ্ঞানিক ভাষার মোড়কে আছে বলেই সেগুলো সবই নিজস্ব পর্যবেক্ষণলব্ধ কিছু নয়।

এই তো, কিছুদিন আগেও জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে দেখা হতো না সাক্ষ্যকে। কিন্তু এ বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা আর প্রকাশনা ভেঙে দেয় জ্ঞানতাত্ত্বিক নীরবতা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সি.এ.জে কোডির 'টেস্টিমনি: আ ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন'। সাক্ষ্যের বৈধতার ব্যাপারে যুক্তি দেখিয়েছেন কোডি। সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানগ্রহণ সম্বন্ধে ডেভিড হিউমের খণ্ডিতবাদী মতেরও সমালোচনা করেছেন তিনি। খণ্ডিতবাদী তত্ত্ব বলে, উপলব্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতো জ্ঞানের অন্যান্য উৎস সাক্ষ্যের ন্যায্যতার প্রমাণ দেয়। অর্থাৎ,

প্রমাণ হিসেবে সাক্ষ্যের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে একে ন্যায্য প্রমাণ হতে হবে।

অন্যদিকে সাক্ষ্য সম্বন্ধে কোডির বিবরণ মৌলিক। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, পর্যবেক্ষণের মতো জ্ঞানের অন্য কোনো উৎসের সাহায্য ছাড়াই সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানের ন্যায্যতা প্রমাণিত। সাক্ষ্যের এই বিবরণ খণ্ডিতবাদ-বিরোধী তত্ত্ব নামে পরিচিত। হিউমের কর্মপন্থার সমালোচনা করে খণ্ডিতবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন তিনি।

হিউম মূলত খণ্ডিতবাদী তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হিসেবে নাম করেছিলেন এনকোয়ারি কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডার্স্ট্যান্ডিং বইতে 'অন মিরাকল্‌স' নামে একটা প্রবন্ধ লিখে। সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানকে তিনি একেবারে নাকচ করেননি; বরং এর কিছু গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন: "মানুষের সাক্ষ্য থেকে যা নিরূপণ করা হয়, বিচারবিশ্লেষণের আর কোনো কিছু এত সহজলভ্য, এত উপযোগী, এমনকি মানবজীবনের জন্য এত প্রয়োজনীয় নয়...।"[৩১৮] হিউম যুক্তি দেখিয়েছেন, সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান এবং আমাদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মাঝে থাকা মিলের ওপর নির্ভর করে সাক্ষ্যের ওপর আমাদের আস্থা। ঠিক এ জায়গাটাতে হিউমের কর্মপন্থার ছিদ্র পেয়েছেন কোডি। তার সমালোচনা কেবল নিচের যুক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং একে তিনি আরও বিস্তৃত করেছেন। এ থেকে তার গোটা যুক্তির শক্তিমত্তাও বোঝা যায়।

কোডি যুক্তি দেখিয়েছেন, সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের কথা বলে হিউম আসলে এক দুষ্টচক্রকে ডেকে এনেছেন। হিউম দাবি করেছেন, কেউ যে-জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়, তা যদি পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সঙ্গে মেলে, কেবল তবেই তার ন্যায্যতা প্রমাণিত। এখানে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য বলতে হিউম ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণকে বোঝাননি; বুঝিয়েছেন সামগ্রিক পর্যবেক্ষণকে। কোডি যুক্তি দেখিয়েছেন, সব সময় আমরা এমন সাধারণীকৃত ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করতে পারি না। এখানেই বের হয়ে আসে দুষ্টচক্রটা। কারণ, কেউ কী পর্যবেক্ষণ করেছেন, সেটা কিন্তু আমরা কেবল তার সাক্ষ্য থেকেই জানতে পারি। শুধু নিজের সরাসরি অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করলে তা যথেষ্ট হবে না। কারণ, সে জ্ঞান হবে খুবই সীমিত, কোনো কিছুর ন্যায্যতা প্রমাণে অনুপযুক্ত—কিংবা অন্তত পক্ষে খুবই সামান্য। আর তাই খণ্ডিতবাদী তত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ। সাক্ষ্যকে পর্যবেক্ষণের মতো জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে ন্যায্য প্রমাণিত হতে হবে—এমন কথা বলে এই মতবাদ আসলে যেটাকে নাকচ করতে চায়, সেটাকেই মেনে নেয়: সাক্ষ্যের মৌলিক রূপকে। মূল যে-কারণ এই বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয় তা হচ্ছে: আমাদের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ কী তা জানতে হলে আপনাকে অন্য লোকের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে, যেহেতু আমরা সেগুলো নিজেরা পর্যবেক্ষণ করিনি।

অভিজ্ঞদের ওপর নির্ভর করা

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। অথচ গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যগুলো সম্বন্ধে অভিজ্ঞরা যা বলেছেন, তার ওপর যদি আস্থা না রাখতাম, তা হলে কিন্তু বিজ্ঞান এতদূর এগোতে পারত না। উদাহরণ হিসেবে বিবর্তনকেই ধরুন। রিচার্ড ডকিন্সকে যদি সব গবেষণা নিজেকেই করতে হতো এবং সব পরীক্ষা নিজের চোখেই দেখতে হতো, তা হলে এর সত্যতা এত জোরের সঙ্গে বলতে পারতেন না তিনি। কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা তিনি নিজে পুনরায় করতে পারলেও, অনেক তথ্যের জন্যই কিন্তু তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কথার ওপর। জ্ঞানের এই শাখার বিস্তৃতি এত বিশাল—সবকিছু নিজেরা খতিয়ে দেখা অসম্ভব। সুতরাং, এ ধরনের ধ্যানধারণা পোষণ করে বসে থাকলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্ভব হতো না।

ওপরের উদাহরণটি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের মুখোমুখি করাচ্ছে আমাদের: সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান যদি কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথার ওপর ভিত্তি করে হয় তখন কী হবে? বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা সবাই অভিজ্ঞ নই। আর তাই সময়ে সময়ে অন্যদের সাক্ষ্য আমাদের গ্রহণ করতে হয়। দর্শনের অধ্যাপক ড. এলিজাবেথ ফ্রিকার বিষয়টাকে খুলে বলছেন:

> "কখনো কখনো সম্মানের সঙ্গে অন্যের সাক্ষ্য মেনে নেওয়াটা যৌক্তিক; না নেওয়াটা অযৌক্তিক। ব্যক্তির শিক্ষাদীক্ষা, তার মননগত এবং শারীরিক প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতার কারণে এটা প্রয়োজন। সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে, সবাই যে একই স্তরের হবে তাও কিন্তু বাস্তব নয়। কেউ তার চেয়ে সেই বিষয়ে ভালোও জানতে পারেন। আমি যে উড়তে পারি না, বা এক সপ্তাহ না ঘুমালে আমার কাজেকর্মে যে ক্ষতি হবে, কিংবা আমি যা জানতে চাই তার সবকিছুই যে নিজে নিজে খুঁজে পাই না, এসব নিয়ে আমি যৌক্তিকভাবে আফসোস করতে পারি। কিন্তু আমার মননগত ও শারীরিক সীমাবদ্ধতা যেহেতু নির্ধারিত পরিমাপের, তাই অন্যের কথায় আমার বর্ধিত কিন্তু বিচক্ষণ আস্থা, তা থেকে অর্জিত বিপুল জ্ঞানগত এবং অন্যান্য ঐশ্বর্য নিয়ে আফসোসের অবকাশ নেই কোনো।"[৩১৯]

আস্থা

সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানগ্রহণের আলোচনায় এবারে বিশ্বস্ততার বিষয়টি চলে আসে। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কারও বিশেষ পাণ্ডিত্যের কারণে তার কথা মেনে নিতে, একদিকে যেমন তার ওপর ভরসা করতে হয়; অন্যদিকে তার বিশ্বস্ততা যাচাইয়ে আমাদেরও হতে হয় বিশ্বস্ত।

সাক্ষ্যের প্রকৃতি ও বৈধতার আলোচনা এখন সরে গেছে খণ্ডিতবাদী ও খণ্ডিতবাদ-বিরোধী ভাবকাঠামো থেকে। দর্শনের অধ্যাপক কেথ লেহরার যুক্তি দেখিয়েছেন, সাক্ষ্যের ন্যায্যতার প্রমাণ এ দুটোর কোনোটাই না; বরং আস্থা। তার কথা, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে সাক্ষ্য থেকে সঠিক জ্ঞান পাওয়া গেলেও, সব পরিস্থিতিতে তা হয় না।[৩২০] তার মতে, "সাক্ষ্য দেওয়া তথ্যদাতা যদি বিশ্বস্ত হন, তা হলে [সাক্ষ্য] নিজেই প্রমাণ হিসেবে গণ্য। না হলে সাক্ষ্য নিজে থেকে কোনো প্রমাণ গঠন করে না।"[৩২১] সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তিকে "বিশ্বস্ত হিসেবে একেবারে অভ্রান্ত হতে হবে"[৩২২] এমন নয় ব্যাপারটা। কিন্তু "সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি যা গ্রহণ করেন এবং প্রচার করেন, সে ব্যাপারে তাকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে।"[৩২৩] কারও কথাকে জ্ঞান হিসেবে নিতে হলে কেবল বিশ্বস্ততাই যথেষ্ট নয় বলে স্বীকার করেছেন লেহরার। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ব্যক্তির বিশ্বস্ততাকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে। এবং আমাদের এই যাচাইয়ের বেলায় আমাদেরও হতে হবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।[৩২৪] কোনো সাক্ষ্যভিত্তিক তথ্য যাচাইয়ে মূল ভূমিকা পালন করে কোনো বিষয়ের আবহ-জ্ঞান, জ্ঞানের সেই নির্দিষ্ট শাখায় অন্যান্যদের সাক্ষ্য, সাথে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক অভিজ্ঞতা।

লেহরার বলেন, অন্যদের বিশ্বস্ততা মূল্যায়নের বেলায় আমরা যদি বিশ্বস্ত হতে চাই, আমাদের তা হলে দেখতে হবে এর আগে যাচাইয়ের বেলায় আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো—সেখানে আমরা কি ঠিক ছিলাম নাকি ভুল। তবে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য যে-নির্ভরযোগ্য না, এটাও সাধারণত আমরা জানি সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে অন্যের সাক্ষ্য থেকে।[৩২৫] কাজেই এখানে একটা দুষ্ট চক্র ওঁত পেতে আছে বলে মনে হতে পারে। কারণ, কারও সাক্ষ্য যাচাইয়ে আমরা নির্ভর করছি অন্যের সাক্ষ্যের ওপর। তবে লেহরার একে বলতে চান অনেকটা "পুণ্যচক্র" হিসেবে।[৩২৬] কীভাবে? দুটো উত্তর দিয়েছেন তিনি:

> "প্রথমত, যুক্তিগ্রাহ্যতা বা বিশ্বস্ততার কোনো সম্পূর্ণ তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে হবে, কেন আমরা সেই তত্ত্বকে গ্রহণ করলে ঠিক কাজ করব বা বিশ্বস্ত আচরণ করব। কাজেই তত্ত্বটাকে নিজের ওপর খাটিয়েই ব্যাখ্যা করতে হবে, কেন আমরা এটা গ্রহণ করে ঠিক কাজ করব বা বিশ্বস্ত আচরণ করব। দ্বিতীয়ত, এবং আগেরটির মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ, অতীতে আমরা কী গ্রহণ করেছি তা থেকে উদ্ভূত হতে হবে আমাদের বিশ্বস্ততাকে। অন্যের সাক্ষ্য থেকে কী গ্রহণ করেছি সেটাও বিবেচনায় থাকবে সেখানে। নির্দিষ্ট যে-জিনিস আমরা গ্রহণ করেছি এবং কোনো কিছু গ্রহণ করায় আমাদের সাধারণ বিশ্বস্ততা—এ-দুয়ের মাঝে এক ধরনের পারস্পরিক সমর্থন আছে। সাধারণ এই বিশ্বস্ততার মাঝে অবশ্য যে-নির্দিষ্ট জিনিসগুলো আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলোও থাকবে। যেসব

জিনিস আমরা গ্রহণ করি, সেগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক এই সমর্থনের ফলস্বরূপ নির্ধারিত হয় কোনো কিছু গ্রহণ করায় আমাদের বিশ্বস্ততা।"[৩২৭]

হস্তান্তর অধিকার

কিন্তু অন্যের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করায় কীভাবে আমরা আস্থা অর্জন করব, সে প্রশ্নটি থেকেই যায় লেহরারের আলোচনা থেকে। অধ্যাপক বেনিয়ামিন ম্যাকমাইলার বেশ আকর্ষণীয় এক যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন এ প্রশ্নের জবাব পেতে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, সাক্ষ্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যাকে "হস্তান্তরের জ্ঞানতাত্ত্বিক অধিকার ব্যাখ্যার সমস্যা হিসেবে পুনর্নির্মাণ" করা যায়।[৩২৮] ম্যাকমিলারের মন্তব্য, শ্রোতার কাছে যদি বক্তার দিকে চ্যালেঞ্জ হস্তান্তরের অধিকার থাকে, তা হলে সাক্ষ্যের সমস্যাটি নতুনভাবে গড়া যায়। এজন্য প্রয়োজন উভয়পক্ষের নিজ নিজ দায় স্বীকার। বক্তাকে তার সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান প্রচারের দায় নিতে হবে। শ্রোতাদেরও জানা থাকতে হবে, তারা বক্তার দিকে চ্যালেঞ্জ হস্তান্তর করতে পারেন।[৩২৯]

বক্তা (বা লেখকের) প্রতি চ্যালেঞ্জ হস্তান্তরের এই অধিকার প্রয়োগ করে বিশ্বস্ততা গড়ে তোলা যায়। এসব চ্যালেঞ্জের সংগতিপূর্ণ জবাব দেওয়া গেলে আস্থা বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। নিচের উদাহরণটি খেয়াল করুন।

মনে করুন, ভাষাবিজ্ঞানের কোনো অধ্যাপক দাবি করলেন কুরআন নকল করা সম্ভব নয়। তিনি কুরআনের বাগ্ অলংকার, এর স্বতন্ত্র ভাষিক রূপ ও ধরনের বর্ণনা দিলেন। শ্রোতারা এবার দায়িত্বভার নিয়ে অধ্যাপককে চ্যালেঞ্জ করলেন। তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন: আপনি কি আমাদের কুরআন থেকে আরও উদাহরণ দিতে পারেন? কুরআনের ধরন নিয়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা কী বলেছেন? যেসব পণ্ডিত আপনার মতের বিরোধিতা করেন, তাদের মতামতকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি? কুরআনের ঐতিহাসিক পটভূমিগত তথ্যের আলোকে এটা কীভাবে আপনার দাবিকে সমর্থন করছে? অধ্যাপক এসব প্রশ্নের সংগতিপূর্ণ জবাব দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুললেন আস্থা।

চাক্ষুস সাক্ষ্যের ব্যাপারে কিছু কথা

এতক্ষণ যাবৎ আমাদের আলোচনা হয়েছে জ্ঞানের সাক্ষ্যভিত্তিক প্রচার নিয়ে। কোনো ঘটনা বা অপরাধ নিজ চোখে দেখে তা হুবহু বর্ণনা করা বিষয়ে নয়। চাক্ষুস সাক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণাপত্র, লেখালেখি আছে। ওসব গবেষণার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নয়। তবে চাক্ষুস সাক্ষ্য কতটা নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে পণ্ডিত-মহলে সংশয় আছে যেহেতু, কাজেই সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। আমাদের ক্ষণকালীন স্মৃতির খুঁত, মানসিক প্রভাব, কোনো ঘটনা হুবহু

বলতে না পারার সীমাবদ্ধতা-সহ বেশ কিছু কারণে আমাদের চাক্ষুস সাক্ষ্যে উনিশ-বিশ হতে পারে। কিন্তু সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান বা ধারণাগুলো এ ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত। কারণ, সাধারণত কোনো বিষয় নিয়ে একাধিকবার গভীর পড়াশোনা, দীর্ঘসময় ধরে গবেষণা করে নিজের মাঝে আত্মস্থ করার পরই কেবল জ্ঞান অর্জিত হয়।

বিষয়টা আমাদের আলোচনাকে সামান্য অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নিয়ে গেলেও বেশ ফলপ্রদ হবে সেটা। ডেভিড হিউম অলৌকিকতার ওপর একটা নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, অলৌকিক ঘটনার পক্ষে একমাত্র প্রমাণ চাক্ষুস সাক্ষ্য। তার কথা ছিল, চাক্ষুস সাক্ষীদের ভুল করার শঙ্কা যদি অলৌকিক ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনার চেয়ে কম হয়, কেবল তখনই আমরা অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতে পারি।[৩৩০]

মাত্র একজনের চাক্ষুস সাক্ষ্যের ব্যাপারে সন্দেহ আছে বটে। তবে একাধিক সাক্ষ্য থাকলে সেই চাক্ষুস সাক্ষ্যকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়াই যায় (ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে এ ধারণাটি পরিচিত 'তাওয়াতুর' নামে)।

যদি বহু সংখ্যক (বা যথেষ্ট বড় সংখ্যক) এমন স্বতন্ত্র সাক্ষী থাকে, যারা কিনা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধারা-পরম্পরায় সাক্ষ্যটি সঞ্চার করেছেন, এবং তাদের অনেকেরই যদি নিজেদের মধ্যে কখনো দেখাসাক্ষাৎ না হয়, তা হলে সেই সাক্ষ্যকে কেউ যদি বাতিল করে দেন, সেটা তা হলে যুক্তিসিদ্ধ হবে না। হিউম নিজেই এ ধরনের চাক্ষুস বর্ণনার জোরের কথা স্বীকার করেছেন। বলতে চেয়েছেন, সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানের বর্ণনা যদি একাধিক উৎস থেকে আসে, তবে অলৌকিকতা প্রমাণ সম্ভব হতে পারে:

অলৌকিক ঘটনা কখনো প্রমাণ করা যাবে না। কাজেই কোনো ধর্মব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে একে ব্যবহার করা যাবে না—একথার সীমাবদ্ধতার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ, আমি স্বীকার করি, মানুষের সাক্ষ্য থেকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রমাণ হতে পারে—যদিও লিপিবদ্ধ ইতিহাসে এরকম কিছু পাওয়া অসম্ভব। তো ধরুন, সব ভাষার সব লেখক একমত হলেন, ১৬০০ সালের জানুয়ারি মাসের শুরুর থেকে ৮ দিন যাবৎ গোটা পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে ছিল। মনে করুন, এই অসাধারণ ঘটনাটির বর্ণনা আজও মানুষের মনে সজীব। সব সফরকারী, যারা বিদেশ থেকে ফেরেন, সামান্যতম উনিশ-বিশ, কিংবা বৈপরীত্য ছাড়াই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। সেক্ষেত্রে, ঘটনাটিকে সন্দেহ করার বদলে, আমাদের বর্তমান দার্শনিকদের একে প্রমাণ হিসেবে মেনে নিতে হবে...।"[৩৩১]

আমাদের এ অধ্যায়ের মূল আলোচনা সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানসঞ্চার নিয়ে; কোনো ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষ্য নিয়ে নয়। এ দুয়ের মাঝে ধারণাগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট। উভয়

ধরনের সাক্ষ্যের পার্থক্যটি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হলো বিষয়টি।

তো মূল কথা, জ্ঞানের এক অনিবার্য উৎস সাক্ষ্য। এ-ধরনের জ্ঞান ছাড়া বর্তমানে লক্ষণীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্ভব হতো না। জ্ঞানের অনেক প্রতিষ্ঠিত বিষয় পরিণত হতো সংশয়বাদীর খেয়ালি চিন্তায়। পৃথিবীকে যারা সমতল ভূমি বলেছিলেন একসময়, তাদের কথাকে আমাদের উড়িয়ে দেওয়ার ন্যায্যতা প্রমাণ হতো না কখনো।

সাক্ষ্যকে জ্ঞানের স্তরে পৌঁছাতে হতে হলে, অন্যের বিশ্বস্ততা যাচাইয়ে আমাদেরও হতে হবে বিশ্বস্ত। সাক্ষীর দিকে চ্যালেঞ্জ হস্তান্তরের দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের দাবির সঙ্গে কিছু সত্যের সংযোগ আছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের। এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে অন্যান্য সাক্ষ্য বা আবহ তথ্য।

সেরা ব্যাখ্যার অনুমান

ভাবনাচিন্তা করার এক অমূল্য উপায় সেরা ব্যাখ্যার অনুমান। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক উপাত্ত এবং/অথবা আবহ জ্ঞানকে সংগতিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় এখানে। যেমন ধরুন, ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন আপনার কেমন লাগছে। আপনি বললেন, নাক বন্ধ, গলায় ব্যথা বা জ্বলে, হাঁচি, ঘড়ঘড় শব্দ হয়, কফ আসে, চোখ দিয়ে পানি পড়ে, জ্বর, মাথাব্যথা, গায়ে ব্যথা, ক্লান্তি ইত্যাদি। আপনার দেওয়া তথ্য বিচার করে ডাক্তার চেষ্টা করেন আপনার শরীর কেন খারাপ সে-সম্বন্ধে সবচে উপযুক্ত কারণ জানাতে। সেই সাথে চিকিৎসা-বিজ্ঞানসংক্রান্ত তার অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তিনি বুঝলেন, আপনার লক্ষণগুলো সাধারণ ঠান্ডা-কাশির সঙ্গে সবচে ভালো মেলে। তিনি অনুমান করলেন সেরা ব্যাখ্যা।

হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্তে আসার বাস্তবিক ও অপরিহার্য ভূমিকা ব্যাখ্যা করে ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপক পিটার লিপটন বলছেন,

> "ডাক্তার অনুমান করলেন রোগীর হাম হয়েছে। কারণ, সামনে থাকা প্রমাণ-সাপেক্ষে এটাই সবচে উপযুক্ত ব্যাখ্যা। জ্যোতির্বিদ অনুমান করলেন, নেপচুনের গতির অস্তিত্ব। ইউরেনাসের মধ্যে যে-বিচ্যুতে নজরে আসে, ওটাই তার সেরা ব্যাখ্যা... সবচে উপযুক্ত ব্যাখ্যার অনুমান অনুযায়ী, আমাদের সিদ্ধান্তজাত চর্চাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাখ্যামূলক বিবেচনা। আমাদের কাছে থাকা উপাত্ত এবং বিশ্বাসের আলোকে আমরা অনুমান করি, যদি সত্য হয়, এসব উপাত্ত থেকে পাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যাগুলো থেকে কোনটা সবচে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেবে...।"[৩৩২]

আমাদের হাতে থাকা উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়েই আমরা পেতে পারি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাগুলোর মাঝে কোনটা সেরা তা আলাদা করে, তাদের সম্ভাব্যতা; এবং এদের মধ্যে পার্থক্যসূচক অন্যান্য উপাত্ত। লিপটন বলছেন, "প্রথমে আমরা সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলোকে বিবেচনা করি। এরপর ওগুলোর মাঝে পার্থক্য সূচিত করে এমন উপাত্ত খুঁজি... অন্য কেউ যদি অধিকতর ভালো কোনো বিকল্প ব্যাখ্যা দিতে পারেন, তা হলে আগের অনুমান বাতিল হয়ে যেতে পারে, অথচ দেখা যাবে প্রমাণ হয়তো কিছুই বদলায়নি।"[৩৩৩]

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যাগুলোর মাঝে কোনটা সবচে বেশি যুক্তিসিদ্ধ তা যাচাই করতে অতিরিক্ত উপাত্তগুলোই একমাত্র পথ নয়; একে হতে হয় সবচে সরল। তবে সরলতা এবং সর্বব্যাপকতার মাঝে একটা সতর্ক ভারসাম্য থাকতে হয়। সর্বব্যাপকতা মানে ব্যাখ্যাটির থাকতে হবে ব্যাখ্যামূলক জোর এবং ব্যাপ্তি। বিসদৃশ বা স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণসহ সব উপাত্তের বর্ণনা দিতে হবে ব্যাখ্যাটিকে।

কোনো ব্যাখ্যা সর্বব্যাপক কিনা তা যাচাইয়ের আরেকটি মাপকাঠি হচ্ছে, আগে যেসব উপাত্ত বা পর্যবেক্ষণগুলো অজানা ছিল, অপ্রত্যাশিত ছিল, বা ব্যাখ্যা করা অসাধ্য ছিল, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারছে কি না। সেরা ব্যাখ্যা যাচাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে আমাদের শিক্ষাদীক্ষার নিরিখে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যাগুলোর তুলনায় একে হতে হবে সম্ভাব্য সবচে সত্য। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির দার্শনিক গিলবার্ট এইচ. হার্মান জোর দিয়ে বলেন, যখন বিকল্প ব্যাখ্যা থাকবে, কাউকে তখন "অনুমানটিকে ন্যায্য প্রমাণ করার আগে বাকি সব বিকল্প রূপতত্ত্বগুলোকে বাতিল করতে পারতে হবে। প্রাপ্ত হেতুবাক্য থেকে কোনো একটি রূপতত্ত্ব অন্য রূপতত্ত্বগুলো থেকে প্রমাণের পক্ষে 'অধিকতর ভালো' ব্যাখ্যা দেবে। আর এভাবেই কেউ অনুমান করেন যে, প্রদত্ত রূপতত্ত্বটি সত্য।"[৩৩৪]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, যুক্তিবিচারে সেরা ব্যাখ্যার অনুমান অপরিহার্য। যাবতীয় সংশয়ও মুছে ফেলতে পারে এটা। আমাদের হাতে যদি সীমিত কিছু উপাত্ত থাকে, আর নির্দিষ্ট কিছু ব্যাখ্যা থাকে, তা হলে সেরা ব্যাখ্যাটি বেশ কিছু পরিমাণে নিশ্চিত। কারণ, এরচে ভালো কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা নেই। আর বিকল্প ভালো কোনো ব্যাখ্যা পেতে নতুন কোনো উপাত্ত পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। কুরআন যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, সেটা এ ধরনের সংশয়হীনতার ওপর ভিত্তি করে নিশ্চিত করা যায়। কুরআনের অন্য কোনো রচয়িতা থাকার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নেই। আর যেসব উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে সেরা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সেগুলোও সীমিত। যেমন, প্রাচীন আরবি ভাষায় আর নতুন কোনো বর্ণ তৈরি হবে না। বা একেবারে নতুন কোনো অগ্রহণীয় আরব ইতিহাস আর জন্ম নেবে না।

যুক্তিপ্রমাণ গঠন

জ্ঞান আহরণে সাক্ষ্য এবং সেরা ব্যাখ্যার অনুমানের গুরুত্ব নিয়ে আলাপ করেছি এতক্ষণ। তবে কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতা সম্বন্ধে কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজ্ঞ সাক্ষ্য থাকায় শুধু সমর্থনীয় সাক্ষ্য উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হচ্ছে না। আমি সেজন্য সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য উপস্থাপন করব। দেখাব, কেন কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতার সমর্থনমূলক সাক্ষ্যগুলো অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত।

কুরআনে ভাষিক ও সাহিত্যিক চ্যালেঞ্জ ছোড়া হয়েছে। ৭ম শতকের আরবেরা আরবি ভাষায় সাহিত্যের মানদণ্ডে শিখরে অবস্থান করছিল। অথচ তারপরও তারা ব্যর্থ হয়েছে কুরআনের অনুকরণে কিছু রচনা করতে। এ বিষয়গুলো যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে কুরআন অনুকরণ-অসাধ্য হওয়ার পক্ষে যেসব সাক্ষ্য আছে, সেগুলো মেনে নেওয়াটা হবে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। কুরআনের অনন্যতার সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোর সাথে বিরোধী সাক্ষ্যগুলো অযৌক্তিকতার পর্যায়ে পড়ে (কিছুক্ষণ পরেই ব্যাখ্যা করা হবে এটা)। সাক্ষ্যভিত্তিক তথ্য গ্রহণ করা হচ্ছে যেহেতু, কুরআন অনুকরণ-অসাধ্য হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যাগুলো তাই যাচাই করতে হবে সেরা ব্যাখ্যার অনুমান করার জন্য। কুরআন হয় কোনো আরবের রচনা, নয় কোনো অনারবের, নয়তো মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রণেতা, আর নয়তো সুমহান আল্লাহ। যুক্তিপ্রমাণটির সার বিষয়গুলো হচ্ছে:

- মানবজাতির সামনে কুরআন ভাষিক ও সাহিত্যিক চ্যালেঞ্জ দেয়।
- কুরআনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সবচে ভালো অবস্থানে ছিল ৭ম শতকের আরবেরা।
- ৭ম শতকেরা আরবেরা চ্যালেঞ্জে হেরে গেছে।
- কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্য হওয়া নিয়ে বিশেষজ্ঞরা সাক্ষ্য দিয়েছেন।
- পাণ্ডিত্য-বিরোধী সাক্ষ্যগুলো সত্য হওয়া সম্ভব না। কারণ, তা হলে প্রতিষ্ঠিত তথ্যকে বাতিল করতে হবে।
- সুতরাং (১-৫ থেকে), কুরআন অনুকরণ অসাধ্য।
- কুরআন অনুকরণ অসাধ্য হওয়ার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এর রচয়িতা, কোনো আরব, অনারব, মুহাম্মাদ ﷺ বা আল্লাহ।
- এটা কোনো আরব, অনারব বা মুহাম্মাদের পক্ষে রচনা করা সম্ভব ছিল না।
- কাজেই, আল্লাহই যে এর রচয়িতা, এটাই সেরা ব্যাখ্যা।

এ অধ্যায়ের বাকি অংশে উপরোক্ত হেতুবাক্যগুলো সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

মানবজাতির সামনে কুরআনের ভাষিক ও সাহিত্যিক চ্যালেঞ্জ

"পাঠ করো তোমার প্রভুর নামে।"—[৩৩৫] ১৪ শ বছর আগে নবি মুহাম্মাদের কাছে অবতীর্ণ প্রথম কথা ছিল এগুলো। মাক্কা থেকে কিছু দূরে এক পর্বতগুহায় তখন নিবিড় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন নবিজি ﷺ। সেদিন তাঁর কাছে এমন এক গ্রন্থ প্রকাশ পেল, গোটা দুনিয়াজুড়ে যার প্রভাব ছড়িয়ে আছে আজও।

কবিতা বা পঙ্‌ক্তি রচনায় একেবারেই কোনো পরিচিতি ছিল না নবিজির। ভাষার বাঙ্‌ময় ব্যবহারেও বিশেষ কোনো প্রতিভা তাঁর মাঝে দেখেনি কেউ। মাত্রই তাঁর কাছে যে-গ্রন্থের প্রথম কিছু কথা অবতীর্ণ হলো, ধীরে ধীরে সেখানে আসবে বিশ্বাসের কথা, বিধি-প্রথা, আধ্যাত্মিকতা, অর্থনীতিসহ যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গের কথা। আর পুরোটাই হবে সম্পূর্ণ অভিনব এক ধরনে, অনুপম সাহিত্য রীতিতে।[৩৩৬]

কুরআন যে-ঐশী গ্রন্থ, মুসলিমরা তাদের এই বিশ্বাসকে প্রমাণ করতে কুরআনের অনন্য সাহিত্যিক ও ভাষিক উপাদান ব্যবহার করে বেশ কিছু যুক্তিপ্রমাণ দাঁড় করিয়েছিলেন। এ নিয়ে ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতা বা 'আল-ই'জাযুল-কুরআন' নামে জ্ঞানের এক স্বতন্ত্র শাখার বিকাশ ঘটে। ক্রিয়াবিশেষ্য 'ই'জায' শব্দটির মানে 'অলৌকিকতা'। 'আ'জাযা' শব্দটি থেকে এসেছে এই শব্দটি। এর মানে 'কোনো কিছু করা অসম্ভব করা' বা 'অসহায় করা'। পরিভাষাটির শাব্দিক অর্থ থেকে বোঝা যায়, কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করাকে আরব ভাষাবিদেরা অসম্ভব মনে করতেন। ১৫ শতকের খ্যাতনামা লেখক ও জ্ঞানশাস্ত্রবিদ জালালুদ্দীন সুয়ুতি লিখেছেন:

> "...নবি তাদের কাছে [চ্যালেঞ্জ] ছুড়ে দিলেন। ওরা ছিল তখন সবচে দক্ষ অলংকারপূর্ণ ভাষা ব্যবহারকারী। তো তিনি ওদের চ্যালেঞ্জ জানালেন [গোটা কুরআনের] অনুরূপ রচনা করতে। আল্লাহ তখন বললেন, 'ওরা যদি সত্যবাদী হয় তবে বলো অনুরূপ কিছু রচনা করতে।' বেশ কিছু বছর পেরিয়ে গেল। কিন্তু ওরা পারল না। এরপর [নবি] চ্যালেঞ্জ জানালেন এর মতো ১০টা সূরা রচনা করতে। আল্লাহ বললেন, 'ওদের বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়, তবে এর মতো ১০টা সূরা রচনা করো। আল্লাহ বাদে তোমাদের আর যত কাউকে পারো ডাকো।' এরপর তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন, কেবল একটা অনুরূপ সূরা রচনা করতে। আল্লাহ বলেছিলেন, 'তারা কি বলতে চায় তিনি [নবি] বানিয়েছে এটা? ওদের বলো, যদি সত্যবাদী হও তো অনুরূপ একটা সূরা রচনা করে দেখাও। আল্লাহ বাদে তোমাদের আর যত কাউকে পারো ডাকো...' ওদের মাঝে ছিল সবচে দক্ষ অলংকারপূর্ণ ভাষা ব্যবহারকারীরা। অথচ তারপরও [কুরআনের] অনুরূপ একটি সূরাও রচনা করতে পারল না [আরবেরা]। [নবি] সবার সামনে ওদের [চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার] ব্যর্থতা

ও অক্ষমতা জানিয়ে দিলেন। ঘোষণা করলেন কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতা। আল্লাহ বলে দিলেন, ওদের বলো, সব মানুষ আর জিন মিলে একে অন্যকে সাহায্য করেও যদি কুরআনের অনুরূপ কিছু তৈরি করতে চায়, তবু পারবে না...।"[৩৩৭]

কুরআনের কালজয়ী ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো অনুসারে, কুরআনের যেসব আয়াতে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ জানানো আছে, পরোক্ষভাবে সেগুলো পরবর্তী যুগের সব ভাষাবিদদেরও আহ্বান করেছে।[৩৩৮] এই চ্যালেঞ্জ পূরণের হাতিয়ার কেবল নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকরণগত বিধি, ভাষিক ও সাহিত্যিক কলা এবং আরবি ভাষার মাত্র ২৮টি বর্ণমালা। স্বাধীন ও বাস্তব এসব তুণগুলো সবার জন্যই লভ্য। অথচ তারপরও যে আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জ পুরো করতে পারেনি তা কিন্তু আরবি ভাষা ও কুরআনের বিশেষজ্ঞদের মোটেই অবাক করে না।

কুরআনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সবচে ভালো অবস্থানে ছিল সপ্তম শতকের আরবেরা

সেই সময়ের আরবেরা যে ভাষিক দক্ষতায় শিখরে অবস্থান করছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুব-পশ্চিমের বিভিন্ন বইপত্র থেকে। জ্ঞানশাস্ত্রবিদ তাকি উসমানির মতে, সপ্তম শতকের আরবদের কাছে "বাকপটুতা এবং ভাষা অলংকার ছিল অক্সিজেনের মতো।"[৩৩৯] নবম শতকের কবিদের জীবনীকার জুমাহির মতে, "আরবেরা যা কিছু জানত পঙ্ক্তির ছন্দে তা লিপিবদ্ধ করে রাখত। এটা ছিল তাদের জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমার পরিচায়ক। তারা যেন পঙ্ক্তি বলতে বলতে ঘুম থেকে উঠত, আবার বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়ত।"[৩৪০] আরবদের জীবনে কবিতার গুরুত্ব তুলে ধরে ১৪ শতকের ইতিহাসবিদ ইবনু খালদুন লিখেছেন, "কথা বলার মাধ্যম হিসেবে কবিতাকে খুব উঁচু নজরে দেখত আরবেরা। তারা একে করে নিয়েছিল তাদের ইতিহাসের নথি, ভালো-খারাপের প্রামাণ্যগ্রন্থ, তাদের বেশির ভাগ পর্যবেক্ষণ আর জ্ঞানের উৎসের মূল আকরগ্রন্থ।"[৩৪১]

সপ্তম শতকের আরব সমাজে ভাষিক দক্ষতা ও সামর্থ্যের প্রভাব ছিল প্রচুর। সাহিত্য-সমালোচক ও ইতিহাসবিদ ইবনু রাশীক উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "আরব গোত্রে যখনই কোনো কবির আবির্ভাব হতো, অন্যান্য গোত্র আসত অভিনন্দন জানাতে। খাবারদাবারের আয়োজন করা হতো। বিয়েতে যেভাবে নারীরা বীণাজাতীয় এক বাদ্য বাজাত, তখনও বাজাত। এই সুখবরে বয়স্ক-যুবা—সব ধরনের মানুষ আনন্দ করতেন। কোনো কবির আবির্ভাব হলে, বা সন্তান জন্ম নিলেই আরবেরা শুধু তখনই একে অন্যকে অভিনন্দন জানাত।"[৩৪২] ৯ম শতকের জ্ঞানশাস্ত্রবিদ ইবনু কুতাইবা আরবদের

চোখে তুলে ধরেছেন কবিতার সংজ্ঞা: "আরবদের জ্ঞানের খনি, তাদের জ্ঞানগ্রন্থ... বিতর্কের দিনে প্রকৃত সাক্ষী, তর্কের সময় চূড়ান্ত প্রমাণ।"[৩৪৩]

আরবি ভাষা পুরোপুরি করায়ত্ত করতে আরবদের কী পরিমাণ পড়াশোনা করতে হতো তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ লেখক নাভিদ কারমানি। তার কথা থেকে বোঝা যায় ৭ম শতকে আরবেরা বলতে গেলে কবিতা-পুজো করত: "প্রাচীন আরবি কবিতা খুবই জটিল বিষয়। আরবি ভাষার শব্দভান্ডার, ব্যাকরণগত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর কঠিন নিয়মগুলো সঞ্চারিত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। কেবল সবচে সহজাত প্রতিভাধর ছাত্ররাই করায়ত্ত করতে পেরেছে এ-ভাষা। কোনো ছাত্রকে হয়তো কখনো কখনো নিবিড়ভাবে চর্চা করতে হয়েছে কোনো কবিগুরুর অধীনে দশকের পর দশক। কেবল তখনই সে নিজেকে পরিচয় দিতে পারত কবি বলে। যে-সমাজে বড় হয়েছেন মুহাম্মাদ ﷺ, কাব্যিক ভাষাভঙ্গিকে তারা যেন প্রায় পূজনীয় করে তুলেছিল।[৩৪৪]

মোট কথা, আরবি ভাষার অতুলনীয় ব্যবহারকে সহজসাধ্য করতে ঠিক যেরকম সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের দরকার ছিল, সপ্তম শতকে ওখানকার পরিবেশ ছিল তেমনই।

ব্যর্থ হলো সপ্তম শতকের আরবেরা

এমন অতুলনীয় ভাষাদক্ষতা থাকার পরও সামষ্টিকভাবে তারা ব্যর্থ হয়েছে কুরআনের ভাষিক ও সাহিত্যিক মানের ধারেকাছে কিছু রচনা করতে। ভাষাবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হুসেইন আবদুর-রাউফ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, "ভাষিক যোগ্যতা ও জ্ঞানে, অলংকারপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে এবং কবিতায় সে সময়ে আরবেরা ছিল চূড়োয়। অথচ তারপরও কুরআনের অনুরূপ একটি সূরাও রচনা করতে পারেনি তারা।"[৩৪৫]

কুরআন-শাস্ত্রের অধ্যাপক অ্যাঞ্জেলিকা নিয়োরিথ যুক্তি দেখিয়েছেন, অতীতে বা বর্তমানে কেউ কখনো সফলতার সঙ্গে কুরআনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি: "... কেউ সফল হয়নি। এটা সঠিক... আমার সত্যিই মনে হয়, কুরআন এমনকি পশ্চিমা গবেষকদেরও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। যে-সময়ে সমাদৃত কোনো লিখিত পুস্তক ছিল না, সেখানে কীভাবে হঠাৎ করে এত সমৃদ্ধ সব বিষয় আর চমৎকার কথামালায় সাজানো কুরআনের আবির্ভাব ঘটল, তা স্পষ্ট করতে পারেন না তারা।"[৩৪৬]

সাব'উ মু'আল্লাকাত বা সপ্তগাথা কবিতার বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন রাবী'আ কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতার কারণেই বরণ করেছিলেন ইসলাম। কুরআনের বাক্‌বৈদগ্ধে এতটাই আচ্ছন্ন ছিলেন, এরপর আর কোনো কবিতা রচনা করেননি। লোকেরা বেশ অবাক হয়েছিল তার এমন পরিবর্তনে। "তিনি ছিলেন তাদের সবচে কৃতী কবি।"[৩৪৭] তারা জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি কবিতা রচনা বন্ধ করে দিয়েছেন।

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "কী বলো তোমরা! কুরআন অবতীর্ণের পর কীভাবে [তা করতে বলো]?"[৩৪৮]

আরবি ভাষা ও কুরআন-বিষয়ক অধ্যাপক ই.এইচ. পালমার যুক্তি দেখিয়েছেন, বিশেষজ্ঞদের এমন কথায় আসলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তিনি লিখেছেন, "আরবের সেরা সেরা লেখকেরা যে কুরআনের সমমানের কিছু রচনা করতে পারেনি তাতে একেবারেই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।"[৩৪৯]

৭ম শতকেরা আরবের কীভাবে এই চ্যালেঞ্জে মোহাবিষ্ট হয়ে নিজেদের অক্ষমতার পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছে, তার উল্লেখ করে অধ্যাপক এম. এ. দ্রাজের বক্তব্য: "আরবি ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায় যখন সোনালি সময়, ভাষা যখন আরোহণ করেছিল পবিত্রতা আর শক্তির চূড়োয়, যখন কিনা আনুষ্ঠানিকভাবে বার্ষিক উৎসবে কবি-কথকদের সম্মাননা দেওয়া হতো, কুরআন এক ঝাটকায় মুছে দিয়েছিল কবিতা বা অলংকারপূর্ণ কথাবার্তার প্রতি তাবত উদ্দীপনা। কা'বার দরজায় ঝুলে থাকা সপ্ত সোনালি কবিতাকে পর্যন্ত বাধ্য করেছিল নামিয়ে ফেলতে। সবার কান যেন চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়েছিল কুরআনি আরবির বিস্ময়কর শক্তিতে।[৩৫০]

সপ্তম শতকের আরবেরা যে কুরআনের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করতে পারেনি, সে সম্বন্ধে এতবেশি সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এ নিয়ে তাই আর কোনো সংশয়ের জায়গা থাকে না। আরবদের অক্ষমতার বিষয়টিকে বাতিল করে দেওয়াটা কোনো ধরনের যুক্তির বিচারে টিকবে না। এছাড়া এ বিষয়ে চাক্ষুস সাক্ষীও পৌঁছেছে 'তাওয়াতুর' পর্যায়ে। বিভিন্ন পরম্পরায় বেশুমার অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা একথা জানিয়েছেন। এবং এদের অনেকেরই কখনো দেখা হয়নি একে অপরের সঙ্গে।

সেসময়ের আরবদের ব্যর্থতার খতিয়ানে সবচে জোরালো যুক্তি তৎকালের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি। কুরআনের মূল আলোচনার অন্যতম অংশ জুড়ে আছে ৭ম শতকীয় মাক্কি গোত্রগুলোর অনৈতিকতা, অন্যায় ও অসদাচরণের নিন্দা। নারীদের পণ্য মনে করা, ব্যবসায় প্রতারণা, মূর্তিপূজা, দুর্বলদের অন্যায্যভাবে দাস বানিয়ে রাখা, সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা, কন্যা সন্তানদের হত্যা, এতিমদের সাথে অসদাচরণ—ইত্যাদি নানাবিধ অপকর্মে জর্জরিত ছিল তারা। কুরআনের নীতিনৈতিকতার বার্তা তাই ওইসময়ের নেতৃস্থানীয় লোকদের আসন টলিয়ে দিয়েছিল। তাদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও নেতৃত্ববাজির জন্য রীতিমতো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুরআন। ক্রমেই কাল হয়ে দাঁড়ানো ইসলামের এই অগ্রগতি থামাতে কুরআনের ভাষিক ও সাহিত্যিক চ্যালেঞ্জটা পূরণ করলেই কিস্তু হয়ে যেত। কিন্তু মাক্কার সেই অবক্ষয়-জর্জরিত সময়টাতে যে ইসলাম সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, তাতেই প্রমাণ হয় সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ব্যর্থতা। কোনো আন্দোলনের মৌলিক দাবিকে যদি স্পষ্টভাবে মিথ্যে

প্রমাণ করা যায়, তবে সেই আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মাক্কার নেতাগোছের লোকেরা কুরআনের চ্যালেঞ্জ পূরণ করতে পারেননি। আর তাই তারা নির্যাতন-নিপীড়নের আশ্রয় নিয়ে দমাতে চেয়েছিলেন ইসলামের অগ্রযাত্রা।

কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য

পুব-পশ্চিমের ধর্মী-নিধর্মী বেশুমার বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য দিয়েছেন কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতা সম্বন্ধে। সেগুলো থেকে অল্প কিছু নমুনা তুলে দিচ্ছি:

প্রাচ্যবিশারদ অধ্যাপক মার্টিন জ্যামিট:

> "ইসলাম-পূর্ব সময়ে অসাধারণ সাহিত্যমান-সম্পন্ন বেশ কিছু দীর্ঘ কবিতা আছে যদিও... আরবি ভাষায় সর্বোচ্চ মানের লিখিত রূপের মাঝে কুরআনের তুলনা কুরআনই।"[৩৫১]

মনীষী শাহ ওয়ালিউল্লাহ:

> "ভাষা অলংকারের সর্বোচ্চ নমুনা এটা। কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না এমন কিছু রচনা। তবে আমরা যেহেতু [কুরআন অবতরণকালীন] প্রাথমিক আরবদের পরে এসেছি, আমরা তাই এর রস পুরোপুরি আস্বাদন করতে অক্ষম। কিন্তু কোনো ধরনের কৃত্রিমতা ছাড়া যে-সহজবোধ্য শব্দ আর শ্রুতিমধুর গঠন আমরা পাই এখানে, তা আগে-পরের কোনো কবিতার মাঝে পাওয়া যায় না।"[৩৫২]

প্রাচ্যবিদ ও সাহিত্যিক এ.জে. অ্যারবেরি:

> "প্রথমত চেয়েছি আমার আগে যারা অনুবাদ করেছেন, তাদের থেকে উন্নত করতে। দ্বিতীয়ত চেয়েছি আরবি কুরআনের অতি উচ্চমানের সাহিত্য-শৈলীকে—সামান্যতম পরিমাণে হলেওউপস্থাপন করতে। তা করতে গিয়ে আমাকে ঘাম ঝরাতে হয়েছে কুরআনের ভাষাশৈলীর খুবই জটিল ও বৈচিত্র্যময় নানা ছন্দ ও মাত্রা বুঝতে। কুরআনের অনুপম বার্তা তো আছেই, এই জটিল-বিচিত্র সাহিত্যশৈলী গুণেই কুরআন নিজেকে দাবি করে সেরা সাহিত্যকর্ম হিসেবে।"[৩৫৩]

প্রখ্যাত ইসলাম বিশারদ তাকি উসমানি:

> "তাদের কেউ কুরআনের আয়াতের অনুরূপ সামান্য একটা পঙ্‌ক্তিও রচনা করতে পারেননি। ভাষাসাহিত্যে তারা কেমন নৈপুণ্য গুণসম্পন্ন লোক ছিলেন তা শুধু ভেবে দেখুন একবার। 'আল্লামা জুরজানি বলেছেন, পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তের কেউ যদি তার ভাষাবৈভব আর অলংকারপূর্ণ কথা নিয়ে গর্ব করত, আর এরা যদি কোনোভাবে জানতে পারত সেটা, কবিতার চরণে তাদের

নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে কসুর করত না তারা। সেখানে কুরআনে এমন বারবার তাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে আর তারা চেষ্টা করেননি, তা অসম্ভব... নবিজির ওপর নিপীড়ন চালাতে কোনো কিছু বাদ দেননি তারা। তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়েছেন, তাঁকে পাগল, জাদুকর, কবি, গণক বলেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও কিন্তু তারা পারেননি কুরআনের আয়াতের অনুরূপ দু-একটা পঙ্‌ক্তি রচনা করতে।"[৩৫৪]

মনীষী ফখরুদ্দীন রাজি:

> "কুরআনের ভাষা-অলংকারের শক্তি এবং এর অনন্য শৈলীর কারণে এর নকল করা অসম্ভব। সামান্যতমও ত্রুটি নেই এতে।"[৩৫৫]

মনীষী যামলাকানি:

> "এর শব্দগুলো তাদের মাত্রার সঙ্গে নিপুণ স্বরসংগতি বজায় রাখে। এর বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দগুচ্ছের অর্থগুলো শ্রেষ্ঠ মানের। প্রতিটি শব্দ আর পদগুচ্ছের সাহিত্য-ধরন অনুপম।[৩৫৬]

অধ্যাপক ব্রুস লরেন্স:

> "বাস্তব নিদর্শন হিসেবে, কুরআনের আয়াতগুলো এক অফুরান সত্যের ভাব প্রকাশ করে। অর্থের বাতাবরণে অর্থ, আলোর ওপরে আলো, বিস্ময়ের পরে বিস্ময় ফুটিয়ে তোলে এগুলো।"[৩৫৭]

অধ্যাপক এবং আরবি বিশারদ হ্যামিলটন গিব:

> "অন্যসব আরবদের মতো তারাও ছিলেন ভাষা ও অলংকার বিশেষজ্ঞ। কুরআন যদি তাঁর নিজের রচনা হতো, তা হলে অন্য কেউ ঠিকই টক্কর দিতে পারত। [আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছেন,] কুরআনের অনুরূপ দশটি আয়াত রচনা করুক তারা। যদি না পারে (তারা যে পারেনি তা তো দেখাই গেছে), তা হলে কুরআনকে তারা অসামান্য প্রামাণিক অলৌকিকতা হিসেবে মেনে নিক।"[৩৫৮]

কুরআনের অনুকরণ অসাধ্যতা সম্বন্ধে যে-বেশুমার সাক্ষ্য আছে, তার থেকে সামান্য কিছু নমুনা ওপরে উল্লেখ করলাম।

'অনুকরণ-অসাধ্যতা'র আরও কিছু নজির: মুতানাব্বি ও শেক্সপিয়র

আবু তায়্যিব আহমাদ বিন হুসাইন মুতানাব্বি কিন্দিকে অননুকরণীয় এক কবি প্রতিভা বিবেচনা করেন অনেক আরব। কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন, অন্যান্য কবিরা তার মতো স্তুতিকাব্য এবং কাব্যিক মাত্রা ব্যবহার করেছেন বটে; কিন্তু তারা বাক্যালংকার এবং শৈলীগত ভিন্নতা ছুঁতে পারেননি। এ থেকে তারা সিদ্ধান্ত টানেন, মুতানাব্বির কবি-প্রতিভা অননুকরণীয়। কারণ, তার কাজের খুঁটিনাটি, ভাষিক কলকব্জা আমাদের

নাগালে আছে। কিন্তু তার কবিতায় কাব্যময় যে-প্রকাশ তা কেউ নকল করতে পারছেন না। একথা সত্য হলে কুরআনের অননুকরণীয় যুক্তি মাটি হয়ে যায়। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে মুতানাব্বির প্রতি কারও কারও এমন উচ্চ ধারণা ভিত্তিহীন। ইহুদি কবি মূসা বিন আযরা এবং সুলাইমান বিন জিব্রীল মুতানাব্বির অনুকরণে কবিতা রচনা করেছেন। আরও মজার ব্যাপার হলো, আন্দালুসীয় কবি বিন হানি আন্দালুসি পশ্চিমের মুতানাব্বি নামে পরিচিত।[৩৫৯]

মধ্যযুগের আরবি কবিতা কিন্তু নতুন কোনো সাহিত্যের ধরন সৃষ্টি করেনি। কারণ, আগের কাব্যধারার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল এগুলো। সরাসরি অভিজ্ঞতার চেয়ে অতীতের সাহিত্যের ওপরই মধ্যযুগীয় কবিতাগুলো বেশি নির্ভর করত বলে মন্তব্য করেছেন পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তি ডেনিস ই. ম্যাক-অলি।[৩৬০]

প্রাচীন আরবি কবিতায় একজন কবি তার পূর্বসূরি কবির অনুরূপ ছন্দ, মাত্রা ও বিষয়বস্তুতে নতুন কবিতা রচনা করতেন। এটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না তখন।[৩৬১] ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক এমিল হোমেরিন ইবনুল-ফারিদের সাহিত্যশৈলী বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "মুতানাব্বির কাব্যশৈলীর সৃজনশীল উপস্থাপন"।[৩৬২] আবু নুওয়াসের কাব্যশৈলী থেকে ধার করেছেন বলে মুতানাব্বি নিজেই স্বীকার করেছেন।[৩৬৩]

সাহিব বিন 'আব্বাদ এবং আবু আলি মুহাম্মাদ বিন হাসান হাতিমির মতো মধ্যযুগের আরব সমালোচকেরা মুতানাব্বির কাজ পর্যালোচনা করেছেন। বিন 'আব্বাদ লিখেছেন আল-কাশ্‌ফ 'আন মাসাউই' শি'রুল-মুতানাব্বি। মুতানাব্বির সাথে সাক্ষাৎ থেকে জীবনীমূলক বর্ণনা দিয়ে হাতিমি লিখেছেন আর-রিসালাতুল-মুদিহা ফি যিকরি সারিকাতি আবিত-তায়্যিব আল-মুতানাব্বি।[৩৬৪] এসব সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থে পাওয়া যায়, মুতানাব্বির কবিতাগুলো অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মেলে ধরলেও, এগুলো অনুকরণ করা সম্ভব। হাতিমি বেশ শক্ত বিতর্ক উপস্থাপন করেছেন মুতানাব্বির কাজের সমালোচনায়। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, তার কবিতার অনন্য কোনো শৈলী নেই। অনেক ভুলও আছে। মুতানাব্বির ওপর করা হাতিমির সমালোচনাটি নিবিড় পাঠের পর অধ্যাপক সিগার এ. বোনব্যাকার বলেছেন, হাতিমের "বিচার-বিশ্লেষণ বেশির ভাগ সময়ই সুযুক্তিপূর্ণ। তার সমালোচনা পড়ে মনে হয় যেন মুতানাব্বি ছিলেন গড়পরতা কবি। তার মাঝে মৌলিকতার অভাব তো ছিলই, ব্যাকরণ, শব্দভান্ডার, অলংকারেরও যথেষ্ট দখল ছিল না। কখনো কখনো খুবই নিচু রসের প্রমাণও পাওয়া যায়।"[৩৬৫]

ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে শেক্সপিয়রের অতুলনীয়তার ব্যাপারে সাধারণ একটা ঐকমত্য আছে। তবে তার কাজগুলোকে কিন্তু অনুকরণ-অসাধ্য ভাবা হয় না। তার সনেটগুলো রচিত হয়েছে মূলত আয়াম্বিক পঞ্চস্বরাঘাতযুক্ত ছন্দ ব্যবহার করে। এই

ছন্দে সনেটের প্রতিটি লাইনে দশটি করে সিলেবল থাকে। সিলেবলগুলো ৫ জোড়ায় বিভক্ত। এগুলো একেকটা আয়াম্ব বা আয়াম্বিক পর্ব নামে পরিচিত।[৩৬৬] তার কাজের মূল ছক যেহেতু জানা, ব্রিটিশ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মারলোর কাজের মাঝেও অনুরূপ শৈলী খুঁজে পাওয়া তাই আশ্চর্য ঠেকে না। অন্যদিকে শেক্সপিয়রের সমকালীন ফ্র্যান্সিস বমঁ, জন ফ্লেচারসহ আরও অনেকের সঙ্গেই তুলনা করা হয় তাকে।[৩৬৭]

কুরআন অনুকরণ অসাধ্য হওয়া মানেই এটা ঐশী নয়

কোনো কোনো পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তি কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতা মেনে নিয়েছেন বটে; তবে একে ঐশীগ্রন্থ মানতে রাজি হননি। তো, এদের উদ্ধৃতি দিয়ে কুরআনকে ঐশীগ্রন্থের কাতার থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। যাহোক, আমি কিন্তু এখনো কুরআনের ঐশী হওয়া সম্বন্ধে কোনো যুক্তিপ্রমাণ দিইনি; দিয়েছি এর অনুকরণ অসাধ্যতা নিয়ে। ওপরের যুক্তি ব্যবহার করে যারা একে মানব-রচিত প্রমাণ করতে চান, তারা আসলে অনুকরণ-অসাধ্যতার যুক্তিকে গুলিয়ে ফেলেন সেরা ব্যাখ্যার অনুমানের সঙ্গে।

আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি এখানে। এসব পণ্ডিতদের কাছে হয়তো সেরা ব্যাখ্যার অনুমান যুক্তিকে তুলে ধরা হয়নি। কিংবা কুরআনের অননুকরণীয়তার দার্শনিক প্রভাব সম্বন্ধে গভীরভাবে ভেবেচিন্তে দেখেননি তারা। হতে পারে তারা হয়তো দার্শনিক প্রকৃতিবাদের সমর্থক। যেকারণে কুরআনের পেছনে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা আছে বলে মানতে নারাজ তারা। প্রকৃতিবাদের প্রতি তাদের বিশ্বাস অতিপ্রাকৃত যেকোনো কিছুর অনুমান করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

আর তা ছাড়া আজকের এই আধুনিকতা-পরবর্তী সংস্কৃতিতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক পণ্ডিতের পদচারণা সীমিত। যেকারণে তাদের অনেকেই কুরআনের ঐশীত্ব মেনে নিতে কিংবা ইসলাম বরণ করতে আগ্রহী নন। নিছক এক সাহিত্যকর্ম হিসেবেই কুরআন নিয়ে গবেষণা করেছেন তারা। আধুনিক জ্ঞানচর্চার জগতে এমনটা হরদম ঘটে। কাজেই, এধরনের পণ্ডিতেরা যখন কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতা নিয়ে ঘাটেন, তখন কেবল কুরআনের সাহিত্যমান নিয়েই তাদের মাথা ঘামানোর সম্ভাবনা বেশি; এর ঐশী দাবি নিয়ে নয়। তারা জানতে চান কুরআন কি অননুকরণীয় নাকি কৃত্রিম; হলে কতটা। কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্য হওয়ার বিষয়টি এর ঐশী উৎসের ব্যাপারে কী ইঙ্গিত দেয় সে-সম্বন্ধে পুরোপুরি অনাগ্রহী তারা।

বিরোধী সাক্ষ্যগুলো সম্ভব নয়; কারণ সেগুলো প্রতিষ্ঠিত আবহ তথ্যকে বাতিল করে

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে কুরআন অনুকরণ-অসাধ্যতার পক্ষে দেওয়া সাক্ষ্যগুলো গ্রহণ করাই সবচে যৌক্তিক—অল্প কয়েকজন বিদ্বানদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে যদিও।

কুরআন অননুকরণীয়তার সমর্থনমূলক সাক্ষ্যগুলো অনেক বেশি যৌক্তিক। কারণ, মজবুত আবহ জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এটা। হেতুবাক্য ১, ২ ও ৩-এ এসব জ্ঞানের কথা বলেছি: মানবজাতির কাছে কুরআন এক ভাষিক ও সাহিত্যিক চ্যালেঞ্জ ছোড়ে। সপ্তম শতকের সবচে সিদ্ধহস্ত আরবেরাই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে।

বিরোধী সাক্ষ্যগুলো আমাদের অযৌক্তিক চিন্তাভাবনার দিকে নিয়ে যায়। কুরআনের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে যারা কিনা সবচে সিদ্ধহস্ত ছিল, তারা কেন ব্যর্থ হলো, তার একটা উচিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে: প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে নাকচ করা। কিংবা সপ্তম শতকের ভাষা মুনশিদের চেয়ে প্রাচীন আরবি সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের অনেক বেশি জ্ঞানবুঝ ও সমঝদারি আছে বলে দাবি করা। এ ধরনের ব্যাখ্যাগুলো বিরোধী সাক্ষ্যগুলোকে কোনো যৌক্তিক ভিত ছাড়া স্রেফ হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে বাতিল করে দিলে আরবি সাহিত্যের ইতিহাসকে নতুন করে রচনার প্রয়োজন পড়বে। আর সপ্তম শতকের ভাষা পণ্ডিতদের চেয়ে বর্তমান সময়ের কেউ প্রাচীন আরবি সাহিত্যের বেশি সমঝদার—সেটাও অমূলক। ওই সময়ের মানুষ এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সমজাতীয় ভাষা পরিবেশে থেকেছেন। এরকম পরিবেশে নিজের ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা হতো বেশি। অন্য ভাষা থেকে ধার করা কিংবা ভাষার অবক্ষয়ের আশঙ্কা থাকত কম। বর্তমান সময়ের আরবি সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ এবং অবক্ষয়ের শিকার। কাজেই ভাষিক বিশুদ্ধতা অর্জনের উর্বর সময় থেকে উঠে আসা মানুষদের চেয়ে নিজেকে উৎকৃষ্ট দাবি করা অযৌক্তিক।

এ ধরনের আপত্তিগুলোর দুর্বলতা তো আছেই। কুরআন অনুকরণ-অসাধ্যতা-বিরোধী মতগুলো বিশ্লেষণ করলেও বিষয়বস্তুর জোলোভাব প্রকট হয়। এরকম একটা ঘাটতির উদাহরণ পাওয়া যায় নন্দিত জার্মান প্রাচ্যবিদ থিয়োডো নলডেকার কাজে। কুরআনের ভাষিক ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা করে এর অনুকরণ-অসাধ্যতাকে অস্বীকার করেছেন তিনি। তবে তার এমন সমালোচনা আসলে এ ধরনের দাবির ভিত্তিহীনতাই নতুন করে চোখে দেখিয়ে দয়ে। যেমন, নলডেকা মন্তব্য করেছেন, "থেকে থেকেই কুরআনে অস্বাভাবিক এবং বিকৃতভাবে ব্যাকরণগত পক্ষের বদল হয়।"[৩৬৮]

তিনি আসলে কুরআনের যে-ভাষিক বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা করছেন এর পারিভাষিক নাম ইলতিফাত বা ব্যাকরণিক বদল। খুবই কার্যকরী এক ভাষা-অলংকার এটা। যেকোনো আরবি-পাঠের সাহিত্য-ভাবকে সমৃদ্ধ করে ইলতিফাত। এটা প্রাচীন আরবি ভাষা-অলংকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৩৬৯] ভাষা-অলংকার নিয়ে আসির, সুয়ুতি ও যারকাশির বইতে এসব বিষয় খুঁজে পাবেন আগ্রহীরা।[৩৭০]

তো, ব্যাকরণিক এই পরিবর্তনের মাঝে থাকে: পক্ষ (শ্রোতা-পক্ষ, বক্তা-পক্ষ, অন্য-পক্ষ), বচনের পরিবর্তন, যাকে উদ্দেশ্য করে বলা তার পরিবর্তন, কালের পরিবর্তন, বিভক্তি চিহ্নের পরিবর্তন, সর্বনামের জায়গায় বিশেষ্যের ব্যবহারসহ আরও অন্যান্য।[৩৭১] এসব পরিবর্তনের মূল কাজ কথার কোথায় জোর দেওয়া হবে সেটার পরিবর্তন, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠককে সচেতন করা, পাঠের শৈলী সমৃদ্ধ করা।[৩৭২] 'ইলতিফাত' ছন্দ ও গতির মাঝে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা আনে। নাটকীয়ভাবে ধরে রাখে শ্রোতার মনোযোগ।[৩৭৩]

ব্যাকরণিক পরিবর্তনের এক চমৎকার উদাহরণ কুরআনের ১০৮তম সূরাটি:

> "তোমাকে তো অবশ্যই আমরা কাওসার দিয়েছি। কাজেই তোমার প্রভুর প্রতি সালাত আদায় করো, কুরবানি করো। যে তোমায় ঘৃণা করবে, সে-ই তো নির্বংশ।"[৩৭৪]

এই সূরার শুরুতে ছিল বক্তা-পক্ষ বহুবচন "আমরা"। সেটা বদলে গেল শ্রোতা-পক্ষে: "...তোমার প্রভু"। এটা কিন্তু কোনো আকস্মিক পরিবর্তন নয়। বরং হিসেব করেই দেওয়া। আল্লাহ ও তাঁর নবির মাঝে এক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে। "আমরা" ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহর মহিমা, ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বিষয়ে জোর দিতে। নবি মুহাম্মাদকে "...প্রাচুর্য" দেওয়ায় আল্লাহর ক্ষমতা ও সামর্থ্যের দিকে নজর কাড়ে ব্যক্তিবাচক সর্বনামটি। অন্যদিকে "তোমার প্রভু" কথাটি ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে সম্পর্কের গভীরতা, ভালোবাসা। আরবি 'রাব্ব' শব্দটির—বাংলায় অর্থ করেছি 'প্রভু'—অনেকগুলো অর্থ আছে। শব্দটি দিয়ে কারও মনিব, পালনকারী, দেখভালকারীসহ আরও অনেক অর্থ বোঝায়। তো একারণে শব্দটির ব্যবহার হয়েছে যুতসই। কারণ, এখানে কথা বলা হচ্ছে সালাত, কুরবানি আর উপাসনা নিয়ে: "কাজেই তোমার প্রভুর প্রতি সালাত আদায় করো, কুরবানি করো।" তা ছাড়া এই সূরাটি অবতীর্ণ করা হয়েছিল নবির মনকে প্রশান্ত করতে। এ ধরনের অন্তরঙ্গ ভাষার ব্যবহার মনোভাষিক প্রভাবও বাড়ায়।

কুরআন সম্বন্ধে থিয়োডর নলডেকারের সমালোচনা তার একান্তই ব্যক্তিগত বিচার। তবে প্রাচীন আরবি সম্বন্ধে তার অপরিপক্ক জ্ঞানও ফাঁস করে এটা। সপ্তম শতকের আরবেরা আরবিতে যে-মুনশিয়ানা অর্জন করেছিলেন, সে ব্যাপারে তার

অক্ষমতাও নিশ্চিত করে। ব্যাকরণিক এসব পরিবর্তন কুরআনের গতিশীলতায় প্রাণ সঞ্চার করে।

ইলিতিফাত আরবি কাব্যসাহিত্যের এক অপরিহার্য শৈলী। কুরআন অবতীর্ণের সময় ভাষার এমন ব্যবহার ছিল সর্বজন পরিচিত। এই বৈশিষ্ট্যকে কুরআন এমনভাবে ব্যবহার করেছে, একদিকে এটা যেমন পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানানসই হয়েছে, অন্যদিকে প্রচারিত বার্তার প্রভাবও বাড়িয়ে তুলেছে বহু গুণে। নিল রবিনসন ডিসকভারিং দ্যা কুর'আন: আ কন্টেম্পরারি অ্যাপ্রোচ টু আ ভেল্ড টেক্সট বইতে ব্যাকরণিক এই পরিবর্তনকে যথার্থই বলেছেন: "...খুবই কার্যকর অলংকারসমৃদ্ধ উপাদান।"[৩৭৫]

তো, মোট কথা, কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতার বিপরীতে যেসব সাক্ষ্য আছে, সেগুলো যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, সমস্যা সমাধানের চেয়ে এগুলো বরং আরও সমস্যা তৈরি করে বেশি। এসব বিরোধী সাক্ষ্যগুলোর পক্ষে ভিত্তি জোগানো গবেষণাগুলো একে তো অপ্রতুল, আরবি ভাষা সম্বন্ধেও বুঝের অপরিপক্বতা দেখা যায় এসব গবেষণায়। কুরআন অনুকরণ-অসাধ্য—এই ধারণা বাতিল করতে নিচের প্রশ্নটার উত্তর জরুরি: কুরআনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারত যে-আরবেরা, কেন তারা ব্যর্থ হলো? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলো উদ্ভট। আর তাই বিরোধী সাক্ষ্যগুলো গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে ভুল।

সুতরাং (১-৫ থেকে) কুরআন অননুকরণীয়

১-৫ সংখ্যক হেতু থেকে বোঝা যায় কুরআন অনুকরণের অসাধ্যতার সত্যতা প্রমাণিত।

কুরআনের অননুকরণীয়তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা—কোনো আরব, অনারব, মুহাম্মাদ ﷺ বা আল্লাহ এর প্রণেতা

আরবি ভাষা যারা বোঝেন না, তাদের কাছে কুরআনের ঐশীত্ব স্পষ্ট করতে প্রয়োজন সাক্ষ্য এবং অনুমানের ব্যবহার। আমি এতক্ষণ আলোচনা করেছি, কুরআন যে অনুকরণ-অসাধ্য তা নিয়ে বৈধ সাক্ষ্য আছে। এর অনুকরণ-অসাধ্যতার সেরা ব্যাখ্যা হয় কোনো আরব, অথবা অনারব, অথবা মুহাম্মাদ ﷺ নয়তো আল্লাহ এর প্রণেতা।

কেউ কেউ যুক্তি দেখাতে পারেন অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও তো থাকতে পারে। কিন্তু আমরা ঠিক জানি না ওগুলো কী। এ ধরনের দাবিকে কেউ কেউ "ভৌতিক ভ্রান্ত ধারণা" নাম দিয়েছেন। যদি সত্যিই কোনো বিকল্প ব্যাখ্যা থাকে, তা হলে সেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার টেবিলে তুলতে হবে। তা না হলে: গাছের পাতা অভিকর্ষজ

তরণের কারণে পড়ে না; এর পেছনে অন্য একটা ব্যাখ্যা হয়তো আছে; কিন্তু আমরা তা জানি না—বিষয়টা এরকম হয়ে যাবে।

কোনো আরব, অনারব বা মুহাম্মাদ ﷺ এটা রচনা করতে পারেন না

কুরআনের আসল রচয়িতা কে হতে পারেন, এ অধ্যায়ের বাকি অংশে সেগুলো ভেঙে ভেঙে দেখাব।

আরব?

বেশ কিছু কারণে কুরআন কোনো আরবের রচনা হতে পারে না। প্রথমত, ভাষা ও সাহিত্যে তাদের অসামান্য দখল থাকলেও, কুরআনের চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। শুধু তাই না, সেই সময়ের বাঘা বাঘা কবিরা এর অননুকরণীয়তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তৎকালের অন্যতম আলংকারিক ওয়ালিদ বিন মুগিরার কণ্ঠে ঝরে পড়েছে আশ্চর্যের রেণু:

> "কী বলব! আল্লাহর কসম, আমার মতো করে কবিতা তোমাদের কেউ জানে না। কাব্য রচনা আর অলংকারেও আমার সঙ্গে পেরে ওঠার কেউ নেই—এমনকি জিনেরাও। কিন্তু তারপরও, আল্লাহর কসম করে বলছি: মুহাম্মাদের কথা [মানে কুরআন] আমার জানা কিছুর সঙ্গেই মেলে না। আল্লাহর কসম, সে যা বলে তা শুনতে বড়ই মধুর—সৌন্দর্য আর মুগ্ধতা দিয়ে সাজানো।"[৩৭৬]

দ্বিতীয়ত, সপ্তম শতকের আরবেরা নবিজিকে প্রথমে কবি বলে দোষারোপ করেছিল। মুসলিমদের সঙ্গে বিবাদ-লড়াইয়ের চেয়ে এটা অনেক সহজ ছিল তাদের জন্য। কিন্তু কথা হচ্ছে, আরবি ভাষায় দখল আনতে কাউকে বছরের পর বছর কোনো গুরু কবির অধীনে চর্চা করতে হতো। ওই সময়ের কেউ কিন্তু দাবি করেননি মুহাম্মাদ ﷺ তাদের শিষ্য। তিনি যে তাঁর বার্তা প্রচারে সফল, এটাই তখনকার কবি-সাহিত্যিকদের কাছে মেলে ধরেছে কুরআনের অলৌকিকতা। কুরআন যদি অনুকরণ করাই যেত, তা হলে কোনো কবি অথবা সাহিত্যিক—এরচে ভালো না পারুক—অন্তত এর অনুরূপ কিছু রচনা করতেই পারতেন। তাদের ব্যর্থতার এ খতিয়ানকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ নাভিদ কেরমানি: "কবিদের সঙ্গে এ লড়াইয়ে নিরঙ্কুশ সফলতা পেয়েছিলেন নবি। নয়তো ইসলাম এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত না।"[৩৭৭]

আরও গোড়ার কথা, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে নবিজির জীবদ্দশায়। যদি অন্য কোনো আরব এর রচয়িতা হতেন, তাকে তো তা হলে সব সময় নবিজির সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকতে হতো। যখনই প্রয়োজন পড়ত টুপ করে মুখে করে তৈরি থাকতে হতো তাকে। ঘটনা যদি সত্যিই এমন হতো ২৩ বছর ধরে সে কি পারত লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে?

ঠিক আছে, এই প্রজন্মের আরবেরা? বর্তমান আরবি সাহিত্যে ভালো দখল আছে, এমন কেউ কুরআনের অনুকরণ করতে পারবে—একথা ভিত্তিহীন। বেশ কিছু কারণ আছে এ বিষয়ের সমর্থনে।

প্রথমত, কুরআনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সবচে উপযুক্ত ছিলেন সপ্তম শতকের আরবেরা। যেখানে তারাই ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে বর্তমানে ভাষিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু আরবেরা তাদের পূর্বসূরিদের ছাপিয়ে যাবে এমন কথা অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন আরবির চেয়ে বর্তমান আরবিতে আত্তীকৃত শব্দ যেমন ঢের বেশি, ভাষিক অবক্ষয়ও হয়েছে আগের চেয়ে অনেক। তো এমন এক ভাষা-পরিবেশে বেড়ে ওঠা কোনো আরব কীভাবে প্রাচীন আরবের বিশুদ্ধতম ভাষা-পণ্ডিতদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে?

তৃতীয়ত, কোনো সমসাময়িক আরব প্রাচীন আরবি শিখলেও, যেসব মানুষ নিমগ্ন ছিলেন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা এক সমাজে, তাদের মতো হতে পারবেন না কখনো।

অনারব?

কুরআন যেহেতু আরবি ভাষায়, কোনো অনারবের পক্ষে তাই এর রচনা অসম্ভব। সফলভাবে কুরআনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হলে আরবি ভাষায় দক্ষতা পূর্বশর্ত। কুরআনেও এদিকটার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে: "আমি জানি অবিশ্বাসীরা বলে, 'একজন লোক তাকে এ কথাগুলো শিখিয়ে দিয়ে যায়।' অথচ ওরা যে-লোকটার কথা বলছে তার ভাষা তো অন্য। আর এই কুরআনের ভাষা পরিষ্কার আরবি।"[৩৭৮]

কুরআনের কালজয়ী ব্যাখ্যাকার ইবনু কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

> "কুরআনের অনুপম ভাষাশৈলী, সুনিপুণ অর্থমালা—যা কিনা পূর্বের যেকোনো নবির কাছে পাঠানো গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশি নিপুণ—তা কীভাবে এমন কারও কাছ থেকে শেখা যায় যে কিনা আরবিই বলতে পারে না ঠিকমতো? সামান্য কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কেউ এমন কথা বলতে পারেন না।"[৩৭৯]

কিন্তু কোনো অনারব যদি তখনই আরবি ভাষা শিখে থাকে? তিনি তা হলে আরবি ভাষায় কথা বলবেন। আর সেক্ষেত্রে আমি ওপরের প্রথম সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটা দেখতে বলব। কিন্তু তারপরও যে-জন্ম থেকে একটি ভাষায় বড় হয়, আর যাকে সেই ভাষা শিখতে হয়, দুজনের ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য থাকে। প্রায়োগিক ভাষাবিদ্যা এবং অনুরূপ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা থেকে তার প্রমাণ মেলে।

একজন জন্মগত ইংরেজি ভাষী আর একজন দীক্ষিত ইংরেজি ভাষীর শব্দ ও বাগধারা ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়।[৩৮০] কোনো ইংরেজি ভাষীর বাবা-মা জন্মগত ইংরেজি ভাষী কিনা, তা থেকেও তার মাঝে ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

যার বাবা-মা'র যেকোনো একজন বহিরাগত, কোনো কোনো কাজে তার ভাষিক দক্ষতায় ঘাটতি ধরা পড়ে।[৩৮১] ভাষা দক্ষতায় স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মাঝে পার্থক্য খালি চোখে দেখা না গেলেও গবেষণায় সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা পড়েছে। কেনেথ হিল্টেন্সটাম এবং নিকলাস অ্যাব্রাহামসন একটি গবেষণা চালিয়েছিলেন এ বিষয়ে। তাদের গবেষণার নাম ছিল: হু ক্যান বিকাম নেটিভ-লাইক ইন আ সেকন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ? অল, সাম অর নান? এ গবেষণায় দেখা গেছে, যোগ্য অস্থানীয় ভাষীদের ত্রুটিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং প্রণালিবদ্ধ ভাষিক বিশ্লেষণ ছাড়া বোঝা যায় না।[৩৮২] কাজেই, অননুকরণীয় এবং অনুপম সাহিত্যকর্ম কুরআনের রচয়িতা কোনো আরব বা অনারব হওয়া বাস্তবসম্মত না।

তবে কি নবি মুহাম্মাদ ﷺ?

আরবের তৎকালের ভাষা-পণ্ডিতেরা শুরুতে নবিকে কবি আখ্যা দিয়ে দোষারোপ করেছিলেন। কিন্তু পরে আর এ নিয়ে রা করেননি। অধ্যাপক মোহর আলি লিখেছেন:

কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তি কিন্তু কুরআনকে কবিতার বই মনে করেন না। নবি ﷺ কখনো কবিতা রচনায় জড়াননি নিজেকে। ওয়াহির বিরোধিতাকারী অবিশ্বাসী কুরাইশরা শুরুতে তাঁর বিরুদ্ধে কবি হওয়ার দোষারোপ করেছিলেন। কিন্তু অচিরেই তারা বুঝল তাদের অপবাদ সঠিক না। তারা তখন তাদের সমালোচনার ধারা বদলে ফেলে। নবি ﷺ যেহেতু অক্ষরজ্ঞানহীন ছিলেন, কাব্য-রচনায় অনভ্যস্ত, তারা বলল নিশ্চয়ই অন্য কেউ তাঁকে শিখিয়ে দেয়। তারা বলা শুরু করল, সেই লোক তাকে 'পুরোনো কিচ্ছাকাহিনি' সকাল-সন্ধ্যায় বলে দেয় তাঁকে।"[৩৮৩]

নবিজিকে কখনো ভাষা-পণ্ডিত বলে বিবেচনা করা হতো না। কবিতা রচনা বা ছন্দবদ্ধ পঙ্‌ক্তি সাজাতেও তাঁকে দেখা যায়নি কখনো। কাজেই কেউ যদি বলেন, কোনো একভাবে বেমক্কা তিনি এক অনন্য সাহিত্যকর্ম রচনা করে ফেলেছেন, তা হলে সেটা রূপকথাকেও হার মানাবে। কেরমানি লিখেছেন, "কবিতার জটিল কলাকৌশলগুলো তিনি শেখেননি, যখন প্রকাশ্যে আয়াতগুলো পাঠ করতেন... কিন্তু তারপরও তার পাঠ ছিল কবিতা, জ্যোতিষীদের ছন্দবদ্ধ গদ্য, কিংবা সেই সময়ের অন্যান্য মাত্রাবদ্ধ কথা থেকে অন্যরকম।"[৩৮৪]

ইসলাম-বিশারদ তাকি উসমানি বলেছেন,

> "এ ধরনের ঘোষণা কিন্তু সাধারণ কিছু না। এটা এমন একজন মানুষের কাছ থেকে এসেছে, যিনি কখনো তাঁর সমকালের কোনো কবি বা বিদ্বানের কাছ থেকে কিছু শেখেননি। তাদের কাব্য আসরে কখনো একটা চরণও আবৃত্তি করেননি। জ্যোতিষীদের মজলিশেও যাননি কখনো। নিজে থেকে কবিতা

> রচনা তো দূরের কথা, তিনি তো অন্যান্য কবিতার পঙ্‌ক্তিও মনে রাখতে পারতেন না।”[৩৮৫]

এগুলো ছাড়াও কুরআনের আয়াতের শৈলী আর নবিজির হাদিসের ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ দুয়ের পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে ড. ড্রাজ যুক্তি দেখিয়েছেন:

> “কুরআনের শৈলী পুরোটাই এক রকম। অন্যদিকে নবির কথাগুলো পুরোপুরি আলাদা। কুরআনের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায় না। কুরআন যেন উড়ন্ত পাখি। মানুষ তার নাগাল পায় না; পারে শুধু দৌড়ে সাথে থাকতে। মানুষের চেষ্টাগুলো যেন জমিনের বুকেই পড়েই থাকে। কেউ হয়তো হামাগুড়ি দেয়, কেউ-বা দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু কুরআনের সাথে যদি এদের সবচে দ্রুতগামীর তুলনা করেন, তা হলে মনে হবে অক্ষে ঘূর্ণিরত গ্রহ-নক্ষত্রের তুলনায় এরা যেন চলমান গাড়ির চেয়ে বেশি কিছু না।”[৩৮৬]

শৈলীগত পার্থক্য সম্বন্ধে ড. ড্রাজের যুক্তিটা যথেষ্ট শক্তিশালী নয় যদিও। কারণ, কবি এবং কথাশিল্পীরা তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা এবং কাজের ভাষার মাঝে শৈলীগত পার্থক্য বজায় রাখেন। নবিজি যে কুরআনের রচয়িতা নন, একথা প্রমাণে তাই এই যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এখানে এটা উল্লেখ করার কারণ, যদি নবিজির কথার ধরন আর কুরআনের ভাষাশৈলী অনুরূপ বা কাছাকাছি হতো, তা হলে অননুকরণীয় ঐশীগ্রন্থ হিসেবে কুরআনের দাবি মাঠে মারা যেত।

নবিত্বের দায়িত্ব পালনে কত না ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করতে হয়েছে নবিজিকে। তার শিশু সন্তান মারা গেছে। প্রিয় স্ত্রী খাদিজা মারা গেছেন। সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা হয়েছিল তাকে। তাঁর কাছের সঙ্গীদের নিপীড়ন করা হয়েছে, মেরে ফেলা হয়েছে। দুর্বিনীত বালকেরা পাথর ছুড়ে মেরেছে তাকে। মাদীনার জীবনে তিনি অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন সামরিক অভিযানে। সুদীর্ঘ এই সংগ্রাম-মুখর জীবনে কুরআন তার ঐশী স্বর আর রূপ হারায়নি একটি শব্দেও।[৩৮৭] এসব বিক্ষুব্ধ সময় কিংবা নবি মুহাম্মাদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর ব্যাপারে নীরব থেকেছে কুরআন। নবি মুহাম্মাদ ﷺ যদি কুরআন রচনাই করতেন, তবে যেসব মানসিক ও শারীরিক কষ্ট তিনি পার করেছেন, কুরআনে তার উল্লেখ না থাকা অসম্ভব।

সাহিত্যের মানদণ্ডে কুরআন এক অনুপম নিদর্শন। অথচ এর আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে। প্রতিটি আয়াত প্রকাশিত হয়েছে কোনো সংশোধন-পরিমার্জন ছাড়াই। কিন্তু তারপরও কী আশ্চর্য! এভাবেই তৈরি হয়েছে সেরা এই সাহিত্যকর্ম। কাজেই কুরআনকে নবি মুহাম্মাদের সাহিত্যকর্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করাটা ভিত্তিহীন। পৃথিবীর অসামান্য সব প্রতিভারা সেরা যেসব সাহিত্যকর্ম রচনা করেছে, বহু কাঁটাছেড়া, ঘষামাজার পর সেগুলো অর্জন

করেছে সাহিত্যিক নিপুণতা। অন্যদিকে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে। আর একবার অবতীর্ণ হওয়ার পরও পরিবর্তন হয়নি একটি আ-কার, ই-কারেও।[৩৮৮] যেকোনো মানসম্পন্ন সাহিত্য গড়তে সম্পাদনা, সংযোজন-বিয়োজন অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্ব স্ব ব্যস্ততার মাঝে পরিশীলিত সাহিত্য রচনা করতে পারেন না কেউ। কিন্তু কুরআনের বেলায় তাই দেখি আমরা! ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আয়াত। আর একবার সে আয়াতগুলো উপস্থিত জনতার সামনে পাঠ করার পর নবিজি কিন্তু সেগুলোতে আর কোনো রদবদল করতে পারতেন না ওগুলোর ভাষা মান উন্নত করার জন্য। কুরআন যে নবিজির পক্ষে রচনা করা সম্ভব না, তার পক্ষে জোরালো পারিপার্শ্বিক প্রমাণ মেলে এখান থেকে। এটা সহ ওপরে আমি আরও যেসব প্রমাণ উল্লেখ করলাম, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় নবিজির পক্ষে এমন সাহিত্যকর্ম রচনা খুবই খুবই অসম্ভব।

কয়েক পৃষ্ঠা আগে আমি কবি মুতানাব্বির কথা বলেছিলাম। আরবের অন্যতম কবি প্রতিভা বিবেচনা করা হয় তাকে। কেউ কেউ বলেছিলেন, তার কাজেরও তুলনা নেই কোনো। সে-ও মানুষ। তার মানে কুরআনও এমন কোনো মানুষেরই রচনা হবে। কিন্তু যুক্তির ধারা মানে না এমন তর্ক। কারণ, মুতানাব্বিকে তার রচনার নিপুণতা আনতে অনেকবার কাটাছেড়া করতে হয়েছে।[৩৮৯] কিন্তু নবিজির বেলায় তা খাটে না। একবার কুরআনের একটা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি একে কাটাছেড়া, ঘষামাজার করেননি। এ থেকে বলা যায় কোনো মানবীয় প্রতিভার শিল্পকর্ম নয় কুরআন।

তো, সব কথার শেষ কথা, কুরআন রচয়িতা হিসেবে নবিজির প্রতিভাকে টেনে আনার ভিত্তি নেই কোনো। অসামান্য কবিপ্রতিভাদেরও প্রয়োজন পড়ে তাদের কাজ সম্পাদনা, সংশোধন ও উন্নতির। কিন্তু কুরআনের বেলায় তা হয়নি। আমাদের হাতে যদি কোনো মানবীয় কর্মের নেপথ্য নকশা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকে, তা হলে তার অনুকরণ অসাধ্য নয়। শেক্সপিয়র ও মুতানাব্বির বেলায় তা দেখেছি আমরা। কুরআন যদি নবিজির কর্মই হতো, তা হলে তা অনুকরণ করা যেত।

শিল্পকর্ম কিংবা সাহিত্য, এমনকি জটিল জটিল সব প্রযুক্তির নকশা এবং তা সম্পাদনের সরঞ্জাম হাতে থাকলে সেগুলোও নকল করা সম্ভব। কোনো কোনো শিল্পকর্ম খুবই অসাধারণ বা বিস্ময়করভাবে স্বতন্ত্র। কিন্তু তারপরও সেগুলো অনুকরণ করা যায়।[৩৯০] কিন্তু কুরআনের বেলায় এর নকশা (কুরআন নিজেই) এবং সরঞ্জাম (প্রাচীন আরবি ভাষার শব্দমালা এবং ব্যাকরণিক বিধি) হাতের নাগালে থাকার পরও এর ভাষা-অলংকার, সাহিত্য মান এবং ধরনের কিছু করা সম্ভব হয়নি আমাদের।

সেরা ব্যাখ্যা কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে

কুরআন যেহেতু কোনো আরব, অনারব বা মুহাম্মাদের রচনা নয়, তা হলে সেরা ব্যাখ্যা হিসেবে এটাই দাঁড়ায় যে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। কুরআনের অনুকরণ অসাধ্যতার পক্ষে এটাই সেরা ব্যাখ্যা। কারণ, উপস্থিত জ্ঞানের সাপেক্ষে বাকি সব ব্যাখ্যাগুলো অবাস্তব ঠেকে। এই উপসংহারের বিপরীতে সম্ভাব্য আপত্তি আসতে পারে, এই অনুমানটি কাজ করতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়। তখন তা হলে এক অতিপ্রাকৃতিক সত্তার অস্তিত্বের প্রশ্ন এসে যায়। কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তার অস্তিত্বে আগে থেকে বিশ্বাস না থাকলেও খাটবে আমাদের যুক্তিপ্রমাণটি। অন্য কোনো আস্তিকের কাছে এটার উপযোগিতা ফলবে বেশি। তবে তারপরও এটা বড় কোনো সমস্যা না। কারণ, আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে জোরালো প্রমাণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে।

আবার উল্টো দিক থেকেও সাজানো যায় যুক্তিটি। কুরআনের অনুকরণ অসাধ্যতাই আল্লাহর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এটা যদি কোনো মানুষের রচনা না হয়, সম্ভাব্য সব ব্যাখ্যাই যদি অসাড় প্রমাণ হয়, তা হলে কে হতে পারেন এর রচয়িতা? কোনো মনুষ্য সাহিত্যিকের চেয়ে অনেক বেশি ভাষা-দক্ষতা আছে এমন কেউই হবেন এর প্রণেতা। আর সেক্ষেত্রে অবধারিতভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টা এসে যায়। সেকারণে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে এক যৌক্তিক ভিত্তি দেয় কুরআনের অননুকরণীয়তা। কিংবা অতিপ্রাকৃতিক সত্তার ইঙ্গিত দেয় অন্তত।

বিজ্ঞানীরাও অনুরূপ যুক্তি খাটান তাদের গবেষণায়। হিগস-বসন আবিষ্কারের সাম্প্রতিক ঘটনাটাই খেয়াল করুন। হিগস ক্ষেত্রের মৌলিক উপাদান হিগস-বসন কণা। মহাজগতের আদি অবস্থায় কণাগুলোর মাঝে ভর পুরতে সচল হয়েছিল ক্ষেত্রটি। কণাটি আবিষ্কারের আগেও মহাজগতের আদি অবস্থায় ফোটন বাদে বাকি সব কণা ভরহীন অবস্থা থেকে ভরপ্রাপ্ত হওয়ার সেরা ব্যাখ্যা ছিল এটা। তার মানে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হওয়ার আগেও লব্ধ উপাত্তের ভিত্তিতে হিগস-বসন কণা ছিল সেরা ব্যাখ্যা। এই একই যুক্তিধারা কুরআনের বেলায় খাটিয়ে বলা যায়, কুরআনের অনুকরণ অসাধ্যতার সেরা ব্যাখ্যা হলো মহান আল্লাহই এর রচয়িতা। আমাদের নাগালে থাকা তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে বাকি সব ব্যাখ্যা যেহেতু মুখ থুবড়ে পড়ছে, কাজে এটাই সেরা ব্যাখ্যা।

বিকল্প অনুমান

কুরআনের অনুকরণ অসাধ্যতা সম্বন্ধে বিকল্প অনুমানগুলোর মধ্যে থাকতে পারে, কোনো উচ্চতর সত্তা এর প্রণেতা বা শয়তান। এ ধরনের অনুমানগুলোর বাস্তবতা

অসম্ভব। সেজন্য এ অধ্যায়ের মূল আলোচনায় উল্লেখ করা হয়নি এগুলো। এদুটো নিয়ে এখন কথা বললেই বুঝবেন, কেন এগুলোর কথা বলিনি।

কুরআনের রচয়িতা হিসেবে কোনো উচ্চতর সত্তার কথা বলাটা স্রেফ শব্দের হেরফের ছাড়া আর কিছু না। 'উচ্চতর সত্তা' আসলে কী? আল্লাহ নিজেই কি উচ্চতর সত্তার সেরা ব্যাখ্যা নন? 'উচ্চতর সত্তা' মানে যদি হয় মানুষের চেয়ে বেশি ভাষিক ক্ষমতা, সামর্থ্যের অধিকারী কিছু, সেজন্য তা হলে আল্লাহ ছাড়া আর কে বেশি উপযুক্ত?

আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে এ বইতে এককভাবে প্রমাণ এসেছে। তো আমাদের সাথে তিনি যোগাযোগ করতে চাইবেন, সেটা খুবই সম্ভব। কারণ, তিনি তো কেবল স্রষ্টা বা পরিকল্পনাকারীই নন, যে-জগতে আমরা বাস করি, আমাদের টিকে থাকার জন্য উপযোগীও করেছেন একে। আমাদের দিয়েছেন একটা আত্মা বা সচেতন বোধ। পুরে দিয়েছেন নৈতিকতা। বোঝাই যাচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব ও বিকাশে প্রবলভাবে নিয়োজিত তিনি। যেকারণে আকাশবাণীর মারফতে আমাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ করার সম্ভাবনা অনেক। সুতরাং, নিজেকে আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে বলা দাবি করা কুরআনে যখন দেখি এমন সব বৈশিষ্ট্য আছে যা কেবল ঐশী কোনো কাজের মধ্যে পাওয়া সম্ভব, এর প্রণেতা হিসেবে আল্লাহকে মেনে নেওয়াই অর্থ বহন করে। কোনো অজ্ঞাত 'উচ্চতর সত্তা' অজ্ঞাত কারণে কুরআন রচনা করে থাকতে পারেন, এমন কথা বলা আর যেকোনো কিছুরই ব্যাখ্যায় কোনো অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্বের ধরনা দেওয়া একই কথা।

কুরআন প্রণেতা হিসেবে শয়তানের কথাও ধোপে টেকে না। শয়তান কিংবা অন্য কোনো প্রাণসত্তা থেকে কুরআন আসা সম্ভব নয়। কারণ, ওধরনের কিছুর অস্তিত্বের ভিত্তি কুরআন অথবা আকাশবাণীই। মানুষ তো আর নিজে থেকে পর্যবেক্ষণ করে ওগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়নি। যেকারণে কেউ যদি কুরআনের উৎস হিসেবে শয়তানের কথা বলেন, তাকে তা হলে শয়তানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। আর তা করতে গিয়ে প্রমাণ দিতে হবে আকাশবাণীর। শয়তানের অস্তিত্ব প্রমাণে কুরআনের বক্তব্য ব্যবহার করলে ঐশীগ্রন্থ হিসেবে কুরআনই প্রতিষ্ঠিত হবে আগে। কারণ, শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হলে কুরআনকে ঐশী মানতে হবে প্রথমে। কাজেই এই যুক্তি আত্মঘাতী। আকাশবাণী বলতে যদি বাইবেল (ইঞ্জিল) বোঝানো হয়, তা হলে শয়তানে বিশ্বাসের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে গ্রন্থটাকে আগে বৈধ ভিত্তি হিসেবে দেখতে হবে। বাইবেলের পাঠগত অবিকৃতি এবং ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা-সংক্রান্ত সমসাময়িক গবেষণার আলোকে বাস্তবসম্মত নয়।[৩৯১] আর কুরআনের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলেও বোঝা যায় এটা কোনো শয়তানের কারসাজি

হতে পারে না। কারণ, এখানে উল্টো তাকেই নিন্দা করা হয়। আর যেধরনের নীতিনৈতিকতার সবক আমরা এখানে পাই, তা শয়তানি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মেলে না।

মোদ্দা কথা

সাক্ষ্য এবং সেরা ব্যাখ্যার অনুমান ব্যবহার করে কুরআনের ঐশী প্রকৃতির পক্ষে যুক্তিপ্রমাণ মেলে ধরেছে এ অধ্যায়। সাক্ষ্যের প্রামাণ্য ও মৌলিক ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে ভাবনাচিন্তার যৌক্তিক ও বৈধ পদ্ধতি হিসেবে দেখানো হয়েছে সেরা সিদ্ধান্তের অনুমানকে। সাক্ষ্য ব্যবহার করে কুরআনের অনুকরণ অসাধ্যতা প্রমাণ করা যায়। আরবি ভাষাবিদ ও সাহিত্য-বিশারদেরা কুরআনের অননুকরণীয় গুণ নিশ্চিত করেছেন। প্রতিষ্ঠিত আবহ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এসব জ্ঞানের মধ্যে আছে: কুরআন এক বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষিক ও সাহিত্যিক চ্যালেঞ্জ ছোড়ে মানুষের কাছে। কুরআনের অনুপম বিষয়বস্তু এবং সাহিত্যিক ধরনের অনুকরণে কিছু রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। প্রতিষ্ঠিত আবহ তথ্যের আলোকে কুরআনের অননুকরণীয়তার পক্ষে দেওয়া সাক্ষ্যগুলো গ্রহণ করা যেহেতু যুক্তিসম্মত, গ্রন্থটির অনুপম ভাষাশৈলী ও সাহিত্যমানের সেরা ব্যাখ্যায় তাই অনুমান করা হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলোর মাঝে আছে, কোনো আরব, অনারব, মুহাম্মাদ ﷺ অথবা আল্লাহ এর রচয়িতা। কিন্তু লব্ধ তথ্যগুলোর আলোকে যেহেতু কোনো আরব, অনারব বা নবি মুহাম্মাদের পক্ষে এমন কিছু রচনা করা অসম্ভব, তাই সেরা ব্যাখ্যা হচ্ছে, মহান আল্লাহ এর প্রণেতা।

এ অধ্যায়ের উপসংহারকে অস্বীকার করা, আর পৃথিবীর গোলক আকার হওয়া কিংবা প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের কথাকে অস্বীকার করা জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে একই কথা। পৃথিবী যে গোলক আকারের, তা আমাদের বেশির ভাগই জেনেছি সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে। রোগ নির্ণয়ে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকদের সিদ্ধান্তগুলো সেরা ব্যাখ্যার অনুমানের ওপর ভিত্তি করে। কেউ কেউ উপরোক্ত প্রমাণের বিরোধিতায় বলতে পারেন, আমরা অন্যান্য আরও যেসব জ্ঞান অর্জন করেছি তার ভিত্তিতে পৃথিবীর গোলক আকার হওয়া এবং চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এগুলো আমাদের অতিপ্রাকৃতের মতো অস্বাভাবিক কোনো দাবির দিকে নিয়ে যায় না। এই বিতর্কটা হরদম শোনা যায়। কিন্তু এটা প্রকৃতিবাদমূলক সত্তাতত্ত্বকে বিনা বিচারে সত্য বলে মেনে নেয়। অর্থাৎ একটা অনুমান লুকিয়ে থাকে এমন বিরোধিতার পেছনে। সেটা হচ্ছে অতিপ্রাকৃত যেকোনো কিছুকে অস্বীকার। এবং সবকিছুকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যাবে বলে ধারণা। মনোদর্শন, ভাষা সামর্থ্য অর্জন ও বিকাশ, ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক সত্য এবং মহাজগৎ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার

আলোকে এমন স্পর্ধিত ও ধৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অযৌক্তিক এবং অসংগত। আর এ অধ্যায়ে আমি অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দিইনি। আগের অধ্যায়গুলোতে তা আমি এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি। এখানে শুধু বলেছি, যে-সত্তাকে আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে প্রমাণ করেছি, নির্দিষ্ট কিছু সত্যের বেলায় তিনিই সেরা ব্যাখ্যা।

শেষ কথা, জগৎ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার সুযোগ নেই এমন সব বুদ্ধিবৃত্তিক বাধা সরিয়ে কেউ যদি মুক্ত মন নিয়ে এ অধ্যায়ের যুক্তিপ্রমাণগুলো দেখেন, বিশেষ করে আগের অধ্যায়ের তৈরি করা আবহের আলোকে, কুরআন যে ঐশী উৎস থেকে এসেছে—সবচে যৌক্তিক এই সিদ্ধান্তই নেবেন তারা। তবে সে যা-ই হোক, কুরআন সম্বন্ধে যত কিছুই বলা হোক বা লেখা হোক, এর শব্দ আর অর্থের প্রকাশে সব সময়ই কম পড়ে যাবে:

> “বলো, ‘আমার প্রভুর কথা লিখতে যদি সব মহাসাগরের পানি কালি হয়, তবু সব কথা শেষ হওয়ার আগেই ফুরিয়ে যাবে কালি’—এমন কী অনুরূপ আরও মহাসাগরও যদি আমি যোগ করি, তবুও।”[৩৯২]

অধ্যায় ১৪

আল্লাহর বাণীবাহক

কুরআন বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল নবি ও রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে। মানুষকে আল্লাহর একত্বের প্রতি আহ্বানের মূল দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁদের। ছোটবেলা থেকেই নবিদের অনেকের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তাদের কারও কারও নাম সুমহান আল্লাহ জানিয়েছেন আমাদের: ইবরাহিম (অ্যাব্রাহাম), মূসা (মোজেস), ঈসা (জিজাস), দাউদ (ডেভিড), ইউনুস (জন), যাকারিয়া, ইলিয়াস, ইয়াকুব (জ্যাকব), ইউসুফ (জোসেফ)—তাঁদের সবার প্রতি আল্লাহর শান্তি ঝরে পড়ুক।

কুরআনে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম এসেছে ৫ বার।[৬৯৩] ফেরেশতা জিব্রীলের মারফতে এ গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে বলে নিশ্চিত করে কুরআন। কুরআন বলে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর শেষ নবি ও রাসূল।[৬৯৪] এই আলোকে নবি মুহাম্মাদের অবস্থান বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিশ্চিত করা বেশ সহজ একটি কাজ। ঐশীগ্রন্থ হিসেবে কুরআনের সত্যতা যেহেতু প্রমাণিত, কাজেই এখানে যা বলা আছে সবই সত্য। এখানে যেহেতু মুহাম্মাদকে আল্লাহর বাণীবাহক বলা হয়েছে, তার মানে নবি মুহাম্মাদ ﷺ যে ঐশী বাণী পাওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, তা সত্য। নবি মুহাম্মাদের জীবন-অভিজ্ঞতা, তাঁর প্রচারিত শিক্ষা, তাঁর চরিত্র এবং যে-প্রভাব তিনি রেখেছিলেন, তা জারি আছে আজও। এগুলো থেকেও তাঁর নবিত্বের প্রমাণ মেলে। তবে সবচে বড় প্রমাণ তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা।

তাঁর পুরো জীবন বিশ্লেষণের পরও যদি তাঁকে মিথ্যাবাদী বা বিভ্রান্ত দাবি করা হয়, তবে কাউকেই আর সত্যবাদী বলার উপায় থাকবে না। আপনি যাকে মা বলেন, তিনিই যে আপনাকে জন্ম দিয়েছেন—জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে এধরনের কথাকে অস্বীকার করার মতো হবে বিষয়টা। নবি মুহাম্মাদ ﷺ যেসব শিক্ষা প্রচার করেছেন, তার মাঝে আছে আধ্যাত্মিকতা, সমাজ, অর্থনীতি এবং মনস্তত্ত্ব থেকে নিয়ে মানবজীবনের সকল বিষয়। তাঁর সুন্নাহ নিয়ে গবেষণা এবং তাঁর প্রচারিত শিক্ষাগুলো সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ একটা দৃষ্টিভঙ্গি লালন করলে, যেকোনো যুক্তিবান মানুষ বুঝবেন, মানুষটির মাঝে অবশ্যই

বিশেষ কিছু আছে। হাজারো কঠিন কঠিন পরিস্থিতি আর অবস্থার সাপেক্ষে তাঁর চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁর সহিষ্ণুতা, ধৈর্য আর বিনয় ছিল অতি মানবীয়। এগুলো ছিল নবি-চরিত্রের অপরিহার্য উপাদান। তাঁর জীবন ও শিক্ষা কেবল আরব বিশ্বকেই নয়, গোটা মানবজাতির ওপরই ফেলেছে অসাধারণ প্রভাব। এক কথায়, সহিষ্ণুতা, অগ্রগতি আর ন্যায়বিচারের বেলায় অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন নবি মুহাম্মাদ ﷺ।

নবিকে অস্বীকার, নিজের মাকে অস্বীকার

অধ্যায় ১৩-তে দেখিয়েছিলাম, যাকে আমরা জন্মদাত্রী মা বলি, তিনি যে সত্যিই আমাদের মা, তা নিশ্চিত করার একমাত্র সত্যিকার উৎস সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান। আমাদের কাছে জন্মসনদ, হাসপাতালের নথি কিংবা ডিএনএ টেস্ট সনদ থাকলেও, সবই কিন্তু একধরনের সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান। আপনাকে অন্যের কথাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে—উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে যথাক্রমে যিনি জন্মসনদ পূরণ করেছেন, যিনি হাসপাতালের নথির ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং যিনি ডিএনএ পরীক্ষা করেছেন। মৌলিকভাবে এগুলো সবই সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান-সঞ্চার। আপনার মা যে আপনাকে জন্ম দিয়েছেন, সেই দাবিটি পর্যবেক্ষণগতভাবে সত্য প্রমাণে কোনো ভৌত প্রমাণ নেই।

সম্ভাবনা যদিও খুব ক্ষীণ, তারপরও কেউ যদি নিজে ডিএনএ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে চান, সেটার ভিত্তিও কিন্তু সাক্ষ্য। কারণ, কোনো না কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কথায় আশ্বস্ত হয়েই আপনি ডিএনএ টেস্ট করে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন, আপনার মা কে সে-সম্বন্ধে নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে। কাজেই জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে, আপনার মায়ের ব্যাপারে এভাবে নিশ্চিত হওয়াটাও সাক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ যে আল্লাহর শেষ বাণীবাহক, এ সম্বন্ধে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। কাজেই এটা যদি আমরা অস্বীকার করি, তা হলে সেটা হবে নিজের মাকে অবিশ্বাস করার মতোই।

যুক্তিপ্রমাণ

আজ থেকে ১৪ শত বছর আগে নবিত্বের ঘোষণা দিয়েছিলেন নবি মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর কথা ছিল খুবই সোজাসাপ্টা: আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নন। মুহাম্মাদ আল্লাহর বাণীবাহক। খুবই সরল কথা—কিন্তু এর প্রভাব অনেক প্রগাঢ়।

তিনি নবি হন ৪০ বছর বয়সে। এর কিছুদিন আগে মাক্কা থেকে কিছু দূরে এক পর্বতগুহায় একাকী সময় কাটাতেন। চিন্তাভাবনা করতেন সমাজ-সংস্কৃতির দুরবস্থা নিয়ে। কুরআনের প্রথম আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে উদয় হয় নবিত্বের। এর বাণী খুবই

সহজসরল: আমাদের জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আল্লাহর উপাসনা। ইসলামে উপাসনার অর্থ অনেক ব্যাপক। এর মানে আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁর বিধিনিষেধ মানা। আমাদের যাবতীয় সব কাজে তাঁর প্রতি নিবেদিত থাকা (দেখুন অধ্যায় ১৫)।

তাঁর নবিত্বের দাবি এবং তাঁর কাছে আসা বাণীর সত্যতা যাচাইয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং তাঁর জীবনসংক্রান্ত সাক্ষ্যগুলো যুক্তির নিক্তিতে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে আমাদের। তা হলে এ সম্বন্ধে আমরা একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছাতে পারব।

নবিজির দাবি প্রমাণে কুরআন কিছু যৌক্তিক ধারা দেয় আমাদের। কুরআন বলে, নবিজি কোনো মিথ্যুক, পাগল, পথহারা বা বিভ্রান্ত নন। তিনি নিজের মনগড়া কোনো কথা বলেন না। কুরআন আরও নিশ্চিত করে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর বাণীবাহক। তিনি যা বলছেন তা ষোলোআনা সত্য।

> "তোমাদের সঙ্গী কোনো পাগল না।"[৩৯৫]
>
> "তোমাদের সঙ্গী পথহারা নয়। সে বিভ্রান্ত নয়। নিজের মনগড়া কোনো কথা বলে না সে।"[৩৯৬]
>
> "মুহাম্মাদ আল্লাহর বাণীবাহক।"[৩৯৭]

যুক্তিটাকে আমরা এভাবে সাজাতে পারি:

- নবি মুহাম্মাদ ﷺ হয় মিথ্যাবাদী, বিভ্রান্ত অথবা সত্য কথা বলছেন।
- তিনি মিথ্যাবাদী বা বিভ্রান্ত নন।
- কাজেই তিনি সত্য বলছেন।

তিনি কি মিথ্যাবাদী?

প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থগুলো নবি মুহাম্মাদের সৎ চরিত্র তুলে ধরে। সেখানে আমরা দেখি, তিনি কোনো মিথ্যাবাদী ছিলেন না। এ ধরনের দাবি অযৌক্তিক। অনেক কারণ আছে এর পেছনে। এগুলোর মাঝে অন্যতম: তাঁর শত্রুরাই তাঁকে "বিশ্বস্ত" বলতেন।[৩৯৮]

নবি মুহাম্মাদের বাণী নড়বড়ে করে দিয়েছিল তৎকালীন সমাজের অর্থনীতি আর ক্ষমতার মচ্ছবকে। সপ্তম শতকের মাক্কার সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। নবি ইব্রাহিম ﷺ যে কা'বা ঘর বানিয়েছিলেন আল্লাহর উপাসনার জন্য, সেই সময়ের মাক্কার গোত্রপতিরা সেখানেই স্থাপন করেন ৩৬০টি মূর্তি। এগুলো দিয়ে তারা আকৃষ্ট করতেন বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের।

নবিজির কথা ছিল খুব সাধারণ। অথচ সেই সাধারণ কথাই অসাধারণভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় সপ্তম শতকের আরব বহুঈশ্বরবাদে। প্রথম দিকে গোত্রপতিরা ভেবেছিলেন তাঁর কথা পাত্তা পাবে না। এজন্য তাঁকে নিয়ে তারা হাসিতামাশা করত।

কিন্তু ধীরে ধীরে যখন সমাজের সুপরিচিত অনেকে এই বাণী গ্রহণ করে নিলেন, নবিজিকে তারা তখন গালাগাল শুরু করল। তাকে অপদস্থ করতে লাগল শারীরিক ও মানসিকভাবে।

নিজের বিশ্বাসের জন্য তাঁকে একঘরে করা হয়েছে। তাঁর প্রাণের শহর মাক্কা থেকে বের হয়ে যেতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। দিনের পর দিন কেটেছে তাঁর অনাহারে। তায়িফে এমনভাবে তাঁর ওপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছে, পা ভিজে গেছে রক্তে। সামাজিকভাবে তাঁকেসহ তাঁর সঙ্গী-সাথিদের যখন বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় এলাকা থেকে কিছু দূরে, সেই সঙিন সময়ে মারা যান তাঁর ভালোবাসার স্ত্রী খাদিজা ﵂.।[৩৯৯] তা ছাড়া মাক্কার গোটা সময়টাতেই নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তাঁর সঙ্গীরা। মিথ্যুকেরা সাধারণত দুনিয়াবি কোনো স্বার্থে মিথ্যে বলে। অথচ তারপরও শত্রুরা যখন তাঁকে ধন-সম্পদ আর ক্ষমতার লোভ দেখালেন,[৪০০] তিনি সাথে সাথে নাকচ করে দিয়েছেন সেটা। আল্লাহর একত্বের বাণী প্রচারে বিন্দু পরিমাণ আপস করেননি। এ থেকে কিন্তু তাঁর নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরবি ও ইসলামি শাস্ত্রের ইমেরিটাস অধ্যাপক প্রয়াত মন্টগোমারি ওয়াট মুহাম্মাদ অ্যাট মাক্কা বইতে যুক্তি দেখিয়েছেন, নবিজিকে ভণ্ড বলা অযৌক্তিক: "নিজের বিশ্বাসের জন্য নির্যাতন ভোগে প্রস্তুত থাকা, তাঁকে যারা বিশ্বাস করেছেন, নেতা হিসেবে দেখেছেন, তাদের উত্তম নৈতিক চরিত্র এবং তাঁর চূড়ান্ত সাফল্য—এগুলো সব তাঁর সততার প্রমাণ দেয়। মুহাম্মাদকে ভণ্ড মনে করলে যত না সমাধান হয়, তারচে বেশি সমস্যা তৈরি হয়।"[৪০১]

তিনি কি বিভ্রান্ত ছিলেন?

নবি মুহাম্মাদকে বিভ্রান্ত বলা মানে, তিনি ভুলভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি আল্লাহর বাণীবাহক। কেউ যখন বিভ্রান্ত হয়, সে তখন তার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকলেও সেখান থেকে সরে আসে না। আবার বিভ্রান্ত ব্যক্তি মিথ্যাকে সত্যি মনে করে প্রচার করে। আল্লাহর বাণী প্রচার করতে গিয়ে অনেক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময় পার করতে হয়েছে নবি মুহাম্মাদকে। তিনি যদি বিভ্রান্ত হতেনই, তবে এসব ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতেন তাঁর বাণীর পেছনে।

তার ছেলে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয় শিশু বয়সেই। যেদিন সে মারা যায় সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আরবের অনেকে ভেবেছিল, বুঝি তাঁর ছেলের মৃত্যুর কারণে আজ সূর্যগ্রহণ হয়েছে। নবি যদি বিভ্রান্ত হতেন, নিজের দাবিকে জোরালো করার এমন মওকা তিনি হারাতেন না। কিন্তু মানুষের কথাকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন,

"কারও মৃত্যুর জন্য সূর্য ও চাঁদে গ্রহণ লাগে না। এ দুটো তো আল্লাহর দুই নিদর্শন। গ্রহণ হতে দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে সালাত পড়বে।"[৪০২]

তাঁর মৃত্যুর পরে মুসলিম জাতি কোন কোন ঘটনার সম্মুখীন হবে, এমন অনেক কিছু তিনি বলে গিয়েছেন জীবদ্দশায়। যেভাবে বলে গিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই হয়েছে সবকিছু। কোনো বিভ্রান্ত ব্যক্তির অপলপের সঙ্গে এগুলো একেবারেই মানানসই নয়। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি:

মোঙ্গলদের হানা

নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর মৃত্যুর প্রায় ৬০০ বছর পরে মুসলিম ভূমিতে হানা দেয় মোঙ্গল জাতি। চালায় নির্বিচার গণহত্যা। একেবারে তছনছ করে ফেলে বাগদাদ শহরকে। সে সময় শহরটি পরিচিত ছিল জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে। ১২৫৮ সালে বাগদাদে হানা দিয়ে সপ্তাহজুড়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মচ্ছব চালায় তারা। শহরটাকে তছনছ করে দিতে তারা যেন বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার বই স্রেফ নষ্ট করে ফেলেছিল তারা। হত্যা করেছে ১০ লাখের মতো মানুষ। ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম সংকটময় এক অধ্যায় এটা।

মোঙ্গলেরা ছিল অনারব। তাদের নাক ছিল চ্যাপটা, চোখ ছোট। তাদের জুতো তৈরি হতো চুল দিয়ে। তাদের জুতোর বাইরের অংশে ডেগতি নামে পশমের আচ্ছাদন থাকত। এত শত বছর পরের এই হামলার ঘটনা কত আগে বলে গিয়েছেন নবি মুহাম্মাদ ﷺ: "অনারবদের মধ্যে খুয ও কিরমানদের সঙ্গে লড়াই করার আগে কিয়ামাত ঘটবে না। ওদের চেহারা হবে লালা আভার। নাক চ্যাপটা, চোখ ছোট। ওদের মুখ দেখতে হবে সমতল ঢালের মতো। আর জুতোগুলো হবে চুলের।"[৪০৩]

সুউচ্চ দালান তৈরির প্রতিযোগিতা

এক লোক একবার নবি মুহাম্মাদ (সা.)-কে বললেন, "কিয়ামাত (কবে হবে সে) সম্বন্ধে বলুন।"

নবি ﷺ বললেন, "জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশি জানেন না।"

"আমাকে তা হলে এর কিছু আলামত বলুন।"

"যাদের পায়ে একসময় জুতো ছিল না, পোশাক-আশাকের ঠিকঠিকানা ছিল না, সেসব নিঃস্ব রাখালেরা উঁচু উঁচু দালান তৈরির প্রতিযোগিতায় নামবে।"[৪০৪]

ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তারিত জিনিসগুলো খেয়াল করুন। খালি পা, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব রাখাল শব্দগুলো দিয়ে নির্দিষ্ট একদল লোককে বোঝানো হয়েছে। ইসলামি জ্ঞানভান্ডারে এরা আরব বেদুইন নামে চিহ্নিত।[৪০৫] নবি ﷺ কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে সাধারণভাবে বললেই

পারতেন, উঁচু উঁচু দালান তৈরির প্রতিযোগিতা শুরু হবে। কথাটা তা হলে দুনিয়ার যেকারও বেলায় খাটানো যেত।

আজ আমরা দেখি আরব উপদ্বীপে, উট-ছাগলের দরিদ্র রাখালেরা উঁচু উঁচু দালান তৈরির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ৮২৮ মিটার উচ্চতার দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা বিশ্বের সবচে উঁচু দালান বর্তমানে।[৪০৬] এর নির্মাণ শেষ হওয়ার কিছুদিন বাদেই প্রতিদ্বন্দ্বী এক সাউদি পরিবার ঘোষণা করেছে, তারা ১০০০ মিটার উচ্চতার কিংডম টাওয়ার নির্মাণ করবে। ২০১৯ সাল নাগাদ এর কাজ শেষ হওয়ার কথা। কে কার চেয়ে উঁচু দালান বানাতে পারে, আক্ষরিক অর্থে তারা এই প্রতিযোগিতায় নেমেছে।[৪০৭]

এই তো, ৫০-৬০ বছর আগেও আরবের এই অঞ্চলগুলোতে দালানকোঠা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। এখানকার মানুষদের বেশির ভাগই ছিল বেদুইন। তাঁবু খাটিয়ে থাকত। গত শতকে তেলের খনি আবিষ্কারের সাথে সাথে ভোজবাজির মতো পাল্টে যায় এ অঞ্চলের চেহারা। তা না হলে হয়তো এখনো সেই সপ্তম শতকের মতো থেকে যেত অঞ্চলটি। বিষয়টা যদি স্রেফ তাঁর কোনো অনুমান-নির্ভর কথা হয়ে থাকে, তা হলে তেলের খনির আবিষ্কার এক বিশাল সৌভাগ্য বলতে হবে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ যদি অনুমানই করে থাকেন শুধু, তা হলে ওই সময়ে যে-রোম আর পারস্য জাতি ছিল পরাশক্তি, যারা কিনা তখনই বড় বড় দালানকোঠা বানাচ্ছিল, তাদের নিয়ে অনুমান করাটাই কি বেশি অর্থবহ হতো না?[৪০৮]

মাক্কায় কৃত্রিম সুড়ঙ্গ, পাহাড় ছাপিয়ে যাওয়া দালান

নবি মুহাম্মাদ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মাক্কায় একসময় সুড়ঙ্গ তৈরি করা হবে। এখানকার ভবনগুলো পাহাড়ের চূড়ো ছাড়িয়ে যাবে: "যখন দেখবে মাক্কায় সুড়ঙ্গ বানানো হয়েছে, এর ভবনগুলো এর পাহাড়ের উচ্চতা ছাড়িয়ে গেছে, বুঝবে সময় হয়ে গেছে।"[৪০৯]

২০১৮ সালে কেউ মাক্কায় গেলে, কিংবা অনলাইনে মাক্কার ছবি দেখলে বুঝবেন, এখানে এখন কত ভবন পাহাড় ছাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওপরের হাদিসটিতে 'সুড়ঙ্গ' বোঝাতে ব্যবহৃত আরবি শব্দটি দিয়ে এমন সুড়ঙ্গ বোঝায় যা দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি সরবরাহ করা হয়। নবি মুহাম্মাদের হাদিসের শব্দটি বর্তমানে মাক্কায় পানি সরবরাহের যেভূ-গর্ভস্থ লাইন আছে সেটা বোঝাতে পারে।

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে নবি মুহাম্মাদের। সেখান থেকে অল্প কয়েকটি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু আগেই সঠিক তথ্য দেওয়া কোনো বিভ্রান্তির লক্ষণ নয়। বরং এটা তার সত্যতার প্রমাণ।

তিনি যে বিভ্রান্ত ছিলেন না, তার পক্ষে অন্যতম শক্ত প্রমাণ তাঁর প্রচারিত শিক্ষা, চরিত্র এবং অভূতপূর্ব বৈশ্বিক প্রভাব। এ অধ্যায়ের পরের অংশ এগুলো সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

তিনি কি একই সাথে মিথ্যুক এবং বিভ্রান্ত ছিলেন?

কোনো ব্যক্তি একই সাথে মিথ্যুক আবার বিভ্রান্ত হতে পারেন না। মানুষ ইচ্ছে করে মিথ্যে বলে। অন্যদিকে বিভ্রান্ত ব্যক্তি ভুলটাকে সঠিক বলে মানে। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেকারণে নবি মুহাম্মাদের পক্ষে একই সাথে মিথ্যুক আবার বিভ্রান্ত হওয়া যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যে দাবি করবেন, সেটাকে আবার সত্য বলে বিশ্বাস করবেন—তা অসম্ভব।

তিনি সত্য বলেছেন

এযাবৎ করা আলোচনার সাপেক্ষে সবচে যৌক্তিক সিদ্ধান্তঃ নবি মুহাম্মাদ ﷺ সত্য বলেছেন। ইতিহাসবিদ ড. উইলিয়াম ড্র্যাপারের কথাতেও পাওয়া যায় তার প্রতিধ্বনিঃ "জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর ৪ বছরের মাথায় ৫৬৯ সালে আরবের মাক্কায় মানুষটির জন্ম। মানব জাতির ওপর তার সে কি অসামান্য প্রভাব... বেশ কিছু সম্রাজ্যের ধর্মীয় নেতা হওয়া, মানব জাতির এক-তৃতীয়াংশের নিত্যদিনের পথনির্দেশ দেওয়া সম্ভবত আল্লাহর বাণীবাহক খেতাবের ন্যায্যতা প্রমাণ করে।"[৪১০]

আপত্তি

কিংবদন্তি

নবি মুহাম্মাদের নবিত্বকে অস্বীকার করতে কেউ কেউ দাবি করেন তাঁর সম্বন্ধে পাওয়া সব বর্ণনাগুলো নিছক কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি। অর্থাৎ তারা বলতে চান, প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। তারা ইসলামের ইতিহাসকে বিশ্বাস করতে চান না। তারা বলেন, এগুলো অনির্ভরযোগ্য। স্বতন্ত্রভাবে এগুলো যাচাই করা যায় না।

'কিংবদন্তি' আপত্তিটা প্রথমত অসংগতিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, নবিজির জীবনীর উৎসগুলোর ঐতিহাসিক সত্যতা বিজ্ঞজনেরা কীভাবে নিশ্চিত করেছেন, সে সম্বন্ধে তাদের জানশোনার ঘাটতি উন্মোচন হয় এতে। ইতিহাস-সংরক্ষণে ইসলামি পদ্ধতির মূল উপাদান দুটিঃ ইসনাদ বা বর্ণনা পরম্পরা, এবং মৎন বা 'পাঠ'। বেশ কিছু কঠিন মানদণ্ডের নিরিখে বর্ণনাগুলোর সত্য-মিথ্যা যাচাই করা হয়। ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টি ইলমুল-হাদিস নামে পরিচিত। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে এই মানদণ্ড কতটা শক্তিশালী তা বোঝাতে এখানে সংক্ষেপে তা তুলে ধরছিঃ

বর্ণনা পরম্পরা নির্ভরযোগ্য হতে প্রত্যেক বর্ণনাকারী সম্বন্ধে অনেকগুলো যৌক্তিক মানদণ্ড পূরণ হতে হয়। যেমন:

- নাম, ডাকনাম, খেতাব, বাবা-মা'র নাম এবং বর্ণনাকারীর পেশা জানতে হবে।
- মূল বর্ণনাকারীকে বলতে হবে যে বর্ণনাটি সরাসরি তিনি শুনেছেন নবি মুহাম্মাদের কাছ থেকে।
- কোনো বর্ণনাকারী যদি অন্য কোনো বর্ণনাকারীর কথা উল্লেখ করেন, তাদের দুজনকেই তা হলে একই সময়ে জীবিত থাকতে হবে, এবং দুজনের মাঝে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- বর্ণনাটি শোনা ও বর্ণনা করার সময় বর্ণনাকারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে কথা বোঝা ও মনে রাখার সামর্থ্য থাকতে হবে।
- বর্ণনাকারীকে ধার্মিক ও পুণ্যবান মানুষ হিসেবে সুপরিচিত হতে হবে।
- তিনি কখনো মিথ্যে বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন বা অপরাধ করেছেন—এমন হতে পারবেন না।
- অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি কখনো কিছু বলেছেন—এমন হতে পারবে না।
- বর্ণনার পাঠ বা ভাষ্য গ্রহণযোগ্য হতে হলেও বেশ কিছু যৌক্তিক মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। যেমন:
- পাঠের ভাষা হতে হবে সহজ ও সরল। কারণ, নবি মুহাম্মাদ ﷺ এভাবেই কথা বলতেন।
- কোনো পাঠে যদি এমন কোনো কাজের কথা বলা থাকে, যা সাধারণত অন্যদের জানা থাকা ও চর্চা করার কথা, কিন্তু দেখা যায় যে অন্যরা জানেন না, চর্চা করেন না, তা হলে সেই পাঠ বাতিল।
- কুরআনের মৌলিক শিক্ষা-বিরোধী কিছু থাকলে তা বাতিল।
- কোনো প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে বেমানান হলে তা বাতিল।[৪১১]

ভ্রান্ত যুক্তি

নবিজির নবিত্ব অস্বীকার করতে বেশ হাস্যকর একটা যুক্তি দাঁড় করানো হয়। বলা হয়, নীতিনৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে নবি মুহাম্মাদ ﷺ মিথ্যা বলেননি। বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নবি বলে দাবি করেছিলেন তিনি। অনৈতিক ও অবক্ষয়ী সমাজকে বদলানোর জন্য সমাজ-সংস্কারক হিসেবে তিনি মনে করেছিলেন

এমন আমূল দাবিই করতে হবে তাঁকে। তার মানে তিনি জেনেবুঝে মিথ্যে বলেছিলেন। সেকারণে তিনি বিভ্রান্ত নন। নৈতিকভাবে তিনি মিথ্যে কথাও বলেননি। অন্য আর দশজন সংস্কারকের মতো বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে তাকে দুটো খারাপের মাঝে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটাকে বেছে নিতে হয়েছে।

আপত্তিটা যেমন বেশ হাস্যকর তেমনই অবাস্তব। প্রয়োজনীয় নৈতিক পরিবর্তন আনতে নবিত্বের দাবি করতে হবে, এমন কথা অযৌক্তিক। তাঁকে তো বরং এই বাণী-প্রচারের কারণে প্রথম দিকে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেতে বেগ পেতে হয়েছে। হাসিতামাশা, গালাগালের পাত্র হতে হয়েছে। কোনো সংস্কারককে যদি তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে এমন কোনো কথা বলতে হয়, যা তার চলার পথকে আরও কঠিন করে তুলবে, তিনি তো তা হলে চাইবেন অমন কথা না বলতে। দ্বিতীয়ত, নবি মুহাম্মাদ অনেক কষ্ট পুহিয়েছেন। তারপরও আপস করেননি তাঁর বাণী-প্রচারে। তাকে কিন্তু শর্তভিত্তিক রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। তার মানে, ক্ষমতায় বসে চাইলেই তিনি তাঁর সংস্কার-চিন্তা বাস্তবায়ন করতে পারতেন অনায়াসে। কিন্তু তিনি রাজি হননি এই প্রস্তাবে। কারণ, তা হলে তাঁকে আল্লাহর একত্বের প্রতি আহ্বান করা ছাড়তে হতো (দেখুন অধ্যায় ১৫)। তিনি যদি সমাজ-সংস্কারকই হতেন, তবে নিজের কৌশল সংশোধন করতেন তিনি। কিন্তু তিনি তা করেননি।

নবিজির প্রচারিত শিক্ষা, তাঁর চরিত্র ও প্রভাব

কোনো মিথ্যাবাদী বা বিভ্রান্ত লোক যেধরনের কথাবার্তা প্রচার করে, নবি মুহাম্মাদের প্রচারিত শিক্ষায় তা পাওয়া যায় না। তিনি যেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, তার মাঝে আছে মমতা, দরদ, বিনয়, শান্তি, ভালোবাসা। তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন কীভাবে অন্যের উপকার করতে হয়, অন্যের সেবা করতে হয়। তিনি ছিলেন নির্মল চরিত্রের অধিকারী। মানবীয় গুণের চূড়ায় ছিল তাঁর অবস্থান। তিনি ছিলেন মমতাবান, বিনয়ী, সহিষ্ণু, ন্যায়পর। অসামান্য ধৈর্য, ধার্মিকতা আর মানবতাগুণে দীপ্তিমান ছিলেন তিনি। তাঁর পথনির্দেশের অভূতপূর্ব প্রভাব দিগ্‌বিজয়ী। তাঁর নেতৃত্ব এবং সহনশীলতা, ন্যায়বিচার, অগ্রগতি, বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং তাঁর জীবনের অন্যান্য অনেক দিক থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি বিভ্রান্ত কেউ ছিলেন না; বরং ছিলেন সৎ মানুষ।

গোটা বিশ্ববাসীর প্রতি তিনি ছিলেন দয়াস্বরূপ। অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে তুলতে ঐশীবাণী পাওয়া মহৎ এক মানুষ। তাঁর অনুপম চরিত্র আর প্রচারিত শিক্ষা থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এগুলোর। আমি এখন তাঁর অনাবিল চরিত্র আর প্রচারিত শিক্ষার কিছু নমুনা মেলে ধরছি আপনাদের সামনে। উদাহরণগুলো নিজেই কথা বলবে তাঁর হয়ে। যত বেশি আমরা তাঁর অমৃত বচনগুলো নিয়ে পড়াশোনা করব, ভাবনাচিন্তা

করব, তত বেশি আমরা অনুভব করব তাঁর প্রতি ভালোবাসা। সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারব তাঁকে।

দয়া-দরদ

> "অন্যের প্রতি যে দয়া দেখায়, সবচে দয়াময় আল্লাহ তাঁকেই দয়া করেন। জমিনের বুকে সবার প্রতি দয়া দেখাও। ওই আকাশে যিনি আছেন, তিনিও তোমাদের দয়া করবেন।"[৪১২]
>
> "আল্লাহ দরদি। দরদকে তিনি ভালোবাসেন।"[৪১৩]
>
> "ছোটদের প্রতি যার স্নেহ নেই, বড়দের প্রতি যার সম্মান নেই, সে আমাদের কেউ নয়।"[৪১৪]
>
> "বেচাকেনার সময় এবং পাওনা চাওয়ার বেলায় যে-লোক সদয় আচরণ করে, আল্লাহ যেন তার প্রতিও সদয় আচরণ করেন।"[৪১৫]

তৃপ্তি-আধ্যাত্মিকতা

> "সয়সম্পদ অঢেল থাকা মানেই সম্পদশালী হওয়া না। মনের সম্পদই সত্যিকার সম্পদ।"[৪১৬]
>
> "আল্লাহ তোমাদের শরীর বা পোশাক-আশাক দেখেন না। তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর আর তোমাদের কাজকর্ম।"[৪১৭]
>
> "আল্লাহকে স্মরণে না রেখে বেশি কথা বলবে না। আল্লাহর স্মরণ ছাড়া বেশি কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আল্লাহ থেকে যারা যত বেশি দূরে, তাদের অন্তর তত বেশি কঠিন।"[৪১৮]
>
> "আল্লাহর ব্যাপারে সতর্ক হও। তাঁকে তোমার সামনে পাবে। সুসময়ে তুমি তাঁকে চিনলে দুঃসময়ে তিনি তোমাকে চিনবেন। মনে রাখবে, যে বিপদ আসেনি, তা কখনো তোমার ওপর আসার কথা ছিল না। আর কোনো কোনো বিপদ যদি তোমার ওপর অবধারিত থাকে, তা হলে সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। আরেকটা ব্যাপার মনে রাখবে, ধৈর্যের সাথে বিজয় আসে, যন্ত্রণার সাথে স্বস্তি আসে, আর কষ্টের সাথে সুখ আসে।"[৪১৯]
>
> "পাঁচটি (স্তম্ভের) ওপর গড়ে উঠেছে ইসলামের ভিত্তি: আল্লাহ বাদে আর কোনো কিছু উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়, এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বাণীবাহক—এই সাক্ষ্য, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, আল্লাহর ঘরে হাজ্জ এবং রামাদানের সিয়াম।"[৪২০]
>
> "সুমহান আল্লাহ বলেছেন, 'আদাম-সন্তান, তোমরা যতক্ষণ আমার কাছে দু'আ করো, আমার ক্ষমার আশা করো—যে অপরাধই করো না কেন—আমি

ততক্ষণ তোমাদের ক্ষমা করে যাই। আদাম-সন্তান, তোমাদের অপরাধ যদি আকাশ-সমান উঁচু হয়, আর তারপরও তোমরা আমার ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করে দেব। আদাম-সন্তান, পৃথিবী-ভরা অপরাধ নিয়ে যদি আমার কাছে হাজির হও, কিন্তু আমার সঙ্গে কাউকে শরিক না করো, আমি তবে পৃথিবী-ভরা ক্ষমা দিয়ে এর প্রতিদান দেব।"[৪২১]

"আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমাকে যেমন ভাবে আমি তেমন। সে যখন আমার কথা স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি নিজে নিজে আমাকে স্মরণ করে, আমিও নিজে নিজে তার কথা মনে করি। সে যদি কোনো সভায় আমাকে স্মরণ করে, আমি তারচেয়েও ভালো সভায় তার কথা উল্লেখ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে এলে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি এক হাত এগোয়, আমি দুহাত এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে হেঁটে এলে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই'।"[৪২২]

ভালোবাসা

"যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। একে অপরকে ভালো না বাসা পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না। কী করলে তোমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে বলব? তোমাদের মাঝে ব্যাপকভাবে সালাম ছড়িয়ে দাও।"[৪২৩]

"আল্লাহর বান্দা যা কিছু নিজের জন্য ভালোবাসে, তা অন্যের জন্যও ভালো না বাসা পর্যন্ত ঈমানের পূর্ণতার স্তরে পৌঁছাতে পারবে না।"[৪২৪]

"নিজের জন্য যা ভালোবাসো, অন্যের জন্যও তা ভালোবাসো—খাঁটি ঈমানদার হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ করো—মুসলিম হবে।"[৪২৫]

"আগেকার জাতির হিংসা ও ঘৃণা-রোগ জেঁকে বসেছে তোমাদের ওপর। ঘৃণা ক্ষুরের মতো। এটা চুল কামায় না, ধর্মকে কামিয়ে ফেলে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, পরস্পরকে ভালো না বাসলে তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না। কী করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে বলব? নিজেদের মাঝে সালাম ছড়িয়ে দাও।"[৪২৬]

"কেউ নিজের জন্য যা ভালোবাসে, অন্যের জন্যও তা ভালো না বাসা পর্যন্ত সে পূর্ণ বিশ্বাসী না।"[৪২৭]

"কেউ যদি তার কোনো ভাইকে ভালোবাসে, তা হলে তাকে তার ভালোবাসার ব্যাপারটি জানানো উচিত।"[৪২৮]

> “নিজের জন্য যা ভালোবাসো, জগদ্বাসীর জন্যও তা ভালোবাসো।”[৪২৯]
>
> “আল্লাহকে বিশ্বাসের পর সবচে ভালো কাজ অন্যের প্রতি মমতামাখা ভালোবাসা।”[৪৩০]

জনসমাজ ও শান্তি

কেউ একজন নবি মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলেন, “ইসলামে কোন ধরনের কাজ বা আচরণ সেরা?” তিনি বললেন, “অন্যকে খাওয়ানো। চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেওয়া।”[৪৩১]

> “মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব নিরসনে যে বানিয়ে বানিয়ে কোনো ভালো খবর দেয় বা বানানো ভালো কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী নয়।”[৪৩২]
>
> “মানুষের প্রতি যে কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।”[৪৩৩]
>
> “আল্লাহর কসম, সে [পূর্ণ] বিশ্বাসী নয়! আল্লাহর কসম, সে [পূর্ণ] বিশ্বাসী নয়! আল্লাহর কসম, সে [পূর্ণ] বিশ্বাসী নয়!” একজন জানতে চাইলেন, “কে, আল্লাহর রাসূল?” তিনি বললেন, “যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।”[৪৩৪]
>
> “সব মানুষ আদাম-হাওয়ার সন্তান। ধার্মিকতা এবং ভালো কাজের মানদণ্ড বাদে কোনো অনারব কোনো আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়; কোনো আরবও কোনো অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। [এই মানদণ্ড বাদে] কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের চেয়ে কিংবা কোনো শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।”[৪৩৫]
>
> “প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে যে পেট ভরে খায়, সে [পূর্ণ] বিশ্বাসী নয়।”[৪৩৬]
>
> “আল্লাহ বলেছেন, ‘দান করো, আদাম-সন্তান। আমি তোমাদের দান করব।’”[৪৩৭]
>
> “দান করলে সম্পদ কমে না।”[৪৩৮]
>
> “রোগীকে দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, দাসদের মুক্ত করো।”[৪৩৯]
>
> “সহজ করো; কঠিন কোরো না। সুখবর দাও। লোকে দূরে সরে যায় এমন কিছু কোরো না।”[৪৪০]
>
> “ঘাম শুকানোর আগে শ্রমিককে পারিশ্রমিক দাও।”[৪৪১]
>
> “প্রত্যেক ভালো কাজ [এক ধরনের] দান।”[৪৪২]

চরিত্র, আচার-আচরণ

> “বিশ্বাসীদের মাঝে যাদের চরিত্র সবচে ভালো, তাদের ঈমনাই সবচে নিখাদ।

যে-তার স্ত্রীর কাছে সেরা, তোমাদের মাঝে সে-ই সেরা।”[৪৪৩]

“কেউ যেন অন্যের ওপর অত্যাচার না করে। [আল্লাহ] সেজন্য আমাকে বলতে বলেছেন, তোমাদের বিনয়ী হতে।”[৪৪৪]

“ক্ষোভ ধরে রাখবে না, [আত্মীয়তার সম্পর্ক] ছিন্ন করবে না। শত্রুতা পোষণ করবে না। ভাই-ভাই হয়ে বাস করো। আল্লাহর দাস হও।”[৪৪৫]

“আল্লাহ ও শেষ দিনে যে বিশ্বাস করে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।”[৪৪৬]

“যার আচরণ ভালো, তোমাদের মাঝে সে-ই সেরা।”[৪৪৭]

“সন্দেহ করার ব্যাপারে সাবধান। এটা সবচে জঘন্য মিথ্যা।”[৪৪৮]

“কুস্তিতে শক্তিশালী ব্যক্তি আসল পালোয়ান নয়। নিজের রাগ যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে-ই সত্যিকার পালোয়ান।”[৪৪৯]

পরিবেশ, পশুপাখি

“যদি কিয়ামাত হওয়ার উপক্রমও হয়, আর তখন তোমাদের কারও হাতে একটা গাছের চারা থাকে, তা হলে গাছটি লাগিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করো।”[৪৫০]

“কোনো মুসলিম যদি গাছ লাগায় বা চারা রোপণ করে, আর তা থেকে কোনো পাখি, বা মানুষ বা কোনো পশু খায়, তবে এটা তার তরফ থেকে দান বলে ধরা হবে।”[৪৫১]

“রাস্তা থেকে ক্ষতিকারক কিছু সরানো এক ধরনের দান।”[৪৫২]

সাহাবিরা নবি মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলেন, “আল্লাহর রাসূল, পশুপাখিকে আদরযত্ন করলে কি আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে?” তিনি বললেন, “যেকোনো প্রাণসত্তাকে আদরযত্ন করলেই পুরস্কার আছে।”[৪৫৩]

“চড়ুই, কিংবা এরচে বড় কিছু কেউ যদি ন্যায্য কারণ ছাড়া মেরে ফেলা হয়, বিচারদিনে আল্লাহ তার কৈফিয়ত নেবেন।”[৪৫৪]

“এক খর রোদের দিনে একজন পতিতা দেখলেন, একটা কুকুর পানির পিপাসায় জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। তিনি তার জুতোয় করে ওর জন্য পানি নিলেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এজন্য।”[৪৫৫]

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস একদিন উযূ করছিলেন। এমন সময় নবি ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “অপচয় হচ্ছে কেন?”

সা'দ বললেন, “উযূতেও কি অপচয় আছে?”

নবিজি ﷺ বললেন, “আছে—এমনকি বহতা নদীতে থাকলেও।”[৪৫৬]

নবি মুহাম্মাদের চারিত্রিক গুণাবলি সম্বন্ধে কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যাবে নিচের বর্ণনাগুলোতে:

সহনশীলতা, ক্ষমা, দরদ

অমুসলিম শত্রুদের সঙ্গে এক যুদ্ধে তাঁর অধীনে লড়ছিল মুসলিম বাহিনী। সেই লড়াইয়ে তাঁর একটি দাঁত ভেঙে যায়। মুখে আঘাত পেয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করে। তাঁর সঙ্গী-সাথিরা বললেন হামলাকারীদের অভিশাপ দিতে। কিন্তু তিনি বললেন, "অভিশাপ দিতে আমাকে পাঠানো হয়নি। আমাকে পাঠানো হয়েছে একজন আহ্বানকারী এবং দয়া হিসেবে। আল্লাহ, আমার লোকদের দিশা দিন; তারা যে জানে না।"[৪৫৭]

আনাস বিন মালিক বলেছেন, "দশ বছর যাবৎ আমি নবিজির সেবা করেছি। কক্ষনো তিনি আমার প্রতি বিরক্তিসূচক কিছু বলেননি। আমার কোনো কাজ নিয়ে কখনো বলেননি, 'এটা করলে কেন?' কিংবা কোনো কাজ না করলে কখনো বলেননি, 'এটা করলে না কেন?'"[৪৫৮]

আরেকদিনের ঘটনা। আনাস বলছেন, "নবি ﷺ একদিন খুব মোটা এক জোব্বা পরে ছিলেন। আমি সেদিন তাঁর সাথে ছিলাম। এক বেদুইন এসে তাঁর জোব্বাটা ধরে জোরে টানাহেঁচড়া করতে লাগল। সে এত জোরে টানছিল যে নবিজির কাঁধের পাশে দাগ পড়ে যায়। লোকটা বলল, 'মুহাম্মাদ, আপনার কাছে আল্লাহর যে-সম্পদ আছে তা দিয়ে আমার এই দুটো উট বোঝাই করে দিন। আপনার বা আপনার বাবার সম্পত্তি থেকে আমাকে বোঝাই করতে দেবে না।'

নবি ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার সাথে তুমি যা করলে, আমি এর প্রতিশোধ নেব?'

'না।'

'কেন?'

'খারাপ কাজের বদলা আপনি খারাপভাবে নেন না, তাই।'

লোকটার কথা শুনে নবিজি হেসে ফেললেন। আদেশ করলেন লোকটার একটা উট যব আর অন্য উট খেজুর দিয়ে বোঝাই করে দিতে।'"[৪৫৯]

একবার এক লোক নবিজিকে খপ করে ধরে তার পাওনা চাচ্ছিল। খুব খারাপ আচরণ করছিল লোকটা। নবিজির সঙ্গী-সাথিরা তাঁর পাশেই ছিলেন। লোকটাকে তারা ধমকি দিচ্ছিলেন। কিন্তু নবিজি ﷺ বললেন, "তোমাদের থেকে তার এবং আমার অন্য

কিছুর প্রয়োজন ছিল। আমাকে ভালোভাবে পাওনা পরিশোধ করতে বলো। আর তাকে ভালোভাবে পাওনা চাইতে বলো।"

নবি ﷺ তার দেনা শোধ করে কিছু বাড়তিও দিলেন। কারণ, তাঁর সঙ্গী-সাথিরা দুর্ব্যবহার করেছিলেন লোকটির সাথে। এর অনেক দিন পরে লোকটি ইসলাম বরণ করেন। তার নাম ছিল যাইদ বিন সা'না। ঘটনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নবিত্বের এমন দুটো নিদর্শন বাকি ছিল, যা আমি মুহাম্মাদের মধ্যে খেয়াল করিনি। বদমেজাজি স্বভাবের বদলে সংযম। এবং কারও থেকে অজমূর্খ আচরণ প্রকাশ পেলে তার সেই সংযম-গুণ আরও বেড়ে যাওয়া। আমি তাকে এজন্য পরীক্ষা করেছিলাম। তাকে যেভাবে বর্ণনা করা হয় আমি তাকে সেভাবে পেয়েছি।"[৪৬০]

শিশুদের প্রতি নবি মুহাম্মাদের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে আনাস বিন মালিক ﵁ বলেছেন, "আল্লাহর রাসূলের চেয়ে আর কারও মাঝে আমি শিশুদের প্রতি এত ভালোবাসা দেখিনি।"[৪৬১]

নবিজির অনেক সঙ্গী-সাথিদের নির্বিচারে হত্যা করেছে অমুসলিম শত্রুরা। চালিয়েছে অমানসিক নির্যাতন। খোদ নবিকেও তারা বর্জন করে রেখেছিল। গালমন্দ তো করেছেই। কতদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে আল্লাহর রাসূলকে। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী-সাথিদের ভোগ করতে হয়েছে অনেক অন্যায়-অবিচার। অথচ তারপরও যেদিন একেবারে বিনাযুদ্ধে মাক্কা জয় করলেন, গুটিকয় কুখ্যাত শত্রুদের বাদে, বাকি সবার জন্য ঘোষণা করলেন সার্বজনীন ক্ষমা। দিনটিকে তিনি বললেন, "ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা আর আনুগত্যের" দিন।[৪৬২]

ভাবভঙ্গি, অমায়িকতা

'আবদুল্লাহ বিন হারিস বলেছেন, "আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বেশি হাসিখুশি কাউকে দেখিনি আমি।"[৪৬৩]

বারা' বিন 'আযিব বলেছেন, "আল্লাহর রাসূল ছিলেন সবচে সুদর্শন পুরুষ। তাঁর ভাবভঙ্গি ছিল সবার সেরা।"[৪৬৪]

জাবির বিন সামুরা বলেছেন, "এক পূর্ণিমার রাতে আল্লাহর রাসূলকে দেখলাম লাল এক পোশাক পরে আছেন। আমি একবার তাঁর দিকে তাকালাম, একবার চাঁদের দিকে। আমার কাছে তাঁকে চাঁদের চেয়েও সুন্দর লাগছিল।"[৪৬৫]

'আলি বিন আবু তালিব বলেছেন, "তাঁকে যারা হঠাৎ দেখেছে, সসম্ভ্রমে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ত। তাঁর কাছের মানুষেরা প্রচণ্ড ভালোবাসত তাঁকে। তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে লোকে বলত, তাঁর আগে বা এখন পর্যন্ত তাঁর মতো কাউকে দেখেনি তারা।"[৪৬৬]

নবি ﷺ দেখতে কেমন ছিলেন উম্মু মা'বাদ খুযা'ই সেটা তার স্বামীর কাছে বলেছেন এভাবে:

> "তিনি কোমনীয় ফর্সা, মুখটা প্রশস্ত। আচার-আচরণ মার্জিত। তাঁর ভুঁড়ি অন্য অনেকের মতো বের হয়ে নেই। মাথায় টাক নেই। চোখজোড়া কালো, আর সুন্দর বাঁকানো জোড়া ভ্রু। চুল উজ্জ্বল ও কালো, ঢেউ খেলানো। পরনে ছিল লম্বা পোশাক। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে বেশ আভিজাত্যের ছাপ পাওয়া যায়। তার মাথার গড়ন ছিল সুষম। সুগঠিত এবং সরু গলার ওপর বসে ছিল সেটা। তাঁর প্রকৃতি চিন্তামগ্ন, প্রশান্ত, গাম্ভীর্যপূর্ণ। দূর থেকে অপরিচিতরা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়। অন্তরঙ্গ হলে সেই মুগ্ধতা রূপ নেয় অনুরাগ আর শ্রদ্ধায়। তাঁর ভাবলেশ খুবই মিষ্টি এবং অন্য রকম। তাঁর কথাবার্তা মার্জিত, কোনো অতিরঞ্জন নেই, যেন মালায় গাঁথা মুক্তো। খুব লম্বা নন, আবার বেটেও নন... সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকেন তাঁর সঙ্গী-সাথিরা। তিনি কথা বলতে শুরু করলে শ্রোতারা মোহাবিষ্ট হয়ে শুনতে থাকে তাঁর কথা। তিনি কোনো আদেশ দিলে, সেটা পালনে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয় সবাই। তিনি ছিলেন নেতা, অভিজাত। তাঁর কথাবার্তায় থাকত সত্য আর নিষ্ঠার ছাপ—যাবতীয় মিথ্যা থেকে মুক্ত।"[৪৬৭]

বিনয় ও শালীনতা

নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন,

> "খ্রিষ্টানরা যেভাবে মারইয়াম-পুত্রের অতিরিক্ত প্রশংসা করে, সেভাবে আমার স্তুতি গাইবে না। আমি একজন দাস মাত্র। আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলেই ডাকো।"[৪৬৮]

নবিজির স্ত্রীকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহর রাসূল যখন বাড়িতে থাকেন, কী করেন?"

তিনি বললেন, "অন্য আর দশটা মানুষের মতোই। তাঁর পোশাকআশাক পরিষ্কার করেন, সেলাই করেন। ছাগলের দুধ দোহান। জুতো মেরামত করেন। নিজের কাজ নিজে করেন। পরিবারের কাজেও সাহায্য করেন। এরপর আযান শুনলে বেরিয়ে যান।"[৪৬৯]

নিজের সীমাবদ্ধতা ফুটিয়ে নবি ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদের মতোই মানুষ মাত্র। [দুনিয়াবি বিষয়ে] তোমাদের মতো আমিও ভুল-প্রবণ।"[৪৭০]

একবার এক লোকে তাঁকে দেখে ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। লোকটিকে তিনি বললেন, "শান্ত হও। আমি কোনো রাজা-মহারাজা নই। আমি এক কুরাইশ নারীর সন্তান, একসময় যারা শুকনো মাংস খেত।"[৪৭১]

আল্লাহর কাছে তিনি ফরিয়াদ জানাতেন, "আল্লাহ, আমাকে বিনীতভাবে বাঁচান, বিনীতভাবে মৃত্যু দিন। পুনরুত্থানের দিনে আমাকে বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"[৪৭২]

আবু সা'ঈদ খুদরি ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাসূলকে আমি দেখেছি কাদাপানিতে সিজদা দিতে। তাঁর কপালে আমি কাদা লেগে থাকতে দেখেছি।"[৪৭৩]

আনাস ﷺ বলেছেন, "নবিকে কখনো কখনো যবের রুটি আর বিস্বাদ চর্বি খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হতো। তিনি তা কবুল করতেন।"[৪৭৪]

উম্মুল মু'মিনিন 'আয়িশা ﷺ বলেন, "আমাদের ঘরে কখনো কখনো এক মাস ধরে চুলো জ্বলত না। শুধু পানি আর খেজুর খেয়ে বাঁচতাম।"[৪৭৫]

পৃথিবীতে নবি মুহাম্মাদের প্রভাব

সত্যিকার অর্থেই গোটা মানবজাতির প্রতি এক দয়ানিধি ছিলেন নবি মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর বার্তা এবং প্রচারিত শিক্ষা তো আছেই, সাথে সমগ্র বিশ্বে তাঁর যে-প্রভাব তা থেকেও বোঝা যায় বিষয়টি। সুবিচার এবং দরদ—এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ কারণে সামাজিক পর্যায়ে তাঁর প্রচারিত শিক্ষার প্রভাব ছিল বেশ যুগান্তকারী।

দরদ ও সুবিচার ইসলামের অন্যতম দুটো মূল্যবোধ। এক-আল্লাহর-অস্তিত্বে আন্তরিক বিশ্বাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ 'ইবাদাতের মাধ্যমে প্রকাশ পায় সেটা। কেবল তাঁর 'ইবাদাত করে, এবং নিজের জবাবদিহি সম্বন্ধে সচেতন থেকে, একজন মুসলিম দরদিপূর্ণ সুবিচারমূলক জীবনযাপনে উৎসাহী হয়। কুরআনে পরিষ্কার বলা আছে:

> "বিশ্বাসীরা, আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকো। সুবিচার সমর্থন করো—অন্যের শত্রুতা যেন তোমাদের অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করো। এটা আল্লাহভীরুতার কাছাকাছি। আল্লাহর প্রতি সচেতন হও। তোমাদের সব কর্মকাণ্ড তিনি জানেন।"[৪৭৬]

> "বিশ্বাসীরা, ন্যায়ের জন্য আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াও—এমনকি তা যদি তোমার নিজের, তোমার বাবা-মা, কাছের আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়। কেউ ধনী হোক কি গরিব, আল্লাহ সবারই সর্বোচ্চ দেখভাল করতে সক্ষম। ন্যায্য বিচার বাদ দিয়ে কামনার অনুসরণ থেকে বিরত থাকো। যদি সুবিচারকে উপেক্ষা করো বা বিকৃত করে, তা হলে জেনে রাখো, তোমরা কী করো না করো তা আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন।"[৪৭৭]

> "কী সেই ঢালু পথ জানো? দাস মুক্ত করা, ক্ষুধাতুর কাছের এতিম আত্মীয় বা দুঃখ-জর্জরিত গরিবকে খাওয়ানো এবং যারা বিশ্বাস করে ও একে অপরকে অবিচলতা ও সহমর্মিতার উৎসাহ দেয় তাদের মতো হওয়া।"[৪৭৮]

সহনশীলতা, সহাবস্থান

এই অসাধারণ দুটো গুণের চর্চা করে ইতিহাসে অনুপম এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল মুসলিমেরা। গোটা ইউরোপ যখন জাতি-সংঘাত, বর্ণবাদ আর ঘৃণায় জর্জরিত, নবি মুহাম্মাদের প্রচারিত শিক্ষা তখন ছিল ভরা চাঁদের আলোর মতো। মাদীনা চুক্তিতে ইহুদি ও খ্রিষ্টান সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে বলা ছিল, "আমাদের সঙ্গে যেসব ইহুদিরা সমঝোতায় এসেছে, তাদের সহায়তা করা, তাদের প্রতি সহমর্মী হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক। তাদের ওপর কোনো ধরনের অত্যাচার করা যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদের কোনোরূপ সহায়তা করা যাবে না।"[৪৭৯]

ইতিহাসবিদ ক্যারেন আর্মস্ট্রং দেখিয়েছেন, নবি মুহাম্মাদের মূল্যবোধ নজিরবিহীন সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছিল: "মুসলিমরা এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল—ইহুদি-খ্রিষ্টান-মুসলিমেরা প্রথমবারের মতো জেরুজালেমে একসাথে বাস করেছিল।[৪৮০]

জনপ্রিয় ইহুদি ইতিহাসবিদ অ্যামনন কোহেন ইসলামি মূল্যবোধের বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছেন। উসমানি খিলাফাতের সময় ইহুদিরা কতটা স্বাধীন ছিল, সমাজে তারা কেমন ভূমিকা রেখেছিল, সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

> "কেউ তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় কিংবা বাহ্যিক সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করেননি... ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে উসমানি খিলাফাতের সময় জেরুজালেমের ইহুদিরা ধর্মীয় ও প্রশাসনিক দিক থেকে পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করেছেন। স্থানীয় অর্থনীতি এবং সমাজের গঠনমূলক ও গতিশীল উপাদান হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগও ছিল তাদের। এবং সেটা তারা করেছেনও।"[৪৮১]

নবি মুহাম্মাদের অন্যতম সাহাবি এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, উমার ইবনুল-খাত্তাব ফিলিস্তিনি খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নিশ্চিত করেছিলেন তাদের নিরাপত্তা ও শান্তি। ফিলিস্তিনি খ্রিষ্টানদের সাথে করা তার চুক্তিতে উল্লেখ ছিল:

> "ফিলিস্তিনি জনবাসীদের এই প্রতিরক্ষা দিচ্ছেন আল্লাহর বান্দা, বিশ্বাসীদের নেতা। এই প্রতিরক্ষা তাদের জীবন, সম্পদ, গির্জা ও ক্রুশের জন্য। সুস্থ, অসুস্থ এবং তাদের সব সহ-ধর্মীর জন্য। এর ফলে তাদের গির্জাগুলো বসতবাড়িতে পরিণত হবে না। সেগুলো ভেঙে ফেলা হবে না। এগুলো কিংবা এগুলোর আশেপাশে কোনো ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি করা হবে না। ক্রুশও অক্ষত রাখা হবে। তাদের সম্পদ থেকে কিছু ছিনিয়েও নেওয়া হবে না। তাদের ধর্মীয় উৎসবে কোনো বাধা দেওয়া হবে না।"[৪৮২]

মুসলিমরা যে তাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদের মূল্যবোধ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন, ৮৬৯ সালে জেরুজালেমের বিশপ থিডোসিয়াসের এক বক্তব্য থেকে এর প্রমাণ পাওয়া

যায়: "ক্রুসেডকালীন মুসলিমেরা আমাদের সঙ্গে বেশ সদ্ভাব দেখিয়েছে। তারা আমাদের গির্জা বানাতে দিচ্ছে। আমাদের ধর্মকর্ম পালনে কোনো বাধা দিচ্ছে না।"[৪৮৩]

ওপরের ঘটনাগুলো ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন কিছু বিবৃতি নয়। সহনশীলতা ও দয়ার ব্যাপারে নবিজির কালজয়ী মূল্যবোধের জমিন থেকে এসব মহীরুহ গড়েছিলেন মুসলিমেরা।

নিরাপত্তা সুরক্ষা

সংখ্যালঘু, প্রবাসী এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে ৭ম শতকে ইউরোপ ছিল অন্ধকারে। অন্যদিকে নবি মুহাম্মাদের প্রচারিত বাণীতে তখন ছিল সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির নিশ্চয়তা:

> "চুক্তিবদ্ধ কাউকে যে ক্ষতি করবে, সাধ্যের অতীত করের বোঝা চাপাবে, বিচারের দিন আমি তার বিরুদ্ধে লড়ব।"[৪৮৪]

> "নিরাপত্তার অধীনে থাকা কোনো অমুসলিমকে যে কষ্ট দেয়, সে আমাকেই কষ্ট দেয়।"[৪৮৫]

নবিজির প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে ত্রয়োদশ শতকের বিচারপতি কারাফি লিখেছেন:

> "মুসলিমদের অধীনে থাকা অমুসলিমদের প্রতি নিরাপত্তা চুক্তি আমাদের ওপর আরোপ করে কিছু বাধ্যবাধকতা। তারা আমাদের প্রতিবেশী। আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার নিশ্চয়তার ভিত্তিতে তারা আমাদের আশ্রয় ও সুরক্ষায় আছেন। সামান্য একটা অপমানজনক কথা বলে, বা কারও সুনামহানি করে, কিংবা কাউকে সামান্যতম ক্ষতি করে বা ক্ষতি করতে সাহায্য করে কেউ যদি এই বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেন, তিনি তবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার নিরাপত্তা ভাঙলেন।"[৪৮৬]

ইতিহাস যখনই নবিজির প্রচারিত শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পেয়েছে নিরাপত্তা ও শান্তি। তারা প্রশংসা করেছে মুসলিম শাসকদের। মু'তাযের শাসনামলে (৮৬৬-৮৬৯) তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী বার্নার্ড সফর করেছিলেন মিশর ও ফিলিস্তিনে। সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন:

> "খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকেরা [মুসলিমদের অধীনে] এমন শান্তিপূর্ণভাবে আছে—আমি যদি কোনো সফরে বের হই, আর আমার মালপত্তর বহনকারী উট বা গাধাটি যদি পথে মারা যায়, আমি যদি তখন আমার মালপত্তর কারও হেফাজতে না রেখে শহরে আসি অন্য একটা সওয়ার খুঁজে নিতে, এসে দেখব আমার মালামালের একটাও খোয়া যায়নি। এমনই শান্তিময় পরিবেশই বিরাজ করছে সেখানে।"[৪৮৭]

ইসলামি মূল্যবোধের অভূতপূর্ব প্রভাবের ফলে মানুষ চেয়েছে ইসলামের দয়াগুণ আর সহনশীলতার আবরণে মোড়া থাকতে। এককালের-ইসলামি-স্পেন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ রিনহার্ট ডোজি এ সম্বন্ধে বলছেন,

> "...আরবদের অপরিসীম সহনশীল গুণের কথায় বিবেচনায় রাখতে হবে। ধর্মীয় বিষয়ে তারা কারও ওপর কোনো চাপাচাপি করে না... ফ্র্যাঙ্কদের চেয়ে খ্রিষ্টানেরা তাদের শাসনই পছন্দ করে।"[৪৮৮]

অধ্যাপক থমাস আর্নল্ড বলেছেন, খ্রিষ্টানেরা ইসলামের কারণে এত সুখে-শান্তিতে ছিল যে, তারা "মুসলিম শাসকদের জন্য কল্যাণের দু'আ করতেন।"[৪৮৯]

ধর্মীয় স্বাধীনতা

সপ্তম শতকে নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস স্বাধীনভাবে চর্চার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি কোথাও পাওয়া যেত না। অথচ ঠিক ওই সময়েই নবি মুহাম্মাদ ﷺ এমন এক সমাজব্যবস্থা তৈরি করলেন, যেখানে কেউ কাউকে ইসলাম বরণের জন্য জোরাজুরি করেননি। কারণ, কুরআনে বলা আছে, "(ইসলামি) জীবনব্যবস্থায় কোনো জোরজবরদস্তি নেই। ভুল পথ থেকে সঠিক পথের নিশানা স্পষ্ট হয়ে গেছে...।"[৪৯০]

ইসলামের প্রাথমিক-ইতিহাস-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাইকেল বোনার ওপরের আয়াতের ঐতিহাসিক প্রতিফলন সম্বন্ধে বলেছেন, "...কোনো জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তর ছিল না। 'হয় ইসলাম নয় তরবারি'—এমন শাখের করাতের মতোও অবস্থা ছিল না ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসরত বিধর্মীদের। কুরআনের মূলনীতি (২:২৫৬) মোতাবেক ইসলামি আইনে এমন কিছুর অনুমতি ছিল না। যিম্মিদের [মুসলিমদের নিরাপত্তায় থাকা অমুসলিমেরা] সম্পূর্ণ অনুমতি ছিল তাদের নিজেদের ধর্ম চর্চার।"[৪৯১]

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

নবি মুহাম্মাদের প্রচারিত আদর্শ তাঁর অধীন জনমানুষদের দিয়েছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। করের হার ছিল সামান্য। যাদের কর পরিশোধের সাধ্য ছিল না, তাদের এক পয়সাও দিতে হতো না।[৪৯২]

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমাজের সবার যেন নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের সামর্থ্য থাকে, তারা যেন একটা ন্যূনতম মান বজায় রেখে জীবনযাপন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল প্রশাসকদের। 'উমার ইবনু 'আবদুল-'আযিয তার খিলাফতকালে ইরাকের প্রতিনিধিকে লিখে পাঠিয়েছিলেন: "তোমার এলাকায় বয়স্ক চুক্তিবদ্ধ লোকদের মধ্যে কারা আয়রোজগারে অক্ষম, তাদের খোঁজো। তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য কোষাগার থেকে নিয়মিত ভাতা দাও।"[৪৯৩]

১৪৫৩ সালে এক ইহুদি পণ্ডিতের লেখা চিঠিতে আরও একবার প্রমাণ পাওয়া যাবে নবিজির প্রচারিত আদর্শের। ইউরোপের অত্যাচারী শাসকদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ ইহুদিদের তিনি আরজ করছিলেন মুসলিম ভূমিতে সফর করতে। তিনি জানিয়েছিলেন, অর্থনৈতিকভাবে তারা স্বাধীন: "তুর্কে আমাদের নালিশ করার মতো কিছু নেই। বেশ সৌভাগ্যবান আমরা। আমাদের হাতে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য আছে। বাড়তি করের বোঝা নেই আমাদের ওপর। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনো বাধা নেই। ধন-সম্পদ এই দুনিয়ার ফল। সবকিছু এখানে কম দাম। আমাদের সবাই শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করছে এখানে...।"[৪৯৪]

নানা বর্ণের মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য

নবি মুহাম্মাদের প্রচারিত শিক্ষা নিশ্চিত করেছিল নানা বর্ণের মানুষের মাঝে সহযোগিতামূলক মনোভাব। কুরআন বেশ চমৎকারভাবে বলেছে, "জগদ্বাসী, একজন পুরুষ আর একজন নারী থেকে আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের। এরপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বর্ণে, গোত্রে—যাতে একে অপরকে তোমরা শনাক্ত করতে পারো। যে লোক আল্লাহর ব্যাপারে সবচে সচেতন সে-ই আল্লাহর চোখে সবচে সম্মানিত। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সব জানেন।"[৪৯৫]

ইসলামে বর্ণবাদ প্রথার কোনো জায়গা নেই। নবি মুহাম্মাদ ﷺ দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

> "সব মানুষ আদাম-হাওয়ার সন্তান। ধার্মিকতা আর ভালো কাজের মানদণ্ড ছাড়া কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবের ওপরও কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গের কারো কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই কৃষ্ণাঙ্গের ওপর। আবার কৃষ্ণাঙ্গের কারোও শ্রেষ্ঠতা নেই শ্বেতাঙ্গের ওপর।"[৪৯৬]

প্রাচ্যবিদ্যার ইতিহাসবিদ হ্যামিল্টন এ আর গিব লিখেছেন:

> "মানবতার তরে ইসলামের এখনো অনেক অবদান রাখার অবকাশ আছে। ইউরোপের চেয়ে প্রাচ্যের বেশি কাছে দাঁড়িয়ে ইসলাম। বিভিন্ন জাতির মাঝে বোঝাপড়া এবং সহযোগিতায় এর আছে চমৎকার ঐতিহ্য। মর্যাদা, সুযোগ এবং প্রচেষ্টার সমতায় বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়কে এক সুতোয় বাঁধতে যে-সাফল্য ইসলামি সমাজ দেখিয়েছে, সেই নজির আর কারও নেই... বর্ণবাদ ও সংস্কৃতি-বিভাজনের আপাত অমীমাংসিত বিষয়গুলোর মীমাংসা করার ক্ষমতা আছে ইসলামের। পূর্ব ও পশ্চিমের বৃহৎ সমাজগুলোর বিরোধিতা যদি সহযোগিতা দিয়ে বদলে দিতে হয়, তা হলে ইসলামের মধ্যস্থতা অপরিহার্য শর্ত। প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে ইউরোপ যেসব সমস্যার মুখোমুখি

> হচ্ছে তার সিংহভাগ সমাধান আছে এর মাঝে। তারা যদি এক হয়, শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা বহুগুণ বেড়ে যায়—কিন্তু ইসলামের সহযোগিতাকে অগ্রাহ্য করে ইউরোপ যদি একে ফেলে দেয় এর শত্রুদের কব্জায়, তা হলে উভয়ের জন্য বিষয়টা হবে মর্মান্তিক।"[৪৯৭]

ইতিহাসবিদ এ জে টয়েনবিও সুর মিলিয়েছেন এর সঙ্গে: "মুসলিমদের মাঝে বর্ণবাদের বিনাশ ইসলামের অসামান্য এক অর্জন। সমকালীন বিশ্বে ইসলামি এই মূল্যবোধ প্রচারের প্রয়োজন অনেক বেশি।"[৪৯৮][৪৯৯]

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি

কথায় ও কাজে নবি মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন কুরআনের মশালবাহী। তাঁর প্রচারিত শিক্ষা প্রশান্তি আর শান্তির যে-বারতা ছড়িয়েছে, তাতে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম সফল সভ্যতা। ইউরোপ যখন ডুবে ছিল অজমূর্খতার আঁধারে, ইসলামি সভ্যতা ছিল তখন গোটা দুনিয়ার আলো। মধ্যযুগের ইউরোপ আর ইসলামি সময়ের স্পেনের তুলনা করে বিজ্ঞান ইতিহাসবিদ ভিক্টর রবিনসন লিখেছেন:

> "সূর্য অস্ত যেতেই অন্ধকার জেঁকে বসত ইউরোপে। আর কর্ডোভা আলোকিত হতো বাতি দিয়ে। ইউরোপ ছিল নোংরা; আর কর্ডোভা তৈরি করেছিল হাজার খানেক গোসলখানা। ইউরোপের মানুষজন নোংরা কাপড় চাপিয়ে রাখত নিজেদের ওপর। কর্ডোভার মানুষজন তাদের জামাকাপড় বদলাত প্রতিদিন। ইউরোপের রাস্তাঘাট ছিল কাদামাটির। কর্ডোভার রাস্তাঘাট ছিল পাকা। ইউরোপের প্রাসাদগুলোর ছাদে ছিল চিমনি। আর কর্ডোভার নকশাগুলো ছিল অতি সুন্দর। ইউরোপের মান্যবর লোকজন নিজেদের নাম স্বাক্ষর করতে পারতেন না। অথচ কর্ডোভার ছেলেমেয়েরা যেত স্কুলে। ইউরোপের পাদ্রীরা দীক্ষাসংক্রান্ত বিষয় পড়তে পারত না। কর্ডোভার শিক্ষকেরা গড়েছিল সম্রাট আলেক্সান্ডারের মতো বিশাল লাইব্রেরি।"[৫০০]

গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং রসায়নে পথে বহুদূর পাড়ি জমিয়েছিল ইসলামি সভ্যতা।

বীজগণিতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন খাওয়ারিজমি। অ্যালগরিদ্‌ম বা গাণিতিক সমস্যা সমাধানে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার অগ্রদূত তিনি। এজন্য তাকে বলা হয় আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের পূর্বপুরুষ। এই অ্যালগরিদ্‌ম ছাড়া কম্পিউটার তৈরি হওয়ার গতি হতো না। আবুল-কাসিম যাহরাউইকে বলা হয় মধ্যযুগের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক। অস্ত্রোপচার করতে বেশ কিছু অভিনব পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি।

মানুষের মানসিক অসুস্থতা উপশমেও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন মুসলিম মনীষীরা। ৮ম শতকে বাগদাদে প্রথম মানসিক অসুখ নিরাময় বিভাগ খোলেন চিকিৎসক রাজি। পশ্চিমে অ্যাভিসিনা নামে পরিচিত, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ১১দশ শতাব্দীর চিকিৎসক ইবনু সিনা বুঝেছিলেন, বেশির ভাগ মানসিক অসুস্থতার সম্বন্ধ শরীরের সঙ্গে।[৫০১]

মজার ব্যাপার কী, ৯ম শতকের চিকিৎসক আবু যাইদ বালখি এমন একটি বিষয়ে বই লিখেছিলেন, আমরা আজ সেটাকে মননগত আচরণ-সংক্রান্ত চিকিৎসা নামে চিনি। মানুষের অন্তর্জাত এবং প্রতিক্রিয়ামূলক বিষণ্ণতার বিষয় দুটো সম্ভবত তার লেখা 'আত্মার খোরাক' বইটিতে প্রথম আলাদা করা হয়েছিল।[৫০২]

ইসলামি মূল্যবোধ অবশ্যই মেধাবী এসব মানুষজনদের প্রভাবিত করেছিল। "আল্লাহ যত রোগব্যাধি পাঠিয়েছেন, সবগুলোর চিকিৎসাও পাঠিয়েছেন।"—রোগের[৫০৩] প্রতিকার খুঁজতে নবিজির এ কথা তাদের অবশ্যই উৎসাহ জাগিয়ে থাকবে।

কুরআন আমাদের উৎসাহিত করে পড়াশোনা করতে, জ্ঞান অর্জন করতে, ভাবনাচিন্তা করতে। পর্যবেক্ষণলব্ধ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় উৎসাহ জোগায় কুরআন। জ্ঞান শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের এক শয়েরও বেশি জায়গায়। এ মহান গ্রন্থ বারবার আমাদের ভাবতে বলে নিজেদের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে:

> "দুনিয়ার জীবনের উপমা শোনো: মেঘমালা থেকে আমি যে বৃষ্টি নামাই, জমিনের গাছলতা তা শুষে নেয়। ওথেকেই আহার করে মানুষ ও পশুপাখি। জমিন একসময় সুফলা হয়ে ওঠে। সেজে ওঠে। মানুষজন ভাবে এর ওপর বুঝি তাদের কর্তৃত্ব তৈরি হয়েছে। আর তখন দিনে কি রাতে আমার হুকুম এসে হাজির হয়। আমি একে এমন এক ন্যাড়া ক্ষেতে পরিণত করি, যেন গতকালও এখানে কোনো ফসল ছিল না। সমঝদার মানুষদের জন্য আমি এভাবেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি আমার নিদর্শনমালা।"[৫০৪]
>
> "পড়ো তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে। এক জমাট পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষকে। পড়ো। তোমাদের প্রভু সবচে কৃপাময়। কলম দিয়ে শিখিয়েছেন তিনি মানুষকে যা সে জানত না।"[৫০৫]
>
> "বলো, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হয়?' কেবল বুঝদার মানুষেরাই শিক্ষা নেবে এ থেকে।"[৫০৬]
>
> "ওরা কি উটগুলোকে দেখে না—কীভাবে ওগুলো সৃষ্টি হয়েছে? আকাশ—কীভাবে তা উঁচুতে তুলে ধরে রাখা হয়েছে? পাহাড়—কীভাবে ওগুলোকে নিশ্চল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে? জমিন—কীভাবে একে বিছিয়ে

দেওয়া হয়েছে?”[৫০৭]

> “মহাকাশমালা ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং দিনরাতের পালাবদলের মাঝে অবশ্যই নিদর্শন আছে বুঝদার মানুষদের জন্য। তারা দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, ভাবনাচিন্তা করে মহাকাশমালা ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে...।”[৫০৮]

নবি মুহাম্মাদের আদর্শ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকেও করেছে শাণিত। ইবনুল-হাইসাম—যাকে কিনা পৃথিবীর অন্যতম প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে অভিহিত করা হয়[৫০৯]—পদ্ধতিগত নিরীক্ষার ওপর জোর দিয়ে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নির্দিষ্ট রূপ দান করেন বলে মনে করেন ডেভিড সি লিন্ডবার্গের মতো অনেক বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ।[৫১০]

তার রচিত আলোকবিজ্ঞান গ্রন্থটি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল ইউরোপে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নির্দিষ্ট রূপ যদি তিনি দাঁড় না করাতেন, তা হলে বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানের যে উন্নতির স্বাদ ভোগ করছি, তা সম্ভব হতো না বলা যায়।

ধর্মতত্ত্ব এবং কুরআন শাস্ত্রেরও ছাত্র ছিলেন ইবনুল-হাইসাম। বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে তার পড়াশোনায় কুরআন যে ব্যাপক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, সে কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, “কোন জিনিসটা আমাদের আল্লাহর কাছে নিয়ে যায়, তাঁকে সবচে বেশি সন্তুষ্ট করে, তাঁর অমোঘ ইচ্ছার কাছে আমাদের নত করে তা-ই অন্বেষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।”[৫১১]

পশ্চিমের অনেক পণ্ডিতই ইসলামের কাছে ইউরোপের ঋণ স্বীকার করেন।[৫১২] অধ্যাপক জর্জ স্যালিবা বলেছেন, “ইসলামি সভ্যতা বা বিজ্ঞানের সাধারণ ইতিহাস নিয়ে রচিত বেশির ভাগ বইতেই ইসলামি বৈজ্ঞানিক চর্চা এবং সাধারণভাবে মানবসভ্যতার বিকাশে এর অবদানের কথা স্বীকার করা হয়।”[৫১৩]

অধ্যাপক থমাস আর্নল্ড মনে করেন ইসলামি স্পেন ইউরোপীয় রেনেসাঁর চালিকাশক্তি: “...মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম আলো ঝলমলে এক আখ্যান লিখে দিয়েছে মুসলিম স্পেন... জন্ম দিয়েছে নতুন ধরনের কাব্য, নতুন ধরনের সংস্কৃতির। খ্রিষ্টান পণ্ডিতেরা এখান থেকেই পেয়েছে গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানচিন্তার হদিস। রেনেসাঁর জন্য এগুলোই তাদের মানসিক কর্মকাণ্ডের পালে হাওয়া লাগিয়েছে।”[৫১৪]

নবি মুহাম্মাদ ﷺ যে-সভ্যতার বীজ রোপণ করেছিলেন, তার সার-সংক্ষেপ সবচে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন হিওলেট প্যাকার্ড (এইচপি) কোম্পানির সাবেক সিইও ক্যার্লি ফিয়োরিনা:

> “একসময় এই পৃথিবীতে ছিল অসাধারণ এক সভ্যতা। এক সাগর থেকে আরেক সাগরব্যাপী মহাদেশীয় এক মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এটা। উত্তরের দেশ

থেকে নিয়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল এবং মরুভূমি পর্যন্ত বিশাল ছিল সেই রাষ্ট্র। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস আর জাতিগোত্রের লাখো কোটি মানুষ বাস করেছে সেখানে। বিপুলা এই রাষ্ট্রের একটি ভাষা পৃথিবীর বেশির ভাগ অঞ্চলের সর্বজনীন ভাষায় রূপ নিয়েছিল। শত শত জায়গার বিভিন্ন মানুষের ভাষিক সেতু হিসেবে কাজ করেছে সে-ভাষা। বহু জাতীয়তার মানুষ দিয়ে গঠিত ছিল এর সেনাবাহিনী। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে যে-শান্তি আর উন্নতির পরশ এখানে দেখা যায়, তা আর কখনো কোথাও হয়েছে বলে জানা যায় না।

"নতুন নতুন উদ্ভাবনেও সমান তালে এগিয়েছে এই সভ্যতা। এর স্থপতিরা এমন সব কাঠামোর নকশা করেছেন, অভিকর্ষজ তরণকে যা বুড়ো আঙুল দেখায়। এর গণিতবিদেরা সূচনা করেছেন বীজগণিত আর অ্যালগরিদমের। কম্পিউটার এবং এনক্রিপশানের পথ করে দিয়েছে এগুলো। এই সভ্যতার ডাক্তারেরা মানব শরীর পরীক্ষা করে রোগ নিরাময়ের নতুন উপায় বের করেছেন। এর জ্যোতির্বিদেরা মহাকাশ পানে চোখ মেলেছেন। নামকরণ করেছেন বিভিন্ন তারকার। পথ খুলে দিয়েছেন মহাশূন্য অভিযাত্রা ও আবিষ্কারের। এর সাহিত্যিকেরা লিখেছেন হাজার হাজার গল্প: সাহস, ভালোবাসা আর জাদুকথার গল্প।

নতুন চিন্তাধারা নিয়ে অন্যান্য জাতিরা যখন কুঁকড়ে থাকত, এই সভ্যতায় চাষ হয়েছে নতুন নতুন ধ্যানধারণার। সেখানেই থেমে থাকেনি—সেগুলোর গোড়ায় নিয়মিত পানি সেচ দিয়ে জীবন্ত রেখেছিল। কাটাছাঁটার কারণে অতীতের জ্ঞান যখন হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কায় টলমল, এই সভ্যতা সেই জ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তুলে দিয়েছে পরের প্রজন্মের হাতে। হ্যাঁ, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতায় এরকম অনেক বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাওয়া যায় যদিও; তবে আমি যে-সভ্যতার কথা বলছি তা ৮০০ থেকে ১৬০০ সালের ইসলামি দুনিয়া। উসমানি সাম্রাজ্য থেকে বাগদাদ, দামাস্কাস আর কায়রোর প্রাঙ্গণ অবধি যার ব্যাপ্তি। প্রবল ক্ষমতাবান সুলাইমানের মতো শাসক ছিল তাদের।

"অন্যান্য সভ্যতার কাছে আমাদের যে-ঋণ, তা সম্বন্ধে বেশির ভাগ সময়েই অসচেতন আমরা। তবে এগুলোর নানা উপহার আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। আরব গণিতবিদগণের অবদান ছাড়া বর্তমান প্রযুক্তি শিল্প আলোর মুখ দেখত না। সহিষ্ণুতা এবং পৌরনেতৃত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় অবদান রেখেছেন সুলাইমানের মতো শাসকেরা। তার উদাহরণ থেকে আমরাও শিখতে পারি: উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, নেতৃত্বের ভিত্তি যোগ্যতা। খ্রিষ্টীয়, ইসলামি এবং ইহুদীয় ঐতিহ্যের নানা মানুষের পূর্ণ সামর্থ্যকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এ সভ্যতায়। সংস্কৃতি, স্থায়ীত্ব, বৈচিত্র্য আর সাহসিকতার

> পৃষ্ঠপোষণকারী আলোকিত এ ধরনের সভ্যতা ৮০০ বছর ধরে জারি রেখেছে উদ্ভাবন ও কল্যাণ।"[৫১৫]

আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি, তাঁকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর 'ইবাদাত করাই ছিল নবি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর ভালোবাসাধন্য অনুসারীদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি। একারণেই এমন সহিষ্ণু ও সহমর্মী এক সভ্যতা গঠনে প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখতে পেরেছিলেন তিনি। সম্ভব হয়েছিল কালান্তরি, ব্যক্তিস্বার্থ নিরপেক্ষ নৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করা। ১৮-দশ শতকের অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, এটাই প্রথম জাতি "...যার অধীনে সমাজে এমন এক স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করেছিল, বৈজ্ঞানিক চর্চার জন্য ঠিক যেমনটি দরকার...।"[৫১৬]

নবি মুহাম্মাদের বিশ্বস্ততা, উচ্চ নৈতিক চরিত্র এবং জগতে তিনি যে-প্রভাব ফেলেছেন, এগুলো সবই তাঁর বাণীবাহক হওয়ার বিষয়টির পক্ষে শক্ত প্রমাণ। তাঁর জীবন নিয়ে পড়াশোনা করলে, তাঁর প্রচারিত বাণীকে সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিকোণ থেকে সূক্ষ্মভাবে বুঝলে একটি কথাই স্পষ্ট হবে: তিনি ছিলেন এ পৃথিবীর প্রতি দয়াস্বরূপ। ঐশী দিকনির্দেশের পথে পরিচালিত করতে আল্লাহর মনোনীত বাণীবাহক।

অধ্যায় ১৫

কেন কেবল আল্লাহ উপাসনা পাওয়ার যোগ্য

"যার অন্তর আল্লাহর থেকে রুদ্ধ, সে-ই প্রকৃত অবরুদ্ধ। যার কামনা তাকে বশীভূত করে রেখেছে সে-ই তো আসল গোলাম।"[৫৭৭]

মনে করুন, আপনার কোনো বন্ধু আপনাকে প্রতিদিন ১০ হাজার টাকা করে দেয় আর্থিক সহায়তা হিসেবে। এক-দু দিন নয়; এভাবে টানা কয়েক বছর সে আপনাকে অর্থ সাহায্য করে যাচ্ছে। নিয়মিত টাকা আসছে আপনার ব্যাংক হিসাবে। সময়ের পরিক্রমায় আপনি একসময় ভুলে গেলেন কে সেই দাতা। আপনি তখন টাকাকেই ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন আসল দাতাকে বাদ দিয়ে। অল্প কথায় এটাই বহুঈশ্বরবাদ ও নাস্তিকতাবাদ। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে অকৃতজ্ঞতা ও অযৌক্তিকতার চূড়ান্ত এটা। কেউ যদি কাউকে উপকারী কিছু দেন, একজন বুদ্ধিমান যুক্তিপ্রবণ মানুষ তো অবশ্যই তাকে ধন্যবাদ জানাবেন। এই নৈতিক মূলনীতি নিয়ে কি দ্বিমত করার সুযোগ আছে কোনো?

আপনার জীবনে এমন একটি জিনিস আছে যা আপনি পেয়েছেন বিনা খরচে। অথচ না আপনি এটা অর্জন করেছেন, আর না আপনি এর মালিক। আপনি যে এর যোগ্য—এমন বিশ্বাসেরও কারণ নেই কোনো। জিনিসটা হচ্ছে এই মুহূর্তটি, এর পরের মুহূর্তটি এবং আপনার সারা জীবনের সব মুহূর্ত। আপনি এই মুহূর্তগুলো অর্জন করেননি। আপনার জীবনের আরও একটি মুহূর্ত পেতে সম্ভাব্য কী করতে পারেন আপনি? চলতি হাওয়ায় আমরা একে বলি উপহার: জীবনের উপহার। আমরা তাই একে মনে করি মহামূল্যবান। আপনি এই মুহূর্তগুলোর মালিক নন, কারণ কোনো কিছুকে অস্তিত্বে আনার সামর্থ্য নেই আপনার। একটা সামান্য মাছি সৃষ্টিরও তাকত নেই আপনার। আপনি এটার হাওলাদারও না, কারণ এটা আপনার না। এক সেকেন্ডের জন্যও কোনো প্রাণ উৎপাদনের ক্ষমতা নেই আপনার। মৌলিক এই সত্যের আলোকে আপনার কি তা হলে উচিত নয় সব সময় কৃতজ্ঞচিত্ত থাকা? আপনি তো এমন একটি জিনিস বিনা ক্লেশে পাচ্ছেন। এটা আপনার নিজের না। আপনি এর মালিকও নন। এটা পাওয়ার জন্য কোনো বিশেষ যোগ্যতাও অর্জন করেননি আপনি।

বহুঈশ্বর পূজারি আর নাস্তিকদের কাছে যেহেতু কৃতজ্ঞতা জানানোর মতো নেই কেউ, বা জানালেও তারা ভুলভাল কিছুকে জানায় (সাধারণত কোনো সৃষ্ট পরনির্ভরশীল বা সসীম সত্তা), তার মানে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু অযৌক্তিকই না, অকৃতজ্ঞতার শেষ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, আল্লাহ কারও অধীন নন; সবকিছুই তাঁর অধীন। কাজেই আমরা যত যা বলি, করি, অর্জন করি তার সবই মৌলিকভাবে কেবল আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। কেউ যদি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হন, নীতিবান হন, তার জন্য তা হলে আল্লাহর সামনে কৃতজ্ঞচিত্তে অবনত হওয়া অনিবার্য।

উপাসনার মূল কথা কৃতজ্ঞতা। তবে ইসলামে উপাসনার ধারণা কেবল এর মাঝেই সীমিত নয়, এখানে এর অর্থ বেশ ব্যাপক। উপাসনা মানে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসব, তাঁকে জানব, তাঁকে মানব। আমাদের যাবতীয় উপাসনা কেবল তাঁকে ঘিরেই পরিচালনা করব। ইসলামের উপাসনামূলক কাজের মধ্যে আছে সালাত (নামাজ), আল্লাহর তারিফ করা, অনুশোচনা, দু'আ, ভালো ভালো কাজ করা, আত্মাকে আধ্যাত্মিক রোগ থেকে মুক্ত করা ইত্যাদি। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যৌক্তিক উপায় এগুলো। কুরআনে বারবার তাই তাগিদ এসেছে এসব কাজের।

কৃতজ্ঞতা উপাসনার মূল বিষয় বলে অধ্যায়টি আমি এদিয়েই শুরু করেছি। কেউ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ মানে, সে বলতে চায় আল্লাহর ওপর সে পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়। ছোটবড় যাবতীয় সবকিছুই যে আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, সেটা সে মানতে নারাজ।

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে অবধারিতভাবে আসে উপাসনা। এছাড়া আর কী কী বিষয় অত্যাবশ্যক করে একে?

আল্লাহকে জানা

ওপরের প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে 'আল্লাহকে জানা' মানে কী, সেটা একটু ভেঙে বলতে চাই। আল্লাহ কেন আমাদের উপাসনা পাওয়ার উপযুক্ত তা বুঝতে তাঁর সম্বন্ধে জানা অপরিহার্য। যাকে জানি না তাকে নিশ্চয়ই উপাসনা করব না আমরা। ইসলামে এজন্যই আল্লাহকে জানাও এক ধরনের উপাসনা: "কাজেই জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"[৫১৮]

আল্লাহকে জানা মানে তিনিই যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং যাবতীয় সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী তা স্বীকার করা (এটা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা আল্লাহর প্রভুসূচক একত্ব নামে পরিচিত)। তাঁর নাম ও গুণাবলিগুলো স্বতন্ত্রভাবে যে শুধু তাঁরই সেই স্বীকৃতি দেওয়ার মানেও আল্লাহকে জানা (তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ব নামে পরিচিত এটা)। আল্লাহকে জানার আরও একটা অর্থ তিনি যে তাঁর উপাস্যসত্তায় এক, একক ও স্বতন্ত্র সেটাও জানা। কেবল তিনিই সব

উপাসনা পাওয়ার যোগ্য (এটা পরিচিত তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা আল্লাহর উপাস্যসত্তার একত্ব নামে।) আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা, নাম ও গুণাবলি এবং তাঁর উপাস্যসত্তায় কারও কোনো অংশ নেই। মানুষ বা অন্য কোনো জন্তুজানোয়ার বা জড় বস্তুর যত ধারণা তাঁর ওপর আরোপ করা হয়, তার সবই বাতিল। তিনি পরাজাগতিক সত্তা। সম্পূর্ণ নিখুঁত। ইসলামে একত্বের এই ধারণার পারিভাষিক নাম 'তাওহীদ'। এর আক্ষরিক অর্থ একত্বের স্বীকৃতি বা কোনো কিছুকে এক বা স্বতন্ত্র অভিধা দেওয়া।

প্রভুসূচক একত্ব: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ

আল্লাহর প্রভুসূচক একত্ব মানে, তিনিই যে একমাত্র স্রষ্টা, মালিক এবং সবকিছুর প্রভু তার স্বীকৃতি দেওয়া। তিনিই সবার জীবিকার ব্যবস্থা করেন, সবার খেয়াল রাখেন। কেউ যদি এগুলো অস্বীকার করেন, তিনি তা হলে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরিক করলেন। শির্কের অপরাধে অপরাধী তিনি। কারণ, তিনি মনে করছেন আল্লাহর এসব বর্ণনা অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তুরও আছে। এভাবে তিনি ওই বস্তুটির ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব আরোপ করে শির্কের অপরাধ করলেন।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ব: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

এর মানে আল্লাহ নিজে তাঁকে যেসব নাম ও গুণাবলিতে বর্ণনা করেছেন, শুধু সেসব নাম ও গুণাবলিতেই তাঁকে ডাকা। কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যায় এগুলো। 'আল-ওয়াদুদ' (ভালোবাসাময়) বা 'আল-লাতিফ' (সূক্ষ্মদর্শী)-এর মতো নামগুলো আমরা স্বীকার করি, এবং এগুলো কোনোভাবেই কোনো সৃষ্টবস্তুর গুণাবলির সঙ্গে তুলনীয় না। তাঁর নাম ও গুণাবলিগুলোতে কোনো ধরনের ত্রুটি বা ঘাটতি নেই। তিনি নিজেই তাঁর নামগুলোকে বলেছেন সবচে সুন্দর:

> "আল্লাহর রয়েছে সবচে সুন্দর সুন্দর নাম; সুতরাং সেসব নাম ধরে তোমরা ডাকো তাঁকে।"[৫১৬]

কেউ যদি কোনো সৃষ্টির সাথে আল্লাহর এসব নাম ও গুণাবলির তুলনা করেন, তিনি তা হলে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে মানবীয় গুণ মেশানোর দোষে দুষ্ট হবেন। আল্লাহর সঙ্গে অংশী করবেন নগণ্য সৃষ্টিকে। কোনো সৃষ্টিকে কেউ আল্লাহর সমান মনে করলে সৃষ্টির ওপর ঐশ্বরিকতা আরোপ করা হয়। এটাও এক ধরনের শির্ক।

আল্লাহর উপাস্যসত্তায় একত্ব: তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

উপাস্যসত্তা হিসেবে আল্লাহর একত্ব মানে সব উপাসনা কেবল তাঁর জন্যই যে নিবেদিত হতে হবে, তার স্বীকৃতি। আল্লাহর বাদে কেউ অন্য কারও উপাসনা করলে, বা কোনো অর্চনায় আল্লাহ বাদে অন্য কারও কাছে পুরস্কার চাইলে এটাও হবে শির্ক।

সবচে বড় অপরাধ

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা সবচে বড় অপরাধ। কেউ যদি এই অপরাধ করা অবস্থায় মারা যান এবং এর জন্য কোনো অনুশোচনা না করে থাকেন, তিনি তা হলে অবিশ্বাসী বা কাফির অবস্থায় মারা যাবেন। এই অপরাধ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না:

> "আল্লাহর সাথে শরিক করার অপরাধকে তিনি ক্ষমা করেন না। এরচে কম কিছু হলে তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। আল্লাহর সাথে যে শরিক করে, সে জঘন্য এক অপরাধ করল।"[৫২০]

তবে কেউ যদি আল্লাহর সাথে শরিক করে পরে অনুশোচনা করে একত্বের পথে ফিরে আসেন, তা হলে তিনি নারী-পুরুষ যে-ই হোন, ক্ষমা পাবেন। শুধু তাই না, তার আগের অপরাধগুলোও পরিবর্তিত হয়ে যাবে ভালো কাজে:

> "আল্লাহ বাদে আর কোনো উপাস্যকে যারা ডাকে না... অনুশোচনা করে, বিশ্বাস করে, ভালো ভালো কাজ করে, আল্লাহ তাদের অপরাধগুলো ভালো কাজে বদলে দেবেন। তিনি বারবার ক্ষমা করেন, সবচে দয়াময়।"[৫২১]

আল্লাহর সাথে যিনি শরিক করেছেন, কিন্তু কখনো অনুশোচনা করেননি, এবং সে-অবস্থাতেই মারা গেছেন (এবং এজন্য কোনো অজুহাতও নেই), তিনি আসলে আল্লাহর দয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ওপর নিজেই অবিচার করেছেন। তার অন্তর চিরটা কাল ধরে আল্লাহর পথনির্দেশ আর দয়াকে অগ্রাহ্য করে গেছে। আল্লাহর কাছ থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে রেখেছেন দূরে। আল্লাহর সাথে যেদিন দেখা হবে তার, সেদিন তিনি আর্জি জানাবেন পৃথিবীতে যেতে। কথা দেবে এবারে তারা সব ঠিকঠাকমতো করবেন:

> "[অবিশ্বাসীদের অবস্থা এমনই], এরপর মৃত্যুর এসে গেলে বলে, 'প্রভু গো, আমাকে আবার ফেরত পাঠান, হয়তো আমি এবারে ছেড়ে আসা ভালো ভালো কাজ করব।' কক্ষনো না, এ তো শুধু তার কথার কথা।"[৫২২]

আল্লাহর দয়া ও ভালোবাসা গ্রহণ করার সব ন্যায্য সুযোগগুলো তিনি হাতছাড়া করেছেন:

> "আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো অবিচার করেননি। তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অবিচার করেছে।"[৫২৩]

> "তোমাদের নিজের হাতে যা করেছ, এ-ই তার পুরস্কার। আল্লাহ কখনো তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিচারক নন।"[৫২৪]

তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এখানে। কেউ যদি সত্য তালাশ করেও ইসলামের সঠিক বার্তা না পান, তাদের একটা কৈফিয়ত থাকবে তা হলে। এবং বিচারদিনে সেই মুহূর্তে তাদের একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।[৫২৫]

আল্লাহ্ সুবিচারক। কারও সঙ্গে তিনি অবিচার করেন না। এজন্য কেউ কেউ মনে করেন কোনো অমসুলিম মারা গেলে তার চূড়ান্ত গন্তব্য নিয়ে নিজস্ব মতামত দেওয়া ঠিক নয় (তবে, কোনো কোনো ইসলাম-বিশারদ বলেছেন, যেসব অমুসলিম কখনো সত্য তালাশ করেননি, কিংবা ইসলাম সম্পর্কে জেনেও তা গ্রহণ করেননি, তাদের জন্য এটা খাটবে না)। আমাদের কেউ জানি না কার মনে কী ছিল। জানি না, ইসলামের সঠিক বার্তাটি কেউ সঠিকভাবে পেয়েছে কি না। সে যা হোক, ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন অমুসলিম মারা গেলে তাকে অমুসলিমদের রীতি অনুযায়ীই সমাহিত করা হবে। কিন্তু কার চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে সেটা বলা যায় না। বাস্তবে আল্লাহ্ সবচে বেশি এবং নিখুঁতভাবে সুবিচারক ও দয়াময়। কাজেই কারও ওপর বেরহম হবেন না তিনি। কারও প্রতি জুলুম করা হবে না।

যারা ঠিকঠাকভাবে ইসলামের বার্তা পেয়েও অস্বীকার করবেন, তাদের সেজন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তবে কেউ যদি ইসলামের বার্তা না পেয়ে, কিংবা বিকৃতভাবে পেয়ে মারা গিয়ে থাকেন, তা হলে বিচারদিনে একটা সুযোগ দেওয়া হবে তাকে। কুরআন ও হাদিসের মূলনীতি থেকে সূক্ষ্ম এই বিষয়টির সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করে গাযালি লিখেছেন,

> "বরং, আমি তো বলব, আল্লাহ চায় তো, এই সময়ের বেশির ভাগ বায়জেন্তীয় খ্রিষ্টান এবং তুর্করা আল্লাহর দয়ার মাঝে শামিল হবেন। আমি এখানে সেসব লোকদের কথা বলছি, যারা বাইজেন্টাইন ও আনাতোলিয়ার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে থাকেন, যারা ইসলামের সংস্পর্শে আসেননি... তাদের ওজর আছে।"[৫২৬]

গাযালি আরও যুক্তি দেখিয়েছেন, যেসব লোক নবি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর প্রচারিত বাণী সম্বন্ধে নেতিবাচক মন্তব্য শুনে শুনে এর প্রতি বিরূপ মনোভাব ধারণ করেছেন, তারাও অব্যাহতি পাবেন:

> "এই মানুষগুলো 'মুহাম্মাদ' নামটি জানেন। কিন্তু তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলির কিছুই জানেন না। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছেন লোকটা মিথ্যাবাদী, 'মুহাম্মাদ' নামক এক ভণ্ড নিজেকে নবি দাবি করেন... আমার মতে এই দলটিও প্রথম দলের মতো। তারা তাঁর নাম শুনে থাকলেও সত্যটা শোনেননি। এজন্য [তাঁর আসল মর্যাদা] অনুসন্ধানে যথেষ্ট তাগিদও অনুভব করেননি।"[৫২৭]

ইসলামের আসল শিক্ষা উগ্রবাদের পথে বিশাল বাধা। আমার মতে, সব ধরনের উগ্রপন্থার শেকড় 'আদর্শিক গোঁড়ামি'। এটা মানুষের অন্তরকে কঠিন করে ফেলে। জগৎ ও অন্যান্য মানুষ সম্বন্ধে এসব লোকজন আলাপ-আলোচনার সুযোগবিহীন, একচোখা এবং নেতিবাচক অনুমান করেন। এর ফলে এক দল আরেক দলকে বাঁকা

চোখে দেখে। মনে করে অপর দলের সবাই বুঝি এক। মানুষের মন তখন কঠিন হয়ে যায়। অন্যদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ হতে বাধা দেয়।

ইসলাম অন্য লোকদের বাঁকা চোখে দেখে না। ইসলাম বলে না অমুসলিম সবারই সর্বনাশ হয়ে গেছে বা অমুসলিম সবাই-ই খারাপ। কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলা আছে অন্য দলের "সবাই এক নয়।"[৫২৮] এদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন "সৎ"।[৫২৯] প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দয়া, মমতা ও ন্যায্যতা বজায় রেখে সদাচরণ করার নির্দেশ দেয় ইসলাম।

উপাসনার সারকথা

ইসলামে প্রার্থনা বা দু'আ করা অন্যতম উপাসনামূলক কাজ। নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, দু'আ "উপাসনার মূল।"[৫৩০] এটা করতে হবে কেবল আল্লাহর কাছে। কারণ, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন শুধু তিনিই পূরণ করতে পারেন। আল্লাহ বাদে অন্য আর কারও কাছে প্রার্থনা করা মানে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা। কারণ, তখন এমন কিছুর কাছে চাওয়া হচ্ছে, যার সেটা দেওয়ার মূল ক্ষমতা নেই। যেমন ধরুন, কেউ যদি পাথরের কোনো মূর্তির কাছে জমজ কন্যা লাভের প্রার্থনা করে, এটা তা হলে শির্ক হবে। কারণ, এই আর্জি পূরণের ক্ষমতা সেই পাথরের মূর্তির নেই। এর মানে অবশ্য এটা না যে কারও কাছে কোনো সাহায্য চাওয়া যাবে না। শুধু তখনই শির্ক হবে যদি কেউ বিশ্বাস করেন, কোনো কিছু দেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা আল্লাহর না; অমুক-তমুকের বা অমুক জিনিসের।

আমাদের উপাসনাকে পবিত্র রাখার অন্যতম উপায় প্রার্থনা করা। সেটা করতে হবে বিনয় আবেশে। আল্লাহ বলেছেন,

> "বিনয় আবেশে তোমাদের প্রভুকে ডাকো।"[৫৩১]
>
> "আল্লাহর প্রতি তোমাদের উপাসনাগুলো একান্ত পবিত্র করে তাঁকে ডাকো।"[৫৩২]

দুটো শর্ত পূরণ করলেই কেবল মঞ্জুর হবে যেকোনো উপাসনা। প্রথমত, ইখলাস অর্থাৎ এটা হতে হবে শুধুই আল্লাহর জন্য। দ্বিতীয়ত সুন্নাহর অনুসরণ, কুরআন সুন্নাহতে যেভাবে বলা আছে, কাজটা হতে হবে ঠিক সেভাবে বা সেই মূলনীতি মেনে। এসব উপাসনা কোনগুলো তা হলে?

ইসলামে উপাসনার অনেক ধরন আছে। যেকোনো ভালো কাজ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় সেটাও বিবেচিত হবে উপাসনা হিসেবে। তবে কিছু কিছু বিশেষ উপাসনা আছে যা করতেই হয়। নবি মুহাম্মাদ ﷺ এগুলোকে বলেছেন ইসলামের স্তম্ভ। এগুলোর মাঝে আছে: আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য যে উপাসনার যোগ্য নন, এবং মুহাম্মাদ যে তাঁর সর্বশেষ বাণীবাহক—অন্তর থেকে তা বিশ্বাস করা, এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার সালাত আদায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক

সামর্থ্য থাকলে বছরে একবার যাকাত। ইসলামি দিনপঞ্জির নবম মাস রামাদানে সিয়াম পালন বা রোজা রাখা। এবং আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকলে জীবনে একবার হাজ্জ করা। এসব উপাসনা বেশ গভীর তাৎপর্য বহন করে। এগুলোর আছে অন্তর্নিহিত মাত্রা। কেউ চাইলে অবশ্য এগুলোর বাইরেও অসংখ্য উপাসান-চর্চা করে নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বিকশিত করতে পারেন। এমনসব কাজের মাঝে আছে: সুন্দর সুরে কুরআন পাঠ, আল্লাহর স্মরণ, আত্মশুদ্ধি, দান-খয়রাত, ইসলামের বাণী-প্রচার, অনাহারীকে খাবার দেওয়া, পশুপাখির দেখভাল, নবিজির জীবনী নিয়ে পড়াশোনা, কুরআন মুখস্থ করা, তাহাজ্জুদের সালাত, প্রাকৃতিক ঘটনাবলি নিয়ে ভাবনাচিন্তাসহ আরও অনেক কিছু।

আমাদের সব উপাসনা কেন আল্লাহর জন্যই হতে হবে?

প্রশ্নটির উত্তর দিতে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত বলব:

- আল্লাহর উপাসনা পাওয়ার অধিকার তাঁর অস্তিত্বের অনিবার্য সত্য
- আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, ভরণ-পোষণ দান করছেন।
- তিনি আমাদের বেশুমার অনুগ্রহ দিয়ে যাচ্ছেন অবিরাম।
- আমরা যদি আমাদের ভালোবাসি, তা হলে আল্লাহকেও অবশ্যই ভালোবাসা উচিত।
- আল্লাহ ভালোবাসাময়। তাঁর ভালোবাসা সবচে নিখাদ ভালোবাসা।
- উপাসনা করা আমাদের প্রকৃতির অংশ
- আল্লাহকে মানা তাঁর উপাসনার অংশ

আল্লাহর উপাসনা পাওয়ার অধিকার তাঁর অস্তিত্বের অনিবার্য সত্য

আল্লাহ কে তা বোঝা দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে বিষয়টা। সংজ্ঞামতে আল্লাহ আমাদের উপাসনা পাওয়ার অধিকার রাখেন। এটা তাঁর অস্তিত্বের অনিবার্য সত্য। তাঁর সম্বন্ধে এ বিষয়টি কুরআনে বারবার এসেছে:

> "আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমার উপাসনা করো। আমার স্মরণে সালাত জারি রাখো।"[৫৩৩]

আমাদের উপাসনা পাওয়ার একমাত্র অধিকার যেহেতু তাঁরই, কাজেই আমাদের সব উপাসনাই হতে হবে তাঁর তরে।

মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ সত্তা। তাঁর নাম ও গুণাবলি সর্বোচ্চ মাত্রায় নিখুঁত। যেমন, আল্লাহর একটি নাম 'আল-ওয়াদুদ' বা ভালোবাসাময়। তাঁর এই নামটি বোঝায় তাঁর

ভালোবাসা সবচে নিখাদ এবং সবচে গভীর। এসব গুণাবলির কারণেই তাঁকে উপাসনা করতে হবে আমাদের। আমরা তো সব সময় দয়াবান, জ্ঞানী মানুষদের প্রশংসা করি। অথচ আল্লাহর দয়া আর জ্ঞানের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কাজেই তিনিই যে সর্বোচ্চ মাত্রার প্রশংসার হকদার তা নিয়ে কি আর কোনো সন্দেহ থাকে? ইসলামে তাই আল্লাহর প্রশংসা করাও এক ধরনের উপাসনামূলক কাজ।

আমাদের যাবতীয় প্রার্থনা মঞ্জুর করার একমাত্র মালিকও তিনি। আমাদের জন্য কোনটা ভালো হবে তা কেবল তিনিই ভালো জানেন। আর তিনি সব সময়ই কল্যাণ চান আমাদের। এমন একজন সত্তার কাছেই কি উচিত না আমাদের যাবতীয় সব মিনতি জানানো? সকল প্রয়োজনে তার কাছে হাত পাতা? আল্লাহর মাঝে এমন বিশেষ কিছু একটা আছে যার কারণে তিনি আমাদের উপাসনা পাওয়ার একমাত্র হকদার।

আল্লাহর উপাসনার ব্যাপারে এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে রাখা জরুরি। আমাদের জীবন যদি স্বাচ্ছন্দ্যময় না-ও হয়, তবুও তিনি আমাদের উপাসনা পাওয়ার অধিকার রাখেন। আমাদের গোটা জীবনও যদি কাটে দুঃখ-দুর্দশায়, তারপরও তাঁর উপাসনা করে যেতে হবে আমাদের। কারণ, আল্লাহর উপাসনার বিষয়টা কোনো বিনিময়-সম্বন্ধের অংশ না। বিষয়টা এমন না যে তিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, এজন্য আমরা তাঁর উপাসনা করব। অসংখ্য অনুগ্রহের বারিধারায় তিনি সিক্ত করে রেখেছেন আমাদের। কিন্তু আমরা তাঁর উপাসনা করি তিনি যা সেকারণে। তাঁর প্রজ্ঞাগুণে তাঁর অনুগ্রহগুলো কীভাবে বণ্টন করছেন তাঁর সে-সিদ্ধান্তের কারণে না।

মানুষজনের খেলোয়াড়ি দক্ষতা, ভাষা-দক্ষতা, শক্তি-সামর্থ্যের কারণে আমরা তাদের প্রশংসা করি। সরাসরি এসব মানুষ আমাদের কোনো উপকার না করলেও তাদের গুণগান করি আমরা। অনুরূপভাবে আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলির কারণে তিনি আমাদের সর্বোচ্চ প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার। কীভাবে তিনি তাঁর সে-বিশেষত্বগুলোর প্রকাশ ঘটালেন আমাদের জীবনে, তার ওপর নির্ভর করে না এটা। সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ সামর্থ্যের মানুষজনদের যদি প্রশংসা করতে পারি আমরা, তা হলে ত্রুটিহীন পবিত্র সেই মহামহিম সত্তার প্রশংসার মাত্রা কেমন হওয়া উচিত তা আপনিই বলুন।

আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, ভরণপোষণ করছেন

আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। গোটা মহাজগতের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন তিনি। নিজ দয়াগুণে পালন-লালন করে যাচ্ছেন আমাদের। কুরআনে বহুভাবে একথাগুলো বলা

আছে। আগ্রহী শ্রোতা-পাঠকের মনে কথাগুলো এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধ ও সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে:

> "পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য।"[৫৩৪]
>
> "তারা কি সত্যিই এমনকিছুকে তাঁর সাথে অংশী বানায়, যারা নিজেরা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং নিজেরাই সৃষ্ট?"[৫৩৫]
>
> "জগদ্বাসী, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহরাশির কথা স্মরণ করো। আকাশ ও পৃথিবী থেকে আল্লাহ বাদে আর কেউ কি তোমাদের জীবন-উপকরণ দেন? তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তারপরও কীভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছো তোমরা?"[৫৩৬]

প্রতিদিন যা কিছু আমরা ব্যবহার করি, আমাদের টিকে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই আল্লাহর। কাজেই সব কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকার তিনি ছাড়া আর কে রাখেন? তিনিই সবকিছুর মালিক—এই আমাদেরও। কাজেই তাঁর প্রতি অগাধ সম্ভ্রম ও কৃতজ্ঞতাবোধ সব সময় জাগ্রত থাকা উচিত আমাদের মাঝে। তিনি আমাদের মনিব, আমরা তাঁর দাস। একথা অস্বীকার করা মানে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। এমন ধৃষ্টতা চরম অকৃতজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্য দেখানোর শামিল।

তিনি যেহেতু আমাদের স্রষ্টা, আমাদের অস্তিত্বের পুরোটাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। আমরা স্বনির্ভর নই—তা আমাদের মাঝে কেউ কেউ যতই অমন ভাবুন না কেন। জীবনে বিলাসিতা থাকুক কি দারিদ্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য থাকুক কি দুর্ভোগ—শেষমেশ আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল আমরা। তাঁকে ছাড়া এই মহাজগতে কিছুই ঘটবে না। যা কিছু হয় সব হয় তাঁর অনুমতিতে। আমাদের ব্যবসায় সাফল্য, কিংবা যেকোনো অর্জন সবই আল্লাহর জন্য। তাঁর সৃষ্টি করা কিছু অনুঘটক ব্যবহার করে কামিয়াবি অর্জন করি আমরা। তিনি যদি না চান, কানাকড়ি সাফল্যের মুখও আমরা দেখতে পাবো না। আল্লাহর ওপর আমাদের চূড়ান্ত নির্ভরতার বিষয়টি বুঝে নিলে মনের অন্দরে অদ্ভুত এক কৃতজ্ঞতাবোধ আর সম্ভ্রম জাগে। বিনয়ে অবনত হয়ে যায় মাথা। আর তাঁর সামনে অবনত হওয়া, তাঁকে শুকরিয়া জানানোটাও উপাসনার এক ধরন।

ঐশী পথনির্দেশ পাওয়ার পথে অন্যতম বড় বাধা আমাদের স্বনির্ভর হওয়ার বিভ্রান্তি। আমাদের অহমিকা আর অহংকারের কারণে সৃষ্টি হয় এটা। কুরআন সাফ সাফ জানিয়েছে:

> "মানুষ যখন নিজেকে আত্মনির্ভর মনে করে, তখন সে সব সীমা ছাড়িয়ে যায়।"[৫৩৭]
>
> "কিছু লোক আছে হাড়কিপটে, আত্মতৃপ্ত। ভালো কিছুকে অগ্রাহ্য করে। আমি তার জন্য দুর্বিষহ পথ সুগম করব। তার পতনে তার সয়সম্পদ কোনো কাজে আসবে না—আমার কাজ তো শুধু দিশা দিয়ে যাওয়া।"[৫৩৮]

আল্লাহ আমাদের বেশুমার অনুগ্রহ দিয়ে রেখেছেন

"আল্লাহর অনুগ্রহ গুনতে গেলে গুনে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু মানুষ তারপরও সবচে বড় অবিচারক, অকৃতজ্ঞ।"[৫৩৯]

আমরা তো কখনোই আল্লাহর প্রতিটা অনুগ্রহের জন্য তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারব না। সেজন্য চিরটা কাল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমাদের। মানুষের হৃদপিণ্ডের উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করি বিষয়টা।

মানুষের হৃদপিণ্ড গড়ে প্রতিদিন ১ লাখ বার স্পন্দিত হয়। তার মানে বছরে প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ বার। যদি কোনো মানুষ ৭৫ বছর বাঁচেন, তার মানে গোটা জীবনে তার হৃদস্পন্দন হবে আনুমানিক ২৭৫ কোটি ৯৪ হাজার বার। বাস্তবে কি এতবার কেউ গুণে দেখেছি আমরা? সত্যি করে বললে কেউ না। কারণ, এত সংখ্যকবার স্পন্দন গোনা অসম্ভব। অথচ আমাদের প্রতিটা স্পন্দন কী মূল্যবান! হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে যদি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ কুরবান করতে হয়, তা-ই করব আমরা। তারপরও চরম অকৃতজ্ঞের মতো এই হৃদযন্ত্রের স্রষ্টাকে অস্বীকার করি, ভুলে থাকি।

এ তো গেল শুধু হৃদস্পন্দের বিষয়টা। এটা ছাড়া আরও যত অনুগ্রহ বিনামূল্যে বিনাযোগ্যতায় ভোগ করছি, তার জন্য আল্লাহর প্রতি কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমাদের?

যদি নিজেকে ভালোবাসি, তবে আল্লাহকেও ভালোবাসতে হবে

অনেক ধরনের ভালোবাসা আছে। তার মাঝে একটা হচ্ছে নিজেকে ভালোবাসা। আমরা নিজেদের ভালোবাসি, কারণ আমরা অনেক অনেক দিন বাঁচতে চাই, আনন্দ উপভোগ করতে চাই; চাই কষ্ট থেকে দূরে থাকতে। নিজেদের প্রতি আমাদের এই ভালোবাসা সহজাত বিষয়। মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম যুক্তি দেখিয়েছেন, নিজেকে ভালোবাসা কোনো অহংকার বা আত্মকেন্দ্রিকতা নয়। বরং এর মানে নিজের প্রতি যত্নবান হওয়া। নিজের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকা। অন্যদের ভালোবাসতেই দরকার এ ধরনের ভালোবাসা। যদি নিজেকেই ভালো না বাসতে পারি, তা হলে অন্যকে ভালোবাসব কীভাবে? আমার নিজের চেয়ে আমার সবচে কাছের আর কে আছে? যদি নিজের খেয়ালই না রাখি, নিজেকে সম্মান না করি, তা হলে অন্যের প্রতি কীভাবে যত্নবান হবো, শ্রদ্ধাশীল হবো? নিজেকে ভালোবাসা মানে তাই নিজের প্রতি দরদি থাকা। আমাদের নিজস্ব অনুভূতি, ভাবনাচিন্তা, আকাঙ্ক্ষা দিয়ে নিজেদের সাথে যুক্ত থাকি আমরা। যদি নিজের সাথে নিজের যোগ না থাকে, তা হলে অন্যের প্রতি দরদ আসবে কীভাবে? অন্যের সঙ্গে যুক্তই-বা হবো কীভাবে? একথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় এরিক ফ্রমের কথায়। তিনি বলছেন, ভালোবাসা "মানে নিজের সততা ও স্বাতন্ত্র্যের

প্রতি শ্রদ্ধা। অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও জানা থেকে নিজেকে জানার ভালোবাসাকে আলাদা করা যাবে না।"[৫৪০]

নিজের প্রতি ভালোবাসা থাকা যদি অপরিহার্য হয়, তা হলে এটা তাকে নিয়ে যায় যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে ভালোবাসার দিকে। কেন?

কারণ, সুখ-সন্তুষ্টি অর্জন আর দুঃখ-কষ্ট এড়ানোর বস্তুগত কারণ ও উপায়গুলো তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আমাদের অস্তিত্বের জন্য মূল্যবান প্রতিটি মুহূর্ত বিনামূল্যে তিনি দিয়েছেন আমাদের। অথচ আমরা এটা অর্জন করে নেইনি, কিংবা আমরা এর মালিকও নই। যদি নিজেকে ভালোবাসি, তবে আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত—এ বিষয়টির সারাংশ চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত মনীষী গাযালি:

> "সুতরাং মানুষের নিজের প্রতি ভালোবাসা যদি অপরিহার্য হয়, তা হলে যিনি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করলেন, এরপর তার সব অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক গুণাবলি দিয়ে তাকে [দুনিয়ায়] স্থায়িত্ব দিলেন, তাকে ভালোবাসাও অপরিহার্য। নিজের অঢেলে বুঁদ হয়ে যার মাঝে এই ভালোবাসা হারিয়ে যায়, সে তার প্রভু ও স্রষ্টাকে অগ্রাহ্য করে। তাঁর সম্বন্ধে কোনো বিশুদ্ধ জ্ঞান নেই তার। তার চোখ শুধু তার কামনা আর ইন্দ্রিয়ের মাঝেই ঘুরপাক আছে।"[৫৪১]

আল্লাহ ভালোবাসাময়; তাঁর ভালোবাসা সবচে পবিত্র

আল্লাহর এই গুণটিই তো যথেষ্ট তাঁকে ভালোবাসার জন্য, তাই না? আর তাঁকে ভালোবাসা তো উপাসনার অন্যতম অংশ। আপনাকে যদি বলি, এমন একজন মানুষ আছেন যিনি খুব ভালোবাসেন সবাইকে। তার ভালোবাসার কোনো তুলনা নেই। আপনার কি ইচ্ছে করবে না সেই মানুষটা সম্বন্ধে জানতে? ইচ্ছে করবে না তাকে ভালোবাসতে? তা হলে যে-সত্তার ভালোবাসা কি না সবচে খাঁটি, যাঁর ভালোবাসার টান সবচে সুতীব্র, কোনো সুস্থজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কি চাইবেন এমন এক সত্তার ভালোবাসাকে দূরে ঠেলে দিতে?

প্রত্যেক ভাষায় ভালোবাসা শব্দটির একাধিক অর্থ থাকতে পারে। কুরআনে এই ঐশী ভালোবাসা বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা দেখে নেওয়া দরকার সেজন্য। কুরআনে আল্লাহর ভালোবাসার বর্ণনায় বলা হয়েছে তাঁর দয়ামায়া (রাহমাহ), তাঁর মমতা (রাহীম) এবং বিশেষ ভালোবাসা (মাওয়াদ্দা)। ঐশী প্রকৃতির সঙ্গে এগুলোর সম্বন্ধ বুঝে নিলে আল্লাহকে ভালোবাসা সহজ হবে আমাদের জন্য।

দয়ামায়া

লোকে বলে ভালোবাসার আরেক নাম দয়ামায়া।

আল্লাহর একটি নাম 'আর-রাহমান'—সবচে দয়াময়। বাংলা এই শব্দ দুটো দিয়ে অবশ্য আরবি শব্দটির গভীরতা মাপা যায় না। শব্দটির তিনটি গভীর দ্যোতনা আছে। এর একটি অর্থ আল্লাহর দয়ামায়া সুতীব্র। দ্বিতীয় অর্থ তাঁর দয়ামায়ার প্রকাশ তাৎক্ষণিক। আর তৃতীয়টি হচ্ছে তাঁর দয়ামায়া এত শক্তিশালী, কোনো কিছু থামাতে পারে না একে। সবকিছুকেই জড়িয়ে রাখে এটা। কুরআনে আল্লাহ বলছেন,

"...দয়াময় প্রভু কুরআন শিখিয়েছেন।"[৫৪২]

আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন তিনি সবচে দয়াময়। মানুষকে তিনি কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন। কুরআন যে আল্লাহর দয়ামায়ার এক নিদর্শন হিসেবে এসেছে মানুষের কাছে, তা বোঝা যায় ভাষিক এই ইঙ্গিত থেকে। অন্যভাবে বললে কুরআন যেন মানবজাতির কাছে পাঠানো এক সুদীর্ঘ ভালোবাসার চিঠি। সত্যিই যিনি ভালোবাসেন, তিনি চান তার ভালোবাসার মানুষটি যেন কোনো কষ্ট না পান। আগে থেকে তাকে হুঁশিয়ার করে দেন বিপদ-আপদ সম্বন্ধে। তাকে দেখিয়ে দেন সুখের ঠিকানা। কুরআনও ঠিক এমনই: মানুষকে সে ডেকে ডেকে হুঁশিয়ার করে, তাকে দেয় অনন্ত সুখের সুখবর।

মমতা

'আর-রাহমান'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি শব্দ 'আর-রাহীম'। দুটো শব্দেরই মূল ধাতু এক; এর অর্থ মায়ের গর্ভ। কিন্তু দুটো শব্দের দ্যোতনার মাঝে কত পার্থক্য! সুমহান আল্লাহর মমতার আবেশে যারা জড়িয়ে নিতে চান নিজেকে, 'আর-রাহীম' সেই মমতারই খোঁজ দিচ্ছে। যারা আল্লাহর পথনির্দেশ মেনে নিয়েছেন, তারা মূলত আল্লাহর বিশেষ মমতার মাঝেও শামিল হয়েছেন। এটা শুধু বিশ্বাসীদের জন্য। জান্নাতে আল্লাহর সঙ্গে পরম সুখে থাকার মধ্য দিয়ে মূর্ত হবে সেই মমতা।

বিশেষ ভালোবাসা

আল্লাহ 'আল-ওয়াদূদ': ভালোবাসাময়। এর মানে দৃশ্যমান ভালোবাসা। আরবি ধাতুমূল 'উদ' থেকে এসেছে শব্দটি। মূল শব্দটির অর্থ কোনো কিছু দেওয়ার মাধ্যমে ভালোবাসার প্রকাশ।

জগতে যত ধরনের ভালোবাসা আছে তার সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় আল্লাহর ভালোবাসা। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ বটে। কিন্তু এটাও সন্তানকে ভালোবাসার এক আন্তরিক প্রয়োজনের কারণে। এই ভালোবাসা তাকে পূর্ণতা দেয়। সন্তানের জন্য নানা ত্যাগের মাঝে তিনি খুঁজে পান তৃপ্তি। কিন্তু আল্লাহ তো কারও অধীন নন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিখুঁত। তাঁর তো কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। কোনো প্রয়োজন বা চাওয়া থেকে উৎপত্তি হয় না তাঁর ভালোবাসা। এই ভালোবাসা তাই সবচে পবিত্র। কারণ, এ ভালোবাসা থেকে তাঁর যে নিজের কিছু পাওয়ার নেই।

আমাদের যিনি কল্পনাতীতভাবে ভালোবাসেন, তাঁকে ভালো না বেসে কীভাবে থাকতে পারি আমরা? নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, "একজন মা তার সন্তানের প্রতি যতটা-না স্নেহশীল, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি তারচেও অনেক বেশি স্নেহশীল।"[৫৪৩]

আল্লাহ্র ভালোবাসার মাত্রা যদি হয় সবচে তীব্র, দুনিয়াতে পাওয়া যেকোনো ভালোবাসার চেয়ে অনেক বেশি গভীর, তাঁর জন্য কি তা হলে গহন এক ভালোবাসা গড়ে ওঠা উচিত না আমাদের মনে? তাঁর একজন অনুগত বান্দা হয়ে আমাদের কি উচিত না সেই ভালোবাসাকে জীবন্ত করা? গাযালি কী চমৎকার বলেছেন, "যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তারা বোঝেন, বাস্তবে আসলে আল্লাহ্ বাদে ভালোবাসার আর কিছু নেই। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই ভালোবাসা পাওয়ার হকদার।"[৫৪৪]

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ করা আমাদের জন্য হবে সবচে বড় অর্জন। কারণ, এই ভালোবাসা আমাদের মনের প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা এবং পরজীবনের পরম সুখের উৎস। আল্লাহ্কে ভালো না বাসা কেবল অকৃতজ্ঞতারই পরিচয় না, চরম ঘৃণ্য মনোভাবেরও পরিচায়ক। ভালোবাসার উৎস যিনি, তাঁকে ভালো না বাসা মানে আমাদের অন্তরে যে-জিনিসটা ভালোবাসার অনুভূতি জাগায়, তা অস্বীকার করা।

আল্লাহ্ অবশ্য তাঁর এই বিশেষ ভালোবাসা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেন না। মমতার বশে তিনি যদিও ভালোবেসে আমাদের অবিরাম উপহার দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিটি মূল্যবান মুহূর্ত, তাঁর ভালোবাসায় পুরোপুরি সিক্ত হতে, তাঁর সেই বিশেষ ভালোবাসার আবেশে নিজেকে জড়াতে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়তে হবে তাঁর সাথে। আল্লাহ্র ভালোবাসা যেন দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু আমরাই সেই দরজা বন্ধ করে রেখেছি। তাঁকে অস্বীকার করে, উপেক্ষা করে দরজায় তালা মেরে রেখেছি। আল্লাহ্ যদি তাঁর এই বিশেষ ভালোবাসা জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতেন, তা হলে এর আর কোনো বিশেষ অর্থ থাকত না। এখন তাই আমাদের হাতে দুটো বিকল্প আছে: সঠিক পথে হেঁটে তাঁর বিশেষ ভালোবাসা অর্জন করে নেওয়া, অথবা তাঁর দিকনির্দেশ অগ্রাহ্য করে অশুভ পরিণামের জন্য অপেক্ষা করা।

আল্লাহ্র ভালোবাসা অর্জন করে নিতে একমাত্র উপায় নবি মুহাম্মাদের দেখানো পথে যাত্রা:

> "বলো, 'যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসো, তবে আমায় অনুসরণ করো। তা হলে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালোবাসবেন। ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের অপরাধগুলো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সবচে মমতাময়।"[৫৪৫]

উপাসনা আমাদের সত্তার অংশ

উপাসনা আমাদের সত্তার অংশ। আর আল্লাহই আমাদের উপাসনা পাওয়ার একমাত্র হকদার। আমাদের খাওয়াপরা, শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো উপাসনাও এক জন্মগত প্রবৃত্তি (দেখুন অধ্যায় ৪)। জন্মগতভাবেই আমরা উপাসনা-প্রবণ। স্রষ্টার পক্ষ থেকেই আমাদের মাঝে পুরে দেওয়া হয়েছে এই প্রবণতা। আল্লাহকে উপাসনা করা তাই যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা। আমরা যখন বলি গাড়িটা লাল, তখন আসলে কী হয়? আমরা আসলে একটি রংকে লাল বলে অভিহিত করেছি। সংজ্ঞামতে এটি লাল। ঠিক সেরকম আমরাও সংজ্ঞামতে উপাসনাকারী। কারণ, আল্লাহ এভাবেই আমাদের 'প্রোগ্রাম' করেছেন: "আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার উপাসনা করার জন্য।"[৫৪৬]

আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করেন না, এমনকি কোনো ঈশ্বরকে যারা উপাসনার ভাগিদার মনে করেন না, তাদের মাঝেও কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধা, আরাধনার বিষয়গুলো দেখা যায়। আপনি যদি আল্লাহর উপাসনা না-ও করেন, কিছু না কিছুর অর্চনা ঠিকই করবেন আপনি। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, যে-জিনিসকে আপনি সবচে বেশি ভালোবাসেন, সশ্রদ্ধ সম্মান করেন, যার নিঃশর্ত আনুগত্য করেন, সর্বোচ্চ ক্ষমতা আপনি যার ওপর আরোপ করেন, যার ওপর নিজেকে নির্ভরশীল মনে করেন, সেটাই আপনার উপাসনার বস্তু। কারও কারও জন্য সেটা কোনো আদর্শ, কোনো নেতা কিংবা পরিবারের কোনো সদস্য—এমনকি হতে পারে সেটা তিনি নিজেই! আক্ষরিক অর্থে অনেকেই এগুলোর অর্চনা করেন। উপাসনা মানে তাই কেবল কোনো বস্তুর সামনে মাথা নোয়ানো বা প্রার্থনা করা নয়; ওপরের কাজগুলোও একধরনের পূজা-অর্চনা।

আল্লাহ গেঁথে আছেন আমাদের অন্তরের গহন অতলে। তিনি যখন আমাদের উপাসনা করার আদেশ করেন, এটা তাঁর তরফ থেকে আসলে এক মমতা আর ভালোবাসার প্রকাশ। আমাদের সবার মনে আছে এক অধরা শূন্যতা। আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দিয়ে পূর্ণ করতে হয় সেটা। কখনো কখনো আমরা তা পূরণ করার চেষ্টা করি নতুন চাকরি, নতুন বাড়ি-গাড়ি দিয়ে। কিংবা ছুটি কাটিয়ে, শখ পূরণ করে, অথবা আত্ম-উন্নয়নমূলক বইপত্র পড়ে। অস্থায়ী এসব জিনিস দিয়ে যতবার সেই শূন্যতা ভরাট করার চেষ্টা করি, ততবারই তৈরি হয় নতুন এক শূন্যতা। পুরোপুরি তৃপ্তি পাই না। নতুন এক উপায় খুঁজি বারে বারে। কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে যখন মনের সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করি, স্থায়ীভাবে মুছে যায় সেটা। পূর্ণতার যে-আবেশ যে-প্রশান্ত পরশে আমরা মগন হই তখন, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

আল্লাহকে মানা তাঁকে উপাসনার অংশ

"দয়া পেতে আল্লাহ ও নবিকে মানো।"[৫৪৭]

আবহাওয়া বিরূপ হলে বিমানে চড়ে যাওয়ার সময় পাইলট ঘোষণা দেন সিট বেল্ট শক্ত করে বেঁধে নিতে। তার ঘোষণা শোনামাত্র সব যাত্রী নিজ নিজ সিটে বসে সিট বেল্ট বেঁধে নেন। আশা করেন শিগগিরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বিমানের পুরো দায়িত্ব থাকে পাইলটের হাতে। তিনি সবচে ভালো জানেন কীভাবে একটা বিমান কাজ করে। বিরূপ আবহাওয়ায় কী হতে পারে। স্বাভাবিক বোধবিবেচনা এবং যুক্তিসম্পন্ন মানুষ কোনো অবস্থাতেই তার কথার অন্যথা করবেন না। এমন পরিস্থিতিতে একমাত্র পাগল কিংবা অহংকারী ব্যক্তি ছাড়া, আমার মনে হয় না আর কেউ পাইলটের কথার অন্যথা করবেন। ৭ বছরের কোনো বাচ্চা যদি বলে ক্যালকুলাস কীভাবে শেখাতে হয় তা গণিতের শিক্ষক জানেন না, কতজন মানুষ বিশ্বাস করবেন তার কথা?

আল্লাহকে অমান্য করাও নিরেট বোকামি এবং ভিত্তিহীন কাজ। তাঁর অনেক হুকুমের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা যদি না-ও বুঝি, তবু তাঁকে মান্য করাটাই সবচে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। তাঁর প্রতিটি আদেশের পেছনে থাকে অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। তিনিই চূড়ান্ত কর্তা। কাগজে এলোপাথাড়ি আঁকিবুকি করে ২ বছরের কোনো শিশু নিজেকে শেক্সপিয়রের চেয়ে বেশি কাবিল মনে করলে যেমন দাঁড়াবে বিষয়টা, আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার বিষয়টাও তেমন (সত্যি বলতে তারচেও অনেক অনেক বেশি জঘন্য)।

এর মানে অবশ্য এই না যে আল্লাহকে মানার সময় আমাদের বুদ্ধিবিবেচনাকে ছুটি দিয়ে রাখব। কারণ, আল্লাহ নিজেই কুরআনের বহু জায়গায় বলেছেন আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করতে। তবে আল্লাহ যা বলেছেন তার প্রমাণ যদি পেয়ে যাই, তা হলে অবশ্যই তা মানা কর্তব্য আমাদের।

আল্লাহকে মানা মানে তাঁকে ভয় করা। আমরা যদি তাঁর অনুগত বান্দা হয়ে থাকতে চাই তা হলে এই ভয়টুকু না থাকার বিকল্প নেই। এই ভয়টা অবশ্য কোনো শত্রু বা শয়তানি শক্তিকে যেভাবে ভয় করি সেরকম নয়। কারণ, আল্লাহর প্রকৃতি চিরকল্যাণময়। এজন্য তাঁকে ভয়ের বিষয়টার সাথে জড়িয়ে থাকে সশ্রদ্ধ সম্মান, দামি কোনো কিছু হারানোর শঙ্কা, তাঁর ভালোবাসা আর নাখোশির সাথে। আমরা আশঙ্কা করি, বুঝি-বা তাঁর ভালোবাসা, দয়ামায়া হারিয়ে ফেলব।[৫৪৮] বিষয়টা বোঝার জন্য নিচের উদাহরণটি খেয়াল করুন:

মনে করুন, এক বিপণি বিতানে ঘুরছেন। হঠাৎ খেয়াল করলেন একটা বাচ্চা মেয়ে তার মা বকছেন কী এক কারণে। বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করল মায়ের পা জড়িয়ে ধরে। মায়ের কাছে মাফ চাইল, বলল তাকে জড়িয়ে ধরতে। মা হাসিমুখে তাকে বললেন, ওকে নিরাপদে রাখার জন্যই বকেছেন তিনি। বাচ্চাটির মনে এখন মায়ের প্রতি একটা ভয় জাগছে বটে, তবে এই ভয় মায়ের ভালোবাসা আর সন্তুষ্টি হারানোর

ভয়। সে চায় না তার মায়ের ভালোবাসা হারাতে। তাকে অখুশি করতে। আল্লাহর প্রতিও এমন ভয় থাকা উচিত আমাদের।

আল্লাহকে না মানার আধ্যাত্মিক পরিণতির শঙ্কা মনে জাগে বলেই তাঁকে মানা উচিত আমাদের। আমরা তাঁর বিশেষ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় করি। বহুদিন ধরে আমাদের উপাসনার মাধ্যমে যে-সম্বন্ধ গড়েছিলাম তাঁর সাথে, শঙ্কা করি তা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার। আল্লাহর দয়ামায়ার চাদর থেকে পালিয়ে যাওয়ার অন্য নাম তাঁর অবাধ্যতা। তাঁর দয়া না পেলে যে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরে জাহান্নামে নিজেদের শেষ ঠিকানা করে নেব আমরা। গাযালি এ ধরনের ভয়কে বলেছেন ভালোবাসার জিনিস খোয়ানোর ভয়: "কেউ যখন কিছু ভালোবাসে, সে সেটা হারানোরও ভয় করে। ভয় ছাড়া ভালোবাসা হয় না। কারণ, ভালোবাসার জিনিস হারাতে মন চায় না।"[৫৪৯]

কুরআনে আল্লাহকে ভয় করার যে-বিষয়টি এসেছে বারবার, সেটা আমি ওপরে এতক্ষণ যেভাবে ব্যাখ্যা করলাম সেভাবেই বুঝে নিতে হবে। এখানে আল্লাহর ব্যাপারে সদাসচেতন থাকার বিষয়টিও এসেছে। ইসলামি পরিভাষায় এর নাম 'তাকওয়া'। কুরআনের যেকোনো মানসম্পন্ন অনুবাদে এ দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করে। তাদের অর্থ আলাদা তবে কিছু মিল আছে। আল্লাহকে ভয় করার মানে তাঁকে অমান্য করার আধ্যাত্মিক পরিণতি এবং তাঁকে হারানোর ভয়। আর আল্লাহর ব্যাপারে সদা সচেতন থাকার মানে তাঁর উপস্থিতির ব্যাপারে সব সময় সজাগ থাকা। সর্বাবস্থায় আমরা কী করি না করি তার সবই যে তিনি জানেন সে-বিষয়ে ওয়াকেফ থাকা। আল্লাহ-প্রেমী হিসেবে তাই সব সময় তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা খোঁজা উচিত আমাদের।

আল্লাহর কি আমাদের উপাসনার প্রয়োজন?

ইসলামে আল্লাহর যে-পরিচয় দেওয়া আছে, সে-সম্বন্ধে ভুল ধারণার কারণে অনেক সময় এই প্রশ্ন উঁকি দেয় অনেকের মনে। কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট বলা আছে আল্লাহ পরাজাগতিক সত্তা। কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তাঁর। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এক সত্তা (দেখুন অধ্যায় ৬)।

আমাদের উপাসনার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই তাঁর। আমরা তাঁর উপাসনা করলে তাঁর কোনো লাভ নেই। আমরা তাঁর উপাসনা না করলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। আমরা আল্লাহর উপাসনা করি, কারণ, তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও মমতাগুণে আমাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়াবি ও আধ্যাত্মিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপাসনাকে আল্লাহ আমাদের জন্য কল্যাণকর করে বানিয়েছেন।

আল্লাহ কেন আমাদের তাঁর উপাসনার জন্য সৃষ্টি করলেন?

তো এরপর সাধারণত যে-প্রশ্নটি আসে: আল্লাহ কেন আমাদের তাঁর উপাসনার জন্য সৃষ্টি করলেন?

দেখুন, আল্লাহ সর্বোচ্চ উত্তম এক সত্তা। তাঁর ক্রিয়াকর্মগুলো শুধু যে ভালো তা-ই না, এগুলো তাঁর সত্তাগত প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ। তিনি যেহেতু আমাদের জন্য কল্যাণ চান, এজন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপাসনার জন্য। তিনি চান আমরা যেন জান্নাতে যাই। তিনি বলে দিয়েছেন, যারা জান্নাতে যাবার মর্যাদা অর্জন করবে, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর দয়ামায়া অনুভব করার জন্য:[৫৫০] "তোমাদের প্রভু যদি চাইতেন, সবাইকে এক জনসমাজ বানাতে পারতেন। কিন্তু যাদের ওপর তোমার প্রভুর দয়ামায়া আছে তারা বাদে সবাই জিইয়ে রাখছে নিজেদের বিরোধিতা। তিনি তাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন।"[৫৫১]

আমাদেরকে তাঁর উপাসনার জন্য সৃষ্টি করাটা ছিল অনিবার্য। তাঁর নিখুঁত নাম ও গুণাবলিগুলোর প্রকাশ ছিল অবশ্যম্ভাবী। একজন চিত্রশিল্পী অবধারিতভাবে সৃষ্টি করেন চিত্রকর্ম। কারণ, তার মাঝে শিল্পীগুণ আছে। তো আল্লাহও অনিবার্যভাবে আমাদের সৃষ্টি করতেন তাঁর উপাসনার জন্য। কারণ, কেবল তিনিই উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। এই অনিবার্যতা কোনো প্রয়োজনের কারণে নয়; বরং এটা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ।

আরেকভাবে উত্তর দেওয়া যায় প্রশ্নটির। আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, সসীম। আল্লাহর প্রজ্ঞার সম্পূর্ণটা কখনোই বুঝে ওঠা সম্ভব না আমাদের। আল্লাহর সব প্রজ্ঞা যদি বুঝেই যেতাম, তবে তো আমরাও আল্লাহ হয়ে যেতাম, কিংবা আল্লাহ হয়ে যেতেন আমাদের মতো। কিন্তু এ দুটোই অসম্ভব। হয়তো ওপরের প্রশ্নটির কোনো যথার্থ উত্তর নেই। কিন্তু এটাই আল্লাহর জ্ঞানের 'অধরা উচ্চতা'র ইঙ্গিত দেয়। মোট কথা, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর অসীম প্রজ্ঞার কারণে। আমাদের পক্ষে তা বোঝা দুষ্কর।

একটা উদাহরণ দিয়ে প্রশ্নটির বাস্তবিক ব্যাখ্যা দিচ্ছি দেখুন।

মনে করুন, এক উঁচু পাহাড়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। পেছন থেকে কেউ আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল সাগরে। সেখানে শয়ে শয়ে হাঙর হা করে আছে আপনাকে গেলার জন্য। তবে আপনাকে যিনি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছেন, তিনি আপনাকে একটা মানচিত্র দিয়েছেন। অক্সিজেনের সিলিন্ডার দিয়েছেন। হাঙ্গর থেকে বাঁচার বিশেষ পোশাকও দিয়েছেন। মানচিত্রটি অনুসরণ করে খুব সুন্দর এক দ্বীপে যেতে পারবেন আপনি। সেখানে আজীবন অনন্ত সুখে থাকতে পারবেন। আপনি যদি বুদ্ধিমান হন, তা হলে মানচিত্রটি দেখে নিরাপদে পৌঁছে যাবেন সে-দ্বীপে। কিন্তু তা না

করে যদি 'কেন তুমি আমাকে এখানে ফেললে?'—এই প্রশ্নের মধ্যেই ঘুরপাক খান, তা হলে হাঙরের পেটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না।

মুসলিমদের জন্য কুরআন আর নবিজির সুন্নাহ হচ্ছে এমন দুটি সুরক্ষাকবচ। নিরাপদ জীবনপথে চলার হাতিয়ার। আল্লাহকে আমাদের জানতে হবে, তাঁকে ভালোবাসতে হবে, মানতে হবে। আমাদের সব উপাসনা উৎসর্গ করতে হবে শুধু তাঁর তরে। আমাদের হাতে বিকল্প দুটি: এই বাণী উপেক্ষা করে নিজের ক্ষতি ডেকে আনা, অথবা তা মেনে নিয়ে আল্লাহর ভালোবাসা আর মমতার চাদরে নিজেদের জড়িয়ে নেওয়া।

মুক্ত দাস

অস্তিত্বগত দিক থেকে, আল্লাহর উপাসনাই সত্যিকার মুক্তি। উপাসনা মানে আল্লাহকে সবচে বেশি ভালোবাসা, তাঁকে সর্বোচ্চ ও নিঃশর্ত আনুগত্য দেওয়া। অথচ এদিক থেকে আমাদের জীবনে আল্লাহ ছাড়া আরও অনেককে, অনেক কিছুকে উপাস্য বানিয়ে বসে আছি আমরা। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন নিজের অহং, নিজের কামনাকে ভালোবাসেন সবচে বেশি। নিজের মনমতো চলেন। আমরা মনে করি আমি সব সময় সঠিক, কখনো ভুল প্রমাণিত হতে চাই না। নিজেদের মতামত চাপিয়ে দিতে চাই অন্যের ওপর। আমরা যেন নিজেই নিজের দাস। এই অধপতিত আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে কুরআন বলেছে যারা নিজের কামনা, নিজের সুতীব্র বাসনা আর খামখেয়ালকে মনিব বানিয়েছে তারা জন্তুজানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট: "নিজের কামনাকে যে তার উপাস্য বানিয়েছে তার কথা ভাবো। তুমি কি তার অভিভাবক হবে? তোমার কি মনে হয় ওদের বেশির ভাগ লোক শুনে বা বোঝে? এরা জন্তুজানোয়ারের মতো—না, বরং তারচেয়েও নিকৃষ্ট।"[৫৫২]

আত্মপূজা থেকে কখনো কখনো আমরা পূজা করি দেশ, রাষ্ট্র ও সামাজিক চাপ, আদর্শ, প্রথা কিংবা সংস্কৃতির। এগুলোই হয়ে ওঠে আমাদের মানদণ্ড। আমরা এগুলোকে ভালোবাসি, এগুলোর ব্যাপারে আরও জানতে চাই, এগুলোকে 'মান্য' করি। বস্তুবাদের কথাই ধরুন। টাকাপয়সা আর বস্তুগত সম্পদ নিয়ে মজনু হয়ে গেছি আমরা। এমনিতে টাকাপয়সা, সম্পদের আকাঙ্ক্ষা তো খারাপ না। কিন্তু ওগুলোই যদি হয়ে পড়ে আমাদের জীবন-মরণ, তখন কী দাঁড়ায় বিষয়টা? আমাদের সব সময় আর চেষ্টাকে নিবিষ্ট করেছি সম্পদের স্তূপ গড়ায়। বস্তুগত সাফল্যকে বানিয়েছি আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। এভাবে আমরা পরিণত হই বস্তুগত জিনিসের কলকাঠিতে। আল্লাহর দাস হওয়ার বদলে হয়ে পড়ি বস্তুবাদী সংস্কৃতির গোলাম। আজকাল বেশির ভাগ মানুষের মাঝেই দেখা যাচ্ছে এমন প্রবণতা।

জন এম. টোয়েঙ্গে এবং টিম ক্যাসের তাদের গবেষণা থেকে বলেছেন, যুবকদের মধ্যে প্রজন্ম-পরিক্রমায় বস্তুবাদিতা বেড়েছে। ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৭ সাল অবধি চালানো গবেষণার ভিত্তিতে এ কথা বলেছেন তারা। এখনো এই হার অনেক উচ্চ। তালাক, বেকারত্ব, বর্ণবাদ, অসামাজিক আচরণ, জীবন নিয়ে অসন্তুষ্টির মতো সামাজিক অস্থিতিশীলতা এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সাথে উচ্চ মাত্রার বস্তুবাদিতার কিছু যোগসাজশ আছে।[৫৫৩] এস.জে. অপ্রি এবং অন্যান্যদের গবেষণাতেও উঠে এসেছে বিষয়টা। তারা বলেছেন শৈশব-কৈশোরে উচ্চমাত্রার বস্তুবাদিতা পরবর্তী সময়ে জীবন নিয়ে সন্তুষ্টির হার কমিয়ে দিতে পারে।[৫৫৪] এ ধরনের গবেষণাগুলো অবশ্যই পুরোপুরি তর্কাতীত নয়। এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। তবে বস্তুবাদী চিন্তাধারা যে বেঠিক, সেই সহজাত বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় এসব গবেষণা থেকে।

আমাদের চাকরি-বাকরি, আয়রোজগার, সয়সম্পদই যেন ঠিক করে দিচ্ছে আমাদের পরিচয়। ধীরে ধীরে আমাদের পরিচয় গণ্ডিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বস্তুবাদী নিয়ামকে। আমাদের নীতি-নৈতিকতা, মানবতা, আল্লাহ এবং অন্যান্য মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক—এগুলোর যেন কোনোই ভূমিকা নেই আমাদের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়ে।

আমরা আল্লাহর উপাসনা না করলেও অন্য কিছুর উপাসনা করি ঠিকই। সেটা হতে পারে আমাদের অহংবোধ, আমাদের কামনা কিংবা ক্ষণস্থায়ী কিছু। অথচ আল্লাহর উপাসনাই আমাদের আসল পরিচয়। এটা আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতির অংশ। আল্লাহকে ভুলে যদি উপাসনার অযোগ্য কিছুর গোলামি করি, তবে একসময় নিজেকেই ভুলে বসব আমরা: “যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তাদের মতো হোয়ো না। তিনি তাদের নিজেদেরই ভুলিয়ে দিয়েছেন।”[৫৫৫]

আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে আমাদের পরিচয়। আমরা যখন আল্লাহর উপাসনা করি, তখন অন্যান্য ‘খোদা’র গোলামি থেকে মুক্ত করি নিজেদের।

কুরআন এক চমৎকার তুলনা দিয়েছে এ-সম্বন্ধে: “যার মালিক নিজেদের-সঙ্গেই-লড়াই-করা বিভিন্ন জন, আর যে কিনা পুরোপুরি নিমগ্ন একজন মালিকের প্রতি, তারা কি সমান? সব তারিফ আল্লাহর। যদিও তাদের বেশির ভাগ জানে না।”[৫৫৬]

এখানে আল্লাহ বলছেন, আমরা যদি তাঁর উপাসনা না করি, তা হলে অবধারিতভাবে অন্য কিছুর উপাসনায় নেমে পড়ি। সেগুলো আমাদের বশীভূত করে, হয়ে ওঠে আমাদের মালিক। কুরআনের উপমাটি বলছে, আল্লাহ না থাকলে বহুজন আমাদের মনিব হয়ে ওঠে। তারা সবাই আমাদের থেকে কিছু চায়। তারা নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে মারামারিতে ব্যস্ত। দিনশেষে দুর্দশা, বিভ্রান্তি আর অশান্তির মাঝে দিনযাপন করি। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ আমাদের বলছেন, তিনি আমাদের আসল মালিক।

কেবল তাঁর উপাসনা করলেই তাঁকে বাদে অন্য যত কিছুর নিগড়ে বন্দি করেছি নিজেদের, তা থেকে চূড়ান্ত মুক্তি মিলবে আমাদের।

আল্লাহকে ভালোবেসে উপাসনা এবং নির্বিবাদে তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দিলে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার গোলামি থেকে মুক্ত হই আমরা। নিজেদের রিপুকামনা এবং আত্মপূজা থেকে আজাদ হই। প্রাচ্যের কবি মুহাম্মাদ ইকবালের পঙ্‌ক্তিতে যেন সেকথাই ধরা দিয়েছে:

"যে একটি সিজদাকে তুমি ভাবো দুরহ
হাজারো সিজদা থেকে তা মুক্তি দেয় তোমায়"[৫৫৭]

অধ্যায় ১৬

অন্তরের নিকেশ

আমার বাবা একজন মুক্ত মানুষ। যে-দেশে তিনি থাকেন, সেই দেশ তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছে বা পরিপূর্ণ মানবাধিকার নিশ্চিত করছে, তা বলছি না। আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের দিক থেকে তিনি মুক্ত। তিনি যখন নিজেকে প্রকাশ করতে চান, কারও পরোয়া না করেই করতে পারেন। তিনি এমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন যেন কোনো বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা নেই।

মনে আছে, মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় আমি স্কুলের ব্যান্ডদলে বাজনা বাজাতাম। ছোটবেলা থেকে বাবা আমাকে গিটার বাজাতে উৎসাহ দিতেন খুব। স্কুলে গিয়ে সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্যান্ডে বাজানো বেছে নিয়েছিলাম। একবার এক কনসার্ট হচ্ছিল স্কুলে। বাবাও এসেছিলেন সেখানে। মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করছিলেন ছাত্রছাত্রীদের সংগীত-সামর্থ্য।

এক ছাত্রী-শিল্পী সেদিন অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। মঞ্চে একসময় সে ভাবের এমন এক আবেশি অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল, উপস্থিত সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। আমার বাবা সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি একাই অবশ্য করেছিলেন সেটা, আর কেউ দাঁড়ায়নি। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটির নৈপুণ্য আর দক্ষতার তারিফ করছিলেন।

মানবীয় প্রতিভার এমন অনেক ঘটনার সাক্ষী আমরা অনেকেই। আমাদের কোনো ক্রীড়াতারকা যখন অসামান্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন, কিংবা কেউ যখন অসম সাহসী কোনো কাজ করেন, বা আমরা যখন কোনো অনুপ্রেরণা জাগানো কথা শুনি—তখন আর তারিফ না করে পারি না। আমরা উঠে দাঁড়াই, হাত তালি দিই। ভূয়সী প্রশংসা করি। আমরা আন্দোলিত হই, অনুপ্রেরণা পাই, উৎসাহিত হই। যা দেখলাম, শুনলাম তাতে উজ্জীবিত হয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি। স্মৃতির পাতা থেকে তা কখনো মুছে যায় না।

কী তাজ্জব এক জগতে আমাদের বসবাস। আমরা আশা করি, ভালোবাসি, সুবিচার খুঁজি। আমরা বিশ্বাস করি মানবজীবনের চূড়ান্ত মূল্যে। আমরা যুক্তি খাটাই,

সিদ্ধান্ত নিই, আবিষ্কার করি। কোটি কোটি তারা, ছায়াপথ আর নক্ষত্র-শোভিত বিশাল এক মহাজগতে আমাদের বিচরণ। বিশাল জগতের এক অতি ক্ষুদ্র কোণে বাস করে সচেতন কিছু সত্তা। স্বতন্ত্র এক অনুভূতি-ধারা আছে তাদের। আমাদের অবস্তুগত মন যোগাযোগ করে জড় জগতের সাথে। আমাদের মহাজগৎ নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আর সূক্ষ্ম বিন্যাসে গড়া। এগুলোর সামান্য হেরফের হলেও সচেতন প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। যত যা-ই হোক, মনের অতি গহনে ঠিকই অনুভব করি খারাপ কাজের কলুষতা, আর ভালো কাজের শুভ্রতা।

আমাদের এই জগতেই এমনসব প্রাণী আছে, যারা নিজেদের ওজনের চেয়ে বহুগুণ বেশি ওজনের ভার বইতে পারে। এমনসব বীজ আছে, উত্তপ্ত আগুন ফুঁড়ে যা বের হয়। আমাদের এই পৃথিবীতে ৬ হাজারেরও অধিক-সংখ্যক ভাষা চলে। ৮০ লাখেরও ওপরে নানা প্রজাতির বসবাস। এমন এক দুনিয়ায় থাকি আমরা, যেখানে মানুষ পৃথিবীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতো অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারে। আবার সেসব অস্ত্রকে প্রতিহত করার মতো যুগান্তকারী চিন্তাধারাও রাখে এই দুনিয়ার মানুষেরা। আমাদের এই জগতের অগণিত পরমাণু থেকে কেবল একটি যদি ভাঙা হয়, বিশাল শক্তি নির্গত হবে তা থেকে। এমন এক জগতে আমাদের বাস, সবার মনগুলো যদি একসুতোয় গাঁথা হয়, সেই শক্তিকে তা হলে ব্যবহার করতে পারব শান্তির পায়রা ওড়াতে।

অথচ, তারপরও, এই মহাজগৎ আর এর মাঝে থাকা সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহকে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তারিফ করি না, তাঁর মহিমা জ্ঞান করি না।[৫৫৮] আমাদের সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে আমরা বিভ্রান্ত, প্রবঞ্চিত, বিস্মৃত: "মানুষ, কীসে তোমাদের দয়াবান প্রভুর ব্যাপারে ধোঁকা দিল?"[৫৫৯]

আল্লাহ সত্যিই মহান!

এমন স্রষ্টার তারিফ করার তাগিদ যদি না পাই মনে, তা হলে বুঝতে হবে আমাদের অন্তরে কোথাও না কোথাও কোনো সমস্যা আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক এই অসুখ মুক্তির জন্য চাই আধ্যাত্মিক ওযুধ। আমাদের অসুখ আমাদের অহং; ওষুধ ইসলাম।

সেই ওষুধ নিয়ে আল্লাহর দয়ামায়া আর বিশেষ ভালোবাসার যোগ্য হতে আমাদেরকে কেবল একটি কথা বিশ্বাস করতে হবে। মনে গেঁথে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে এবং এর মর্মার্থের কাছে সঁপে দিতে হবে নিজেকে। সেকথাটি হলো:

> "আল্লাহ বাদে আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। মুহাম্মাদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

আশা করি বইটি আপনার নিরাময়-প্রক্রিয়া শুরু করতে সাহায্য করেছে। আল্লাহ আপনাকে দিশা দিন। আপনাকে জড়িয়ে রাখুন তাঁর বিশেষ ভালোবাসায়।

শেষ কথা

ঘৃণা নয়, বিতর্ক করুন : ইসলাম নিয়ে সংলাপ

তথ্যের জন্য বিশাল এক উৎস ইন্টারনেট। কিন্তু এখানে তথ্যের পরিমাণ এত বেশি, এর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ তথ্য বেছে নেওয়া খুব কঠিন। এর একদিকে যেমন ইতিবাচকতার মালভূমি, অন্যদিকে মিথ্যে, ভুলতথ্য, ভুল-উপস্থাপনের খাদ। ইন্টারনেট কখনো কখনো নির্মম। কত বার আমি ইন্টারনেটের এই অন্ধকার গলির শিকার হয়েছি। আমার সব ভুলভ্রান্তি, বোঝার ভুল সবই আছে ওখানে লোকে হাসার জন্য। কিন্তু এগুলোও যে মানুষের শেখার উৎস, সে-ভাবনাটাই তৃপ্তি দেয় আমাকে।

পরস্পর-বিরোধী মত প্রচারে বিশ্বাসী আমি। কারণ, এমন প্রতিবেশে সব সময় সত্যেরই জয় হয়। এ-বই আসলে আমার ব্যর্থতা আর ভুলের ফসল। তার মানে কি এই বই অভ্রান্ত?

অবশ্যই না।

তবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে এটা নিয়ে গেছে আমাকে। পাঠক হিসেবে নিজেকে আপনি নাস্তিক, সংশয়বাদী, মুসলিম, সেক্যুলার, মানবতাবাদী যা-ই মনে করুন, আপনার মনে অবশ্যই আরও প্রশ্ন জাগবে। কিংবা আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন আপনার। আমাদের এই আলোচনাকে চালিয়ে নিতে আমি সেজন্য একটি ওয়েবপেইজ তৈরি করেছি। যেকোনো প্রশ্ন, মন্তব্য, চিন্তা বা গঠনমূলক মতামত জানাতে পারেন www.hamzatzortzis.com/thedivinereality পাতায়।

এ ধরনের বইয়ের জন্য বিষয়টি একেবারে অন্যরকম। বইটি কেবল একমুখী বক্তৃতা হোক, আমি সেটা চাইনি। চেয়েছি দ্বিমুখী সংলাপ। অবশ্য এজন্য নৈতিক নিয়ম আছে। এর মানে কোনো বিদ্বেষমূলক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না (যদি না কোনো যুক্তিযুক্ত বিষয় প্রমাণে কাউকে উদ্ধৃত করেন), ব্যক্তিগত আক্রমণ অথবা মানহানিকর কথা বলা যাবে না। এগুলো বাদে সব চলবে।

একটি বিষয়ের সবকিছু একটি বইয়ে থাকে না। পরিসর ও অগ্রাধিকারের কথা ভেবে কিছু কিছু বিষয়ের জায়গা দেওয়া হয়নি এখানে। এর মানে অবশ্য এই না যে ইসলামে এর জবাব নেই।

আগ্রহীদের পরামর্শ দেব মন খোলা রাখতে। আন্তরিকতার সাথে সংলাপে যোগ দিতে।

আমাদের জীবনের দুটো বলয় আছে: একটা আমাদের কল্পনা, আরেকটা আমাদের বাস্তবতা। আমরা মনে করি দুটো বুঝি এক। কিন্তু আসলে তা না। আমাদের নেতিবাচক অতীত অভিজ্ঞতা, সীমিত বুদ্ধিমত্তা, ধারণা এবং দৃষ্টিকোণ নিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের কল্পনা। আর বাস্তবতা তো বাস্তবতাই। কিন্তু সব সময় আমরা বাস্তবতাকে বিকৃত করে এর ওপর আমাদের কল্পনা চাপিয়ে দিই। অন্যদের সঙ্গে এজন্য আমরা সহজে যুক্ত হতে পারি না। আমাদের জীবনকে মনে হয় এক বিশাল বৃত্ত: ঘুরেফিরে বিভিন্নভাবে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি। আমরা এর আগে বহুবার করেছি এমন। অতীতের অমন দু-চারটা নেতিবাচক অভিজ্ঞতা কেড়ে নিয়েছে বর্তমান মানুষদের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য। অতীতের দেওয়ালকে সাথে নিয়ে তৈরি করেছে ভবিষ্যৎ। এই একই ভুল বারবার করে যাচ্ছি আমরা।

ভবিষ্যৎ অতীতের মতো না। ধর্ম, ইসলাম, স্রষ্টার ব্যাপারে যুক্তিপ্রমাণ এবং ঐশীগ্রন্থ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা যা-ই হোক না কেন, অনুরোধ করব, বইটিতে যা পড়েছেন, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে গিয়ে ওগুলো যেন আপনার বিচারবুদ্ধিকে ছেয়ে না ফেলে।

আলোচনা, বিতর্ক এবং অন্যের সাথে আচরণ-সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহর কিছু উপদেশ দিয়ে শেষ করব এই অংশটি। ফিরাউনের কাছে ইসলামের বাণী প্রচারে মূসা নবিকে আল্লাহ আদেশ করেছিলেন কোমলভাবে কথা বলতে: "তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো; হয়তো সে উপদেশ কবুল করবে।"[৫৬০]

কালজয়ী কুরআন ব্যাখ্যাকার ইমাম কুরতুবি আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "অত্যাচারী ফিরাউনের সঙ্গে যদি মূসাকে এভাবে কোমলভাবে কথা বলার আদেশ দেওয়া হয়, তা হলে অন্যদের সাথে কথা বলার সময় এবং ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজে বারণ করার সময় অন্যদেরও এই আদেশ মানা কর্তব্য।"[৫৬১]

নবি মুহাম্মাদকে আল্লাহ আদেশ করেছেন সম্ভাব্য সেরাভাবে সুন্দর সুন্দর কথা বলে আলোচনা করতে: "বিচক্ষণতা এবং সুন্দরভাবে কথা বলে তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো। সেরা উপায়ে বিতর্ক করো।"[৫৬২]

আয়াতটি সম্বন্ধে ব্যাকরণবিদ যামাখশারি বলেছেন, "সেরা উপায়ে বিতর্ক করার মানে বিতর্কের সময়... সদয় ও ভদ্র আচরণ করা। হেঁড়ে গলায় কর্কশ স্বরে কথা না বলা।"[৫৬৩]

আলোচনার প্রতিবেশে ভালো ভালো কথা বলা ইসলামে অন্যতম সদ্‌গুণ। ভালো কথাকে ফলবান মজবুত শেকড়যুক্ত গাছের সঙ্গে তুলনা করে চমৎকার এক উদাহরণ ফুটিয়েছে কুরআন:

> "আল্লাহর দেওয়া উপমাটি খেয়াল করো। ভালো কথা যেন সুন্দর এক গাছের মতো। এর শেকড় অনেক মজবুত। শাখাগুলো আকাশচুম্বী। আল্লাহর ইচ্ছায় এ গাছ ফল দিয়ে যাচ্ছি অবিরাম। মানুষজনের ভাবনাচিন্তার জন্য আল্লাহ এরকম উপমা দেন। খারাপ কথা যেন নিকৃষ্ট গাছের মতো। মাটি থেকে এটা উপড়ে পড়ে আছে। টিকে থাকার শক্তি নেই। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসীদের তিনি দৃঢ়তা দেবেন দুনিয়ার জীবনে, পরজীবনে। অন্যদিকে দুষ্কৃতিকারীদের পাঠাবেন বিপথে। [প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে] যা ইচ্ছে তা-ই করেন তিনি।"[৫৬৪]

কালান্তরী এসব মূল্যবোধ ও শিক্ষার চর্চা করে খারাপকে আমরা সবাই ভালো দিয়ে দূর করতে পারব বলে আশা করি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি আলোচনায় ঘৃণার প্রয়োজন নেই। তা হলে মতবিরোধ হলেও বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারব: "ভালো কাজ আর খারাপ কাজ এক না। ভালোটা দিয়ে খারাপটাকে প্রতিহত করো। তা হলে দেখবে যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা ছিল সে হবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"[৫৬৫]

আয়াতটির সবচে সুন্দর দিক কী, আরবিতে 'প্রতিহত' শব্দটার মূল আরবির পরে সরাসরি কোনো কর্মবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তার মানে যেকোনো কিছুকে ভালো কিছু দিয়ে সরিয়ে দিতে হবে। বিজ্ঞজনেরা বলেন, এর মানে যা অধিক গুণসম্পন্ন, অধিক সুন্দর তা দিয়ে সাড়া দিতে হবে যেকোনো কিছুর।

চলুন আমরা গুণবান এবং সুন্দর মনের মানুষ হই।

প্রান্তটীকা

[১] বুলিভ্যান্ট, এস. (২০১৫)। ডিফাইনিং 'এথিজম'। দা অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ এথিজম। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ১১-২১।

[২] শোয়েজার, বি. (২০১০)। হেটিং গড: দা আনটোল্ড স্টোরি অফ মিসোথিজম। নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ২৮।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৬।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮।

[৬] প্রকৃতিবাদ বলতে বোঝায় জগতে ঘটা সকল ব্যাপারকেই প্রাকৃতিকভাবে ঘটা বলে দাবি করা। অতি-প্রাকৃতিক কোনো কিছুতে অবিশ্বাস করার নামই হলো প্রকৃতিবাদ—অনুবাদ সম্পাদক।

[৭] ডকিন্স, আর. (২০০৬)। দা গড ডিলিউশন। লন্ডন: ব্যান্টাম প্রেস, পৃষ্ঠা ১৪।

[৮] মুসলিম।

[৯]

[১০] কুরআন, ২:১৩০

[১১] ক্রোন, পি.। এথিজম (প্রি-মডার্ন)। এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম, থ্রি, সম্পাদনা: কেইট ফ্লিট, গুদরুন ক্র্যামার, ডেনিস ম্যাটরিঞ্জ, জন নাওয়াস, এভারেট রোসন। http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_23358 [Accessed 1st October 2016].

[১২] প্রাগুক্ত

[১৩] গাজালি (২০০৭)। কিমিয়ায়ে সাআদাত: দা অ্যালকেমি অফ হ্যাপিনেস। অনুবাদ: ক্লদ ফিল্ড। কুয়ালালামপুর: ইসলামিক বুক ট্রাস্ট, পৃষ্ঠা ২২। অনুবাদক এখানে চিকিৎসকের কথা বলেছেন। তবে মূল পাঠে নির্দেশ করা হয়েছে যারা আল্লাহর তত্ত্বাবধানকে অস্বীকার করেন।

[১৪] কুরআন, ১০:৯৯

[১৫] কুরআন, ২:২৫৬

[১৬] ইদরিস, জে. (২০১২)। অ্যান ইসলামিক ভিউ অফ পিসফুল কো-এক্সিসটেন্স। www.jaafaridris.com/an-islamic-view-of-peaceful-coexistence [Accessed 1st October 2016]

[১৭] ব্রেমার, জে.এন. (২০০৭)। এথিজম ইন অ্যান্টিকিটি। সম্পাদনা: এম. মার্টিন। দা ক্যামব্রিজ কম্প্যানিয়ন টু এথিজম, প্রথম সংস্করণ। নিউ ইয়র্ক: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ১১।

[১৮] হায়মান, জি. (২০০৭)। এথিজম ইন অ্যান্টিকিটি। সম্পাদনা: এম. মার্টিন। দা ক্যামব্রিজ কম্প্যানিয়ন টু এথিজম, প্রথম সংস্করণ। নিউ ইয়র্ক: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ২৯।

[১৯] এডিসন, জে. (১৭৫৩)। দা এভিডেন্স অফ দা ক্রিস্টিয়ান রেলিজিয়ন। লন্ডন, পৃষ্ঠা ২২৩-২২৪।

[২০] হায়মান, জি. (২০০৭)। এথিজম ইন মডার্ন হিস্টোরি, পৃষ্ঠা ৩১।

[২১] ব্র্যাডলাফ, সি. (১৯২৯)। হিউম্যানিটি'স গেন ফ্রম আনবিলিফ অ্যান্ড আদার সিলেকশনস ফ্রম দা ওয়ার্কস অফ চার্লস ব্র্যাডলাফ। লন্ডন: ওয়াটস অ্যান্ড কো. দি থিংকার্স লাইব্রেরি, নং ৪।

[২২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩।

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১।

[২৪] মডার্নাইজিং দা কেইস ফর গড। টাইম ম্যাগাজিন, ৭ এপ্রিল ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬। http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,921990,00.html [Accessed 2nd October 2016]

[২৫] ক্রিক, এফ. (১৯৮২)। লাইফ ইটসেলফ: ইটস অরিজিন অ্যান্ড নেচার। লন্ডন: ফিউচুরা

পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা ১১৭-১২৯।

[২৬] হিচেনস, সি. (২০০৭)। গড ইজ নট গ্রেট: দা কেইস অ্যাগেন্সট রেলিজিয়ন। নিউ ইয়র্ক: আটলান্টিক বুকস, পৃষ্ঠা ১৩।

[২৭] হ্যারিস, এস. (২০০৬)। দা এন্ড অফ ফেইথ: রেলিজিয়ন, টেরর অ্যান্ড দা ফিউচার অফ রিজন। লন্ডন: দা ফ্রি প্রেস, পৃষ্ঠা ২২৭।

[২৮] ডকিন্স, আর. (২০০৬)। দা গড ডিলিউশন, পৃষ্ঠা ২০।

[২৯] উইলিয়াম, পি.এস. (২০০৯)। আ স্কেপটিক'স গাইড টু এথিজম। মিলটন কিনস: প্যাটারনস্টার; পৃষ্ঠা ৪১।

[৩০] ফাইন টিউনিং বা নিপুণ নকশা হলো- মহাবিশ্বের সব উপাদানগুলো বিস্ময়করভাবে এমন এক উপায়ে সংঘবদ্ধ হয়েছে যে, যার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলেই বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ছিল- অনুবাদ সম্পাদক।

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪।

[৩২] অফিস অভ ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকস (২০১১)। http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-localauthorities-in-england-and-wales/rpt-religion.html#tab-Changing-picture-of-religiousaffiliation-over-last-decade. [Accessed 1st October 2016]

[৩৩] বায়োটেকনলজি রিপোর্ট। ফিল্ডওয়ার্ক জানুয়ারি ২০১০-ফেব্রুয়ারি ২০১০। ব্রুক্সেলস: টিএনএস অপিনিয়ন অ্যান্ড স্যোশাল, পৃষ্ঠা ২০৩। http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf [Accessed 1st October 2016]

[৩৪] চীনে নাস্তিকতাবাদের ইতিহাস পশ্চিমা নাস্তিকতাবাদের মতো নয়। এখানকার নাস্তিকতাবাদ ডারউইনবাদ বা ডকিন্সীয় নব্য নাস্তিকতাবাদের কারণে না। এখানে কারণ এখানকার নিজস্ব সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিজাত অনুঘটক। এটাকে আলাদা চোখে দেখতে হবে।

[৩৫] জাকারম্যান, পি. (২০০৭)। এথিজম: কন্টেম্পরারি নাম্বারস অ্যান্ড প্যাটার্নস। এম. মার্টিন সম্পাদিত। দা ক্যামব্রিজ কম্প্যানিয়ন টু এথিজম, পৃষ্ঠা ৬১।

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫।

[৩৭] ডব্লিউ আই এন-গ্যালাপ ইন্টারন্যাশনাল, (২০১২)। গ্লোবাল ইনডেক্স অভ রেলিজিয়সিটি অ্যান্ড এথিজম, পৃষ্ঠা ১৬। http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf [Accessed 2nd October 216]

[৩৮] এই অধ্যায়ের কিছু কিছু ধারণার প্রেরণা ক্রেগ ডব্লিউ এল থেকে নেওয়া। 'সৃষ্টিকর্তা ছাড়া জীবনের অনর্থকতা' লেখাটি পাওয়া যাবে: http://www.reasonablefaith.org/the-absurdityof-life-without-god [Accessed 23rd November 2016]

[৩৯] সোফেনহর, এ. (২০১৪)। স্টাডিজ ইন পেসিমিজম: অন দা সাফারিংস অফ দা ওয়ার্ল্ড। [ইবই] দা ইউনিভার্সিটি অফ এডিলেড লাইব্রেরি। অধ্যায় ১। Available at: https://ebooks.adelaide.edu.au/s/schopenhauer/arthur/pessimism/chapter1.html [Accessed 2nd October 2016].

[৪০] কুরআন, ১২:৮৭

[৪১] কুরআন, ৯৯:৬-৮

[৪২] কুরআন, ৪৫:২২

[৪৩] কুরআন, ৫০:৩৫

[৪৪] কুরআন, ১০:২৬

[৪৫] কুরআন, ৩৬:৫৫-৫৮

[৪৬] কুরআন, ১৭:৭০

[৪৭] কুরআন, ৩:১৯১

[৪৮] কুরআন, ৩২:১৮

[৪৯] বস্তুনিরপেক্ষ বা Objective বলতে বোঝায় যে কাজের নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য আছে, এরকম—অনুবাদ সম্পাদক।

[৫০] ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা Subjective বলতে বোঝায় যার উদ্দেশ্যটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ, নিজেকে প্রকাশ করা, তুলে ধরাই যার মুখ্য উদ্দেশ্য—অনুবাদ সম্পাদক।

[৫১] নাস্‌র, এস.এইচ (২০০৪)। দা হার্ট অফ ইসলাম: এনডিউরিং ভ্যালুজ অফ হিউম্যানিটি। নিউ ইয়র্ক: হার্পারস্যানফ্রান্সিস্কো, পৃষ্ঠা ২৭৫

[৫২] কুরআন, ৫৭:২০-২১

[৫৩] বিবিসি রেডিও ৪ - ইন আওয়ার টাইমস - গ্রেটেস্ট ফিলোসফার — লুডউইগ উইটজেন্সটেন। http://www.bbc.co.uk/radio4/history/inourtime/greatest_philosopher_ludwig_wittgenstein.shtml [Accessed 1st October 2016]

[৫৪] পলান, এস.এম. এবং লেভিন, এম. (২০০৬)। ইট'স অল ইন ইয়োর হেড: থিংকিং ইয়োর ওয়ে টু হ্যাপিনেস। নিউ ইয়র্ক: হার্পারকলিন্স, পৃষ্ঠা ৪।

[৫৫] উইলিয়ামস, এম. (২০১৫) দা লাইফ সাইক্‌ল অফ দা সান। http://www.universetoday.com/18847/life-of-the-sun/ [Accessed 2nd October 2016]

[৫৬] কুরআন, ৩:৯০

[৫৭] ডিএনএ হলো জীবনের আধার। ডিএনএ-তে আমাদের শারীরিক সকল তথ্য মজুদ থাকে। ডিএনএ-তে তথ্য সঞ্চারকেই বিবর্তনবাদীরা জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে, যা নিছক ছেলেমানুষি—অনুবাদ সম্পাদক।

[৫৮] ডকিন্স, আর. (২০০৬) দা সেলফিশ জিন। ৩০তম বার্ষিক সংস্করণ। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

[৫৯] কুরআন, ৭:১২৮

[৬০] কুরআন ৩৯:২৯

[৬১] মোগাহেদ, ওয়াই. (২০১৫)। রিক্লেম ইয়োর হার্ট। ২য় সংস্করণ। স্যান ক্লেমেন্তে, ক্যালিফোর্নিয়া: এফবি পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ৫৫।

[৬২] ডকিন্স, আর. (২০০১)। রিভার আউট অভ এডেন: আ ডারউইনিয়ান ভিউ অভ লাইফ। লান্ডান: ফনিক্স, পৃষ্ঠা ১৫৫।

[৬৩] বনয়ুর, লরেন্স (১৯৯৮)। ইন ডিফেন্স অফ পিউর রিজন। ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ১০০-১০২।

[৬৪] বনয়ুর, লরেন্স (১৯৯৫)। "টুওয়ার্ড আ মডারেইট র‍্যাশনালিজম।" দার্শনিক বিষয়াদি ২৩, সংখ্যা ১:৫০।

[৬৫] বিজ্ঞানের বুনিয়াদি অনুমান (তারিখ নেই)। http://undsci.berkeley.edu/article/basic_assumptions [Accessed 14th November 2016]

[৬৬] ডারউইন করেসপনডেন্স প্রজেক্ট (২০১৬)। https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-13230.xml [Accessed 4th October 2016]

[৬৭] ও'হার, এ. (১৯৯৭)। বিয়ন্ড এভোল্যুশান: হিউম্যান ন্যাচার অ্যান্ড দা লিমিটস অফ এভোল্যুশনারি এক্সপ্লেনেশান। নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৬০।

[৬৮] গ্রে, জে. (২০১৪)। দা ক্লোজড মাইন্ড অভ রিচার্ড ডকিন্স। https://newrepublic.com/article/119596/

appetite-wonder-review-closed-mind-richarddawkins [Accessed 4th October 2016]

[৬৯] ফ্র্যান্সিস, সি. (১৯৯৪) দা অ্যাস্টনিশিং হাইপোথিসিস: দা সায়েন্টিফিক সার্চ ফর দা সোল। নিউ ইয়র্ক: স্ক্রিবেনার'স সন্স, পৃষ্ঠা ২৬২।

[৭০] পিংকার, এস. (১৯৯৭)। হাউ দা মাইন্ড ওয়ার্কস। নিউ ইয়র্ক: ডব্লিউ. ডব্লিউ. নরটন, পৃষ্ঠা ২০৫।

[৭১] হ্যারিস, এস. (২০০৫)। দা মোরাল ল্যান্ডস্কেইপ। নিউ ইয়র্ক: ফ্রি প্রেস, পৃষ্ঠা ৬৬।

[৭২] কুরআন, ৪১:৫৩।

[৭৩] কুরআন, ৪৭:২৪।

[৭৪] কুরআন, ১১:৫১।

[৭৫] কুরআন, ৩:১৯০।

[৭৬] ট্যালিস, রেমন্ড (২০১৪)। এপিং ম্যানকাইন্ড: নিউরোম্যানিয়া, ডারউইনিতিস অ্যান্ড দা মিসরেপ্রেজেন্টেশান অভ হিউম্যানিটি। নিউ ইয়র্ক: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ৮৭।

[৭৭] সার্ল, জে (১৯৮৯) থেকে। জ্যাকেটের উত্তরে। ফিলোসফি অ্যান্ড ফেনোমিনোলজিকাল রিসার্চ, ৪৯(৪), ৭০৩।

[৭৮] এই আপত্তটির জবাবের ধারণা কেইন বি থেকে নেওয়া (২০১৪)। ফিলোসফি অভ মাইন্ড ৪.২ - অবজেকশানস টু ফাংশনালিজম। https://www.youtube.com/watch?v=ZmEk1lq_Wgk [Accessed 24th October 2016]

[৭৯] সার্লে, জে. (১৯৮৪)। মাইন্ডস, ব্রেনস অ্যান্ড সায়েন্স। ক্যাম্বব্রিজ, ম্যাস: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।

[৮০] সার্লে, জে. (১৯৯০)। ইজ দা ব্রেন'স মাইন্ড আ কাম্পিউটার প্রোগ্রাম? সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান ২৬২:২৭।

[৮১] প্রাগুক্ত।

[৮২] প্রাগুক্ত। অন্যান্য আপত্তির জবাব এবং আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন: সার্লে, জে. (১৯৮০) মাইন্ডস, ব্রেনস অ্যান্ড প্রোগ্রামস। বিহেভিয়রাল অ্যান্ড ব্রেন সায়েন্সেস ৩: ৪১৭-৪২৪; সার্লে, জে. (১৯৮০) ইন্ট্রিনজিক ইন্টেনশনালিটি। বিহয়েভিয়রাল অ্যান্ড ব্রেন সায়েন্সেস ৩:৪৫০-৫৪৬; সার্লে, জে. (১৯৮৯)। জ্যাকেটের উত্তরে। ফিলোসফি অ্যান্ড ফেনোমিনোলজিকাল রিসার্চ, ৪৯(৪), ৭০১-৭০৮; সার্লে জে. (১৯৯০) ইজ দা ব্রেন'স মাইন্ড আ কাম্পিউটার প্রোগ্রাম? সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান ২৬২:২৬-৩১; সার্লে, জে. (১৯৯২), দা রিডিসকভারি অভ দা মাইন্ড। ক্যামব্রিজ, এমএ: এমআইটি প্রেস।

[৮৩] হ্যাসকার, উইলিয়াম। মেটাফিজিকস। ডাওনার্স গ্রোভ, ইল: ইন্টার ভারসিটি, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৪৯, আরও দেখুন: "দা ট্র্যানসিডেন্টাল রেফ্যুটেশান অভ ডেটারমিনিজিম," সাউদার্ন জার্নাল অভ ফিলোসফি ১১, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৭৫-৮৩।

[৮৪] বিবিসি টুডে। (২০০৮)। http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_7745000/7745514.stm [Accessed 1st October 2016

[৮৫] ইবনু তাইমিয়্যা, এ. (১৯৯১)। দার তারুদ আল-আক্ল ওয়ান-নাক্ল। ২য় সংস্করণ। সম্পাদনা: মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম, জামিআ আল-ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল-ইসলামিয়া। খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৮২।

[৮৬] ইসফাহানি, রাগিব। (২০০৯)। মুফরাদাতুল-কুরআনিল-কারিম। ৪থ সংস্করণ। সম্পাদনা: সাফওয়ান দাউদি। বৈরুত: আদ-দার আশ-শামিয়া, পৃষ্ঠা ৬৪০।

[৮৭] পেত্রোভিচ, ও। (১৯৯৭)। আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা নন-ন্যাচারাল কজালিটি ইন চিলড্রেন অ্যান্ড

অ্যাডাল্টস: আ কেইস এগেন্সট আর্টিফিশিয়ালিজম। সাইকি এন গিলুফ, ৮: ১৫১-১৬৫।
[৮৮] জাওয়ার্তজ, বি. (২০০৮)। ইনফ্যান্টস 'হ্যাভ নাচারাল বিলিফ ইন গড'। http://www.theage.com.au/national/infants-have-natural-belief-in-god-20080725-313b.html [Accessed 4th October 2016]
[৮৯] ব্লুম, পি. (২০০৭)। রিলিজিয়ন ইজ ন্যাচারাল। ডিভেলপমেন্টাল সায়েন্স, ১০: ১৪৭-১৫১।
[৯০] কেলেমেন, ডি. (২০০৪)। আর চিলড্রেন "ইনটুইটিভ থিস্টস"? রিজনিং অ্যাবাউট পার্পাস অ্যান্ড ডিজাইন ইন ন্যাচার। সাইকোলজিকাল সায়েন্স, ১৫ (৫), ২৯৫-৩০১।
[৯১] জার্নফেল্ট, ই., ক্যানফিল্ড, সি.এফ. অ্যান্ড কেলেমেন, ডি. (২০১৫)। দা ডিভাইডেড মাইন্ড অভ আ ডিসবিলিভার: ইনটুইটিভ বিলিফস অ্যাবাউট ন্যাচার অ্যাজ পারপাজফুলি ক্রিয়েটেড অ্যামাং ডিফারেন্ট গ্রুপস অভ নন-রিলিজিয়াস অ্যাডাল্টস। কাগনিশন ১৪০:৭২-৮৮।
[৯২] প্রাগুক্ত।
[৯৩] প্রাগুক্ত, ৭৯।
[৯৪] প্রাগুক্ত, ৮১।
[৯৫] প্রাগুক্ত, ৮২।
[৯৬] প্রাগুক্ত, ৮৩।
[৯৭] প্রাগুক্ত, ৮৪।
[৯৮] প্রাগুক্ত।
[৯৯] করিভু, কে. এইচ., চেন, ই. ই. অ্যান্ড হ্যারিস, পি. এল. (২০১৫), জাজমেন্টস অ্যাবাউট ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিকশান: চিলড্রেন ফ্রম রিলিজিয়াস অ্যান্ড নন-রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ডস। Cogn Sci, 39: 353-382. doi:10.1111/cogs.12138
[১০০] ব্যারেট, জে. এল. (২০১২) বর্ন বিলিভার্স: দা সায়েন্স অভ চিলড্রেন'স রিলিজিয়াস বিলিফ। নিউ ইয়র্ক: ফ্রি প্রেস, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬।
[১০১] আসকালানি, এ. (২০০০)। ফাতহুল-বারি: শারহু সাহিহিল-বুখারি। ৩য় সংস্করণ। রিয়াদ: দারুস-সালাম, পৃষ্ঠা ৩১৬।
[১০২] মুসলিম
[১০৩] গাজালি (২০০৭)। কিমিয়ায়ে সাআদাত: দা অ্যালকেমি অভ হ্যাপিনেস। অনুবাদ: ক্লদ ফিল্ড। কুয়ালা লামপুর: ইসলামিক বুক ট্রাস্ট, পৃষ্ঠা ১০।
[১০৪] ইবনু তাইমিয়্যাহ, এ. (২০০৪) মাজমুউল-ফাতওয়া শাইখুল-ইসলাম আহমাদ বিন তাইমিয়্যা। মাদিনা: মুজামা' মালিক ফাহাদ। খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ৩২৪।
[১০৫] প্রাগুক্ত। খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭৩।
[১০৬] ইবনু তাইমিয়্যাহ, এ. (১৯৯১) দারু তাআরুদুল-আকলি ওয়ান-নাকলি। খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২১৯।
[১০৭] কুরআন, ১৬:৬৯
[১০৮] কুরআন, ১০:২৪
[১০৯] কুরআন, ৫২:৩৫-৩৬
[১১০] কুরআন, ২৮:৫৬
[১১১] ফারফুর, এম. এস. (২০১০)। দা বেনিফিশিয়াল মেসেজ অ্যান্ড দা ডেফিনিটিভ প্রুফ ইন দা স্টাডি থিয়োলজি। অনুবাদ ও নোট: ওয়েসাম চারকাউই। অবার্ন: ওয়েসাম চারকাউই, পৃষ্ঠা ৮৬।
[১১২] গোয়াইন, এর. ডব্লিউ. (২০০৪) লজিক, রিটোরিক অ্যান্ড লিগ্যাল রিজনিং ইন দা কুরআন: গড'স আর্গুমেন্টস। অ্যাবিংডন: রাউটলেজ। ২০০৪, পৃষ্ঠা ix।
[১১৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৩।

[১১৪] হুভার, জে. (২০০৭)। ইবনু তাইমিয়্যা'স থিয়োডিসি অভ পার্পেচুয়াল অপটিজিম। লিডেন: ব্রিল, পৃষ্ঠা ৩১।
[১১৫] কুরআন, ৫২:৩৫-৩৬
[১১৬] মোহর, এম. এ. (২০০৩)। আ ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড মিনিং অভ দা কুরআন, খণ্ড ৩। ইপসউইচ: জিমাস, পৃষ্ঠা ১৭১৩।
[১১৭] ধারণাটি নেওয়া হয়েছে: ইদ্রিস, জে. (১৯৯৪)। দা কন্টেম্পরারি ফিজিসিস্টস অ্যান্ড গড'স এক্সিসটেন্স http://www.jaafaridris.com/the-contemporary-physicists-and-gods-existence/ [Accessed 23rd November 2016]
[১১৮] হিলবার্ট, ডি. (১৯৬৪)। অন দা ইনফিনাইট। পি. বেনাকেরাফ অ্যান্ড এইচ পুতনাম (সম্পাদক), ফিলসফি অভ ম্যাথমেটিকস: সিলেক্টেড রিডিংস। ইঙ্গলউড ক্লিফস, এনজে: প্রেনটিস-হল, পৃষ্ঠা ১৫১।
[১১৯] কোয়াইন: টার্মস এক্সপ্লেনড। http://www.rit.edu/cla/philosophy/quine/underdetermination.html [Accessed 23rd October 2016]
[১২০] অ্যামেরিকান ফিজিকাল সোসাইটি। (১৯৯৮) ফোকাস: দা ফোর্স অভ এমপ্টি স্পেইস। http://physics.aps.org/story/v2/st28 [Accessed 23rd November 2016]
[১২১] লিবনিজ, জি. ডব্লিউ (১৭১৪) দা প্রিন্সিপ্লস অভ নেচার অ্যান্ড গ্রেইস, বেইসড অন রিজন। ১৭১৪। http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/leibniz1714a.pdf [Accessed 4th October 2016]
[১২২] ক্রাউস এল. এম. (২০১২) আ ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং: ওয়াই ইজ দেয়ার সামথিং র‍্যাদার দ্যান নাথিং। লান্ডান: সিমন অ্যান্ড শুস্টার, পৃষ্ঠা ১৭০।
[১২৩] প্রাগুক্ত।
[১২৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৫।
[১২৫] অ্যালবার্ট, ডি. (২০১২) 'আ ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং,' লরেন্স এম. কর্স। http://www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-bylawrence-m-krauss.html?_r=0 [Accessed 1st October 2016]
[১২৬] ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. (২০১২)। আ ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং। http://www.reasonablefaith.org/a-universe-from-nothing [Accessed 9th October 2016]
[১২৭] ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. (২০১২) থেকে তুলনাগুলো নেয়া। আ ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং। http://www.reasonablefaith.org/a-universe-from-nothing [Accessed 9th October 2016]
[১২৮] ক্রাউস, এল. এম. (২০১২) আ ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং: ওয়াই ইজ দেয়ার সামথিং র‍্যাদার দ্যান নাথিং। লান্ডান: সিমন অ্যান্ড শুস্টার, পৃষ্ঠা ১৭৪।
[১২৯] সোবার, ই. (২০১০)। এমপিরিসিজম। জিলস, এস এবং কার্ড, এম (সম্পাদক)। দা রাউটলেজ কমপেনিয়ন অভ ফিলসোফি অভ সায়েন্স। এবিংডন: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮।
[১৩০] ক্রস, এল. এম. (২০১২) আ ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং। পৃষ্ঠা xiii।
[১৩১] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৪৭।
[১৩২] আইইআরএ। (২০১৩)। লরেন্স ক্রাউস বনাম হামজা জর্জিস — ইসলাম বনাম নাস্তিকতা বিতর্ক। http://www.youtube.com/watch?v=uSwJuOPG4FI [Accessed 10th September 2016]
[১৩৩] টনি সোবরাদো। (২০১২)। হাউ দা ইউনিভার্স কেইম ফ্রম 'নাথিং', রিচার্ড ডকিন্স অ্যান্ড লরেন্স ক্রাউস আলাপ। https://youtu.be/CXGyesfHzew?t=921 [Accessed 2nd October 2016]

[১৩৪] ওয়ালিউল্লাহ, এস. (২০০৩)। দা কনক্লুসিভ আর্গুমেন্ট ফ্রম গড (হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা)। অনুবাদক: মার্সিয়া কে. হার্মানসেন। ইসলামাবাদ: ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পৃষ্ঠা ৩৩।
[১৩৫] বায়হাকি, এ. (২০০৬)। কিতাবুল-আসমা ওয়াস-সিফাত। সম্পাদনা: আবদুল্লাহ হাশিদি। কায়রো: মাকতাবাতুস-সুওয়াদি। খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭১।
[১৩৬] উদাহরণটি নেওয়া হয়েছে 'দা ম্যান ইন দা রেড আন্ডারপ্যান্টস', গ্রিন, এ. আর. বই থেকে। ২য় সংস্করণ। লান্ডান: ওয়ান রিজন, পৃষ্ঠা ৯-১০।
[১৩৭] ইদরিজ, জে. (২০০৬), কন্টেম্পরারি ফিজিসিস্টস অ্যান্ড গড'স এক্সিসটেন্স (খণ্ড ৩ এর ২): আ সিরিজি অভ কজেজ। http://www.islamreligion.com/articles/491/ [Accessed 2nd October 2016] উদাহরণটি এখান থেকে নেওয়া
[১৩৮] ইদরিস, জে. (২০০৬) কন্টেম্পরারি ফিজিসিস্টস অ্যান্ড গড'স এক্সিসটেন্স (খণ্ড ৩ এর ২): আ সিরিজি অভ কজেজ। http://www.islamreligion.com/articles/491/ [Accessed 2nd October 2016]
[১৩৯] গুডম্যান, এল. এ. (১৯৭১) গাজালি'স আর্গুমেন্ট ফ্রম ক্রিয়েশন (1)। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অভ মিডল ইস্ট স্টাডিজ, খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ৮৩।
[১৪০] ফ্লিউ, এ. (২০০৭)। দেয়ার ইজ আ গড: হাউ দা ওয়ার্ল্ড'স মস্ট নটরিয়াস এথিস্ট চেইনজড হিজ মাইন্ড। নিউ ইয়র্ক: হার্পারওয়ান। ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৬৫।
[১৪১] বুখারি
[১৪২] বায়হাকি, এ. (২০০৬)। কিতাবুল-আসমা ওয়াস-সিফাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭০।
[১৪৩] কুরআন, ১১২:২-৩
[১৪৪] লেনক্স, জে.সি. (২০০৯)। গড'স আন্ডারটেইকার: হ্যাজ সায়েন্স বারিড গড? অক্সফোর্ড: লায়ন বুকস, পৃষ্ঠা ১৮৩।
[১৪৫] হুভার, জে. (২০০৪)। পার্পেচুয়াল ক্রিয়েটিভিটি ইন দা পার্ফেকশান অভ গড: ইবনু তাইমিয়্যা'স হাদিস কমেন্টারি অন গড'স ক্রিয়েশন অভ দিস ওয়ার্ল্ড। জার্নাল অভ ইসলামিক স্টাডিজ ১৫(৩):২৯৬।
[১৪৬] কুরআন, ৪২:১১।
[১৪৭] 151
[১৪৮] পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাজগতের আনুমানিক সব তারায় যে-পরিমাণ হাইড্রোজেনে পরমাণু থাকতে পারে তার ওপর ভিত্তি করে এই অনুমান। বাকি সব পরমাণু ধরলে সংখ্যাটা আরও বেশি হবে।
[১৪৯] কুরআন, ২৪:৪৫।
[১৫০] তাহাউই (২০০৭)। দা ক্রিড অভ ইমাম তাহাউই। ভূমিকা ও টীকা: হামজা ইউসুফ। ক্যালিফোর্নিয়া: জাইতুনা ইন্সটিটিউট, পৃষ্ঠা ৫০।
[১৫১] কুরতুবি, এম. (২০০৬)। আল-জামিউল-আহকামুল-কুরআন। সম্পাদনা: ড. আবদুল্লাহ তুর্কি, মুহাম্মাদ আরকাসুসি। বৈরুত: মুআস্সাসাল-রিসালাহ। খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৮-৩৩৯।
[১৫২] ক্রেগ, ডব্লিউ. এল.। দা কোহেরেন্স অভ থিজম — খণ্ড ২ থেকে অনুপ্রাণিত। Available at: http://www.bethinking.org/god/the-coherence-of-theism/part-2 [Accessed 13th November 2016]
[১৫৩] সোয়াইনবার্ন, আর. (২০০৪)। দা এক্সিস্টেনস অভ গড। ২য় সংস্করণ। নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ৫২-৭২।
[১৫৪] কুরআন, ১১:১০৭
[১৫৫] আল-গাজালি, এম. (২০০৫)। ইহ্‌য়া উলুমুদ-দিন। বৈরুত: দার ইবনু হাজ্‌ম। পৃষ্ঠা ১০৭।

[১৫৬] রানজাওয়া, এস (২০০১)। দা কালাম কসমোলজিকাল আর্গুমেন্ট অ্যান্ড দা প্রবলেম অভ ডিভাইন ক্রিয়েটিভ এজেন্সি অ্যান্ড পার্পাস। খসড়া সংস্করণ। Available at: http://www.academia.edu/29016615/The_Kal%C4%81m_Cosmological_Argument_and_the_Problem_of_Divine_Creative_Agency_and_Purpose [Accessed 22nd October 2016]

[১৫৭] ওয়েনরাইট, ডব্লিউ. জে. (১৯৮৮)। ফিলসফি অভ রেলিজিয়ন। ২য় সংস্করণ। বেলমন্ত, সিএ: ওয়াডওয়র্থ পাবলিশিং।

[১৫৮] কুরআন, ৩:৯৭।

[১৫৯] কুরআন, ৩৫:১৫।

[১৬০] ইবনু কাসির, ই. (১৯৯৯)। তাফসিরুল-কুরআনুল-আজিম। সম্পাদনা: সামি সালামা। ২য় সংস্করণ। রিয়াদ: দার তায়্যিবা। খণ্ড ৬। পৃষ্ঠা ৫৪১।

[১৬১] হুসাইন, এস. (১৯৯৩)। অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক কসমলজিকাল ডকট্রিনস। অ্যালবানি: স্টেইট য়ুনিভার্সিটি অভ নিউ য়র্ক প্রেস, পৃষ্ঠা ১৯৭-২০০।

[১৬২] গাজালি, এম. (১৯৬৪)। ফাদাইতুল-বাতিনিয়্যা। সম্পাদনা: আবদুররাহমান বাদাউই। কুয়েত: মুয়াসাস্সা দারুল-কুতুবুল-সিকাফা, পৃষ্ঠা ৮২।

[১৬৩] ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. (২০০৮)। রিজনেবল ফেইথ: ক্রিস্টিয়ান ট্রুথ অ্যান্ড অ্যাপলজেটিকস। ৩য় সংস্করণ। উইটন, ইলিয়নস: ক্রসওয়ে বুকস। পৃষ্ঠা ১০৯।

[১৬৪] গডউইন, এস. জে. (তারিখ নেই)। ট্র্যান্সক্রিপ্ট অভ দা রাসেল/কাপ্ল্সটন রেডিয়ো ডিবেইট। http://www.scandalon.co.uk/philosophy/cosmological_radio.htm [Accessed 4th October 2016]

[১৬৫] ক্রেইগ, ডব্লিউ. এল. রিজনেবল ফেইথ অবলম্বনে। http://www.reasonablefaith.org/defenders-1-podcast/transcript/s04-01 [Accessed: 24th October 2016]

[১৬৬] ইটন, জি. (২০০১)। রিমেম্বারিং গড: রেফ্লেকশনস অন ইসলাম। লাহোর: সুহাইল অ্যাকাডেমি, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

[১৬৭] নিউ সায়েন্টিস্ট: দা কালেকশান। দা বিগ কোয়েশ্চনস। খণ্ড ১, সংখ্যা ১, পৃষ্ঠা ৫১।

[১৬৮] কচ, সি. (২০১২)। কনশাসনেস: কনফেশনস অভ আ রোম্যান্টিক রিডাকশনিস্ট। ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস: এমআইটি প্রেস, পৃষ্ঠা ২৩-২৪।

[১৬৯] শ্যালমার্স, ডি. (২০১০)। দা কারেক্টার অভ কনশাসনেস। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিতি প্রেস, পৃষ্ঠা ৫।

[১৭০] অ্যাল্টার, টি. (২০১৪)। হার্ড প্রবলেমফ অভ কনশাসনেস। বেনে, টি., ক্লিরম্যান্স, এ. এবং উইলকেন, পি (সম্পাদনা)। দা অক্সফোর্ড কম্প্যানিয়ন টু কনশাসনেস। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৩৪০।

[১৭১] পয়েন্ট ৫টি শ্যালমার্স, ডি. (২০১০)। দা কারেক্টার অভ কনশাসনেস থেকে নেওয়া

[১৭২] ডিসকভার ম্যাগাজিন। (২০১৬)। ওয়াট ইজ কনশাসনেস?। ডিসকভার ম্যাগাজিন.কম http://discovermagazine.com/1992/nov/whatisconsciousn149. [Accessed 1st October 2016]

[১৭৩] রেভনসু, এ. (২০১০)। কনশাসনেস: দা সায়েন্স অভ সাবজেক্টিভিটি। হোভ, ইস্ট সাসেক্স: সাইকলজি প্রেস, পৃষ্ঠা ২০২।

[১৭৪] মানজতি, আর. এবং মোদারেতো, পি. (২০১৪)। নিউরোসায়েন্স: ডুয়ালিজম ইন ডিজগুইজ। লাভাজ্জা, এ এবং রবিনসন, এইচ (সম্পাদিত) কন্টেম্পরারি ডুয়ালিজম: আ ডিফেন্স। অ্যাবিংডন:

রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ৮২।
[১৭৫] প্রাগুক্ত
[১৭৬] শ্যালমার, ডি. (২০১০) দা কারেক্টার অভ কনশাসনেস, পৃষ্ঠা ১০৫।
[১৭৭] লিভাইন, জে. (২০১১)। দা এক্সপ্লানেটরি গ্যাপ। বেনে, টি., ক্লিরম্যানস, এ. এবং উইলকেন, পি. (সম্পাদিত)। দা অক্সফোর্ড কমপ্যানিয়ন টু কনশাসনেস। অক্সফোর্ডঃ অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ২৮০।
[১৭৮] জ্যাকসন, এফ. (১৯৮৬) ওয়াট ম্যারি ডিডন'ট নো। দা জার্নাল অভ ফিলোসফি, খণ্ড ৮৩, সংখ্যা ৫: ২৯১-২৯৫
[১৭৯] চ্যালমার্স, ডি. (২০১০) দা কারেক্টার অভ কনশাসনেস, পৃষ্ঠা ১০৮।
[১৮০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯।
[১৮১] লোর, ব্রায়ান (১৯৯৭)। "ফেনোমেনাল কনশাসনেস", দা ন্যাচার অভ কনশাসনেসঃ ফিলোসফিক্যাল ডিবেইটস। সম্পাদনাঃ নেড ব্লক এবং অন্যান্য। ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটসঃ এমআইটি প্রেস।
[১৮২] দর্শনে স্নাতক করতে গিয়ে দেয়া প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন লেকচার ও সেমিনার থেকে। পিটারসন, এস. (২০১৬) সপ্তা ৬ঃ রেসপন্সেস টু দা মডাল অ্যান্ড নলেজ আর্গুমেন্টস। ফিলোসফি অভ মাইন্ড অ্যাট বার্কবেক কলেজ, য়ুনিভার্সিটি অভ লন্ডন, নভেম্বর ১৬, ২০১৬ তারিখে দেয়া লেকচার নোটস থেকে
[১৮৩] টাই, মাইকেল (২০০৯) কনশাসনেস রিভিজিটেডঃ ম্যাটেরিয়ালিজম উইদাউট ফেনোমেনাল কনসেপ্টস। ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটসঃ এমআইটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৪৯-৫১।
[১৮৪] ডিমির্কিগলু, এরহান (২০১৩) "ফিজিকালিজম অ্যান্ড ফেনোমেনলা কনসেপ্টস" ফিলোসফিক্যাল স্টাডিজঃ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ফর ফিলোসফি ইন দা অ্যানালইটিক ট্র্যাডিশন ১৬৫, সংখ্যা ১।
[১৮৫] চ্যালমার্স, ডি. (২০০৭) ফেনোমেনাল কনশাসনেস অ্যান্ড দা এক্সপ্লেনেটরি গ্যাপ। অল্টার, টি. এবং ওয়াল্টার, এস (সম্পাদিত)। ফেনোমেনাল কনসেপ্টস অ্যান্ড ফেনোমেনাল নলেজঃ নিউ এসেস অন কনশাসনেস অ্যান্ড ফিজিক্যালিজম। নিউ য়র্কঃ অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস। প্রবন্ধটির একটি সংস্করণ পাওয়া যাবেঃ [http://consc.net/papers/pceg.pdf [Accessed 21st November 2016].
[১৮৬] চ্যালমার্স, ডি. (২০১০) দা কারেক্টার অভ কনশাসনেস, পৃষ্ঠা ১১১।
[১৮৭] চার্চল্যান্ড, ডি. (১৯৮৮) ম্যাটার অ্যান্ড কনশাসনেসঃ আ কন্টেম্পরারি ইন্ট্রোডাকশন টু দা ফিলোসফি অভ দা মাইন্ড। ক্যামব্রিজঃ এমআইটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৯।
[১৮৮] প্রাগুক্ত।
[১৮৯] প্রাগুক্ত।
[১৯০] রেভনসু, এ. (২০১০) কনশাসনেসঃ দা সায়েন্স অভ সাবজেক্টিভিটি, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১।
[১৯১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১
[১৯২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২
[১৯৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪
[১৯৪] লুন্দ, ডি. (২০১৪) ম্যাটেরিয়ালিজ, ডুয়ালিজম অ্যান্ড দা কনশাসনেস সেল্ফ। লাভাজ্জা, এ. এবং রবিনসন, এইচ. (সম্পাদিত)। কন্টেম্পরারি ডুয়ালিজমঃ আ ডিফেন্স। এবিংডনঃ রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ৫৭।

[১৯৫] সলোমোন, আর. (২০০৫) ইনট্রোডিউসিং ফিলোসফি: আ টেক্সট উইথ ইন্টিগ্রেইটেড রিডিংস। ৮ম সংস্করণ। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৪১৬।

[১৯৬] ব্লক, এন. (১৯৮০) ট্রাবলস উইথ ফাংশনালিজম। ব্লক, এন (সম্পাদিত) রিডিংস ইন দা ফিলোসফি অভ সাইকোলজি। ক্যামব্রিজ: এমএ: হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস। খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৮-৩০৫

[১৯৭] ফন গুলিক, আর. (২০০৮) ফাংশনালিজম অ্যান্ড কুয়ালিয়া। ভেলম্যান্স, এম. এবং শ্নাইডার, এস. (সম্পাদিত)। দা ব্ল্যাকওয়েল কম্প্যানিয়ন টু কনশাসনেস। অক্সফোর্ড: ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ৩৮১।

[১৯৮] রেভনসু, এ. (২০১০) কনশাসনেস: দা সায়েন্স অভ সাবজেক্টিভিটি, পৃষ্ঠা ৩৯।

[১৯৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬।

[২০০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯-৩০।

[২০১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০।

[২০২] সোবার, ই. (২০১০)। এম্পিরিসিজম। পিসিলস, এস. এবং কার্ড, এম। দা রাউটলেজ কম্প্যানিয়ন টু ফিলোসফি অভ সায়েন্স, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮।

[২০৩] ইক্‌ল্‌স, জে. সি. (১৯৮৯) এভোল্যুশান অভ দা ব্রেন, ক্রিয়েশন অভ দা সেলফ। এবিংডন: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ২৪১।

[২০৪] সোবার, ই. (২০০০) ফিলোসফি অভ বায়োলজি, ২য় সংস্করণ। বোল্ডার, সিও: ওয়েস্টভিউ প্রেস, পৃষ্ঠা ২৪।

[২০৫] সেগার, ডব্লিউ. এবং অ্যালেন-হার্ম্যানসন, এস. (২০১৫) "প্যানসাইকিজম", দা স্ট্যানফর্ড এনসাইক্লোপেডিয়া অভ ফিলোসফি (ফল ২০১৫ সংস্করণ), এডওয়ার্ড এন. জেল্টা (সংস্করণ) Available online at: http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/panpsychism/.□

[২০৬] ফেজার, ই. (২০০৬) দা ফিলোসফি অভ মাইন্ড। অক্সফোর্ড: ওয়ানওয়ার্ল্ড, পৃষ্ঠা ১৩৮।

[২০৭] মোরল্যান্ড, জে.পি. (২০০৮) কনশাসনেস অ্যান্ড দা এক্সিসটেন্স অভ গড: দা থিস্টিক আর্গুমেন্ট। এবিংডন: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ৩৫।

[২০৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯২।

[২০৯] তালিয়াফেরো, সি. (২০০৬) ন্যাচারালিজম অ্যান্ড দা মাইন্ড। ক্রেগ ডব্লিউ. এল. অ্যান্ড মরল্যান্ড, জে. পি. (সম্পাদিত)। ন্যাচারালিজম: আ ক্রিটিকাল অ্যানাসাইসিস। এবিংডন: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯।

[২১০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫০।

[২১১] কুরআন, ২:২৫৫

[২১২] কুরআন, ৬৭:১৪

[২১৩] তালিয়াফেরো, সি. (২০১৪) দা প্রমিজ অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি অভ ইন্টেগ্র্যাটিভ ডুয়ালিমজ। লাভাজ্জা, এ. এবং রবিনসন, এইচ. (সম্পাদিত) কন্টেম্পরারি ডুয়ালিজম: আ ডিফেন্স: এবিংডন: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ২০২-২০৩

[২১৪] কুরআন, ১৭:৮৫

[২১৫] কুরআন, ৩০:৮

[২১৬] তুলনাটি নেওয়া কলিন্স, আর. (২০০২) গড, ডিজাইন অ্যান্ড ফাইন-টিউনিং থেকে। Available at: http://home.messiah.edu/~rcollins/Finetuning/Revised%20Version%20of%20Fine-tuning%20for%20anthology.doc [Accessed

[২১৭] কুরআন, ৫৫:৫-৭
[২১৮] কুরআন, ২:১৯০
[২১৯] কুরআন, ১৬:১২
[২২০] তিবাউই, এ.ল. (সম্পাদিত ও অনূদিত)। (১৯৬৫) আল-রিসালাতুল-কুদসিয়্যা (দা জেরুজালেম এপিস্টল) "আল-গাজালি'স ট্র্যাক্ট অন ডগম্যাটিক থিয়োলজি"। দা ইসলামিক কুয়ার্টারলি, ৯:৩-৪ (১৯৬৫), ৩-৪।
[২২১] ইবনু আবুল-'ইজ্জ (২০০০) কমেন্টারি অন দা ক্রিড অভ আত-তাহাউই। অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল-হাক্ক আনসারি। রিয়াদঃ ইন্সটিটিউত অভ ইসলামিক অ্যান্ড অ্যারাবিক সায়েন্স ইন আমেরিকা, পৃষ্ঠা ৯।
[২২২] কলিন্স, আর. (২০০৯)। দা থিয়োলজিকাল আর্গুমেন্ট। ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. অ্যান্ড মোরল্যান্ড, জে.পি. দা ব্ল্যাকওয়েল কম্প্যানিয়ন টু ন্যাচারাল থিয়োলজি। ওয়েস্ট সাসেক্সঃ উইলি-ব্ল্যাকওয়েল, পৃষ্ঠা, ২১২।
[২২৩] প্রাগুক্ত।
[২২৪] জন লেসলি (২০০১) ইনফিনাইট মাইন্ডসঃ আ ফিলোসফিকাল কসমলজি। অক্সফোর্ডঃ ক্ল্যারেন্ডন প্রেস, পৃষ্ঠা ২০৫।
[২২৫] কলিন্স, আর. দা টেলিওলজিকাল আর্গুমেন্ট, পৃষ্ঠা, ২১২।
[২২৬] জ্যামার, এম. (১৯৯৯)-তে উদ্ধৃত। আইন্সটাইন অ্যান্ড রেলিজিয়ন। প্রিন্সটন, এনজেঃ প্রিন্সেটন য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা, ১৫০।
[২২৭] ডকিন্স, আর. (১৯৯৯) আনওয়েভিং দা রেনবো। লন্ডনঃ পেঙ্গুইন, পৃষ্ঠা, ৪।
[২২৮] ওয়ার্ড, পি. ডি. অ্যান্ড ব্রাউনলি, ডি (২০০৪) রেয়ার আর্থঃ ওয়াই কমপ্লেক্স লাইফ ইজ আনকমন ইন দা য়ুনিভার্স। নিউ ইয়র্কঃ কোপার্নিকাস বুকস, পৃষ্ঠা, ১৬।
[২২৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২২১-২২।
[২৩০] 'নো জুপিটার, নো অ্যাডভ্যান্সড লাইফ?'—এভোল্যুশান মে বি ইম্পাসিবল ইন দা স্টার সিস্টেমস উইদাউট আ জায়ান্ট প্ল্যানেট (২০১২)। http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2012/11/would-advanced-life-be-impossible-instar-systems-without-a-jupiter-.html [Accessed 2nd October 2016]
[২৩১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২২৭।
[২৩২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২২৩।
[২৩৩] প্রাগুক্ত।
[২৩৪] কলিন্স, আর. দা ফাইন-টিউনিং ডিজাইন আর্গুমেন্ট—অবলম্বনে। PowerPoint Presentation. Available at: http://home.messiah.edu/~rcollins/Fine tuning/Fine-tuning%20powerpoint%20final%20version%2010-3-08.ppt [Accessed 24th October 2016].
[২৩৫] প্রাগুক্ত।
[২৩৬] ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. (২০০৮)। রিজনেব্‌ল ফেইথঃ ক্রিস্টিয়ান ট্রুথ অ্যান্ড অ্যাপলোজেটিকস, পৃষ্ঠা, ১৬১।
[২৩৭] ডেভিস, পি. (১৯৯৩)। দা মাইন্ড অভ গডঃ সায়েন্স অ্যান্ড দা সার্চ ফর আল্টিমেইট মিনিং। লন্ডনঃ পেঙ্গুইন, পৃষ্ঠা, ১৬৯।
[২৩৮] উদ্ধৃত হয়েছে ক্লিউ, এ. (২০০৭)। দেয়ার ইজ আ গড, পৃষ্ঠা, ১১৯।

[২৩৯] প্রাগুক্ত।

[২৪০] বার্নস, এল. এ. (২০১১) দা ফাইন-টিউনিং অভ দা য়ুনিভার্স ফর ইন্টেলিজেন্ট লাইফ। সিডনি ইন্সটিটিউট ফর অ্যাস্ট্রনমি। http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1112/1112.4647v1.pdf [Accessed 5th October 2016]

[২৪১] কলিন্স, আর. (২০০৯) দা টেলিওলজিকাল আর্গুমেন্ট, পৃষ্ঠা, ২৬২-২৬৫ থেকে অভিযোজিত

[২৪২] এই আপত্তিগুলোর জবাবে আবু হুরায়রার অবদানের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

[২৪৩] ডকিন্স, আর. (২০০৬) দা গড ডিলিউশন, পৃষ্ঠা, ১৫৮।

[২৪৪] ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. (২০০৯)। ডকিন্স ডিলিউশন। কোপান, পি. এবং ক্রেগ ডব্লিউ এল. (সম্পাদিত)। কন্টেন্ডিং উইথ ক্রিস্টিয়ানিটি'স ক্রিটিকস: অ্যানসারিং নিউ এথিস্টস অ্যান্ড আদার অবজেক্টরস। ন্যাশভিল, টেনিসি: বি এন্ড এইচ পাবলিশিং গ্রুপ, পৃষ্ঠা, ৪।

[২৪৫] কুরআন, ১১২:১-৪

[২৪৬] ফ্লিউ, এ (২০০৭)। দেয়ার ইজ আ গড, পৃষ্ঠা, ১১১।

[২৪৭] কলিন্স, আর (২০০২) গড, ডিজাইন অ্যান্ড ফাইন-টিউনিং। http://home.messiah.edu/~rcollins/Fine-tuning/Revised%20Version%20of%20Finetuning%20for%20anthology.doc [Accessed 24th October 2016]

[২৪৮] কলিন্স, আর. (২০০৯) দা টেলিওলজিকাল আর্গুমেন্ট, পৃষ্ঠা, ২৭৬।

[২৪৯] প্রাগুক্ত।

[২৫০] মারখাম, আই. এস. (২০১০) অ্যাগেন্সট এথিজম: ওয়াই ডকিন্স, হিচেন্স অ্যান্ড হ্যারিস আর ফান্ডামেন্টালি রং। ওয়েস্ট সাসেক্স: উইলি-ব্ল্যাকওয়েল, পৃষ্ঠা ৩৪।

[২৫১] অধ্যায়ে উপস্থাপতি যুক্তিপ্রমাণ এবং কিছু ধারণা নেওয়া হয়েছে ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. ক্যান উই বি গুড উইদাউট গড? http://www.reasonablefaith.org/can-we-be-good-without-god [Accessed: 24th October 2016]; ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. (২০০৮) রিজনেবল ফেইথ: ক্রিস্টিয়ান ট্রুথ অ্যান্ড অ্যাপলজেটিকস উইটন, ইলিয়নস: ক্রসওয়ে বুকস, পৃষ্ঠা ১৭২-১৮৩

[২৫২] প্রাগুক্ত।

[২৫৩] কুরআন, ৭:২৮

[২৫৪] ম্যাকি, জে. এল. (১৯৯০) এথিক্স: ইনভেন্টিং রাইট অ্যান্ড রং। লান্ডান: পেঙ্গুইন। ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৫।

[২৫৫] আখতার, এস. (২০০৮) দা কুরআন অ্যান্ড দা সেকুলার মাইন্ড। এবিংডন: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ৯৯।

[২৫৬] ডারউইন, সি. (১৮৭৪)। দা ডিসেন্ট অভ ম্যান অ্যান্ড সিলেকশান ইন রিলেশান টু সেক্স। ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৯। http://www.gutenberg.org/ebooks/2300 [Accessed 4th October 2016]

[২৫৭] ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক (১৯৯৬)। শার্কস ইন লাভ। http://video.nationalgeographic.com/video/shark_nurse_mating [Accessed 24th October 2016]

[২৫৮] উদ্ধৃত হয়েছে লিনভিল, এম. ডি. (২০০৯) দা মোরাল আর্গুমেন্ট। ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. এবং মোরল্যান্ড, জে. পি. (সম্পাদিত)। দা ব্ল্যাকওয়েল কম্পানিয়ন টু ন্যাচারাল থিয়োলজি। ওয়েস্ট সাসেক্স: উইলি-ব্ল্যাকওয়েল, পৃষ্ঠা ৪০০।

[২৫৯] কুরআন, ২১:২২

[২৬০] আল-মাহাল্লি, জে. এবং আস-সুয়ুতি, জে. (২০০৭)। তাফসিরুল-জালালাইন। অনুবাদ: আইশা বেওলি। লান্ডান: দারুত-তাকওয়া, পৃষ্ঠা ৬৯০; আল-মাহাল্লি, জে. এবং আস-সয়ুতি জে. (২০০১) তাফসিরুল-জালালাইন। ৩য় সংস্করণ, কায়রো: দারুল-হাদিস। পৃষ্ঠা ৪২২। অনলাইন কপি পাবেন এখানে: https://ia800205.us.archive.org/1/items/FP158160/158160.pdf [Accessed 1st October 2016]

[২৬১] অ্যাভেরোস। (২০০১) ফেইথ অ্যান্ড রিজন ইন ইসলাম। টীকা, শব্দসূচি এবং জীবনী-সহ অনুবাদ ইবরাহিম ওয়াই. নাজ্জার। অক্সফোর্ড: ওয়ান ওয়ার্ল্ড, পৃষ্ঠা ৪০।

[২৬২] কুরআন, ৭:২৮

[২৬৩] কুরআনের ঐশীত্ব সম্বন্ধে আরও ধারণা পেতে পড়ুন: খান, এন. এ. এবং রানজাওয়া, এস. (২০১৬)। ডিভাইন স্পিচ এক্সপ্লোরিং দা কুরআন অ্যাজ লিটারেচার। টেক্সাস: বায়্যিনাহ ইন্সটিটিউট এবং জাকারিয়া এ. (২০১৫) দা ইটারনাল চ্যালেঞ্জ: অ্যা জার্নি থ্রু দা মিরাকুলাস কুরআন। লান্ডান: ওয়ান রিজন।

[২৬৪] কুরআন, ২৯:৪৬।

[২৬৫] তিরমিজি।

[২৬৬] বিপদ এবং কষ্টের যুক্তিতর্কটি আরও কিছুভাবে বলা হয়েছে। কোনো কোনো যুক্তিতর্কে ভালো, দয়া, ভালোবাসা, সদয় শব্দগুলো অদলবদল করে ব্যবহার করা হয়। যে-শব্দেই বলা হোক, যুক্তিতর্কটি একই। বিপদ সমস্যার তর্কটি ধারণা করে স্রষ্টা সম্বন্ধে যে-চিরায়ত ধারণা, তাতে তাঁর মাঝে এমন এক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, যেখানে দেখা যাবে স্রষ্টা চান বিপদ-আপদ, কষ্ট চান না। সুতরাং দয়াবান, ভালোবাসাময় এবং সদয়-এর মতো শব্দগুলো অদলবদল করে ব্যবহারে মূল যুক্তিতর্কে কোনো সমস্যা নেই।

[২৬৭] অধ্যাপক উইলিয়াম লেইন ক্রেগ বিপদের সমস্যা নিয়ে যে-আলোচনা করেছেন তা থেকে এই অনুমানটি অভিযোজিত। মোরল্যান্ড, জে. পি. এবং ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. (২০০৩)। দার্শনিক ফাউন্ডেশানস ফর আ ক্রিস্টিয়ান ওয়ার্ল্ডভিউ। ডাওনার্স গ্রোভ, ইল, ইন্টার ভার্সিটি প্রেস। দেখুন অধ্যায় ২৭।

[২৬৮] শাহা, এ. (২০১২) দা ইয়াং এথিস্ট'স হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা ৫১।

[২৬৯] কুরআন, ১৮:৬৫-৮২

[২৭০] ইবনু কাসির, আই. (১৯৯৯) তাফসিরুল-কুরআনিল-আজিম। খণ্ড ৫। পৃষ্ঠা ১৮১।

[২৭১] প্রাগুক্ত।

[২৭২] ইবনু তাইমিয়্যাহ, এ. (২০০৪) মাজমুউল-ফাতওয়া শাইখুল-ইসলাম আহমাদ বিন তাইমিয়্যাহ। খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৬৬।

[২৭৩] ইবনু তাইমিয়্যাহ, এ. (১৯৮৬) মিনহাজুস-সুন্নাহ। সম্পাদনা: মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম। রিয়াদ: জামিআতু-ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদিল-ইসলামিয়্যাহ। খণ্ড ৩। পৃষ্ঠা ১৪২।

[২৭৪] উদ্ধৃত হয়েছে হুভার, জে. (২০০৭)। ইবনু তাইমিয়্যা'স থিয়োডিসি অভ পার্পেচুয়াল অপটিমিজিম। লেডেন: ব্রিল, পৃষ্ঠা ৪।

[২৭৫] কুরআন, ৫১:৫৬।

[২৭৬] কুরআন, ৬৭:২।

[২৭৭] কুরআন, ৩৯:৭।

[২৭৮] তিরমিজি

[২৭৯] কুরআন, ২:২১৪

[২৮০] কুরআন, ২:২৮৬
[২৮১] কুরআন, ৫:১০০
[২৮২] বায়হাকির শু'বুল-ইমান। হাদীস-মান: হাসান
[২৮৩] কুরআন, ৫৭:২০
[২৮৪] মুসলিম
[২৮৫] বুখারি
[২৮৬] মুসলিম
[২৮৭] বুখারি
[২৮৮] সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বা আত্মঘাতি বোমাহামলায় যারা মারা যান তারা কেউ শহিদ নন। এগুলো হারাম।
[২৮৯] আহমাদ
[২৯০] মুসলিম
[২৯১] প্রাগুক্ত।
[২৯২] প্রাগুক্ত।
[২৯৩] গাউচ, এইচ. জি. জুনিয়র (২০১২) সায়েন্টিফিক মেথড ইন ব্রিফ। ক্যাম্ব্রিজ: ক্যাম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৯৮।
[২৯৪] ফারহাদ, এ. (২০১৩) রিচার্ড ডকিন্স — সায়েন্স ওয়ার্কস বিচেস! https://youtu.be/0OtFSDKrq88?t=73 [Accessed 2nd October 2016]
[২৯৫] রাসেল, বি. (১৯৩৫) রিলিজিয়ন অ্যান্ড সায়েন্স। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৮।
[২৯৬] ডিপিমোস্টেলার। (২০১১) হ্যাজ সায়েন্স মেইড বিলিফ ইন গড আনরিজনেবল, জে. পি. মোরল্যান্ড থেকে অভিযোজিত। Available at: http://www.youtube.com/watch?v=TU9iiCqHxbE [Accessed 2nd October 2016]
[২৯৭] সোবার, ই. (২০১০)। এম্পিরিসিজম। পিসিলোস, এস এবং কার্ড, এম. সম্পাদিত। দা রাউটলেজ কম্প্যানিয়ন টু ফিলসোফি অভ সায়েন্স, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮
[২৯৮] ডারউইন, সি. দা ডিসেন্ট অভ ম্যান অ্যান্ড সিলেকশন ইন রিলেশান টু সেক্স। ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৯। http://www.gutenberg.org/ebooks/2300 [Accessed 4th October 2016]
[২৯৯] আইএআরএ (২০১৩) লরেন্স ক্রস বনাম হামজা জর্জিস — ইসলাম বনাম এথিজম বিতর্ক। https://youtu.be/uSwJuOPG4FI?t=4161 [Accessed 18th October 2016]
[৩০০] জনসন, আর. (২০১৩) র‍্যাশনাল মোরালিটি: আ সায়েন্স অভ রাইট অ্যান্ড রং। গ্রেট ব্রিটেন: ডেঞ্জেরাস লিটল বুকস, পৃষ্ঠা ১৯-২০
[৩০১] ক্রেগ, ডব্লিউ. এল. (২০১১) ইজ সায়েন্টিসজম সেলফ-রিফিউটিং। http://www.reasonablefaith.org/is-scientism-self-refuting [Accessed 4th October 2016]
[৩০২] ম্যাকম্যাইলার, বি. (২০১১)। টেস্টিমনি, ট্রুথ অ্যান্ড অথরিটি। নিউ য়র্ক: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৩।
[৩০৩] ল্যাকি, জে. (২০০৬)। ইন্ট্রোডাকশন। ল্যাকি, জে. এবং সোসা, ই. (সম্পাদিত)। দা এপিস্টেমোলজি অভ টেস্টিমনি। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ২।
[৩০৪] ম্যাকমাইলার, বি. (২০১১)। টেস্টিমনি, ট্রুথ অ্যান্ড অথরিটি, পৃষ্ঠা ১০।

[৩০৫] কোডি, সি. এ. (১৯৯২) টেস্টিমনি: আ ফিলোসোফিকাল স্টাডি। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৮২।

[৩০৬] দেখুন শাপিরো, জে. এ. (২০১১) এভোল্যুশান: আ ভিউ ফ্রম দা একবিংশ শতাব্দী। নিউ জার্সি: এফটি প্রেস। এবং পিগলিউক্কি, এম. এবং মুলার, জি. বি. (সম্পাদিত)। (২০১০)। এভোল্যুশান: দা এক্সটেন্ডেড সিনথেসিস। ক্যাম্ব্রিজ, এমএ: এমআইটি প্রেস; এবং গডফ্রে-স্মিথ, পি. (২০১৪) ফিলোসফি অভ বায়োলজি। প্রিন্সেটন, এনজে: প্রিন্সেটন য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

[৩০৭] বার্কার, জি. এবং কিচার, পি. (২০১৩) ফিলোসফি অভ সায়েন্স: আ নিউ ইন্ট্রোডাকশন। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস। ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৭।

[৩০৮] আন্নাস, জে. অ্যান্ড বার্নস, জে. (১৯৯৪)। সেক্সটাস এম্পিরিকাস: আউটলাইনস অভ স্কেপটিসিজম। নিউ য়র্ক: ক্যাম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ১২৩।

[৩০৯] হিউম, ডি. (২০০২) অভ স্কেপটিসিজম উইথ রিগার্ড টু রিজন। ইন: এপিস্টেমোলজি: হিউমার, এম, সম্পাদিত। কন্টেম্পরারি রিডিংস। এবিংডন: রাউটলেজ পৃষ্ঠা ২৯৮-৩১০। প্রথম প্রকাশ হিউম, ডি. (১৯০২) স্কেপটিকাল ডাউটস কনসার্নিং দা অপারেশনস অভ আন্ডার্স্ট্যান্ডিং। সেলবি-বিগে, এল. এ. সম্পাদিত অ্যান এনকোয়ারি কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডার্স্ট্যান্ডিং। এনকোয়ারি কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড কনসার্নিং দা প্রিন্সিপল্স অভ মোরালস, ২য় সংস্করণ। অক্সফোর্ড: ক্ল্যারেনডন প্রেস, পৃষ্ঠা ২৯৮-৩১০।

[৩১০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৫।

[৩১১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩০৫।

[৩১২] রোজেনবার্গ, এ. (২০১২) ফিলোসফি অভ সায়েন্স: আ কন্টেম্পরারি ইন্ট্রোডাকশন। নিউ য়র্ক: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ১৮২।

[৩১৩] ওকাশা, এস. (২০০২) ফিলোসফি অভ সায়েন্স, এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৭৭।

[৩১৪] স্টিউয়ার্ট, আর. বি. (সম্পাদিত)। (২০০৭) ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন: উইলিয়াম এ. ডেম্বস্কি এবং মাইকেল রুস ইন ডায়লক। মিনিপোলিস, এমএন: ফর্ট্রিস প্রেস, পৃষ্ঠা ৩৭।

[৩১৫] মোরল্যান্ড, জে. পি. (২০০৯) দা রিক্যালকিটর‍্যান্ট ইমাগো দে। লান্ডান: এসসিএম প্রেস, পৃষ্ঠা ৪।

[৩১৬] টড, স্কট. সি. (১৯৯৯) আ ভিউ ফ্রম কানসাস অন দ্যাট এভোল্যুশান ডিবেইট। করেস্পন্ডেন্স টু ন্যাচার। ৪০১ (৬৭৫২): ৪২৩, ৩০ সেপ্টেম্বর। https://www.nature.com/articles/46661 [Accessed 10th May 2018]

[৩১৭] আইইআরএ (২০১৩) লরেন্স ক্রস বনাম হামজা জর্জিস — ইসলাম বনাম এথিজম বিতর্ক। http://www.youtube.com/watch?v=uSwJuOPG4FI#t=7247 [Accessed 2nd October 2016]

[৩১৮] হিউম, ডি. (১৯০২) অ্যান এনকোয়ারি কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডার্স্ট্যান্ডিং, সেকশান ৮৮। http://www.gutenberg.org/files/9662/9662-h/9662-h.htm [Accessed 4th October 2016].

[৩১৯] ফ্রিকার, ই. (২০০৬) টেস্টিমনি অ্যান্ড এপিস্টেমিক অটনমি। জেনিফার ল্যাকি, জে অ্যান্ড সোসা, ই, সম্পাদিত। দা এপিস্টেমোলোজি অভ টেস্টিমনি। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ২৪৪।

[৩২০] লেহরার, কে. (২০০৬)। টেস্টিমনি অ্যান্ড ট্রাস্টওর্দিনেস। জেনিফার ল্যাকি, জে এবং সোসা,

ই, সম্পাদিত। দা এপিস্টেমোলজি অভ টেস্টিমনি। পৃষ্ঠা ১৪৫।
[৩২১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯।
[৩২২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫০।
[৩২৩] প্রাগুক্ত।
[৩২৪] প্রাগুক্ত।
[৩২৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১।
[৩২৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬।
[৩২৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭
[৩২৮] ম্যাকমাইলার, বি. (২০১১) টেস্টিমনি, ট্রুথ অ্যান্ড অথরিটি, পৃষ্ঠা ৬৬।
[৩২৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯
[৩৩০] হিউম, ডি. (১৯০২) অ্যান এনকোয়ারি কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডার্স্ট্যান্ডিং, সেকশন ৯১। http://www.gutenberg.org/files/9662/9662-h/9662-h.htm [Accessed 4th October 2016]
[৩৩১] প্রাগুক্ত, সেকশন ৯৯।
[৩৩২] লিপটন, পি. (২০০৪) ইনফারেন্স টু দা বেস্ট এক্সপ্ল্যানেশান। ২য় সংস্করণ। এবিংডন: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ৫৬।
[৩৩৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫
[৩৩৪] হার্মান, জি. (১৯৬৫) দা ইনফারেন্স টু দা বেস্ট এক্সপ্ল্যানেশান। দা ফিলোসফিকাল রিভিউ, ৭৪(১), ৮৮-৯৫। http://people.hss.caltech.edu/~franz/Knowledge%20and%20Reality/PDFs/Gilbert%20H.%20Harman%20-%20The%20Inference%20to%20the%20Best%20Explanation.pdf [Accessed 4th October 2016]
[৩৩৫] কুরআন, ৯৬:১
[৩৩৬] দা ম্যাগনিফিসেন্ট কুরআন: আ য়ুনিক হিস্টোরি অভ প্রিজারভেশান। (২০১০) লান্ডান: এক্সহিবিশান ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪৫-২০৪
[৩৩৭] আল-সুয়ুতি. জে. (২০০৫) আল-ইতকান ফি উলুমিল-কুরআন। মাদিনা: মুজাম্মা মালিক ফাহাদ, পৃষ্ঠা ১৮৭৫
[৩৩৮] শাফি, এম. (২০০৫) মাআরিফুল-কুরআন, ২য় সংস্করণ। অনুবাদ: মুহাম্মাদ জাসান আসকারি এবং মুহাম্মাদ শামিম। কারাচি: মাকতাবায়ে দারুল-উলুম। খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪৯
[৩৩৯] উসমানি, এম. টি. (২০০০) অ্যান অ্যাপ্রোচ টু দা কুরআনিক সায়েন্সেস। অনুবাদ: মুহাম্মাদ সালিহ সিদ্দিকি। পরিমার্জন ও সম্পাদনা রাফিক আবদুর-রাহমান। কারাচি: দারুল ইশাত, পৃষ্ঠা ২৬০।
[৩৪০] আরউইন, আর. (১৯৯৯) দা পেঙ্গুইন অ্যানথলজি অভ ক্ল্যাসিকাল অ্যারাবিক লিটারেচার। লান্ডান: পেঙ্গুইন বুকস, পৃষ্ঠা ২-তে উদ্ধৃত।
[৩৪১] ইবনু খালদুন, এ. দা মুকাদ্দিমাহ। অনুবাদ: ফ্র্যানজ রোজেনথাল। অধ্যায় ৬। ধারা ৫৮। http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Chapter6/Ch_6_58.htm [Accessed 9th October 2016]
[৩৪২] ইবনু রাশিক, এ. এইচ. (২০০০) আল-উমদা ফি সিনাআতুশ-শি'য়ার ওয়া নাকদিহি। সম্পাদনা: ড. আন-নাবউই শালান। কায়রো: মাকতাবা খানিজি, পৃষ্ঠা ৮৯।

[৩৪৩] আল-কুতায়বা, এ. (১৯২৫) উয়ুনুল-আখবার। বৈরুতঃ দারুল-কুতুবুল-আরাবি। খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৫।

[৩৪৪] কেরমানি, কে. (২০০৬) পোয়েট্রি অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। রিপিন, এ (সম্পাদিত) দা ব্ল্যাকওয়েল কম্প্যানিয়ন টু দা কুরআন। অক্সফোর্ডঃ ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ১০৮।

[৩৪৫] আবদুর-রউফ, এইচ. (২০০৩) এক্সপ্লোরিং দা কুরআন। ডান্ডিঃ আল-মাখতুম ইন্সটিটিউট অ্যাকাডেমিক প্রেস, পৃষ্ঠা ৬৪।

[৩৪৬] জার্মানিতে অধ্যাপক অ্যাঞ্জেলিকা নিউরিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। কেউ চাইলে ধারণকৃত অডিও দেওয়া যাবে।

[৩৪৭] ইসলাহি, এ. এ. (২০০৭) পন্ডারিং ওভার দা কুরআনঃ তাফসির অভ সুরা ফাতিহা অ্যান্ড সুরা বাকারা। খণ্ড ১। অনুবাদঃ মোহাম্মাদ সালিম কায়ানি। কুয়ালা লামপুরঃ ইসলামিক বুক ট্রাস্ট, পৃষ্ঠা ২৫-২৬।

[৩৪৮] ইসলাহি, এ. এ. (২০০৭) পন্ডারিং ওভার দা কুরআনঃ তাফসির অভ সুরা ফাতিহা অ্যান্ড সুরা বাকারা খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬-এ উদ্ধৃত।

[৩৪৯] প্যালমার, ই. এইচ (অনূদিত) (১৯০০)। দা কুরআন। খণ্ড ১। অক্সফোর্ডঃ ক্ল্যারেন্ডান প্রেস, পৃষ্ঠা lv.

[৩৫০] ড্রাজ, এম. এ. (২০০০)। ইন্ট্রোডাকশান টু কুরআন। লান্ডানঃ আই.বি. টরিস। পৃষ্ঠা ৯০।

[৩৫১] জামিত, এম. আর (২০০২) আ কম্পারেটিভ লেক্সিকাল স্টাডি অভ কুরআনিক অ্যারাবিক। লেডেনঃ ব্রিল, পৃষ্ঠা ২৭।

[৩৫২] ওয়ালিউল্লাহ, এস. (২০১৪) আল-ফাওজুল-কাবির ফি উসুলি-তাফসির। দা গ্রেট ভিক্টরি অন কুরআনিক হার্মানিউটিক্সঃ আ ম্যানুয়াল অভ দা প্রিন্সিপলস অ্যান সাটেলিটিস অভ কুরআনিক তাফসির। অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকাঃ তাহির মাহমুদ কিয়ানি। লান্ডানঃ তাহা, পৃষ্ঠা ১৬০।

[৩৫৩] অ্যারবেরি, এ. জে. (১৯৯৮) দা কুরআনঃ ট্র্যান্সলেটেড উইথ অ্যান ইন্ট্রোডাকশান বাই আর্থুর জে. অ্যারবেরি। অক্সফোর্ডঃ অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা x।

[৩৫৪] উসমানি, এম. টি. (২০০০) অ্যান অ্যাপ্রোচ টু দা কুরআনিক সায়েন্সেস, পৃষ্ঠা ২৬২।

[৩৫৫] আস-সুয়ুতি, জে. (২০০৫) আল-ইতকান ফি উলুমিল-কুরআন। মাদিনাঃ মুজাম্মা মালিক ফাহাদ, পৃষ্ঠা ১৮৮১।

[৩৫৬] প্রাগুক্ত।

[৩৫৭] লরেন্স, বি. (২০০৬)। দা কুরআনঃ আ বায়োগ্রাফি। লান্ডানঃ আটলান্টিক বুকস, পৃষ্ঠা ৮।

[৩৫৮] গিব, এইচ. এ. আর. (১৯৮০) ইসলামঃ আ হিস্টোরিকাল সার্ভে। অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ২৮।

[৩৫৯] ফন জেল্ডার, জি. জে. এইচ. (২০১৩) ক্ল্যাসিকাল অ্যারাবিক লিটারেচারঃ আ লাইব্রেরি অভ অ্যারাবিক লিটারেচার অ্যানথলজি। নিউ য়র্কঃ নিউ য়র্ক য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৩১-৩৩।

[৩৬০] ম্যাকঅলি, ডি. ই. (২০১২) ইবনু আরাবি'স মিস্টিকাল পোয়েটিকস। অক্সফোর্ডঃ অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৯৩।

[৩৬১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৪।

[৩৬২] ডি. ই. (২০১২) ইবনু আরাবি'স মিস্টিকাল পোয়েটিকস। অক্সফোর্ডঃ অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৯৪।

[৩৬৩] বোনব্যাকার, এস. এ. (১৯৮৪), হাতিমি অ্যান্ড হিজ এনকাউন্টার উইথ মুতানাব্বিঃ আ বায়োগ্রাফিকাল স্কেচ। অক্সফোর্ডঃ নর্থ-হল্যান্ড পাবলিশিং কোম্পানি, পৃষ্ঠা ৪৭।

[৩৬৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫। দেখুন ওয়াং, ডব্লিউ. (১৯৯৭) লিটারেরি ক্রিটিসিজম ইন মিডিয়াভিল অ্যারাবিক ইসলামিক কালচার: দা মেকিং অভ আ ট্র্যাডিশান। এডিনবোরা য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

[৩৬৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্পা ৪৪।

[৩৬৬] ম্যাবিলার্ড, এ. (১৯৯৯) শেক্সপিরিয়ান সনেট বেসিকস: য়্যামবিক পেন্টামিটার অ্যান্ড দা ইংলিশ সনেট স্টাইল। http://www.shakespeare-online.com/sonnets/sonnetstyle.html [Accessed 5th October 2016].

[৩৬৭] হল্যান্ড, পি. (২০১৩) শেক্সপিয়ার, উইলিয়ান (১৫৬৪-১৬১৬)। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অভ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি। অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস। http://dx.doi.org/10.1093/ref:odnb/25200 [Accessed 9th October 2016].

[৩৬৮] আবদেল হালিম, এম. (২০০৫) আন্ডার্স্ট্যান্ডিং দা কুরআন: থিমস অ্যান্ড স্টাইল। লান্ডান: আই. বি. টরিস, পৃষ্ঠা ১৮৪-তে উদ্ধৃত।

[৩৬৯] আবদুর-রউফ, এইচ. (২০০৩) এক্সপ্লোরিং দা কুরআন, ডান্ডি: আল-মাকতুম ইন্সটিটিউট অ্যাকাডেমিক প্রেস; আবদুর-রউফ, এইচ. (২০০১) কুরআন ট্র্যান্সলেশান: ডিসকোর্স, টেক্সচার অ্যান্ড এক্সেজিস। রিচমন্ড, সারে: কার্জন।

[৩৭০] আবদেল হালিম, এম. (২০০৫) আন্ডার্স্ট্যান্ডিং দা কুরআন: থিমস অ্যান্ড স্টাইসল, পৃষ্ঠা ১৮৫।

[৩৭১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৮।

[৩৭২] চৌধুরি, এস. জেড. (২০১০) ইন্ট্রোডিউসিং অ্যারাবিক রেটোরিক। হালনাগাদ সংস্করণ। লান্ডান: আদ-দুহা, পৃষ্ঠা ৯৯।

[৩৭৩] প্রাগুক্ত।

[৩৭৪] কুরআন, ১০৮:১-৩

[৩৭৫] রবিনসন, এন. (২০০৩) ডিসকভারিং দা কুরআন: আ কন্টেম্পরারি অ্যাপ্রোচ টু আ ভেলড টেক্সট, ২য় সংস্করণ। ওয়াশিংটন: জর্জটাউন য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ২৫৪।

[৩৭৬] কাদি, ওয়াই (১৯৯৯)। অ্যান ইন্ট্রোডাকশান টু দা সায়েন্সেস অভ দা কুরআন। বার্মিংহাম: আল-হিদায়াহ, পৃষ্ঠা ২৬৯-তে উদ্ধৃত। মূল অনুবাদে আল্লাহ শব্দের জায়গায় স্রষ্টা দেওয়া হয়েছে।

[৩৭৭] কেরমানি, কে. (২০০৬) পোয়েট্রি অ্যান্ড ল্যাঙ্গোয়েজ। রিপিন, এ. (সম্পাদিত) দা ব্ল্যাকওয়েল কম্প্যানিয়ন টু দা কুরআন। অক্সফোর্ড: ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ১১০।

[৩৭৮] কুরআন, ১৬:১০৩

[৩৭৯] ইবনু কাসির, আই. (১৯৯৯) তাফসিরুল-কুরআনিল-আজিম। খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬০৩।

[৩৮০] ভ্যানল্যাঙ্কার-সিদতিস, ডি. (২০০৩) অডিটরি রিকগনিশন অভ ইডিয়মস বাই নেটিভ অ্যান নন-নেটিভ স্পিকার্স অভ ইংলিশ: ইট টেইকস ওয়ান টু নো ওয়ান। অ্যাপ্লাইড সাইকোলিঙ্গুইস্টিকস ২৪, ৪৫-৫৭।

[৩৮১] প্রাগুক্ত।

[৩৮২] হাইল্টেনস্টাম, কে. অ্যান্ড অ্যাব্রাহামসন, এন. (২০০০)। হু ক্যান বিকাম নেটিভ-লাইক ইন আ সেকন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ? অল, সাম, অর নান? স্টাডিয়া লিঙ্গুইস্টিকস, ৫৪: ১৫০-১৬৬। doi: 10.1111/1467-9582.00056.

[৩৮৩] আলি, এম. এম. (২০০৪) দা কুরআন অ্যান্ড দা ওরিয়েন্টালিস্টস। ইপসউইচ: জামিয়াত ইহ্য়া মিনহাজুস-সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ১৪।

[৩৮৪] কেরমানি, কে (২০০৬) পোয়েট্রি অ্যান্ড ল্যাঙ্গোয়েজ, পৃষ্ঠা ১০৮

[৩৮৫] উসমানি, এম. টি. (২০০০) অ্যান অ্যাপ্রোচ টু দা কুরআনিক সায়েন্সস, পৃষ্ঠা ২৬১।
[৩৮৬] ড্র্যাজ, এম. এ. (২০০১) দা কুরআন: অ্যান এটার্নাল চ্যালেঞ্জ। অনুবাদ ও সম্পাদনা: আদিল সালাহি। লিচেস্টার: দা ইসলামিক ফাউন্ডেশান, পৃষ্ঠা ৮৩।
[৩৮৭] লিংস, এম. (১৯৮৩) মুহাম্মাদ: হিজ লাইফ বেইসড অন দা আর্লিয়েস্ট সোর্সেস। পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ। ক্যাম্ব্রিজ: দা ইসলামিক টেক্সটস সোসাইটি, পৃষ্ঠা ৫৩-৭৯।
[৩৮৮] ইসলামিক অ্যাওয়ারনেস (তারিখ নেই) দা টেক্সট অভ দা কুরআন। http://www.islamicawareness.org/Quran/Text/ [Accessed 1st October 2016].
[৩৮৯] অ্যারবেরি, এ. জে. (১৯৬৭) পোয়েমস অভ আল-মুতানাব্বি। ক্যাম্ব্রিজ: ক্যাম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ১-১৮
[৩৯০] এসবের উদাহরণের মধ্যে আছে পিকাসোর শিল্পকর্মের পুনর্সৃষ্টি। http://www.sohoart.co/artist/Pablo-Picasso.html [Accessed 6th October 2016].
[৩৯১] দেখুন: টেক্সচুয়াল ইন্টেগ্রিটি অভ দা বাইবেল। http://www.islamicawareness.org/Bible/Text/ [Accessed 7th October 2016].
[৩৯২] কুরআন, ১৮:১০৯
[৩৯৩] মুহাম্মাদ নামটির উল্লেখ আছে ৪ বার। আহমাদ (তাঁর অন্য এক নাম) নামটির উল্লেখ আছে ১ বার। দেখুন: http://corpus.quran.com/search.jsp?q=muhammad and http://corpus.quran.com/search.jsp?q=ahmad [Accessed 24th October 2016].
[৩৯৪] "মুহাম্মাদ তোমাদের কারও বাবা নন। সে আল্লাহর বাণীবাহক। নবিদের সিলমোহর। আল্লাহ সবকিছু জানেন।" কুরআন, ৩৩:৪০
[৩৯৫] কুরআন, ৮১:২২
[৩৯৬] কুরআন, ৫৩:২
[৩৯৭] কুরআন, ৪:২৯
[৩৯৮] লিঙস, এম. (১৯৮৩) মুহাম্মাদ: হিজ লাইফ বেইসড অন দা আর্লিয়েস্ট সোর্সেস, পৃষ্ঠা ৩৪।
[৩৯৯] প্রাগুক্ত।
[৪০০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩-৭৯
[৪০১] ওয়াট, ডব্লিউ. এম. (১৯৫৩) মুহাম্মাদ অ্যাট মেক্কা। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৫২।
[৪০২] বুখারি
[৪০৩] মুসলিম
[৪০৪] মুসলিম
[৪০৫] জারাবোজো, জামালদু-দিন। খণ্ড ১। (১৯৯৯) কমেন্টারি অভ দা ফরটি হাদিথ অভ আন-নাওয়াওয়ি। আল-বাশির পাবলিকেশনস অ্যান্ড ট্র্যান্সলেশানস, পৃষ্ঠা ২৭০।
[৪০৬] বুর্জ খালিফা। (২০১৬) ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগারস। Available at: http://www.burjkhalifa.ae/en/thetower/factsandfigures.aspx [Accessed 1st October 2016].
[৪০৭] ক্যারিংটন, ডি. (২০১৪)। সাউদি আরাবিয়া টু বিল্ড ওয়ার্ল্ডস টলেস্ট টাওয়ার, রিচিং ওয়ান কিলোমিটার ইনটু দা স্কাই। http://edition.cnn.com/2014/04/17/world/meast/saudi-arabia-to-build-tallest-buildingever/ [Accessed 1st October 2016].
[৪০৮] জাকারিয়া, এ. (২০১৫)। দা এটার্নাল চ্যালেঞ্জ: আ জার্নি থ্রু দা মিরাকুলাস কুরআন। লান্ডান:

ওয়ান রিজন, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।

[৪০৯] ইবনু আবু শাইবা। এই বর্ণনাটির বর্ণনাপরম্পরা শেষ হয়েছে এক সাহাবিতে গিয়ে। আলিমেরা বলেন, বর্ণনাপরম্পরার কারণে এবং যেহেতু এখানে অদৃশ্যের জ্ঞানের বিষয়ে বলা, সেজন্য এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য। কোনো কোনো আলিম বলেন, সাধারণত, ওয়াহির—যেমন নবিজির কথা বা শিক্ষা—জ্ঞাননির্ভরনা হলে ধর্মতত্ত্বের কোনো বিষয়ে সাহাবিরা নিজস্ব মত দেবেন না।

[৪১০] ড্রাপার, জে. ডব্লিউ (১৯০৫) হিস্টোরি অভ দা ইন্টেলেকচুয়াল ডিভেলপমেন্ট অভ য়োরোপ। নিউ য়র্ক অ্যান্ড লান্ডান: হার্পার অ্যান্ড ব্রাদার্স পাবলিশার্স। খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০।

[৪১১] দেখুন এম. এম আজমি (১৯৭৮) স্টাডিজ ইন আর্লি হাদিথ লিটারেচার। ইন্ডিয়ানাপোলিস। ইন্ডিয়ানা: অ্যামেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশানস।

[৪১২] আবু দাউদ, তিরমিজি

[৪১৩] বুখারি, আল-আদাবুল-মুফরাদ

[৪১৪] তিরমিজি

[৪১৫] বুখারি

[৪১৬] প্রাগুক্ত

[৪১৭] মুসলিম

[৪১৮] তিরমিজি

[৪১৯] প্রাগুক্ত।

[৪২০] বুখারি ও মুসলিম

[৪২১] তিরমিজি

[৪২২] বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনু মাজাহ

[৪২৩] মুসলিম

[৪২৪] ইবনু হিব্বান

[৪২৫] ইবনু মাজাহ

[৪২৬] আহমাদ

[৪২৭] প্রাগুক্ত।

[৪২৮] আবু দাউদ, তিরমিজি

[৪২৯] বুখারি, তারিখুল-কাবির

[৪৩০] তাবারানি

[৪৩১] বুখারি

[৪৩২] প্রাগুক্ত

[৪৩৩] আহমাদ, তিরমিজি

[৪৩৪] বুখারি

[৪৩৫] বুখারি, মুসলিম, আহমাদ

[৪৩৬] বুখারি, মুসলিম

[৪৩৭] বুখারি

[৪৩৮] মুসলিম

[৪৩৯] বুখারি

[৪৪০] প্রাগুক্ত

[৪৪১] ইবনু মাজাহ

[৪৪২] মুসলিম
[৪৪৩] তিরমিজি
[৪৪৪] মুসলিম
[৪৪৫] প্রাগুক্ত
[৪৪৬] প্রাগুক্ত
[৪৪৭] বুখারি
[৪৪৮] বুখারি ও মুসলিম
[৪৪৯] বুখারি
[৪৫০] প্রাগুক্ত
[৪৫১] প্রাগুক্ত
[৪৫২] বুখারি ও মুসলিম
[৪৫৩] বুখারি
[৪৫৪] আন-নাসাই
[৪৫৫] মুসলিম
[৪৫৬] আহমাদ
[৪৫৭] ইবনু মুসা আল-য়াহসুবি, কিউ. আই. (২০০৬)। মুহাম্মাদ মেসেঞ্জার অভ আল্লাহ: আশ-শিফা অভ কাদি ইয়াদ। অনুবাদ: আইশা আবদুর-রাহমান বেওলি। কেইপ টাউন: মাদিনা প্রেস, পৃষ্ঠা ৫৫।
[৪৫৮] বুখারি ও মুসলিম
[৪৫৯] প্রাগুক্ত
[৪৬০] বায়হাকি, ইবনু হিব্বান, তাবারানি, আবু নুয়াইম
[৪৬১] মুসলিম
[৪৬২] আস-সাল্লাবি, এম. এ. (২০০৫) দা নোবল লাইফ অভ দা প্রফেট। খণ্ড ৩: রিয়াদ: দারুসসালাম, পৃষ্ঠা ১৭০৭ এবং ১৭১২।
[৪৬৩] তিরমিজি
[৪৬৪] প্রাগুক্ত
[৪৬৫] প্রাগুক্ত
[৪৬৬] প্রাগুক্ত
[৪৬৭] ইবনুল কায়্যিম, এস. (১৯৯৮) যাদুল-মা'আদ। সম্পাদানঃ শুয়াইব আরনাউত এবং আবদুল-কাদির আরনাউত, খণ্ড ৩। বৈরুত: মু'আসসাসা আর-রিসালাহ, পৃষ্ঠা ৫০-৫১। অনলাইন কপি দেখতে: http://ia801308.us.archive.org/0/items/FP37672/03_37674.pdf [Accessed 1st October 2016].
[৪৬৮] বুখারি
[৪৬৯] বুখারি, মুসলিম, আহমাদ
[৪৭০] বুখারি, মুসলিম
[৪৭১] ইবনু মাজাহ, হাকিম
[৪৭২] তিরমিজি
[৪৭৩] বুখারি, মুসলিম
[৪৭৪] তিরমিজি
[৪৭৫] প্রাগুক্ত

[৪৭৬] কুরআন, ৫:৮
[৪৭৭] কুরআন, ৪:১৩৫
[৪৭৮] কুরআন, ৯০:১২-১৮
[৪৭৯] ইবনু হিশাম, এ. (১৯৫৫) আস-সিরা আন-নাবাউয়িয়্যা। কায়রো: মুস্তাফা আল-হালাবি অ্যান্ড সনস। খণ্ড ১। পৃষ্ঠা ৫০১-৫০৪
[৪৮০] আর্মস্ট্রং, কে. (১৯৯৭)। আ হিস্টোরি অভ জেরুজালেম: ওয়ান সিটি থ্রি ফেইথস। নিউ য়র্ক: ব্যালেন্টাইন বুকস, পৃষ্ঠা ২৪৫।
[৪৮১] কোহেন, এ. (১৯৯৪) আ ওয়ার্ল্ড উইদিন: জিউয়িশ লাইফ অ্যাজ রেফলেক্টেড ইন মুসলিম কোর্ট ডকুমেন্টস ফ্রম দা সিজিল অভ জেরুজালেম (XVI সেনচুরি)। পার্ট ওয়ান। ফিলাডেলফিয়া: দা সেন্টার ফর জুডাইক স্টাডিজ, য়ুনিভার্সিটি অভ পেনসিলভ্যানিয়া, পৃষ্ঠা ২২-২৩।
[৪৮২] তাবারি, এম. এস. (১৯৬৭। তারিখ তাবারি: তারিখ আর-রাসুল ওয়াল-মুলুক। সম্পাদনা: মুহাম্মাদ ইবরাহি। খণ্ড ৩, ৩য় সংস্করণ। কায়রো: দারুল-মা'আরিফা, পৃষ্ঠা ৬০৯।
[৪৮৩] উদ্ধৃত হয়েছে, ওয়াকার সি. জে. (২০০৫) ইসলাম অ্যান্ড দা ওয়েস্ট: আ ডিসোন্যান্ট হারমনি অভ সিভিলাইজেশানস। গ্লুসেস্টার: সুটন পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ১৭।
[৪৮৪] আল-খারাজ বইতে য়াহ্য়া বিন আদাম থেকে।
[৪৮৫] তাবারানি, আল-মু'জামুল-আওসাত
[৪৮৬] আল-কারাফি, এ. (১৯৯৮) আল-ফুরুক, খণ্ড ৩। ১ম সংস্করণ। সম্পাদনা: খালিল আল-মানসুর। বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৯।
[৪৮৭] উদ্ধৃত হয়েছে, ওয়াকার, সি. জে. (২০০৫) ইসলাম অ্যান্ড দা ওয়েস্ট: আ ডিসোন্যান্ট হার্মনি অভ সিভিলাইজেশনস, পৃষ্ঠা ১৭।
[৪৮৮] ডজি, আর. (১৯১৩)। আ হিস্টরি অভ মুসলিম ইন স্পেন। লান্ডান: শাতো অ্যান্ড উইন্ডুস, পৃষ্ঠা ২৩৫।
[৪৮৯] আর্নল্ড, টি. (১৮৯৬)। দা প্রিচিং অভ ইসলাম: আ হিস্টোরি অভ দা প্রোপাগেশান অভ দা মুসলিম ফেইথ। ওয়েস্টমিনিস্টার: আর্চিব্যান্ড কন্সট্যাবল অ্যান্ড কোং., পৃষ্ঠা ৫৬।
[৪৯০] কুরআন, ২:২৫৬।
[৪৯১] বোনার, এম. (২০০৬)। জিহাদ ইন ইসলামিক হিস্টরি। প্রিন্সেটন: প্রিন্সেটন য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০।
[৪৯২] হাল্লাক, ডব্লিউ. বি. (২০০৯) শারিয়া: থিয়োরি, প্র্যাকটিস অ্যান্ড ট্র্যান্সফরমেশান। নিউ য়র্ক: ক্যামব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৩৩২।
[৪৯৩] ইবনু জানজাউইয়া, এইচ. এস. (১৯৮৬) কিতাবুল-আমওয়াল। সম্পাদনা: শাকির ফিয়াদ। মাক্কা: মারকাজ আল-মালিক ফাইসাল, পৃষ্ঠা ১৬৯-'৭০।
[৪৯৪] ম্যানসেল, পি. (১৯৯৫)। কন্সট্যান্ট্যানিপল: সিটি অভ দা ওয়ার্ল্ডস ডিজায়ার, ১৪৫৩-১৯২৪। লান্ডান: পেঙ্গুইন বুকস, পৃষ্ঠা ১৫।
[৪৯৫] কুরআন, ৪৯:১৩
[৪৯৬] সাহিহ ইবনু হিব্বান, ফাদালা বিন উবাইদ থেকে ইবনু হিব্বানের নিজ সূত্রে; এবং বায়হাকি
[৪৯৭] গিব, এইচ. আর. (২০১২) উইদার ইসলাম? আ সার্ভে অভ মডার্ন মুভমেন্টস ইন দা মোজলেম ওয়ার্ল্ড। অ্যাবিংডন: রাউটলেজ, পৃষ্ঠা ৩৭৯
[৪৯৮] টয়েনবি, এ. জে. (১৯৪৮) সিভিলাইজেশান অন ট্রায়াল। নিউ য়র্ক: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ২০৫।

[৪৯৯] 513
[৫০০] রবিনসন, ভি. (১৯৩৬)। দা স্টোরি অভ মেডিসিন। নিউ য়র্ক: টুডর পাবলিশিং কোম্প্যানি, পৃষ্ঠা ১৬৪।
[৫০১] স্যাব্রি, ডব্লিউ, এম., এবং ভোহরা, এ. (২০১৩)। রোল অভ ইসলাম ইন দা ম্যানেজমেন্ট অভ সাইকিয়াট্রিক ডিজঅর্ডার্স। ইন্ডিয়ান জার্নাল অভ সাইকিয়াট্রি, ৫৫ (সাপ্লিমেন্টারি ২), এস২০৫-এস২১৪।
[৫০২] বাদ্‌রি, এম. (২০১৩)। আবু যাইদ আল-বালখি'স সাস্টিন্যান্স অভ দা সৌল: দা কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি অভ আ নাইন্থ সেঞ্চুরি ফিজিশিয়ান। সারে: ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অভ ইসলামিক থট।
[৫০৩] বুখারি
[৫০৪] কুরআন, ১০:২৪
[৫০৫] কুরআণ, ৯৬:১-৫
[৫০৬] কুরআন, ৩৯:৯
[৫০৭] কুরআন, ৮৮:১৭-২০
[৫০৮] কুরআন, ৩:১৯০-১৯১।
[৫০৯] দেখুন স্টেফান্স, বি (২০০৭) ইবনু হাইসাম: প্রথম বিজ্ঞানী। গ্রিনসবোরো, এনসি: মর্গান রেনল্ডস পাবলিশিং।
[৫১০] লিন্ডবার্গ, ডেভিড সি. (১৯৯২)। দা বিগিনিংস অভ ওয়েস্টার্ন সায়েন্স। শিকাগো: দা য়ুনিভার্সিটি অভ শিকাগো প্রেস, পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৩।
[৫১১] স্টেফান্স, বি (২০০৭) ইবনু হাইসাম: ফার্স্ট সায়েন্টিস্ট, পৃষ্ঠা ২৭।
[৫১২] বিস্তারিত দেখুন: আল-জাজাইরি, এস. ই. (২০০৫) দা হিডেন ডেব্‌ট টু ইসলামিক সিভিলাইজেশান। অক্সফোর্ড: বাইতুল-হিকমা প্রেস; স্যালিবা, জি (২০০৭) ইসলামিক সায়েন্সেস অ্যান্ড দা মেকিং অভ য়োরোপিয়ান রেনেসাঁ। ম্যাসাচুসেটস: এমআইটি প্রেস।
[৫১৩] স্যালিবা, জি (২০০৭) ইসলামিক সায়েন্সেস অ্যান্ড দা মেকিং অভ য়োরোপিয়ান রেনেসাঁ। ম্যাসাচুসেটস: এমআইটি প্রেস, পৃষ্ঠা ১।
[৫১৪] আর্নল্ড, টি. (১৮৯৬) দা প্রিচিং অভ ইসলাম, পৃষ্ঠা ১১২।
[৫১৫] হিউলেট প্যাকার্ড। ক্যারলি ফিয়োরিনা স্পিচেস। টেক্নলজি, বিজনেস অ্যান্ড ওয়ে অভ লাইফ: ওয়াট'স নেক্সট. (২০০১) http://www.hp.com/hpinfo/execteam/speeches/fiorina/minnesota01.html [Accessed 10th September 2016].
[৫১৬] স্মিথ, এ. (১৮৬৯) দা এসেস অভ অ্যাডাম স্মিথ। লান্ডান: অ্যালেক্স মুরে, পৃষ্ঠা ৩৫৩।
[৫১৭] ইবনু কায়্যিম, এস. (২০০৫)। আল-ওয়াবিল আস-সায়্যিব। সম্পাদনা: আবদুল্লাহ কা'য়ির এবং বাক্‌র আবু জাইদ। মাক্কা: দার আলিম আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা ১০৯। অনলাইন কপি নামানো যাবে এখান থেকে: http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=26489&d=1363130186 [Accessed 1st October 2016].
[৫১৮] কুরআন, ৪৭:১৯
[৫১৯] কুরআন, ৭:১৮০
[৫২০] কুরআন, ৪:৪৮
[৫২১] কুরআন, ২৫:৬৮-৭০

[৫২২] কুরআন, ২৩:৯৯-১০০

[৫২৩] কুরআন, ৩:১১৭

[৫২৪] কুরআন, ৮:৫১

[৫২৫] ইমাম আহমাদ এবং ইবনু হিব্বান বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে। হাদিসটি এমন: বিচারদিনে ৪ ধরনের মানুষ আল্লাহর কাছে (ওজর পেশ করবে)। যে বয়রা মানুষ কখনো কিছু শোনেনি, পাগল, থুরথুরা বুড়ো এবং ঈসা ও মুহাম্মাদ নবির মধ্যবর্তী সময়ে যিনি মারা গিয়েছেন। বয়রা লোক বলবেন, "প্রভু গো, ইসলাম তো এসেছিল, কিন্তু আমি যে কখনো কিছু শুনিনি।" পাগল লোক বলবেন, "প্রভু গো, ইসলাম তো এসেছিল; কিন্তু ছেলেপেলে আমার পিছে পিছে দৌড়াত, আমাকে পাথর ছুড়ত।" থুরথুরো বুড়ো বলবেন, "প্রভু গো, ইসলাম তো এসেছিল; কিন্তু আমি যে তখন কিছুই বুঝতাম না।" ফাতরার সময় মৃত্যুবরণকারী বলবেন, "প্রভু গো, আপনার কোনো রাসুল আমার কাছে আসেননি।" আল্লাহ তখন তাদের আনুগত্যের ওয়াদা নেবেন। তাদের বলা হবে আগুনে ঝাঁপ দিতে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর কসম, তারা যদি ঝাঁপ দেয়, ওটা শীতল হয়ে যাবে, তাদের জন্য নিরাপদ হবে।" এটা ছাড়াও আরও কিছু হাদিস এবং কুরআনের আয়াত থেকে বোঝা যায় ইসলামের সঠিক বার্তা কেউ পাবার পর অস্বীকার করলেই কেবল তাকে জাহান্নামে ঢোকানো হবে।

[৫২৬] গাজালি, এম. এ. (১৯৯৩) ফায়াসলিত-তাফ্রিকা বাইনাল-ইসলামি ওয়াল-জানদাক। সম্পাদনা: এম. বেজু। দামাস্কাস, পৃষ্ঠা ৮৪। অনলাইন কপি পাওয়া যাবে এখান থেকে: http://ghazali.org/books/fiysalbejou.

pdf [Accessed 21st November 2016].

[৫২৭] প্রাগুক্ত

[৫২৮] কুরআন, ৩:১১৩। আয়াতটিতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বোঝানো হয়েছে। তবে মূলনীতি সব শ্রেণির মানুষের জন্য খাটে।

[৫২৯] প্রাগুক্ত।

[৫৩০] বুখারি।

[৫৩১] কুরআন, ৭:৫৫

[৫৩২] কুরআন, ৪০:১

[৫৩৩] কুরআন, ২০:১৪

[৫৩৪] কুরআন, ২:২৯

[৫৩৫] কুরআন, ৭:১৯১-১৯৪

[৫৩৬] কুরআন, ৩৫:৩

[৫৩৭] কুরআন, ৯৬:৬-৭

[৫৩৮] কুরআন, ৯২:৮-১২

[৫৩৯] কুরআন, ১৪:৩৪

[৫৪০] ফ্রম, ই. (১৯৫৬) দা আর্ট অভ লাভিং। নিউ য়র্ক: হার্পার অ্যান্ড রো, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯

[৫৪১] আল-গাজালি (২০১১) আল-গাজালি অন লাভ, লঙ্গিং, ইন্টিম্যাসি অ্যান্ড কন্টেন্টমেন্ট। ভূমিকা এবং টীকাসহ অনুবাদ: এরিক অর্মসবি। ক্যাম্ব্রিজ: দা ইসলামিক টেক্সটস সোসাইটি। পৃষ্ঠা ২৫।

[৫৪২] কুরআন, ৫৫:১-২

[৫৪৩] আবু দাউদ

[৫৪৪] আল-গাজালি (২০১১) আল-গাজালি অন লাভ, লঙ্গিং, ইন্টিম্যাসি অ্যান্ড কন্টেন্টমেন্ট, পৃষ্ঠা ২৩।

[৫৪৫] কুরআন, ৩:৩১

[৫৪৬] কুরআন, ৫১:৫৬

[৫৪৭] আল্লাহকে মানার কারণস্বরূপ নবিজিকে মানা। এটা তাঁরই আদেশ।

[৫৪৮] আল-গাজালি (২০১১) আল-গাজালি অন লাভ, লঙ্গিং, ইন্টিম্যাসি অ্যান্ড কন্টেন্টমেন্ট, পৃষ্ঠা ১২০-১২১।

[৫৪৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩।

[৫৫০] মাহালি, জে. এবং আস-সুয়ুতি, জে. (২০০১) তাফসিরুল-জালালাইন, পৃষ্ঠা ৩০২।

[৫৫১] কুরআন, ১১: ১১৮-১১৯

[৫৫২] কুরআন, ২৫:৪৩-৪৪

[৫৫৩] টোয়েঞ্জ জেএম, এবং কেসার টি.। Generational changes in materialism and work centrality, 1976-2007: Associations with temporal changes in societal insecurity and materialistic role modeling. Personality and Social Psychology Bulletin. 2013,. 39 (7) 883-897; DOI: 10.1177/0146167213484586.

[৫৫৪] Opree SJ, Buijzen M, & Valkenburg PM. Lower life satisfaction related to materialism in children frequently exposed to advertising. Pediatrics. 2012, 130 (3) e486-e491; DOI: 10.1542/peds.2011-3148.

[৫৫৫] কুরআন, ৫৯:১৯

[৫৫৬] কুরআন, ৩৯:২৯

[৫৫৭] উদ্ধৃত হয়েছে রিফাত, এইচ. (১৯৬৮) দা মেইন ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া ইন দা রাইটিংস অভ মুহাম্মাদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮)। ডারহাম থিসিস, ডারহাম য়ুনিভার্সিটি। http://etheses.dur.ac.uk/7986/2/7986_4984-vol2.PDF?UkUDh:CyT [Accessed 6th October 2016].

[৫৫৮] হামজা ইউসুফের এক রিমাইন্ডার থেকে এই অধ্যায়ের বিন্যাস ও বিষয়গুলো অভিযোজিত। বেস্ট অভ হামজা ইউসুফ।

[৫৫৯] কুরআন, ৮২:৬

[৫৬০] কুরআন, ২০:৪৪

[৫৬১] আল-কুরতুবি, এম. (২০০৬) আল-জামি আল-আহকাম আল-কুরআন, পৃষ্ঠা ৬৫।

[৫৬২] কুরআন, ১৬:১২৫

[৫৬৩] আল-জামাখশারি, জে. (২০০৯) তাফসির আল-কাশশাফ আন হাকায়িক আত-তানজি। সম্পাদনা: খলিল শায়হা। বৈরুত: দারুল মারেফা, পৃষ্ঠা ৫৮৮।

[৫৬৪] কুরআন, ১৪:২৪-২৭

[৫৬৫] কুরআন, ৪১-৩৪

পিডিএফ বানানো অত্যাধিক ঝামেলার কাজরে ভাই

— PDF Maker (illegal)

নাস্তিকদের প্রধান অস্ত্র হলো বিজ্ঞান এবং দর্শন। এ দুটো বিষয়ের মারপ্যাঁচে তারা এমন একটা ভাব দাঁড় করাতে চায় যেন দুনিয়ার তাবত বিজ্ঞান আর দর্শনের মূলমন্ত্র হলো একটাই—ধর্ম হটাও। আসলেই কি তা-ই? বিজ্ঞান কি সত্যিই খেদিয়ে বিদেয় করে দেয় ধর্মকে? দর্শন কি আসলেই অবান্তর বলে মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে?

বিজ্ঞানের যে-ব্যাপারগুলোকে রংচং মাখিয়ে, দর্শনের যে-বিষয়গুলোকে ধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিকেরা দাঁড় করাত, ঠিক সেই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে একে একে সেগুলোর অপনোদন করা হয়েছে এই বইতে। সেই সাথে সত্য ধর্ম আর সত্য উপাস্যের দিকেও আহ্বান আছে এখানে।

ISBN 978-984-8046-00-5

www.seanpublication.com